অজেয় রায়
রহস্য সমগ্র
সংগ্রহ ও সম্পাদনা
অরিন্দম দীঘাল ও সমুদ্র বসু

অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ - অজেয় রায়
Anusandhanir Rahassabed by Ajeo Ray
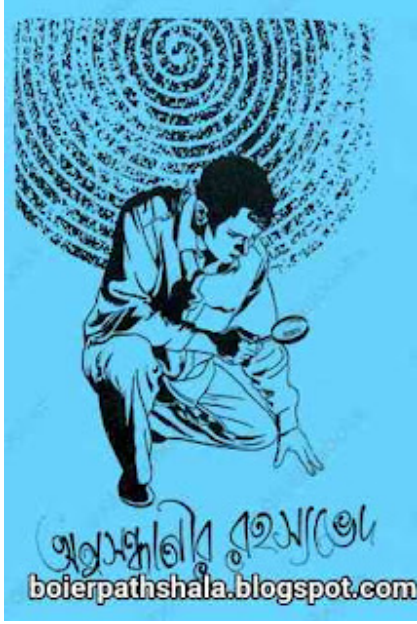
বিকেল প্রায় চারটে। দক্ষিণ কলকাতায় যতীন দাস রোডে একটি বাড়ির সামনে থামল জয়। ছোট দোতলা বাড়ি। দোতলায় ওঠার দরজার পাশে দেয়ালে কাঠের ফলকে লেখা-পুলক রায়, অনুসন্ধানী।

জয় কলিংবেল টিপল। দরজা খুলল হরিহর।

পুলকের পড়ার ঘর থেকে ডাক এল, "এসো জয়, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। আসছ কোত্থেকে?"

"ন্যাশনাল লাইব্রেরি।" "এক্ষুনি বেরোতে হবে। যাবে আমার সঙ্গে? সময় আছে?" "তা আছে। কী ব্যাপার?"

"চুরি। তবে ঠিক কী হয়েছে এখনও কিসসু জানি না। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি টেলিফোন করেছিলেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে এক্ষুনি। তারপর জানা যাবে পুরো ব্যাপারটা। তবে ব্যানার্জিসাহেব যখন তাগাদা দিয়েছেন ব্যাপার নিশ্চয় ঘোরালো।"

'নাম আর ঠিকানাটা শুধু জেনেছি। নাম বিশ্বনাথ মজুমদার। নিবাস নিকটেই, সদানন্দ রোডে। বয়স্ক, বিপত্নীক। পয়সা আছে। ঠিকেদারি ব্যবসা করতেন।

ব্যানার্জিসাহেবের বিশেষ পরিচিত। একজন দক্ষ প্রাইভেট ডিটেটিভের খোঁজ চেয়েছেন। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি আমার নাম করেছেন। চা খাবে?"

জয় বলল, "না। স্রেফ ঠান্ডা কুঁজোর জল। যা গরম, পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিই।" জয় গা এলিয়ে বসল।

পুলক রায়ের বয়স ত্রিশ টুয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। পাকা ছ'ফুট লম্বা। দোহারা বলিষ্ঠ গড়ন। ধারালো মুখ। পরনে হাফ-হাতা শার্ট ও ট্রাউজার্স। কথা বলে ঠাণ্ডা গলায়।

জয়ের বয়স চব্বিবশ। লম্বায় পুলকের কাছাকাছি। তবে কিঞ্চিৎ রোগাটে। রং ফর্সা। টিকালো না। বড়-বড় চোখ। পরনে পাঞ্জাবি ও পাজামা।

হরিহর জল আনল। এক চুমুকে গ্লাস নিঃশেষ করে, মিনিটখানেক জিরিয়েই খাড়া হল জয়, "চলো পুলকদা।" কালীঘাটে সদানন্দ রোডে মস্ত এক দোতলা বাড়ির সামনে থামল পুলক ও জয়। "এই বাড়ি," নোটবইয়ে লেখা ঠিকানার সঙ্গে মিলিয়ে জানাল পুলক। গেট ঠেলে ঢুকল দু'জনে। একফালি গাড়িবারান্দা পার হল। তারপর সদর দরজার কলিংবেল টিপল।

দরজা খুলে গেল, "কাকে চাই?" মাঝবয়সি একটি লোক উকি মেরে প্রশ্ন করল। তার গা খালি। খাটো ধুতি পরা। দেখে মনে হয় বাড়ির পরিচারক।

"বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার। বলবে, ব্যারিস্টার ব্যানার্জি পাঠিয়েছেন," বলল পুলক।

কৌতহলী চোখে কয়েক পলক আগন্তুকদের নজর করে লোকটি বলল, "বসুন, বাবাকে বলছি।"

বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসল পুলকরা। লোকটি ভিতরে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। ডাকল, "আসুন ওপরে, বাবুর ঘরে।"

প্রথমে বৈঠকখানা। গলিমোড়া দামি সোফাসেট সাজানো। দেয়ালে ফ্রেমে আটকানো বড়-বড় কয়েকটা ছবি। হাতে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে চওড়া বারান্দা। একটু বাঁয়ে হেঁটে ওপরে ওঠার সিড়ি। লোকটি সিড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, পিছনে জয় ও পুলক। বাড়ির আকৃতি সেকেন্ড ব্রাকেটের

মতো। জয় এক নজরে দেখে নিল একতলাটা। সিমেন্ট বাধানো চৌকো মস্ত চত্বরে তিন দিক ঘিরে টানা-বারান্দা। বারান্দার লাগোয়া পর-পর ঘর। তাদের দেখে ঘোমটা টেনে সরে গেলেন লাল-পাড় শাড়ি পরা মাঝবয়সি খুব ফর্সা মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা। সিড়ি ভাঙতে ভাঙতে পুলক জিজ্ঞেস করল লোকটিকে, “বাবু নিচে নামেন না?” জবাব হল, "নামেন। আজ নামবেন না। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে কিনা, তাই।”

দোতলায় সিড়ির মুখ থেকে কোনাকুনি ভাবে দুধারে রেলিং দেওয়া বারান্দা চলে গিয়েছে। এই তলাতেও অনেক ঘর। ঘরগুলোর দরজা-জানলার কোনোটার পাল্লা বন্ধ, কোনোটার পর্দা টানা। একটিও মানুষের দর্শন মিলল না। দোতলায় উঠেই, সোজাসুজি বারান্দায় দেওয়াল ঘেঁষে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা বড় অ্যাকোয়ারিয়াম। আর রেলিংয়ের ধারে ধারে খানিক তফাতে-তফাতে নিচু টুলের ওপর রাখা সুদৃশ্য চিনেমাটির টবে চারটি চার রকম ক্যাকটাসগাছ। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে নানা আকারের নুড়িপাথর, বালি ও আঁকাবাকা শুভ্র প্রবাল ফসিল। কয়েক জাতের বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির ছোট-ছোট মাছ খেলছে তার জলে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দাড়িয়ে পড়ল পুলক। জয় জানে, এককালে পুলকের অ্যাকোয়ারিয়ামের শখ ছিল।

‘রঙিন মাছ কে পোষে?" পুলক জিজ্ঞেস করে। “আজ্ঞে শিববাবু, উত্তর দেয় লোকটি। “আর ওই গাছ?” ক্যাকটাসগুলো দেখায় পুলিশ।

“গাছের শখ বড়দাদাবাবুর। ওধারে বারান্দাতেও আছে কয়েকটা। ওই যে লোকটি আঙুল দেখায়।

সিড়ি পাক খেয়ে উঠে গেছে ছাদে। সিডি, বারান্দার মেঝে, দেওয়াল ঝকঝকে তকতকে। সব মিলিয়ে এই বাড়ির বাসিন্দাদের সচ্ছল অবস্থা এবং সুরুচির পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে।

পথপ্রদর্শকের পিছু-পিছু সোজা চলেছে পুলকরা। হঠাৎ এক বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, “কে, কে?”

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলক ও জয়। সঙ্গের লোকটি ইঙ্গিত করল, এগিয়ে চলুন। অরপর সে নিচু গলায় বলল, “আজ্ঞে আমি ছোড়দাদু, গোবিন্দ। ঘর থেকে ফের প্রশ্ন হল, “ও। তোর সঙ্গে কারা?

বড়বাবুর কাছে এয়েছেন, গোবিন্দ নামে লোকটি জবাব দিল। বলতে বলতেই সে এগোয়। এবং পরের পরের ঘরের সামনে থামে। পর্দা ঢাকা দরজার সামনে গিয়ে গোবিন্দ বলল, “বাবু, ওঁরা এয়েছেন।”

“ভেতরে নিয়ে আয়,”ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে ঘরের ভিতর থেকে। গোবিন্দ পুলকদের বলল, "বাবু, জুতো বাইরে খুলে ঢোকেন।” জুতো খুলে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল পুলক ও জয়। দরজার কপাট খোলাই ছিল।

ঘরের মাঝখানে এক পালঙ্ক। মাথার ওপর ঘুরছে ফ্যান। হলুদ-রঙা বেডকভারে ঢাকা বিছানায় একটা গোঙ্গা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া মানুষটিকে দেখে ভয় থমকে গেল। শীর্ণ শরীর। শুকনো হর্তুকির মতো মুখখানা। টিয়াপাখির মতো বাঁকা নাক। ঘন পাকা চুল। দাড়ি-গোঁফহীন। সরু গোল পিতলের ফ্রেমে চশমার কাচের পিছনে ঈষৎ রক্তাভ দুই চোখে তীর চাউনি। গৌরবর্ণ কালের কুঞ্চনে বিবর্ণ। পরনে ধুতি ও সাদা ফতুয়া। বৃদ্ধ ধর দৃষ্টিতে পুলক ও জয়কে দেখে নিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

জয় এক নজর বুলিয়ে নিল ঘরে। ঘরটা বেশ বড়। প্রচুর আসবাব। কয়েকটি কাঠের চেয়ার। একটা স্টিলের আলমারি। দেয়াল-ব্যাকে অনেক বই ও বাঁধানো পত্রিকা। কোণে একটা টেবিলে কিছু ফাইল এবং কাগজপত্র। একটি আলনায় পাট করা কাপড়, গামছা ইত্যাদি। সবই সাজানো গোছানো। পুবের জানলাটা খোলা, তবে পর্দা টানা।

বৃদ্ধ ধীর স্বরে বললেন, “ব্যানার্জি পাঠিয়েছে?” ওই ক্ষীণ কাঠামোয় কণ্ঠস্বরটি কিন্তু আশ্চর্যরকম ভরাট।

“আজ্ঞে হ্যা,” জানাল পুলক।

“উত্তম, বসুন," বিশ্বনাথবাবু দেওয়াল ঘেষে রাখা চেয়ার দেখালেন। পুলক ও জয়। বসল। অতঃপর বিশ্বনাথবাবু গোবিন্দকে বললেন, “তুই এখন যা। বাইরে বারান্দায় থাক। কাউকে এখরে আসতে দিবিনে। বলবি আমার বারণ আছে। আমি এদের সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলব। দরজাটা ভেজিয়ে দিস।”

গোবিন্দ মাথা হেলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

আবার একপ্রস্থ পর্যবেক্ষণ। বিশ্বনাথবাবুর ললাটে কয়েকটি বাড়তি ভাজ পড়ে। তিনি পুলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ব্যানার্জি বলেছে কিছু?”

“সামান্যই। শুধু এটা একটা চুরির কেস, পুলকের জবাব।

হুম। আপনি পুলক রায়। অনুসন্ধানী। অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভ?” “হুম, ইয়াংম্যান। অভিজ্ঞতা আছে?” পুলক উত্তর দিল না। কেবল একচিলতে নীরব হাসি তার ঠোটের কোণে ঝিলিক দিল। “হঠাৎ এ-লাইনে কেন?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

পুলক বলল, “পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঙ্কে চাকরি করেছি বছরপাঁচেক। এই লাইনে কিছুটা অভিজ্ঞতা হল। তবে চাকরি ভালো লাগল না। ইচ্ছে হল স্বাধীনভাবে কাজ করি।”

“যাক, ব্যানার্জি যখন রেকমেন্ড করেছে, যোগ্য লোকই হবে”বুদ্ধের স্বগতোক্তি, ইটি কে?” বিশ্বনাথবাবুর চোখ এবার জয়ের ওপর।

“ওর নাম জয় দত্ত, "জানাল পুলক।

“আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট?

ওয়াটসন বুঝি?

পুলকের মুখে হাসি ফোটে। বলে, “হু, তাই হওয়ারই ইচ্ছে বটে।”

“আর কিছু করা হয়?” বুদ্ধের প্রশ্ন জয়কে লক্ষ করে।

জবাবটা পুলকই দিল - আপাতত ও মডার্ন হিস্ট্রিতে এম এ পাশ করেছে। ওকে বিশ্বাস করতে পারি ? ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।” তা পারেন,” বলল পুলক, “জয় আমার সঙ্গে আরও কেসে সাহায্য করেছে।

এ-লাইনের রীতিনীতি জানে।”

“চাটা কিছু খাবেন?” “এখন থাক,” বাধা দেয় পুলক। “হুম্।” বৃদ্ধ মাথা নিচু করে রইলেন অল্পক্ষণ। কী বলবেন গুছিয়ে নিচ্ছেন যেন মনেমনে।

বিশ্বনাথবাবু মুখ তুলে পুলককে বললেন, 'বুঝলে, আমার একটা আংটি চুরি গিয়েছে। এঃ, তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। অবশ্য তোমরা আমার ছেলের বয়সি।”

“না, না, মনে করার কী আছে? তুমিই বলুন, পুলক আশ্বাস দেয়, “তারপর?" বিশ্বনাথবাবু বলেন, “সোনার আংটি। খুব ভালো একটা হীরে বসানো। আট-দশ হাজার টাকা দাম হবে।”

“কোথায় ছিল?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

“এই ঘরে। ওই আলমারিতে," দেওয়ালের গায়ে খাড়-করা স্টিলের আলমারিটা তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। বললেন, “ওই আলমারির সাধারণ চাবি এবং লকারের চাবি দুইই ছিল আমার এই বিছানায়, মাথার বালিশের তলায়।” “কখন চুরি হয়েছে মনে হয়?” পুলকের প্রশ্ন।

গতকাল রাতে। রাত ন'টা থেকে ভোর সাতটার মধ্যে। চোর আমার বালিশের নিচে থেকে চাবি বের করে নিয়েছিল। চুরি করে ফের লকার এবং আলমারি বন্ধ করে চাবি দুটো যথাস্থানে অর্থাৎ আমার বালিশের তলায় রেখে দেয়। তবে ঠিক আগের জায়গায় রাখতে পারেনি, একটু বাইরে ছিল।” “রাত ন'টা থেকে সকাল সাতটা অবধি কি আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন?” বলল পুলক।

কারেই," জানালেন বৃদ্ধ। “এ ঘরে আর কেউ শোয়?”

“ঘরের দরজা খুলল কীভাবে?”

"কাল রাতে আমার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ছিটকিনি নিইনি। আমার হাঁটুতে বাত আছে। ব্যথা বাড়লে ঘরের দরজা রাতে ভেজানো থাকে। কারণ, যন্ত্রণা বেশি হলে গোবিন্দকে ডাকি। ও আমার পা টিপে দেয়, ওষুধ দেয়। জলতেষ্টা পেলে জল দেয়। আমার ঘর থেকে গোবিন্দকে ডাকার জন্য কলিংবেল আছে। বারবার উঠে দরজার ছিটকিনি খুলতে আমার তখন কষ্ট হয়। গোবিন্দ পাশের ঘরে শোয়, এই বারান্দার শেষ ঘরে। ওই আমার দেখাশোনা করে। কাল অবশ্য ওকে আমার প্রয়োজন হয়নি।

কারণ, কাল রাতে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলুম। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আমার হাঁটুর থাটা খুব বাড়ে। তখন রাতে মোটে ঘুমাতে পারি না। তাই ওইসব রাতে ঘুমের

ওষুধ খেতে বাধ্য হই। গতকাল ছিল অমাবস্যা।”

“আপনি যে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ঘুমের ওষুধ খান, এ খবর কে কে জানে বাড়িতে?

“অনেকেই জানে, এটা কিছু গোপন ব্যাপার নয়।”

‘আলমারিতে আর-কোনো দামি জিনিস ছিল না?" বলল পুলক।

“ছিল বইকি,” বিশ্বনাথবাবু উত্তর দেন,

“এর চেয়ে ঢের ঢের দামি জিনিস। একগাদা জড়োয়া গয়না। দুটো হার, দু’সেট কানের দুল, তিনগাছি বালা। পাঁচটা আংটি, একসেট বোতাম। সব সোনার। কোনো-কোনোটায় দামি পাথর বা মুক্তো বসানো। এ ছাড়া ছিল তিনটে আলগা জুয়েল-স্টোন, দুটো চুনি এবং একটা পোখরাজ।”

“এসব আপনি ঘরে রাখেন!” অবাক হয়ে বলল পুলক।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, “মোটেই রাখি না। ব্যাঙ্কের ভল্টে থাকে। মাত্র তিন দিন আগে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছি ভল্ট থেকে। ইচ্ছে আছে এর ভিতর থেকে একটা গয়না। দেব আমার এক ভাইঝি’র বিয়েতে। শিগগিরি তার বিয়ে। বাকি গয়না লিস্ট করে উইল করে যাব, আমার অবর্তমানে কে কী পাবে। আমার অন্য সব সম্পত্তির উইল করা হয়েছে। শুধু এই গয়নাগুলো বাকি। উইল হলে গয়না আবার ব্যাঙ্কে রেখে আসব। গতকাল সন্ধ্যায় একবার গয়নাগুলো বের করে বসি। কিন্তু শরীরটা জুত না ঠেকায় লিস্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। তুলে রাখি আলমারিতে। আজ সকাল সাড়ে দশটায় ফের বের করি। তখনই বুঝতে পারি একটা আংটি খোয়া গিয়েছে, এবং খেয়াল হয় চাবিটাও তো ঠিক জায়গায় ছিল না। ব্যানার্জিকে টেলিফোনে ধরতে দেরি হয়ে গেল। তুমি কখন খবর পেলে?"

“সাড়ে তিনটে নাগান,” জানাল পুলক। এবং বলল, “আচ্ছা, শুধু একটা আংটি নেওয়ার কারণ কিছু ভেবেছেন কি?”

“হয়তো চোর ভেবেছে শুধু মাত্র একটা আংটি মিসিং হলে আমি ধরতে পারব না। তাই মনে হয় এটা বাড়ির কারও কীর্তি। বাইরের চোর হলে সব কটাই যেত।

এবং এটা বুঝেছি, যে নিয়েছে সে বিশেষ জুয়েল চেনে না। কারণ ওখানে আর-একটা আংটি ছিল, যেটা নিয়েছে তার চেয়েও দামি।"

"নগদ টাকা ছিল কিছু লকারে?”

না। ক্যাশ আমি বাড়িতে খুব কমই রাখি। দরকারমতো ব্যাঙ্ক থেকে আনই। যা থাকে, তা আমার মানিব্যাগে। মানিব্যাগ ছিল আমার বিছানায় তোশকের তলায়। যখন চুরি টের পেলাম, বাড়ির পুরুষরা সবাই কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। তা নইলে সব্বাইকে আটকে রেখে বাড়ি সার্চ করতাম।

“গয়নাগুলো ছিল কীসে?" পুলকের প্রশ্ন।

“একটা রেশমি থলিতে।”

“ব্যাঙ্ক থেকে আপনার গয়না আনার খবর বাড়িতে কে কে জানে?" পুলক জিজ্ঞেস করে।

বিশ্বনাথবাবু বললেন, “অনেকেই জানতে পারে। সেদিন আমার মেজো ছেলের সঙ্গে ওর গাড়িতেই ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। একই সঙ্গে ফিরেছি। এখন একা-একা বাইরের কাজ করতে কষ্ট হয়। তাই বেশির ভাগ সময় কাউকে হেল্প তে সঙ্গে নিই। এরপর খবরটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। গতকালই তো সকালে আমার বড় নাতনিটি বলে গিয়েছে “দাদ, গয়না এনেছ শুনলাম। দাও না পরে দেখি কেমন মানায়। দেখবে মুন্ডু ঘুরে যাবে।

আপনি পুলিশে খবর দিলেন না কেন?" পুলক জিজ্ঞেস করে। পুলিশ এলে হুলস্থুল লাগত। পাড়ায় জানাজানি হত। বাড়ির লোক মথ হয়ৱন করতআমি তা চাই না। এখনও এই চুরির কথা বাড়িতে কাউকে বলিনি। আমি ছাড়া আর-কেউ জানে না। অবশ্য আসল চোরটি বাদে।” “আমার কাছে স চান?" স্থির চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল পুলক।

থাসম্ভব গোপন অনুসন্ধান। দোষী কে জানতে চাই। আট-দশ হাজার টাকার জিনিস খোয়া গেলে আমার যে খুৰ গায়ে লাগবে তা নয়। কিন্তু একজন লোভী, অসৎ, এই বাড়িরই কেউ চুরি করে পার পেয়ে যাবে, সেটা আমার অভিপ্রায় নয়। আংটি উদ্ধার হোক বা নাই হোক, কে দোষী সেটুকু জানতে পারলেও হবে। আদালতে নয়, আমি স্বয়ং তার শাস্তির ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া লোভী চোর এ-

যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলে ভবিষ্যতে তার সাহস বাড়বে এবং আরও বড় অপকর্মে হাত দেবে। তাই কালপ্রিট কে, অন্তত সেটা তুমি বের করে দাও।”

পুলক ধীর স্বরে জানাল, “আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।”

“উত্তম, বিশ্বনাথবাবুর মুখে খুশির বলক, “চেষ্টা করে দেখ। আংটিচোরকে ধরতে না পারলেও, তোমার চেষ্টার মূল্য, তোমার প্রাপ্য ফিজ আমি অবশ্যই দেব।”

“আজ্ঞে আমার চেষ্টা সফল না হলে আমি ফিজ নিই না,” সবিনয়ে জানাল পুলক।" “গুড, ভেরি গুড়। ব্যানার্জি ঠিক লোককেই পাঠিয়েছে।” এবার আমার কিছু প্রশ্ন আছে,” বলল পুলক। “বেশ, করো। আমি সাধ্যমতো উত্তর দেব, বিশ্বনাথবাবু জানালেন।

“প্রথমে জানতে চাই, এই বাড়িতে কে কে থাকে? কে শেন্ ঘরে? একতলায় এবং দোতলায়।”

বিশ্বনাথবাবু গড়গড় করে উত্তর দিয়ে গেলেন, “দোতলায় পশ্চিমে আমার পরে শেষ ঘরটীয় থাকে গোবিন্দ। তারপর আমার এই ঘর। এরপর বাথরুম। বাথরুমে আমার ঘর দিয়ে এবং বারান্দা দিয়ে ঢোকা যায়। তারপরের ঘরে থাকে নিশিকান্ত, আমার খুড়তুতো ভাই। এর পরের ঘরে আছে শিবু। শিবপদ। আমার নাতি হয় দূর সম্পর্কে।

সিড়ির ডাইনে উত্তরমুখো দুটো ঘর। প্রথমটায় থাকে আমার বড় ছেলে প্রমথ ও বড়

মা। তার পরেরটায় আমার বড় ছেলের একমাত্র মেয়ে কুমা। পূবদিকের বারান্দার লাগোয়া দুটো ঘর। একটা গুদাম। অন্যটা বড় বউমার ঠাকুরঘর।"

নিচের তলার ঘরগুলো একই প্যাটার্নের। এই অংশের তলায় থাকে আমার ছোট ছেলে চন্দ্রনাথ ও ছোট বউমা এবং ওদের পাঁচ বছরের ছেলে বুবাই। তারপর বাথরুম, হরেম। সিঁড়ির পাশের ঘরটা কঁকা থাকে। গেস্টরুম। আত্মীয়-স্বজন এলে থাকে।

গুলো খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার বাড়ির উত্তরে কম্পাউন্ডের ভিতর আভট হাউসে। থাকে বামুনঠাকুর, সপরিবারে।"

ক খানিক চুপ করে ভাবল। বুঝি মনে-মনে ছকে নিল বাড়িটা। তারপর বলল, এবার জানতে চাই, এই বাড়ির কে কী করেন, বয়স ইত্যাদি।

এবারও চটপট উত্তর হল, "আমার বড় ছেলে প্রমথ চাকরি করে একটা আধা-বিদেশি ফার্মে। ভালোই মাইনে পায়। তবে ইদানীং ও শেয়ার মার্কেটে ঝুঁকেছে শুনছি। বড় বউ সংসার সামলায়। শান্ত প্রকৃতির। মনটিও ভালো। বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। নাতনি ঝম পড়ে কলেজ ফাটইয়ারে।"

"নিশিকান্ত অসুস্থ। আমারই বয়সি। ওর চোখ দুটোও গিয়েছে। একেবারেই প্রায় দেখতে পায় না। ওর একমাত্র ছেলে আছে বিদেশে। স্ত্রী মারা গিয়েছে। বারাকপুরে থাকত একা। আমি এখানে এনে রেখেছি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে অনেক খেলাধুলো হই-হল্লা করেছি। সেই টান। বাড়ির লোকের অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল না আর একটি রুগণ বৃদ্ধের ভার নেয়। আমি জোর করেই এনেছি। গোবিন্দই ওর সেবাযত্ন করে।"

"শিবু মানে শিবপদর দেশের বাড়ি হুগলির এক গ্রামে। আমার এখানে আসে কলেজে পড়তে। বার-দুই ফেল করে পড়া ছেড়ে ব্যবসা ধরেছে। ইলেকট্রিকের কাজ বেশ জানে। তার ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দোকান দিয়েছে আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে। দোকান শুনেছি মল চলছে না। শুরুতে আমি তিন হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম পাঁচ বছরে শোধ করবে এই করে। চার বছরে মাত্র পাঁচশো টাকা শোধ দিয়েছে। তাগাদা লাগাচ্ছি। ছেলেটা বেশ খরচে। কিছু জমাতে পারে বলে মনে হয় না।"

"আমার ছোট ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। বছর-দশেক চাকরি করে আপাতত স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছে। ঠিকেদারি। কনস্ট্রাকশন-ফার্ম করেছে এক বন্ধুর সঙ্গে। বারণ করেছিলাম, শোনেনি। আসলে ওর পার্টনার বন্ধুটিকে আমার পছন্দ নয়। ভয় হয় লোকসান না দেয়। যাক গে, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ছোট বউমাটি কিঞ্চিৎ শৌখিন। বাইরে ঘোরেন বেশি। খরচেও আছে। আর কী জানতে চাও?

ঠাকুর-চাকর?" পুলকের প্রশ্ন।

“চাকর একজন, গোবিন্দ। একজন ঝি আছে, লক্ষ্মীর মা। আর আছে রাঁধুনি বামুন।"

“এদের কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?”।

“না। কারণ গোবিন্দ সন্দেহের উর্ধ্বে। আমার কাছে আছে তিরিশ বছর। অতি বিশ্বস্ত। বামুনঠাকুর এবং লক্ষ্মীর মা'ও পুরনো লোক। এবং বিশ্বাসী বলেই জানি। তা ছাড়া ওরা দুজন আমার ঘরে ঢোকে না। এ-ঘরে কোথায় কী থাকে ওদের পক্ষে জানার কথা নয়। আমার ঘরের যাবতীয় কাজ করে গোবিন্দ। এ-কাজ ঝি-চাকরের বলে আমার মনে হয় না। তারা গরিব মানুষ। অতগুলো দামি-দামি জিনিস হাতে পেয়ে মাত্র একটি সরিয়ে লোভ দমন করা? এতটা সংযম এবং বুদ্ধি? উহু, বৃদ্ধ মাথা নাড়েন।

পুলক বলল, “অর্থাৎ আপনি বোঝাতে চান, এই কাজ আপনার ছেলে বা আত্মীয়দের কারওঁ ?”

‘হু, তাই। আর সেইজন্যেই ব্যাপারটা চাউর হোক আমি চাই না।”

“কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?” “প্রমাণ না পেয়ে কাউকে সন্দেহ করা কি উচিত? তবে মানুষের স্বভাব অতি বিচিত্রা আর লোভ বড় শক্তিশালী রিপু।”

পুলক মাথা ঝাকিয়ে সমর্থন করল বিশ্বনাথবাবুর যুক্তি। তারপর বলল, “আলমারির চাবি যে আপনার বালিশের নিচে ছিল এ-খোজ কে কে জানতে পারে?

অনাথবাবু বললেন, “এটা আমার পুরনো অভ্যেস। রাতে মাথার বালিশের তলায় রাবির চাবি রাখি। গোবিন্দ বা মা বিছানা তুলতে এসে অনেকবার দেখেছে। এর মুখ থেকে বাড়ির অন্যরাও জানতে পারে। আগে যখন ব্যবসা করতাম, খাওয়ার পর রাতে বসে হিসেপত্র দেখতাম। ক্যাশ মিলাতাম। তারপর সব আলমারিতে তুলে রেখে চাবি রাখতাম বালিশের তলায়। তবে আমার স্ত্রী যদ্দিন জীবিত ছিলেন, মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে বসে কাজ করতাম। তারপর বসতাম বিছানায়। টেবিল-চেয়ারে বসে বেশিক্ষণ কাজ করা আমার পোষায় না। দিনে অবশ্য চাবি থাকে এই ঘরে, একটা গোপন জায়গায়। তবে চুরি টের

পাওয়ার পর চাবি এখানেই আছে। এই যে-” বিশ্বনাথবাবু বেডকভার তুলে বালিশের তলা হাতড়ে দু'টি লম্বা চাবি বের করে দেখালেন।

তিনি তিক্ত হেসে বললেন, “সাধারণ অবস্থায় কেউ আমার বালিশ হটিকালে ঠিক টের পেতাম। আমার ঘুম খুব পাতলা। তবে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ফলে, হু, বলতে পারো কেয়ারলেস হয়েছি। তবে কিনা আমার ঘর থেকে কখনও একটি জিনিসও চুরি যায়নি। বাড়ির কারও এতখানি দুঃসাহস হবে ভাবতে পারিনি।”

বিশ্বনাথবাবু, ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখে ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। ঘরের ঝকঝকে মসৃণ মেঝের দিকে তাকিয়ে পুলক বলল, “এই ঘর যখন মোছা হয়?" “প্রতিদিন সকাল এগারোটা নাগাদ,” উত্তর দিলেন বিশ্বনাথবাবু। ‘আজকে কি মোছা হয়েছে?”

“না। আজ সকালে ঘটনাটা বুঝতে পেরেই আমি গোবিন্দকে এই ঘর ঝাট দিতে বা মুছতে নিষেধ করি। কারণটা বুঝেছ? ফিংগারপ্রিন্ট।"

“হু, ঠিক করেছেন,” বলল পুলক,

“আচ্ছা গতকাল মোছর পর এ-ঘরে আপনি ছাড়া আর কে কে ঢুকেছে?”

“গোবিন্দ, বড় বউমা। এবং তোমরা দু'জন। এ-ছাড়া আর একজন, যার পরিচয় 'আমি জানি না।” “অর্থাৎ যে চুরি করেছে?”

“বড় বউমাকে আপনার সন্দেহের লিস্ট থেকে তা হলে বাদ দিচ্ছেন?” বলল পুলক।

“না, না, জোর দিয়ে তা অবশ্যই বলতে পারি না। তবে কিনা...” বিশ্বনাথবাবুর মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বোঝা গেল।

“আপনার বড় বউমা কী করতে ঘরে ঢুকেছিলেন?” জিজ্ঞেস করে পুলক।

“খাবার দিতে। বাতের ব্যথা বাড়লে আমি নিচে খাবার ঘরে খেতে যাই না। এই ঘারই থাই। ওই টেবিলটায়। বউমা দুপুর আর রাতের খাবার নিয়ে আসে। গোবিন্দ আনে চা অলখাবার। এ ছাড়া বউমা দু’বার ওষুধ খাওয়াতে এসেছে।”

পুলক চেয়ার ছেড়ে উঠল। ঘরে মেঝের ওপর চোখ রেখে গোটা ঘরে ধীরে ধীরে চক্কর খতে লাগল। পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল। কখনও-কখনও উবু হয়ে বলে ওই কাচের ভিতর দিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল মেঝের জায়গায় জায়গায়। রে সে চেয়ারে এসে বসে প্রশ্ন করল, “জুতো মানে শু পায়ে কেউ ঢুকেছিল এই ঘরে?”

"শ্যু” বিশ্বনাথবাব ভুরু কুচকেন, "না। এ ঘরে রাস্তায় সোয়া চট, জুতো পরে কোন আমি পছন্দ করি না। বউমা বা গোবিন্দ ঢোকে খালি পায়ে। আমি নিজেও বাইরের জলে বারান্দায় খুলে ঘরে ঢুকি। গোবিন্দ সেটা ঝাড়পোছ করে ঘরে রাখে।”

“কিন্তু শু পায়ে ঢুকেছিল কেউ," দৃঢ় স্বরে জানাল পুলক, “আমি ছাপ দেখছি।”

“তা হলে সেই নির্ঘাত চোর।” রাগে গরগর করে ওঠেন বৃদ্ধ। শুধু চুরির অপরাধে নয়, তার ঘরে জুতো পায়ে ঢোকাও মনে হল তাঁর রাগের কারণ।

“চণ্ডীবাবুকে একবার ডেকে আনা দরকার। আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?” জুতোর প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বিছানার পাশে টুলে রাখা টেলিফোন-যন্ত্রটি দেখাল পুলক। বিশ্বনাথবাবু বললেন, “বিলক্ষণ। চণ্ডীবাবু কে?"

“ফিংগারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। আগে পুলিশে ছিলেন। রিটায়ার্ড। এখন প্রাইভেট কাজ করেন। ওঁর ওপরের গাটে ফোন আছে চন্তীবাবুকে চাইলে ডেকে দেয়।"

চণ্ডীবাবু এলেন আধ ঘন্টার মধ্যে। মাঝারি লম্বা, পোক্ত গড়ন। ছোট করে ছাঁটা কাচা-পাকা চুল। রং রোদে পোড়া তামাটে। গম্ভীর, ভারিক্তি ধরন। গোবিন্দ তাকে পৌছে দিল বিশ্বনাথবাবুর ঘরের দোর অবধি। চণ্ডীবাবুও জুতো খুলে মোজা পায়ে ঘরে ঢুকলেন। পুলক তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বিশ্বনাথবাবুর। একটি সংক্ষিপ্ত নমস্কার জানিয়ে চণ্ডীবাবু চেয়ার নিলেন।

পুলক কাজের কথায় এল, “এই ঘরের মেঝেতে বিশেষ করে ওই আলমারির সামনে পায়ের ছাপ যা পাবেন প্রিন্ট চাই। মনে হচ্ছে জুতোর ছাপও রয়েছে। আর বিশ্বনাথবাবু এবং গোবিন্দর হাত ও পায়ের প্রিন্টটাও নেবেন।” চণ্ডীবাবু অত্যন্ত দক্ষতায় কাজ শুরু করলেন।

জয় আগে চণ্ডীবাবুর কাজের পদ্ধতি দেখেছে। তবে বিশ্বনাথবাবু মহা কৌতুহলে গলা বাড়িয়ে লক্ষ করতে থাকেন।

সন্দেহজনক ছাপের ওপর বিশেষ ধরনের পাউডার ছড়িয়ে হালকা ব্রাশ করতে ছাপ স্পষ্ট হয়। এরপর চণ্ডীবাবু ক্যামেরা বের করে ফ্ল্যাশ-বাঘের সাহায্যে অনেকগুলি ছাপের ফোটো তুললেন।

জয় ফিসফিস করে পুলককে বলল, "আলমারির হাতল আর চাবিগুলো দেখবে না? চোরের আঙুলের ছাপ পেতে পারো।"

উত্তর হল, "লাভ নেই। বিশ্বনাথবাবুর আঙুলের ছাপে অপরাধীর ফিংগারপ্রিন্ট মুছে গিয়েছে।"

পুলক ফের মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে কয়েক জায়গা লক্ষ করল। একটা কলারের সাহায্যে কিছু মাপ নিয়ে টুকে রাখল নোটবইয়ে। টেবিলের ওপর রাখা প্লাস্টিকের ঢাকাসুদু কসার গেলাসটা দেখিয়ে বলল, "এটা শেষ কে ধরেছে?

বড় বউম", জানালেন বিশ্বনাথবাবু। "তা হলে এটাও চাই," বলল পুলক, দু-একদিনের জন্য।" চণ্ডীবাবু গেলাসটা কাগজে মুড়ে ব্যাগে ভরলেন।

দু'টি সুন্দর নকশা-কাটা বাক্স দুটো খালি। পুলক বাক্স কে চাবি দিয়ে বারকয়েক আলমারি খুলল, বন্ধ করল। গয়নার রেশমি থলিটি ছাড়াও নকশা-কাটা ছোট-ছোট কাঠের বাক্স ছিল লকারে। বিশ্বনাথবাবু জানালেন যে, টো খালি। পুলক বাক্স দুটো চেয়ে নিয়ে চণ্ডীবাবুর হেফাজতে দিল। যদি ফিংগারপ্রিন্ট মেলে! বলা যায় না অপরাধ হতো ওই গগুলোও খুলেছে।

চণ্ডীবাবু বিদায় নিলেন।

পুলক বলল, "এবার আমরাও যাব। আবার কবে আসৰ বলতে পারছি না। বোধহয় -চারদিনের মধ্যেই। আপনার বাড়ির লোকজনদের সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে গোপনে। ইতিমধ্যে আপনি কাউকে কিছু বলবেন না এ-বিষয়ে। হয়তো আপনার বাড়ির লোককে জেরা করার দরকার হতে পারে ভবিষ্যতে।"

“বেশ, বিশ্বনাথবাবু সম্মতি জানালেন। “তারা রাজি হবেন তো আমার প্রশ্নের জবাব দিতে?”

“আলবত রাজি হবে। আমার হুকুম। তা নইলে আমি সত্যি পুলিশে খবর দেব। তাতে তাদের সম্মান কমবে বই বাড়বে না।”

পুলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমার কাজের বিষয়ে আগেই বলেছি। তবে চণ্ডীবাবুর বিলটা পরের বার আনব, মিটিয়ে দেবেন। হ্যা, বাড়ির কাউকে আমাদের পরিচয় এখন দেবেন না। কেউ কৌতুহল দেখালে বলবেন—আচ্ছা আপনার কোনো মামলা চলছে কি?"

বিশ্বনাথবাবু বললেন, “একটা কেন, দু-দুটো মকদ্দমা ঝুলে আছে। ব্যানাজিই আমার। ল-ইয়ার। সম্পত্তি থাকলেই এসব ঝক্কি থাকে।”

“বেশ বেশ, তা হলে বলে দেবেন, আমরা ব্যারিস্টার ব্যানার্জির লোক। মামলার কাজে এসেছি। অবশ্য পরে আমাদের আসল পরিচয় জানাজানি হবে ঠিকই," বলল পুলক।

নিশিকান্তবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে চলেছে পুলকরা, সেই খনখনে গলা ভেসে এল। আধখোলা দরজার ওধার থেকে, “কে কে?

“আজ্ঞে সেই বাবুরা ফিরছেন,” জবাব দিল গোবিন্দ। যেতে যেতে গোবিন্দ দুঃখিত স্বরে বলল, “নিশিকান্তবাবুর ভারি কষ্ট। হাঁপানির টানটা বেড়েছে। কদিন মোটে ঘুম হচ্ছে ঠায় জেগে বসে থাকেন।”

রাস্তায় যেতে যেতে জয় বলল, “পুলকদা, বিশ্বনাথবাবুর বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে তোমার গুপ্তচর বাহিনীকে লাগাবে, তাই না?"

‘কারেক্ট।” পুলক মাথা ঝাকাল।।

পুলকের কিছু গুপ্তচর আছে। তাদের কয়েকজনকে দেখেছে জয়। এরা নানা ধরনের, নানা বয়সি লোক। কারোকে দেখতে নেহাত গোবেচারা, যেন অফিসের বাবু। কেউ দারুণ

স্মার্ট, চালাক-চতুর। কেউ মাস্তান টাইপের। পয়সার বিনিময়ে এরা পুলকের নির্দেশে নানা খোজখবর জোগাড় করে দেয় গোপনে। কয়েকজন মেয়েও নাকি আছে এই দলে। কীভাবে এদের জোটাল পুলক, জয় তা জানে না। এরা সবাই নাকি পুলকের বেজায় ভক্ত এবং বিশ্বাসী।

গল্পের পরের অংশ পড়ুন এখানে

দুই

বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি পুলকরা প্রথমবার গিয়েছিল মঙ্গলবার। শুক্রবার সকালে জয় পুলরে বাড়ি যেতেই পুলক বলল, "আজ দুপুরে একবার মজুমদার বাড়ি যাব, তিনটে নাগাদি। বিশ্বনাথবাবুর দিবানিদ্রার ব্যাঘাত হবে, কিন্তু উপায় নেই। কারণ ওই সময়টা মজুমদারবাড়ি বেশ ফাকা থাকে। তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?"

"আলবত যাব," জানাল জয়। "তা হলে চলে এসো আড়াইটের মধ্যে।" জয় বলল, "মজুমদারবাড়ির লোকদের সম্বন্ধে খোজখবর কীরকম পেলে?" পুলক বলল, ই, আমার সিক্রেট সার্ভিসের রিপোর্ট কিছু মিলেছে শুনবে?" "হ্যা, হা।" জয়ের বেজায় কৌতুহল। পুলক বলে, "সন্দেহটা আপাতত কয়েকজনের ওপর সীমাবদ্ধ রেখেছি বিশেষ কারণে। এদের মঙ্গলবারের গতিবিধিটা খুব ইমপর্টেন্ট।

কারণ সোমবার রাতে আংটি চুরি করলে পরদিনই হয়তো চোর সেটা পাচার করার চেষ্টা করবে। এক এক করে বলছি। চা খাবে তো? হরিহর, চা..

"বেতের চেয়ারে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে খানিক আপনমনেই বলে চলে পুলক, বিশ্বনাথবাবুর বড় ছেলে প্রমথনাথ সেদিন যথারীতি সকাল সাড়ে ন'টায় অফিসের পথে রওনা হয়েছিলেন। উনি মিনিবাসে অফিস যান। পাড়ার আরও কয়েকজন ডালহৌসিতে অফিস করতে যায় ওই একই বাসে। তারা সাক্ষী।”

“অফিসে টিফিনের সময় উনি বেরিয়েছিলেন। নাকি এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কাছের এক রেস্তোরায়। ফেরেন সওয়া দুটোয়। বন্ধুর রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন ঠিকই। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন পৌনে দুটোয়। ওই রেস্তোরাঁ থেকে ওর অফিস পৌছতে পাচ মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। সুতরাং বাকি পঁচিশ মিনিট কী করেছেন?”

“অবশ্য অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি করেননি। ঠিক সময়েই বাস ধরে ফেরেন। সন্ধে সাতটায় আবার বেরোন। ফেরেন ন'টা নাগাদ। কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে গিয়েছিলেন। তাস খেলা হয়েছিল ঠিকই। তবে সেখানে যাওয়া-আসার পথে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন কি না বা বন্ধুর বাড়ি তাস খেলা ছাড়া আর কিছু করেছেন কি না এখনও চেক-আপ করা যায়নি।”

এবার দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রনাথ। ইনি এখন প্রতিদিন বেহালায় কাজে যান সকাল ন'টা নাগাদ, ব্রেকফাস্ট সেরে। এখানে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হচ্ছে, উনি সেটা তৈরির কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন। মঙ্গলবারও ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ন'টায় হাজির হন স্পটে। এগারোটায় সেখান থেকে যান ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এক পাটির সঙ্গে লাঞ্চ সারেন পার্কস্ট্রিটের এক হোটেলে। ফের যান বেহালায় বেলা দুটোয়। সেখানে থাকেন চারটে। অবধি। বাড়ি ফেরেন সাড়ে চারটেয়। সন্ধে ছ'টায় বেরিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে। রাত। সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরেন। রবীন্দ্রসদনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দু'জনে। চন্দ্রনাথের নিজের মোটর আছে। তাতেই যাতায়াত করেন। ব্যাঙ্কে বা হোটেলে যাওয়া-আসার পথে 'অন্য কোথাও ঢু মেরেছিলেন কি না জানা যায়নি। হ্যা, মেজোগিন্নি সন্ধে বেরুবার আগে পর্যন্ত বাড়িতেই ছিলেন।”

এবার শিবু। শিবুর অভ্যেস চা-টা খেয়ে সকাল আটটায় ওর দোকানে যাওয়া। দুপুরে সায় একটায় বাড়িতে খেতে আসে। খানিক বিশ্রাম করে। তিনটে নাগাদ

ফের দোকানে যায়। রাত আটটায় দোকান বন্ধ হলে কোনো-কোনোদিন তক্ষুনি একবার বাড়ি ঘুরে গিয়ে বার হয়। কখনও কখনও ফেরে একদম রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়, আড্ডা মেরে বা সিনেমা-টিনেমা দেখে। মঙ্গলবার ও রাত সাড়ে আটটায় বাড়ি এসে চা খেয়ে ঘণ্টাখানেক বাইরে ঘুরে আসে। হাজর-মোড়ের বান্ধব কাফেতে আল্লা মেরেছে। অবশ্য পুরো সমাটা ওইখানেই কাটিয়েছিল কি না এখনও ঠিক জানি না।”

পুলক থামল। জয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী বুঝলে?"

"বুঝলাম, মজুমদার বাড়ি থেকে এই যারা বাইরে বেরিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই আংটি পাচার করার সুযোগ পেয়েছে, উত্তর দিল জয়।

পুলক চিন্তিতভাবে বলল, ", সেটাই মুশকিল। দেখা যাক। তবে আমার এজেন্টরা এই ক'জনকে সমানে ফলো করে যাচ্ছে। খুটিনাটি খোঁজ নিচ্ছে। যদি কোনো পাওয়া যায়?

দুপুর তিনটে বাজে। ঝা-বা রোদ। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিক থেকে সদানন্দ রোড ধরে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছে পুলক ও জয়। সহসা ঝলমলে শার্ট ও চোঙা ফুলপ্যান্ট পরা কাপ্তেন টাইপের এক ছোকরা এসে দাঁড়াল সামনে। পুলক থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটিকে, “কি, লাইন ক্লিয়ার ?”

“ইয়েস স্যার," ছেলেটি উত্তর দিল।

“কোথায় গেছে?”

“দোকানে।”

“অল রাইট। তোমার এখন ডিউটি অফ;" পুলক ছেলেটিকে জানাল, “চলো জয়।” পুলক ফের এগোল মজুমদার-বাড়ির উদ্দেশে।

“কে দোকানে গেছে," উৎসুক জয় প্রশ্ন করে।

“শিবপদ। দিবানিদ্রা সেরে আপাতত তার দোকানে ফিরেছে।”

গোবিন্দ বোধহয় অপেক্ষায় ছিল। কারণ কলিংবেল টেপা মাত্র সে দরজা খুলে দিল। গোবিন্দ যখন পুলকদের বিশ্বনাথবাবুর ঘরে পৌঁছে দিল, মজুমদার-বাড়ি তখন নিঝুম। কেবল চোখের আড়ালে কলতলায় বাসন মাজার ঠুনঠান আওয়াজ কানে আসছে। গোবিন্দ বিশ্বনাথবাবু এবং নিশিকান্তবাবু ছাড়া আর কেউই বোধহয় টের পেল না পুলকদের আগমন।

নিশিকান্তবাবুর কান ফাকি দেওয়া যায়নি। ওর ঘর পেরোবার সময় আধখোলা দরজার ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, "কে?"

পর মুহূর্তে নিজেই জবাব দিলেন, “ও গোবিন্দ। আর সেই দু'জন বুঝি ?"

“আজ্ঞে হ্যা,” জানাল গোবিন্দ। বিশ্বনাথবাবুকে দেখে মালুম হল, তিনি সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন, বালিশের ওপর 'তাকিয়া চাপিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

“কী হে অনুসন্ধানী, কদূর এগোল কে?" পুলক ঘরে ঢোকামাত্র জানিতে চাইলেন বিশ্বনাথ মজুমদার।

“আজ্ঞে এখনও এগোয়নি বিশেষ। হাতড়াচ্ছি," পূলক জবাব দিয়ে কিন্তু বলল না। জয়কে বলল, “তুমি এ-ঘরে অপেক্ষা করো। আমি গোবিন্দর সঙ্গে ক'টা কথা বলতে চাই প্রাইভেটলি। চলো গোবিন্দ তোমার ঘরে।" পুলক কাউকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই গোবিন্দকে একরকম ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বনাথবাবু তির্যক চোখে দেখলেন ব্যাপারটা। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। পুলক ও গোবিন্দ চলে যেতেই বিছানায় আধশোয়া হয়ে চোখ বুজলেন। অগত্যা জয় টেবিলে রাখা দৈনিক পত্রিকাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল। মিনিট দশ-বারো বাদে এর কানে এল পায়ের শব্দ। পুলক বিশ্বনাথবাবুর ঘরে ঢুকল না, সামনে দিয়ে চলে গেল। খানিক এগিয়ে থামল পদশব্দ। অল্প কথাবার্তার আওয়াজ। নিশিকান্তবাবুর চেরা কণ্ঠস্বর। এরপর আর কিছু শোনা যায় না।

“গোবিন্দ," ডাকলেন বিশ্বনাথবাবু।

“আজ্ঞে ?” সাড়া দিয়ে ঘরে ঢোকে গোবিন্দ।

“পুলকবাবু কোথায়?” “আজ্ঞে নিশিদাদুর সঙ্গে কথা বলছেন, ওঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে।”

“ঠিক আছে, তুই যা।” গোবিন্দ বিদায় নিল।

পুলক নিশিবাবুর ঘর থেকে বেরোল মিনিট কুড়ি বাদে। ফের সে গোবিন্দকে বারান্দার কোণে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ঢুকল বিশ্বনাথবাবুর ঘরে।

জয় ও বিশ্বনাথবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুলকের দিকে। পুলকের কিন্তু ক্ষেপ নেই। সে নির্বিকার। তবে জয়ের ঠাওর হল পুলকের মুখে একটা চাপা খুশির আভাস। পুলক দিব্যি খোশমেজাজে গোবিন্দকে ডাক দিয়ে বলল, “এক কাপ চা খাওয়াতে পারো? তবে অন্য কাউকে বিরক্ত করা চলবে না। তোমায় নিজে বানাতে হবে। স্রেফ চা। মাথাটা বেশ ধরেছে। জয়, তুমি খাবে? বেশ, দু কাপ চা। কী বিশ্বনাথবাবু, অসুবিধা হবে?"

বিশ্বনাথবাবু উঠে বসে খরদৃষ্টিতে দেখছিলেন। তিনি ইশারায় গোবিন্দকে চা আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

যেই গোবিন্দ গেল অমনি পুলক বলল, 'জয়, তুমি কাগজ পড়ো, আমি বারান্দায় একটু পায়চারি করি। বারান্দা থেকে বাড়িটা একবার সার্ভে করতে চাই," বলেই সে বেরিয়ে গেল।

জয় মুখ কালো করে খবরের কাগজ রেখে এবার টেবিলে রাখা পাজিটা নিয়ে ওলটাতে লাগল। পুলক কথার সুরে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে একা থাকতে চায়। তাই জয় বাধ্য হয়ে পুলকের সঙ্গ ধরতে পারল না। বিশ্বনাথবাবু চোখ পিটপিট করে স্বগতোক্তি করলেন, গোবিন্দকে সরিয়ে দিল এবং ওয়াটসনকেও সঙ্গে নিল না, হুম।" তিনি ফের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঝিমুতে লাগলেন।

গোবিন্দ চা আনল মিনিট-পনেরোর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরল পুলক। চায়ে চুমুক দিল, “আঃ'। তারপর বলল, “গোবিন্দ, একবার কষ্ট করবে? তুমি নিচে গিয়ে মালিক গারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখো। আমি এই সামনের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাব। লক্ষ করবে, আমায়। তুমি দেখতে পাও কি না?”

“আজ্ঞে তা দেখা যাবে, জানাল গোবিন্দ, “আমি নিজে কতবার দেখেছি।"

“আচ্ছা মালির ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় এই বারান্দা?”

“আজ্ঞে হ্যা, যায়।"

“বেশ, বেশ," পুলক খুশি হয়ে ওঠে। সে ঘড়ি দেখে বলল, “এখন চারটে দশ। প্রমথবাবু অফিস থেকে ফিরবেন কখন?"

“আজ্ঞে তা ছটা বাজবে," গোবিন্দ জানায়।

“আয় চন্দ্রনাথবাবু?”

“তার ফেরার ঠিক নেই।”

“শিবপদবাবু?"।

“ওঁনারও কিছু ঠিক নেই। কোনো দিন আটটা সাড়ে-আটটায় ফেরেন। কখনও আরও দেরি হয়।"

“ও আচ্ছা," বলল পুলক, “বিশ্বনাথবাবু, আমরা এখন চলি। আবার আসব সাড়েপাঁচটা নাগাদ। আপনার বাড়ির কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। গোবিন্দ, পারলে তুমি ওই সময় সদর দরজায় থেকো। যতটা সম্ভব চুপচাপ এই ঘরে ঢুকে পড়ব, কেমন?"

পুলক ও জয় বিদায় নিল।

বিকেল পাঁচটা পয়ত্রিশে মজুমদারবাড়ির দোতলায় উঠে জয় দেখল, একটি সুশ্রী তরুণী প্রমথবাবুর ঘরের সামনে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। নিশ্চয় ও প্রমথনাথের কন্যা ঝুমা। হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ, গম্ভীর চালে পুলক ধীর। পদক্ষেপে প্রবেশ করল বিশ্বনাথবাবুর ঘরে। পিছু-পিছু ব্যাগ হাতে জয়। ভাবখানা, যেন কোনো জরুরি মোকদ্দমার কাজে তাদের আগমন। গোবিন্দকে বলা হল যে, প্রমথবাবু এলেই যেন তাকে সোজা নিয়ে আসা হয় এই ঘরে।

বিশ্বনাথবাবু বিছানায় বসেছিলেন যথারীতি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পুলক তার মাথার কাছে খাটের ধারে চেয়ার টেনে বসল। সে জয়কে বল, “তুমি আমার

পিছনে চেয়ারে বাসো।” পুলকের সামনে রইল একটা ফাকা চেয়ার।

পুলক এবার খোশগল্প জুড়ে দিল। কয়েকটি পরামর্শও হয়ে গেল তদন্তের ব্যাপারে। একবার লঘু পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বারান্দায়। বোঝা গেল কৌতুহলী ঝুমা পাক খেয়ে গেল সামনে দিয়ে।

আধঘণ্টাটাক বাদে। ভারী পায়ের শব্দ বারান্দা দিয়ে এসে থামে পর্দার বাইরে। ভেসে আসে ভারিক্কি কণ্ঠস্বর, বাবা আমায় ডেকেছ?”

“ও প্রমথ, ভিতরে এসো, বিশ্বনাথবাবু আহ্বান জানান।

প্রমথনাথ পর্দা সরিয়ে ঢুকেই ঘরে দু'জন অপরিচিত যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বাপের সঙ্গে তার চেহারার মিল খুব কম। রং ময়লা। শরীরও কিঞ্চিৎ স্থূল। অর্ধেক মাথাজোড়া টাক পুরুষ্ট গোঁফ। নাক চাপা না হলেও, বাবার তীক্ষ্ণতা নেই। পরনে ফুল শার্ট ও ট্রাউজার্স। চোখে চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা। পায়ে জুতোবিহীন মোজা।

“বোসো,” পুলকের সামনের চেয়ারটা দেখালেন বিশ্বনাথবাবু।

প্রমথনাথ আড়ষ্টভাবে বসলেন। বিশ্বনাথবাবু পুলকের দিকে চেয়ে বললেন, “এই আমার বড়ছেলে প্রমথ। আর এরা? হ্যা, বুঝলে প্রমথ, একটা দরকারে ডেকেছি তোমায়। এরা দু'জন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমি ওদের অ্যাপয়েন্ট করেছি। আমার একটা জিনিস হারিয়েছে বা বলতে পারো চুরি গেছে, সেই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনের জন্য। তোমায় এই পুলক রায় কিছু প্রশ্ন করবেন। উত্তর দিও।"

পুলক ও জয় হাত তুলে নমস্কার জানাল। ভদ্রতার খাতিরে প্রমথনাথ হাতজোড় করলেন বটে, তবে তাঁর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ভাব দেখে মনে হল এক্ষুনি বুঝি ফেটে পড়বেন রাগে। নেহাত অতি প্রতাপশালী ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাপের ভয়েই নিজেকে সামলে নিয়ে তিক্তস্বরে বললেন, “কী হারিয়েছে?”

পুলক চট করে বলে উঠল, “মিঃ মজুমদার, প্লিজ, সেটা এখন জানতে চাইবেন না, পরে জানাব। আমি এখন দু-চারটে প্রশ্ন করব। বেশি নয়। আপনি অফিস থেকে সবে। ফিরেছেন, টায়ার্ড।”

প্রমথনাথ কোনো কথা না বলে ঠোট টিপে কুদ্ধ দৃষ্টিতে পুলককে একবার দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

পুলক অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, “আচ্ছা মিঃ মজুমদার, গত সোমবার অফিস থেকে ফিরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, এবং কখন ফিরলেন, যদি কাইন্ডলি বলেন।"

“গত সোমবার? সে কি মনে আছে ছাই!" গজগজ করেন প্রমথনাথ।

“একটু মনে করুন প্লিজ, পুলকের অনুরোধ।

খানিক গোজ হয়ে ভেবে নিয়ে প্রমথনাথ বললেন, “নেমন্তন্ন ছিল। বন্ধুর বাড়িতে, লেকের কাছে। ফিরেছি বোধহয় রাত সাড়ে-নটা দশটায়।”

বাড়ি ফিরে কী করলেন?”

“সোজা নিজের ঘরে ঢুকলাম।”

“বাথরুমে যাননি ?”

ও হ্যঁ,"চমকে যান প্রমথনাথ। “হ্যা হ্যা গিয়েছিলাম। পথে বৃষ্টির জল জমেছিল। পাশ দিয়ে মোটর যেতে জলকাদা ছিটকে লাগে গায়ে। তাই বাড়ি এসেই বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে যাই। আর-একবার বাথরুমে যাই মিনিট পনেরো কুড়ি বাদে, শোওয়ার ঠিক আগে।”

“আচ্ছা সেদিন কি আপনি রাবার সোলের জুতোটা পরে বেরিয়েছিলেন?"

“হা!" বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে উত্তর দেন প্রমথনাথ। প্রথমবার কি বাইরের জুতো, পোশাক পরেই সোজা বাথরুমে ঢুকেছিলেন?”

“আর দ্বিতীয়বার ?”

“চটি পায়ে। ঘরের পাজামা আর গেঞ্জি পরে।”

“জুতোটা কোথায় ছেড়ে রেখেছিলেন, ঘরে?”

“না, বাইরে। আমার দরজার পাশে।”

“নোংরা জুতোয় কাদা লেগেছিল, তাই ঘরে ঢোকাইনি। এটা আমার অভ্যেস।” প্রমথনাথ একবার বিশ্বনাথবাবুর দিকে চাইলেন। জয়ের মনে হল, এই অভ্যেস তিনি তার বাবার কাছ থেকে হয়তো পেয়েছেন।

পুলক নিজের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে প্রমথনাথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা মিঃ মজুমদার, বাথরুমে যাওয়ার সময় আপনি কি আপনার বাবার ঘরে উকি দিয়েছিলেন?”

“ঠিক মনে আছে?”

“মানে! কী বলতে চাইছেন? আমি মিথ্যে বলছি?” প্রমথনাথ তেতে ওঠেন। “আমি বাথরুমের দরজা পেরিয়ে এক পা-ও এগুইনি।”

ব্যস, ব্যস। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পুলক যেন লজ্জিত। রাগ করবেন না, স্রেফ রুটিন কোয়েশ্চেন। আর আপনাকে আটকৰ না। প্রয়োজন হলে পরে কথা হবে। একটি অনুরোধ। আমাদের সঙ্গে আপনার কী কথাবার্তা হল, এখন তা জানাবেন না কাউকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে, বিশ্বনাথবাবুর মোকদ্দমার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। আমরা ব্যারিস্টার ব্যানার্জির 'অ্যাসিস্ট্যান্ট।”

প্রমথনাথ ইতস্তত করে বললেন, কিন্তু কী চুরি গেছে।” “পরে শুনতে পাবেন,” অমায়িক হেসে জানাল পুলক।

“ননসেন্স!” প্রমথনাথ উঠে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। পুলক ঘড়ি দেখে বলল, ‘ছটা চল্লিশ। বিশ্বনাথবাবু, একবার গোবিন্দকে ডাকবেন?”

“গোবিন্দ,” হাঁক দিলেন বিশ্বনাথবাবু। গোবিন্দ ধারেকাছেই ছিল। দ্রুত হাজির হল। পুলক জিজ্ঞেস করল, “গোবিন্দ চন্দ্রনাথবাবু ফিরেছেন?

“আচ্ছা, শিবপদবাবুকে ডেকে আনতে পারবে? ওর দোকানেই পাবে বোধহয়। বলবে বিশ্বনাথবাবু ডাকছেন। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে এই ঘর অবধি।”

গোবিন্দ বড়বাবুর দিকে তাকাল। বিশ্বনাথবাবু ইঙ্গিত করলেন—যাও যা বলছেন করো। গোবিন্দ চলে গেল।

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হয়। "দাদু," দরজার বাইরে মৃদু গলা শোনা গেল। "শিবু, এসো।" বিশ্বনাথবাবু ডাকলেন।

একটি বছর পঁচিশের যুবক পর্দা সরিয়ে ছাল ঢুকে পুলকদের দেখে থমকে গেল। রোগ। চোয়াড়ে চেহারা। রং কালো। মাঝারি লম্বা। হালের এক বিখ্যাত ফিল্মস্টারের ছাদে মাথার টেরি। পরনে হলুদ রঙা পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার্স। পা খালি।

শিবু বিশ্বনাথবাবুকে বলল, "আমায় ডেকেছেন?"

', বোসো," ফাকা চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন বিশ্বনাথবাবু, "শোনো, এই এঁরা হচ্ছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার একটা জিনিস চুরি গিয়েছে। আমি এদের ভার দিয়েছি ইনভেস্টিগেশনের। এরা তোমায় কিছু প্রশ্ন করবেন। উওর নিও।" তিনি পুলককে বললেন "এই হচ্ছে শিবপদ মজুমদার। সম্পর্কে আমার নাতি।

পুলক এবার কিন্তু নমস্কার জানাল না। গাট হয়ে বসে শুধু একবার মাথা ঝাকাল। "আঁ, চুরি! কী চুরি?" শিবপদ অবাক।

"সেটা পরে জানতে পারবেন,"

পুলকের জবাব। "ও!" সন্ত্রস্ত ভাবে বসল শিবু।

পুলক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শিবপদবাবু, গত সোমবার রাতে আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন ক'টায়?"

"সোমবার?" মুখ নিচু করে একটু ভেবে নিয়ে শিবু বলল, "এই রাত ন'টা নাগাদ হবে। দোকান থেকে বেরিয়ে খানিক গল্পগুজব করে তারপর বাড়ি ফিরি।"

"খেলেন ক'টায়?"

"বাড়ি ফিরেই।"

"খাবার পরে কী করলেন?"

খানিকক্ষণ বই পড়ি ঘরে বসে, তারপর শুই।”

“একটা রহস্য পত্রিকা।”

কখন শুলেন?”

“ঠিক মনে নেই। এই রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা হবে।” “ঘর থেকে আর বেরোননি?"

না। ও হ্যা, বাথরুমে গিয়েছিলাম একবার শোবার আগে।”

“বাথরুমে গিয়েই ফিরে এসেছিলেন?”

“আচ্ছা, ওই সময় আপনি বিশ্বনাথবাবুর ঘরে উকি দিয়েছিলেন বা ঢুকেছিলেন কি?"

“মানে? আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন? চোর ভাবছেন? রীতিমতো চটে ওঠে শিবপদ।”

‘না, না, সন্দেহ-টন্দেহর ব্যাপার নয়। স্রেফ রুটিন কোয়েশ্চেন। তা ছাড়া জিনিসটা যে এই ঘর থেকেই গিয়েছে ভাবছেন কেন?"

“ও! মানে আমি তাই ভাবলাম। না, আমি দাদুর ঘরের দিকে যাইনি বা ঢুকিনি।"

“ঠিক আছে, ঠিক আছে," পুলক একটু নড়েচড়ে বসে বলল, “আচ্ছা আপনি অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পুষছেন কন্দিন?” জেরা হঠাৎ হবির প্রসঙ্গে মোড় নিতে শিবু থতমত খেয়ে আমতা-আমতা করল, “অ্যাকোয়ারিয়াম? মাছ? তা তিন বছর।”

মাছ মরেছে কি এর মধ্যে?”

ও, মরেছে কয়েকটা।" শিবুর সন্দিগ্ধ ভাব দেখে মনে হল যে, সে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না পুলকের উদ্দেশ্য।

পুলক আনমনে গলা, গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, “আমার অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ যে কেন বাঁচছে না, ধরতে পারছি না। দু-দু'বার সব মরে

গেল,” বলতে বলতেই সে শিকুর দিকে তাকিয়ে গলা পালটে ঈষৎ ব্যঙ্গ-মেশানো স্বরে বলে উঠল, 'কী, চিনতে পেরেছেন? চিচিং ফাক।”

জয় সচকিত হয়ে দেখল, শিবু স্তম্ভিতভাবে পুলকের দিকে চেয়ে আছে।

“কী ব্যাপার?" কিছু একটা রহস্য আঁচ করে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

“ব্যাপার এই..." পুলক তার বাঁ হাতের চেটোর উলটো দিক মেলে ধরল বিশ্বনাথবাবর দিকে। জয় দেখল, পুলকের ওই হাতের অনামিকায় একটি আংটি, দেখে মনে হয় সোনার। এবং তাতে একটি স্বচ্ছ সাদা বড়সড় পাথর বসানো। নিওনবাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে পাথরটা। জয় আগে কখনও পুত্রের হাতে কোনো আংটি দেখেনি।

“আরে, এই তো আমার সেই আংটি, বিশ্বনাথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

পুলক আংটিটা খুলে বিশ্বনাথবাবুর হাতে দিল। তিনি সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, “হু, ঠিক তাই। কোথায় পেলে?”

বারান্দায় অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে," পুলক জবাব দেয়, "শিববাবু এটা চুরি করে ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাই ওটা আমার হাতে দেখে ভারি অবাক হয়েছেন।”

“মিথ্যে কথা। কী যা-তা বলছেন?” প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ায় শিবুবাবু।

পুলক বাকা হেসে বলল, 'বসুন শিববাবু, বসুন। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। আপনার খেয়াল ছিল না যে, সিড়ির মুখে সারা রাত একটা বাল্ব জ্বলে। আর বারান্দার এই অংশ নিচে মালির ঘর থেকে দেখা যায়।”

‘মালির ঘরের উঠোনে তখন কেউ ছিল না, আমি সেটা দেখেছি।" তারস্বরে ঘোষণা করল শিবু।।

“বটে, সেটাও লক্ষ রেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মালির ঘরের জানলা দিয়ে কেউ আপনাকে দেখে থাকলে অন্ধকারে তা আপনার নজরে না পড়াই স্বাভাবিক। যাক গে, আর মিছিমিছি প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আমার কাছে

আপনার অপরাধের আরও মোক্ষম কিছু প্রমাণ আছে। দোষ অস্বীকার করলে ব্যাপারটা হয়তো আরও জটিল হবে। আপনার দাদুকে হয়তো পুলিশ ডাকতে বাধ্য করবেন।” শিবপদ ফ্যাকাশে মুখে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে কারও মুখে কথা নেই। আওয়াজ বলতে শুধু, খাড়া-হয়ে-বসা বিশ্বনাথবাবুর জোরালো শ্বাস-প্রশ্বাস। তা তার মুখ রাগে টকটকে। মনে হল উনি বুঝি মেরেই বসবেন শিবপদকে।

তবে বিশ্বনাথবাবু সামলে নিলেন নিজেকে। শিবপদকে লক্ষ করে চাপা তীব্র কণ্ঠে কেটে-কেটে উচ্চারণ করলেন, “খাও, বেরিয়ে যাও। গেট আউট। আর, কালকের মধ্যে তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তোমার আর মুখদর্শন করতে চাই না। মনে থাকে যেন।”

নতমস্তকে বেরিয়ে গেল শিবপন। বিশ্বনাথবাবু খানিক গুম হয়ে রইলেন, তারপর পুলককে বললেন, “তুমি ঠিক ধরেছ ওই যে অপরাধী সন্দেহ নেই। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে, তুমি বুঝলে কীভাবে? এমন কী আংটিটা অবধি উদ্ধার করলে, আশ্চর্য!"

পুলক হাসিমুখে বলল, "কৃতিত্বটা অবশ্য আমার একার বলা উচিত হবে না। এর মধ্যে নিশিকান্তবাবুর ভাগও অনেকখানি।”

"নিশিকান্ত! মানে?”

“তা হলে একটা গোড়া থেকেই বলি," বলল পুলক, “আপনার ঘরে আপনি এবং গোবিন্দ ছাড়া আর কারও পায়ের ছাপ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। আলমারির লকারে কাঠের বাক্স দুটোতেও আপনার ছাড়া আর কারও আঙুলের ছাপ ছিল না। হয়তো শিবু গ্লাভস পরে এসেছিল। তবে একটা ইমপর্টেন্ট পাওয়া যায়, একজোড়া জুতোর ছাপ। খাজ কাটা রাবার-সোলের জুতো। গোবিন্দর থেকে জানলাম যে, ওই ধরনের জুতোর মালিক এ-বাড়িতে একজনই। আপনার বড় ছেলে প্রমথবাবু। কাজেই গোড়ায় সন্দেহটা তার দিকেই ঝোকে।” | "তবু আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগে। প্রমথবাবু কি এতই বোশ হবেন যে, চুরি করতে এসে নিজের কাদামাখা জুতোর ছাপ রেখে যাবেন ঘরে? খালি পায়ে কার্যোদ্ধার করাই তো উচিত। সামান্য বুদ্ধি থাকলেই লোকে অর্থাৎ চোরে তাই করবে। কোথায় যেন গন্ডগোল। তখনই নিশিকান্তবাবুর আশ্চর্য শ্রবণশক্তির কথা

আমার মনে জাগল। প্রথমদিন এসেই খেয়াল করেছিলাম ব্যাপারটা। ঈশ্বর যখন কারও কোনো ইন্দ্রিয় কেড়ে নেন, সাধারণত তখন হতভাগ্যের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অনেক বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। নিশিকান্তবালুরও তাই হয়েছে। গোবিন্দ বলল যে, এই বাড়ির প্রত্যেকের পায়ের শব্দ উনি নাকি চেনেন। ওঁর ঘরের সামনে দিয়ে চেনা কেউ গেলে ঠিক ধরতে পারেন। আর অচেনা কারও পায়ের শব্দ পেলেই, কে যাচ্ছে, প্রশ্ন করা তার স্বভাব।”

“গোবিন্দ বলেছিল, হাঁপানির জন্য নিশিকান্তবাবু প্রায়ই রাতে ঘুমোত পারেন না। তাই ভাবলাম, দেখা যাক এ-রহস্যের কোনো কিনারা উনি দিতে পারেন কি না। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিশিবাবু সোমবার রাতে জেগেই ছিলেন এবং ওর ঘরের সামনে দিয়ে রাত সাড়ে ন'টা দশটার পর তিনজনের যাতায়াতের শব্দ শুনেছেন।”

“প্রথমে নিশিৰাৰু পরপর দু'বার প্রমথবাবুর পায়ের শব্দ শোনেন। প্রথমবার জুতো পায়ে। পরেরবার রাবারের চটি পায়ে। প্রমথবাবু দু’বারই সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। তারপর বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যান। বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি দেওয়া আর খোলার আওয়াজ নিশিবাবুর কান এড়ায়নি।” |
“এর পর যায় গোবিন্দ। ও সোজা গিয়ে নিজের ঘরে বিল দেয়। ওর খিল দেওয়ার শব্দটা নিশিবাবুর পরিচিত।”

"গোবিন্দ চলে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ বাদে ঘরের সামনে দিয়ে অচেনা পায়ের প পেয়ে নিশিবাবু যথারীতি প্রশ্ন করেন, “কে?” মৃদু স্বরে উত্তর হয়, আমি'। শিবপনর গলা। আসলে শিবপদ তখন প্রমথবাবুর বাইরে ছেড়ে রাখা খাঁজকাটা রাবার-সোলের জুতোটা

অনুসন্ধানীর রহসফu১৮১ পায়ে গলিয়ে পা টিপেটিপে আসছিল। তাই তার পদশব্দ নিশিবাবুর কেমন অচেনা ঠেকে।”

“শিবপদ কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাথরুমে ঢোকেনি। অন্তত মিনিট-দশেক বাদে নিশিবাবু বাথরুমের দরজা বন্ধের আওয়াজ পান। এই সময়টুকুর মধ্যেই শিবপদ আপনার ঘর থেকে আংটি চুরি করে। বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজও হয় খুব তাড়াতাড়ি। শিবপদ ফিরে যায় তেমনি সন্তর্পণে। প্রমথবাবুর জুতো বাইরে যথাস্থানে রেখে সে নিজের ঘরে ঢোকে। প্রমথবাবুর জুতো পায়ে দেওয়ার কারণ, যদি চুরি টের পাওয়া যায়, বিশ্বনাথবাবুর ঘরে জুতোর ছাপ দেখে, দোষটা

প্রমথবাবুর ঘাড়েই চাপবে। হয়তো শিবপদর কোনো পুরনো রাগ আছে প্রমথবাবুর ওপর, তাই এক ঢিলে দুই পাখি বধের ফন্দি।”

বিশ্বনাথবাবু চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন, “স্কাউড্রেল। বুঝেছি, সেদিন প্রমথর কাছে বকুনি খেয়েছিল, তারই প্রতিশোধ। ও প্রমথর কাছেও টাকা ধার করেছে। শোধ দিচ্ছে না। তাই তাড়া লাগিয়েছে প্রমথ।”

“আপনি বোধহয় জানেন না,” বলল পুলক, “শিবপদ জুয়া খেলা শুরু করেছে। এটাই ওর টাকার টানাটানির কারণ।”

ফের খানিকক্ষণ রক্তচক্ষু মেলে ফোঁস-ফোস করে বিশ্বনাথবাবু বললেন, “আচ্ছা, সে রাতে নিচে থেকে কেউ কি দেখতে পেয়েছিল শিবুকে আমার ঘরে ঢুকতে?"

“আরে না, ওটা আমার একটা চাল," হেসে বলল পুলক, “শিবপনকে ওই বলে আবাড়ে দিয়ে দোষ স্বীকার করালাম।”

“কিন্তু আংটিটা উদ্ধার, মানে ওটা যে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকনো ছিল, তুমি বুঝলে কীভাবে?" বিশ্বনাথবাবু থই পান না।

“অনুমান এবং আমাদের ভাগ্য,” পুলকের জবাব, “সন্দেহটা যখন শিবপদর ওপর দানা বাঁধল, তখন ভাবতে লাগলাম ও আংটিটা নিয়ে কী করেছে? ইতিমধ্যে খোঁজ পেয়েছিলাম যে দোকানের এই পার্টনারের কাছে ওর মোটা টাকা দেনা রয়েছে। কিন্তু এই তিনদিনের ভিতর সে দেনা শোধ হয়নি। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও এই কদিনের টাকা জমা পড়েনি। অতএব আংটি বোধহয় ও এখনও বিক্রি করতে পারেনি। কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আর আংটি বিক্রি করলেও অতখানি নগদ টাকা কোথায় রাখতে পারে? নিজের ঘরে রাখা বিপজ্জনক। যা কড়া প্রকৃতির দাদু। আংটি মিসিং হয়েছে টের পেলে হয়তো পুলিশেই খবর দেবেন। তখন ঘর সার্চ হবে। দোকানে রাখলে পার্টনারদের চোখে পড়তে পারে। কারও কাছে গচ্ছিত রাখলে জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা। এসব ভাবতে ভাবতেই দুটো জিনিস নজরে এল, বারান্দায় ক্যাকটাসের টব এবং অ্যাকোয়ারিয়াম।"

“প্রত্যেক ক্যাকটাসগাছের গোড়ায় নানা রঙের নুড়িপাথর জড়ো করা। এইভাবেই সাজায় ক্যাকটাসটব। টবের মাটি কদাচিৎ খোঁড়াখুড়ির দরকার হয়।

অতএব পাথর নাড়াচাড়াও হয় না। মাঝেমধ্যে গাছের ওপর থেকে জল ঢেলে দিলেই যথেষ্ট। অ্যাকোয়ারিয়ামেও রয়েছে প্রচুর ছোট-ছোট পাথর আর বালি। এবং অ্যাকোয়ারিয়ামে শিবপদ ছাড়া আর কেউ হাত দেয় না। সুতরাং ক্যাকটাসের টবে বা অ্যাকোয়ারিয়ামের পাথর-বালির তলায় আংটিটা লুকিয়ে রাখা যায়। ভাবলাম, দেখি খুলে। গোবিন্দকে চা

চআনতে সরিয়ে দিয়ে এবং জয়কে আপনার ঘরে ছুতো করে আটকে রেখে চটপট খুজলাম। প্রথমে ক্যাকটাসের টবগুলোতে পাথরের ভিতরে। কারণ দায়টা প্রমথবাবর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা ছিল। কিন্তু টবে পেলাম না। তখন অ্যাকোয়ারিয়ামের পাথর একট হাঁটকাতেই আংটি বেরিয়ে পড়ল। লুকোবার আদর্শ জায়গা বটে। চোখের সামনে, অথচ অতি নিরাপদ। কে সন্দেহ করবে ওখানে?”

“তা তখনই বললে না কেন? এত জেরা-টেরার প্রয়োজন কী ছিল?” বিশ্বনাথবাবু যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

পুলক বলল, “আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। যদি ভুল হয় ? যদি নিশিবাবুর কান বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে? যদি আর কেউ আংটিটা চুরি করে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকিয়ে রেখে থাকে?”

“আংটিটা আমার বুক-পকেটে ছিল। প্রমথবাবুকে জেরা করতে করতে এক ফাকে আংটি বার করে আমার বাঁ হাতে পরে নিয়ে হাতটা এমনভাবে রাখি, যাতে সেটা প্রমথবাবুর নজরে পড়ে অথচ আপনার বা জয়ের নজরে না পড়ে। লক্ষ করলাম, আংটিটা দেখেও প্রমথবাবুর কোনো বিকার হল না। বুঝলাম উনি নির্দোষ। ফের আংটি ঢুকে গেল আমার পকেটে। শিবপদর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই একই কায়দা করলাম। দেখলেন তো, আংটিটা দেখেই শিবপদ কীরকম চমকে উঠল। একদম থ মেরে গেল। বেশি চালাকি করতে গিয়েই শ্রীমান ফেঁসে গেলেন। খালি পায়ে নিঃশব্দে গিয়ে চুরি করলে হয়তো ও নিশিবাবুর কান এড়াতে পারত।”

“যদি আংটি না পেতে?” এতক্ষণে মুখ খোলে জয়।

পুলক বলল, “তা হলে অন্যভাবে চাপ দিয়ে ওকে দোষ স্বীকার করাতাম। আমার অনুমান যখন খেটে গিয়েছে, তখন ও পার পেত না। কিছু সময় বেশি

লাগত এই যা। তবে ইতিমধ্যে আংটিটা বিক্রি করে ফেললে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব হত কি না কে জানে।”

বিশ্বনাথবাবু হাত বাড়িয়ে পুলকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, “কনগ্রাচুলেশনস ইয়াংম্যান। তোমার উন্নতি হোক।”

পুলক স্মিত মুখে বলল, “আমার কাজ শেষ। এবার তাহলে ছুটি ?”

“এক মিনিট,” বাধা দিলেন বিশ্বনাথবাবু। তিনি তোশকের তলা থেকে একটা ব্যাঙ্কের চেক-বই বের করে বালিশের পাশ থেকে কলম নিয়ে বললেন, “তোমার ফিজ, কত টাকা লিখব?”

“পাঁচশো,” জানাল পুলক।

“উহু, ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। তারপর খসখস করে একটা চেক লিখে পাতাটা ছিড়ে পুলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এক হাজার দিলাম। তোমার ন্যায্য পাওনা।" “ধন্যবাদ,” পুলক হাসি-মুখে হাত বাড়াল।

সমাপ্ত

জোনাকিদের বাড়ি এক পেখম স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

অপারেশন ব্ল্যাক স্কোয়াড - অজেয় রায়
Operation Black Squad - Ajeo Ray

ঠক ঠক ঠক-দরজায় তিনবার টোকার শব্দ।

-কে?

আমি। দরজার বাইরে থেকে জবাব আসে।

এসো!—আহ্বান জানালেন চেয়ারম্যান।

ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। লম্বা, পেটানো চেহারা তার। একটু চাপা নাক। দু'চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

মস্ত এক টেবিল, তার পিছনে বসে চেয়ারম্যান! মাথার চুল ধবধবে সাদা। ঈষৎ লম্বাটে ভাঁজ পড়া মুখ। সাদা, খাড়া নাক। মোটা ফ্রেমের চশমার পিছনে তার উজ্জ্বল চোখ। টেবিল ল্যাম্পের জোরালো আলোর নিচে কয়েকটি জরুরি ফাইল খোলা অবস্থায় রয়েছে।

বসো চিফ। হাতের ফাইলটা ড্রয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান। চিফ বসলেন চেয়ারম্যানের মুখোমুখি চেয়ারটিতে।

চিঠিটা দেখ।– চেয়ারম্যান পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা সাধারণ খাম বের করে চিফের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

খাম খোলাই ছিল। ভিতর থেকে বেরুল একটি চিরকুট। সাদা কাগজে ইংরিজি টাইপে লেখা দু'টি লাইন পনেরোই ডিসেম্বরের সভা সম্বন্ধে সাবধান। প্রাণ সংশয় হতে পারে।

ব্যস। কে লিখেছে, কোথা থেকে, কোনো হদিশই নেই। খামটা পরীক্ষা করলেন চিফ। ডাকঘরের ছাপ দেখে বোঝা যায় এই শহরেরই এক জায়গায় পোস্ট করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে চেয়ারম্যান একটি ফাইলে চোখ বোলাতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল চিফ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফাইল বন্ধ করে চেয়ারম্যান বললেন, কী বুঝলে?

—ওয়ার্নিং।

ধাপ্পাও হতে পারে।

—তা পারে। তবে -

বেশ, ধরা যাক সত্যি খবর।

বিপদটা কার কাছ থেকে আসবে মনে হয়?

একটু ভাবলেন চিফ। তারপর উচ্চারণ করলেন, —ব্ল্যাক স্কোয়াড।

—হুঁ, তাই মনে হয়। আমার উপরই ওদের সব চেয়ে আক্রোশ।

চেয়ারম্যানের কথা শুনে চিফের মনে পড়ে যায় ব্ল্যাক স্কোয়াডের পুরনো সব রেকর্ড।

ব্ল্যাক স্কোয়াড একটি গুপ্ত দল। এই দলটা তৈরি হয়েছে বছর চারেক আগে। নানা রকম গোপন ব্যবসা এবং বেআইনি পথে প্রচুর টাকা রোজগার এই দলের উদ্দেশ্য। কার্য সিদ্ধি করতে তারা অনায়াসে খুন-জখমও করত। ক্রমে এদের লোভ বাড়ে, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে হাত বাড়ায়।

দু বছর আগে চেয়ারম্যানের দল দেশ শাসনের অধিকার পায়। কিছুকাল পরেই তারা তস্কোয়াডের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করে। বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগে এদের কিছ চাই গ্রেফতারও হয়। জেলে যায়। দলটা এখন প্রায় বসে গিয়েছে। চিফ জানতেন কাক স্কোয়াডের বিরুদ্ধে সরকারি প্রশাসনের তৎপরতার পিছনে রয়েছে আসলে চেয়ারম্যানের হাত। আর ব্ল্যাক স্কোয়াডও এতদিনে সে খবর পেয়ে গিয়েছে।

চেয়ারম্যান বলেন, হয়তো জানো, তিন দিন আগে একটা জরুরি গোপন মিটিং হয়েছিল। মিটিং-এই ঠিক হয় যে ব্ল্যাক স্কোয়াডকে এবার পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ব্ল্যাক স্কোয়াডকে চূর্ণ করার জন্য আমিই বেশি জোর দিই। বোঝা যাচ্ছে মিটিং-এর সিদ্ধান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তাই ওরা আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। জানে আমায় সরাতে পারলে ওরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হবে। হয়তো আমার কোনো উপকারী বন্ধু এই চিঠি দিয়ে গোপনে সাবধান করতে চেয়েছে আমায়, অবশ্য চিঠিটা যদি না ধাপ্পা হয়।

যদি সে দিন সভায় না যান? যদি রটিয়ে দেন আপনার শরীর অসুস্থ?—বললেন চিফ।

—সভায় আমায় যেতেই হবে। সেদিন আমাদের দলের কিছু নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে চাই। আমি না গেলে সে ঘঘাষণা হবে অন্য কারও মুখ থেকে। তাতে দলে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে।

তাছাড়া ভয়ের কাছে কখনও আমি মাথা নিচু করিনি। এর আগে বার বার আমার কাছে উড়ো চিঠি এসেছে নানা কারণে—প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে। আমি পিছছাইনি। দু'বার সত্যিই আক্রমণ এসেছিল। এই দেখ গালে কাটা দাগ। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল গুলিটা। আর একবার গায়ে লাগেনি। আর কেউ যদি এই ভাবে ধাপ্পা দিয়ে আমার ওই সভায় যাওয়া বন্ধ করতে চায় বা আমায় বোকা বানাতে চায়, সে মতলবও পূরণ হবে না। সুস্থ থাকলে সভায় আমি যাবই। তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করব বইকি। সেই জন্যই তোমায় ডেকেছি।

চিফ চুপ করে তাকিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে চেয়ারম্যানের ফী নির্দেশ হয় সেটা আগে শোনা ভালো।

চেয়ারম্যান বললেন, "শোনো চিফ, আমার ধারণা তিন দিন আগের গোপন মিটিং-এর সিদ্ধান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ব্ল্যাক স্কোয়াড মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই খবর বেরুল কী করে? যাঁরা সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন সকলেই উচু পদের লোক এবং আমাদের বিশ্বাসভাজন। তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত? এদের কি কেউ ব্ল্যাক স্কোয়াডের লোক?

চারদিন সময় দিচ্ছি তোমায়। খুজে দেখ ওদের মধ্যে কাকে কাকে তোমার সন্দেহ হয়। তারপর ভাবা যাবে আত্মরক্ষার উপায়! হা, এই চিঠি বা তোমার সঙ্গে আমার এই আলোচনার কথা যেন কেউ না জানতে পারে। কে যে বিশ্বাসঘাতক জানি না। আমার বন্ধুরা হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজনায় ফাস করে দেবে চিঠির কথা। যদি সত্যি আক্রমণ আসে এই সুযোগ। আমরা সতর্ক থাকলে আক্রমণকারীদের ধরে ফেলতে পারবে। জানতে পারব এর অন্য সভ্যদের হদিশ। ভাগ্যে থাকলে মাথাটিকেও ধরে ফেলতে পারি। তাহলে ব্ল্যাক স্কোয়াডকে উৎখাত করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

চিফ অবাক হয়ে ভাবেন। চেয়ারম্যান সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা গভীর। এই মানুষটির দুর্দান্ত সাহসের অনেক গল্প তিনি শুনেছেন। এবার হাতে নাতে প্রমাণ পেলেন। নিজের জীবনকে টোপ ফেলেও শত্রুকে ঘায়েল করতে পিছপা নন। যদি চিঠির কথা সত্যি হয়? এত বড় বিপদের ঝুঁকি?

নিজেকে খুব অসহায় লাগে চিফের। তিনি আমতা আমতা করেন,—এতখানি রিস্ক! যদি কিছু... | চেয়ারম্যান থামিয়ে দেন, "জানি জানি। এও জানি, তিন মাস আগে আমাদের পূর্ব অঞ্চলের পার্টির সেক্রেটারি এদের হাতেই খুন হয়েছে বলে, সন্দেহ। যদিও কাউকে ধরা যায়নি। ব্ল্যাক স্কোয়াডের ব্যাপারে ওই সেক্রেটারি ছিল আমার সাপোর্টার। তাই এদের ধ্বংস করতেই হবে। আর এই হচ্ছে ফাঁদ।

চিফ চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক বাদেই চেয়ারম্যান টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেন।

-হ্যালো! কে প্রফেসর? আমি চেয়ারম্যান বলছি। একবার আসতে পারবেন আমার বাড়িতে? এখুনি! খুব দরকার। নইলে আমিই যেতে পারি। ও-তুমিই আসবে? ধন্যবাদ!

চেয়ারম্যান প্রফেসর বলে যাকে সম্বোধন করলেন তিনি হচ্ছেন ইনস্টিটিউট অফ কম্পিউটার সেন্টারের ডিরেক্টর। তরুণ বয়সে চেয়ারম্যান ও তিনি কিছুকাল একই কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর দুজনের জীবনপথ আলাদা হয়ে যায়। চেয়ারম্যান ঝাপিয়ে পড়েন রাজনীতিতে। আর প্রফেসরও ছাত্র পড়ানোর চেয়ে গবেষণার কাজেই বেশি মন দেন। তবু দু'জনের বন্ধুত্বটা অটুট রয়েছে। দু'জনেই নিজের ক্ষেত্রে আজ বিখ্যাত। এখন পরস্পরের সম্বোধনটা দাঁড়িয়েছে প্রফেসর এবং চেয়ারম্যান। খাতিরের ডাক নয়, মজা করে ডাকা।

আধঘন্টার ভিতরেই প্রফেসর চেয়ারম্যানের কাছে হাজির হলেন। প্রফেসর চেয়ারম্যানের মতন লম্বা রোগা নন। কিঞ্চিৎ খর্বকায় ও গাট্টাগোট্টা। গোল মুখ। এলোমলো কাঁচাপাকা চুল। চলাফেরা যুবকের মতো চটপটে। চেয়ারম্যানের সামনের চেয়ারে বসেই প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

-কী খাবে? চা না কফি?

কিছু না। কী ব্যাপার বলো?

ধীরে ধীরে বলেন চেয়ারম্যান,—মনে আছে দু বছর আগে আমার লাইফের উপর একটা অ্যাটেম্পট হয়। অল্পের জন্য সেবার বেঁচে গেলাম।

খুব মনে আছে। একদিন এইভাবেই মরবে। যা একখানা লাইন বেছে নিয়েছ। বন্ধুর জীবনের চিন্তায় প্রফেসর বেশ ক্ষুব্ধ। হাসলেন চেয়ারম্যান, মনে আছে সেবার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলে? -খুব মনে আছে। তুমি তো কানই দিলে না। —সে ব্যবস্থা এখন সম্ভব?

কেন নয়?—তারপর বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রফেসর বললেন: হঠাৎ অ্যাদ্দিন বাদে?

চেয়ারম্যান বুক পকেট থেকে খাম বেরল করে খুলে চিরকুটটি এগিয়ে দিলেন প্রফেসরকে। চারদিন পরে। রাত সোয়া সাতটা। ঠক ঠক ঠক-দরজায় তিনবার টোকা পড়ল।

কে?—প্রশ্ন করলেন, চেয়ারম্যান।

উত্তর এল, আমি।

এসো। -ডাকলেন চেয়ারম্যান।

ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন চিফ। গিয়ে বসলেন চেয়ারম্যানের মুখোমুখি টেবিলের অন্য ধারের চেয়ারে।

কী খবর পেলে বলো। -চেয়ারম্যান সোজাসুজি কাজের কথায় আসেন।

কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করেন চিফ। তারপর ঝট করে পকেট থেকে নোট বই বের করে একটা পাতা ছিড়ে পেন দিয়ে একটা নাম লিখে এগিয়ে দিলেন চেয়ারম্যানের হাতে।

চেয়ারম্যান কাগজে চোখ বুলিয়ে ভুরু কুঁচকালেন। এই ভয়টাই করছিলেন চিফ। চেয়ারম্যান হয়তো বিশ্বাসই করবেন না তার কথা। কারণ সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি একজন উচু পদের সরকারি কর্মচারী এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে এর খুবই খাতির।

প্রমাণ? -চেয়ারম্যানের প্রশ্ন!

সে রকম প্রমাণ এখনই দিতে পারব না! তবে এর পুরনো রেকর্ড দেখে আমার মনে হয়েছে।স্পষ্ট গলায় জানালেন চিফ।

ই, ঠিক আছে। দেখা যাক। চেয়ারম্যান মুখ নিচু করে চিন্তা করলেন ইনি সভায় বসবেন কোথায়?

—মঞ্চের পাশেই ভিআইপি এনক্লোজারে। বেশ। কুটি কুটি করে কাগজটা ছিড়ে ফেললেন চেয়ারম্যান।

এক মিনিট। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ফিরে এলেন চেয়ারম্যান: চারজন বিশ্বাসী লোক দিতে পারবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে? খুব বিশ্বাসী হওয়া চাই।

একটু ভেবে চিফ বললেন, পারব।

—বেশ, এবার যা বলছি শোননা। সেদিনকার সভায় আমার সিকিউরিটির জন্য কোনো বাড়াবাড়ির দরকার নেই। যা অন্যবার হয়ে থাকে, ব্যস, সেইটুকু। ব্ল্যাক স্কোয়াড যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে আমরা কিছু টের পেয়েছি।

পনেরোই ডিসেম্বর। দুপুর তিনটে। সভা আরম্ভ হতে আর সামান্য বাকি। হু হু করে বইছে হিমেল হাওয়া।

বিশাল জনসমুদ্রের সামনে বক্তৃতা মঞ্চ। প্রায় দশ বারো ফুট উঁচু। সেখানে বসেছেন মন্ত্রীরা। এবং পার্টির কয়েকজন প্রথম সারির নেতা।

প্রধান বক্তৃতা মঞ্চের একপাশে মাটি থেকে দু ফুট উঁচু করে পাটাতন ফেলে অনেকখানি বসবার জায়গা। সেখানে বসছেন পার্টির ছোটখাটো নেতা, কিছু উঁচু পদের সরকারি আমলা ও কিছু গণ্যমান্য নাগরিক। এরা বসেছেন বক্তৃতা মঞ্চের দিকে মুখ করে দুই ধাপ মঞ্চের সব চেয়ারই প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। চিফ বসেছেন নিচের ধান পিছনের দিকে।

সভা আরম্ভ হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছলেন চেয়ারম্যান। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। পরনে চাপা পাজামা এবং হালকা ছাই রঙের কোট। চোখে কালো, চশমা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল তার নিজস্ব দেহরক্ষী।

মাপা পদক্ষেপে চেয়ারম্যান এগিয়ে গেলেন মঞ্চের পিছনে সিড়ির দিকে। ওপরের মঞ্চে উঠে চেয়ারম্যান একধারে চেয়ারে বসলেন। দেহরক্ষী বসল ঠিক তার পিছনে। চেয়ারম্যানের পাশেই রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অনেকেই নমস্কার জানালেন, হাসলেন চেয়ারম্যানকে লক্ষ করে।

চেয়ারম্যান মাঝে মাঝে একটু মাথা নোয়ালেন কিন্তু কারও দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তার ওষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ, মুখ পাথরের মতো কঠিন। চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে সোজা চেয়ে রইলেন সামনে।

চিক দেখলেন, চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো তার চারজন বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার হাজির। একজন উঠে গেল ওপরের বক্তৃতা মঞ্চে। হোমরা চোমরাদের পিছনে আড়াল হয়ে বসল সে। বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইল নিচে, সিঁড়িতে ওঠার ঠিক মুখে। | মঞ্চের সামনে প্রায় হাত পঞ্চাশ জায়গা অর্ধচন্দ্রাকারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। কিছু পুলিশ ভিড় ঠেকাচ্ছে। যাতে ওই ফাকা জায়গায় শ্রোতারা ঢুকে পড়ে। ফাঁকা জায়গাটুকুতে ঘোরাফেরা করছে কিছু পুলিশের লোক। এবং জনা কুড়ি ব্যাজ আঁটা পার্টি ভলানটিয়ার।

একটু কাত হয়ে বসলেন চিফ। যাতে এই নিচু মঞ্চে বসা প্রায় তিরিশজনের ওপর নজর রাখা যায়। আজ এটাই তার কর্তব্য-চেয়ারম্যানের নির্দেশ! চিফের চোখে কালো সান গ্লাস। শুধু রোদের জন্য নয়! যাতে তার দৃষ্টি কেউ না বুঝতে পারে। তিনি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন নির্লিপ্তভাবে।

বক্তৃতা শুরু হল। প্রথম উঠলেন প্রধানমন্ত্রী। উঁচু মঞ্চের ওপর পাঁচ-ছয়টা মাইক্রোফোন বেঁকে চুরে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। মাইকের সামনে দাঁড়ালেন বক্তা। লাউডস্পিকারের সাহায্যে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার ভাষণ।

চিফের চোখ বার বার আটকে যাচ্ছে এক বিশেষ ব্যক্তির ওপর। সেই অফিসার —যার নাম তিনি সন্দেহ করে জানিয়েছিলেন চেয়ারম্যানকে।

হঠাৎ সেই ব্যক্তিটি ঘাড় ফেরালেন! কয়েকটা চেয়ার তফাতে বসা একজনের সঙ্গে যেন তার চোখাচোখি হল। চিফ আবার দৃষ্টি ফেরালেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি একজন উঠতি ব্যারিস্টার। মন্ত্রীদের সঙ্গে তার যথেষ্ট খাতির। লোকে ওই আইনজীবীকে চেয়ারম্যানের দলের এক বড় সমর্থক বলে জানে। তবে কি চকিতে একটা প্রশ্ন খেলে যায়। চিফের মনে।।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ। এবার চেয়ারম্যানের পালা। উঠলেন চেয়ারম্যান। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে। একজন মাইক-মিস্ত্রি ছুটে এসে মাইক্রোফোন ঠিকঠাক করে দিল।

বন্ধুগণ...। -চেয়ারম্যানের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হল। সহসা সংবিৎ ফিরে এল চিফের। এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন চেয়ারম্যানকে। ভুলে গিয়েছিলেন নিজের কাজ। আবার তার নজর ফিরল নিচু মঞ্চের দিকে।

একি! সেই ব্যারিস্টার চেয়ারম্যানের থেকে চোখ সরিয়ে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে তাকালেন মঞ্চের সামনে ফাকা জমিতে বসা এক পার্টি ভলানটিয়ারের দিকে। ভলানটিয়ারটি অন্যদের থেকে বেশ তফাতে বসেছে। তার দৃষ্টিও আইনজীবীর ওপর। কেমন চোয়াড়ে চেহারা লোকটির।

আইনজীবীর বাঁ হাত উঠল। চশমাটা যেন ঠিক করলেন। ফের হাত নামল। আগের মতো মাথা তুলে তিনি দেখতে লাগলেন চেয়ারম্যানকে।

চিফ লক্ষ করলেন, স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ আঁটা সেই লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে একটু সরে গেল। সে এখন মঞ্চের মুখোমুখি। ওখান থেকে বোধহয় বক্তার পুরো শরীরটা নজরে আসে। লোকটির ডান হাত ঢুকে গেল জামার নিচে। এ চিফ যেন আঁচ করতে পারেন, কী ঘটতে যাচ্ছে। তার স্নায়ু উত্তেজনায় টান টান। কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিষেধ। চেয়ারম্যানের নির্দেশ। চিফের কাজ আপাতত শুধু মঞ্চের লোকগুলোকে লক্ষ করা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে চিফ তার কর্তব্যে মন দেন।

দুম দুম্...! পরপর দুটো গুলির আওয়াজ। চিফ দেখলেন সেই ভলানটিয়ারটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার হাতের মুঠোয় ধরা পিস্তল ঝকঝক করছে—চেয়ারম্যানের দিকে সোজা তাক করা। দুম্। তৃতীয় গুলির শব্দ হল।

চেয়ারম্যানের দেহ দুলছে। টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন। ক্ষিপ্র চিতার মতো লাফ দিয়ে এগোল তাঁর দেহরক্ষী। জড়িয়ে ধরল পতনোন্মুখ চেয়ারম্যানকে। শুইয়ে দিল মঞ্চে।

সেই বিশাল জনসমুদ্র বুঝি এক পলকের জন্য হতবাক হয়ে গেল। তারপর শুরু হল হাহাকার, অট্ট রোল। ফের দু'বার গুলির আওয়াজ। একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলি করল হত্যাকারীকে। লুটিয়ে পড়ল আততায়ী। চিফ লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেলেন ওপরের মঞ্চে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

প্লিজ, চেয়ারম্যানের গায়ে কেউ হাত দেবেন না। চিফের গলা শোনা গেল। চিফ, চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী এবং তার দু’জন বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার ঘিরে ফেলেছে ভূলুণ্ঠিত দেহ।

ইন্সপেক্টর সিঁড়ি দিয়ে কাউকে উঠতে দেবেন না।

—চিফের জোরালো গলার নির্দেশ শোনা গেল।

সত্যি, চিৎ হয়ে শোয়া নিস্পন্দ চেয়ারম্যানের বুকের কাছে কোটের কাপড় লাল হয়ে উঠেছে। আর মৃদু লয়ে ওঠা নামা করছে তার বক্ষ।

চিফের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তাকালেন তাঁর তিন সঙ্গীর দিকে। তাদের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। নিজেকে সামলে নিলেন চিফ। দু-হাত ছড়িয়ে চেয়ারম্যানের দেহের ওপর ফের ঝুঁকে আসা ভিড় ঠেকাতে থাকেন, —সরে যান, সরে যান প্লিজ!

স্ট্রেচার পৌঁছতে দশ সেকেন্ডও লাগেনি। চটপট চেয়ারম্যানকে তুলে স্ট্রেচার ক নিয়ে চলল দুই পুলিশ ইন্সপেক্টর। পাশে পাশে চললেন চিফ ও দেহরক্ষী। স্ট্রেচার উ১ অ্যাম্বুল্যান্সে। পরক্ষণেই স্টার্ট দিল অ্যাম্বুল্যান্স।

সেন্ট্রাল হসপিটালে চললো।ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন চিফ। তিরবেগে ছুটল গাড়ি। দিশেহারা জনগণের বিপুল কলরব ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে।

সেন্ট্রাল হসপিটালের বিরাট কম্পাউন্ড। অ্যাম্বুল্যান্স গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। প্রধান সার্জন ডঃ চৌধুরি বেরিয়ে আসেন। গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নামেন চিফ। কাছে গিয়ে বলেন, চেয়ারম্যানকে গুলি করেছে, নিয়ে এসেছি।

গম্ভীর প্রাজ্ঞ চিকিৎসক চৌধুরির কপালে কয়েকটা ভাজ পড়ে। একবার মাথা ঝাকান। তৎক্ষণাৎ পিছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করেন।

চিফকে ইঙ্গিত করেন,—নিয়ে এসো।

একটা আলাদা বাড়ি। একটা বিশেষ ওয়ার্ড। চৌধুরি সেই দিকে চললেন। গাড়ি থেকে স্ট্রেচার নামল চেয়ারম্যানের দেহ সমেত। স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাওয়া হল ডাক্তারের পিছু পিছু। ডঃ চৌধুরি ছাড়া আর কোনো ডাক্তার, নার্স বা হাসপাতালের কর্মীকে সেই ওয়ার্ডের ভিতরে থাকতে দিলেন না চিফ।

ওয়ার্ডের নিচের তলায় একটা বড় ঘর। সেখানে অপারেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এখানে অপারেশন করা হয়। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকল স্ট্রেচার বাহকরা। একটু বাদেই বেরিয়ে এল ওরা দু'জন

চেয়ারম্যানের স্ত্রীর পৌছতে দশ মিনিটও লাগেনি। গাড়ি থেকে নেমে তিনি পাগলের মতো ছুটে আসেন।

—কোথায়, কোথায় তিনি? ভয় নেই ম্যাডাম। —আশ্বাস দেন চিফ। -উনি বেঁচে আছেন তো?

আছেন বইকি, আসুন।দরজাটা একটু ফাক করলেন চিফ। চেয়ারম্যানের পত্নী ঝড়ের মতো ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে গেলেন চিফ।

অপারেশন টেবিলে শায়িত নিথর চেয়ারম্যানের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী। সত্যি প্রাণ আছে তো? চেয়ারম্যানের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন প্রফেসর। পাশে দাঁড়িয়ে ডঃ চৌধুরি। একটা প্রবল কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ শুকিয়ে গেল।

ডাক্তারের খানিক পিছনে ও কে দাঁড়িয়ে?

এ যে স্বয়ং চেয়ারম্যান। ঠোটে চাপা হাসি। দেখছেন স্ত্রীকে।

একী! - চেয়ারম্যান-পত্নী থ।

চিনতে পারছ না? —চেয়ারম্যানের কণ্ঠ শান্ত, মৃদু কৌতুক মেশানো।

তা হলে ও কে?—শায়িত দেহটির দিকে অঙ্গুলি দেখান স্ত্রী।

আমার নকল।বললেন চেয়ারম্যান।

-মানে?

মানে রোবট।—আমাদের প্রফেসর বানিয়েছে।

ওঃ! তোমার কিছু হয়নি?—আশঙ্কা মুক্তির উল্লাসে স্ত্রী জড়িয়ে ধরলেন চেয়ারম্যানকে। তার চোখে আনন্দের অশ্রু : কিন্তু আমি যে টিভিতে দেখলাম তুমি সভায় গেলে, বসলে - সব এই রোবট করেছে। আর ওকে চালিয়েছে আমাদের প্রফেসর। হাসপাতালের গায়েই ডঃ চৌধুরির কোয়ার্টারে বসে। যাকে বলে রিমোট কনট্রোল

—বললেন চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে মহা আগ্রহে দেখতে থাকেন তার স্বামীর অবিকল প্রতিমূর্তিকে। কৌতুহলী চিফও ভালো করে দেখেন সেই যন্ত্রমানবকে। এর আগে তাড়াহুড়োয় খুঁটিয়ে দেখা হয়নি।

প্রফেসর রোবটের গায়ের কোটের বোতাম খুলে ফেলেছেন। রোবটের বুক ও শরীরের অনেক জায়গায় রবার ও চামড়ার পুরু আবরণ। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। তার লৌহ অঙ্গ। বুকের রবারের প্যাডিংয়ে বড় বড় ফুটোগুলির ঘায়ে

হয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে নিচে ধাতুর পাত। মূর্তির মুখটা কি দিয়ে করেছে কে জানে। প্লাস্টিক নাকি? কি অদ্ভুত মিল! বুকের এক জায়গা সমানে ওঠা নামা করছে। জামার ওপর থেকে যেন মনে। হবে শ্বাস-প্রশ্বাস।

ফার্স্ট ক্লাস। চমৎকার কাজ করেছে। - প্রফেসর বলেনঃ আঘাত পেয়ে রক্ত বেরুনোটা ঠিক মতো হবে কি না সন্দেহ ছিল। নাঃ-কোনো গন্ডগোল করেনি।

রক্ত?—চিফ অবাক।

ওই হল। লাল জল।—প্রফেসর বেশ বিরক্ত।

চেয়ারম্যানের স্ত্রী আমতা আমতা করেন, সভায় যাওয়ার আগে তুমি যখন আমাকে বলতে এলে, তখনই কি?

না – বললেন চেয়ারম্যান। তখন আসল আমিই ছিলাম। বললাম না, মাথা ধরেছে। চৌধুরির কাছ থেকে ঘুরে যাব। যাওয়ার পথে ডাঃ চৌধুরির বাড়িতেই বদলটা হল। তারপর লুকিয়ে এসে এখানে অপেক্ষা করছিলাম।

আমায় বলেনি কেন? - স্ত্রীর কণ্ঠে অনুযোগ। চেয়ারম্যান চুপ করে থাকেন। -বুঝেছি পাছে বলে ফেলি কাউকে।

কে কে জানত? —এই চিফ। আমার বডি গার্ড। চারজন বিশ্বাসী পুলিশ ইন্সপেক্টর। এবং প্রধানমন্ত্রী। ডঃ চৌধুরি বা প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্টের কথা বাদই দিচ্ছি।

ডাক্তার চৌধুরি বলে উঠলেন, গুলি কোথায় লেগেছে দেখেছেন? দুটো হৃদপিণ্ডে। একটা গলায়। আপনার গায়ে সত্যি লাগলে কারও সাধ্যি ছিল না বাঁচায়। চেয়ারম্যান চিফের দিকে ফিরলেন।

-কনগ্রাচুলেশনস। আমার মার্ডার সিনে তোমাদের অভিনয় খাসা হয়েছে। আমি সব দেখেছি টিভিতে। ওই ব্যারিস্টারটিই হয়তো ব্ল্যাক-স্কোয়াডের ব্রেন। এবার চটপট জাল গুটোও। হেঁকে তোলো দলটাকে।

দরজায় টোকা পড়ল। চিফ দরজা খুললেন। একজন ইন্সপেক্টর উকি দিয়ে বলল -স্যার, কয়েকজন মন্ত্রী এসে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রীও এসেছেন। খবর

জানতে চাইছেন।

বলো, চিফ, যথাসাধ্য নিজেকে বিষণ্ন, গম্ভীর করে তোলেন: অপারেশন হচ্ছে। খানিক বাদে দেখতে আসতে পারবেন। প্রেসের লোকদের বলো,—দশ-বারো ঘণ্টা না গেলে চেয়ারম্যানের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। —চিফ দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ইন্সপেক্টর চলে গেল। চেয়ারম্যান হাসতে হাসতে বললেন,—ওহে প্রফেসর, এবার রোবটটা সরাও। আর ওহে ডাক্তার, আর দেরি কোরো না, জলদি আমায় ব্যান্ডেজট্যান্ডেজ বেঁধে শুইয়ে দাও। কিছু লোককে তো এই আহত অবস্থায় দর্শন দিতেই হবে! নইলে ব্যাপারটা কেঁচে যাবে না?

কেদার বাবার রহস্য সন্ধান - অজেয়
Kedar Babar Rahassa Sandhane by Ajeo Ray

সকাল ন'টা নাগাদ বোলপুর শহরে নিজের ঘরে বসে একখানি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে চোখ বোলাচ্ছিল দীপক। জলপাইগুড়িতে একপাল বন্য হাতির উপদ্রবের খবরে তার নজর আটকে গেল। এই সময় পাশ থেকে তার ভাইপো ষোলো বছরের ছোটন মৃদুস্বরে ডাকল-কাকু।

'উ?' অন্যমনস্ক দীপকের জবাব।

'তুমি কেদারবাবাকে দেখেছ?' বলল ছোটন।

'হুম।' উত্তরটা দায়সারা। কারণ দীপকের মন তখন হস্তীযুথের তাণ্ডবের রোমহর্ষক বর্ণনায় মগ্ন। 'জানো কাকু, কেদারবাবার গোঁফটা না ফলস', বলল ছোটন। 'ও।' ছোটনের কথা দীপকের মনের গভীরে ছোঁয় না। সে তখন ভাবছে— ইস, এই জন্যেই নামকরা কাগজগুলোর এত কাটতি। কোন দূর দেশের ইন্টারেস্টিং ঘটনা সব জোগাড় করে ছাপে। অবশ্য এর জন্য অনেক রিপোর্টার চাই। অর্থ চাই। বঙ্গবার্তা তা পাবে কোথায় ? তার সংগতি যে সামান্য।

'সত্যি বলছি কাকু।' দীপকের রকম দেখে ছোটন ভাবে, কাকা বুঝি তার কথা অবিশ্বাস করছে। তাই সে এবার একটু জোর দিয়েই জানায়, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি।

অ্যা, কী দেখেছিস?' দীপকের চমক ভাঙে। ‘কেদারবাবার গোঁফটা ফল। ‘মানে!’ কাগজ রেখে দীপক ঘুরে সোজা হয়ে বসে, কী করে জানলি?' বললাম না, আমি নিজে দেখেছি।' কীভাবে দেখলি?' ‘তালপুকুরের ধারে যে মস্ত আমগাছটা আছে ওটায় উঠেছিলুম কাল দুপুরে। যা আম ধরেছে না!'

‘ও, দুপুরে বাড়ি থেকে কেটেছিলি? গ্রীষ্মের ছুটিতে এই হচ্ছে? "প্লিজ কাকু, বাড়িতে বলে দিও না। আর কক্ষনো যাব না।' ‘হু, তা কী দেখলি শুনি?'

কাকার কাছে ভরসা পেয়ে ছোটন হাতমুখ নেড়ে উত্তেজিত চাপা স্বরে বলতে থাকে— “গাছটা দেখেছ তো কাকু, কী ঘন ডালপালা। মাঝামাঝি উঠে কয়েকটা আম পেড়ে ডালে বসে নুন দিয়ে চাখছি। বেশ পাতার আড়ালে বসেছি। গাছ পাহারা দেয় যে লোকটা সে ওই পুকুরের কাছেই থাকে। দেখতে পেলেই তাড়া করবে। তবে তখন বোধহয় ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ দেখি কেদারবাবা তার চেলাকে নিয়ে হাজির হলেন। আমার ভারি ভয় লাগে ওঁকে। বাপূরে ক লম্বা। আর কী গম্ভীর! ওঁর চেলাটাও শুনেছি খুব রাগী। আমি চুপচাপ লুকিয়ে বসে দেখতে লাগলুম।

‘দু'জনে ঘাট দিয়ে নেমে জলে হাত-পা ধুল। তারপর সাধু বসলেন ঘাটের বাঁধানো চাতালে। ওঁর সেই হরিণের চামড়ার আসনটা পেতে। মাথার পাগড়ি খুলে নেড়ে নেড়ে বাতাস খেতে লাগলেন। ওঁর শিষ্যও বসল কাছে। বোধহয় অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে জিরোচ্ছিলেন। কমণ্ডলু থেকে জল খেলেন সাধু। চেলাও খেল। খানিক বাদে কেদারবাবা ফের মাথায় পাগড়ি বেঁধে পকেট না কোথেকে জানি একটা চিরুনি বের করে নিজের দাড়ি-গোফ আঁচড়াতে লাগলেন। আমগাছটা ঘাটের উল্টোদিকে। ওরা আমায় দেখতে পাচ্ছিল না। আমি কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছিলুম ওদের। হঠাৎ দেখি সাধুর একদিকের গোঁফ খানিকটা ঝুলে পড়েছে। যেন নকল গোফ খুলে আলগা হয়ে গেছে। সাধু, মানে কোরবাৰা অমনি টপ করে তার গোফ আঙুল দিয়ে তুলে চেপে ধরে এদিক সেদিক তাকিয়ে উঠে গিয়ে বসলেন একটা ঝোপের আড়ালে। ওঁর শিষ্যও গেল পিছু পিছু তার ঝুলিটা নিয়ে। তারপর কী যে করল ঠিক দেখতে পেলুম না। একটুক্ষণ বাদে দু'জনে ফিরে এসে ফের ঘাটে বসল। তখন দেখি কেদারবাবার গোঁফ আগের মতন হয়ে গিয়েছে। গোফটা লাগিয়ে নিল নিশ্চয়ই। থিয়েটারে যেমন আঠা দিয়ে গোঁফ-দাড়ি লাগায়। কী মনে। হয় কাকু, উনি সত্যি সাধু না, ভণ্ড। সত্যি হলে নকল গোফ লাগাবেন কেন?”

'তুই ঠিক দেখেছিস?' জিজ্ঞেস করে দীপক। হা কাকু। স্পষ্ট দেখলাম। গোঁফের একটা ধার খুলে ঝুলছিল।

'ওরা গেল কখন?

'খানিক বাদেই। ওরা দূরে চলে গেলে আমি নামলাম গাছ থেকে। খুব ভয় করছিল। ভণ্ড সাধু যদি দুষ্ট লোক হয়। তাই আগে নামিনি। ওদের মতলব কী কাকু? এখানে এসেছে কেন?' ছোটন উৎসুকভাবে চেয়ে থাকে দীপকের পানে। সে জানে তার কাকা একজন সাংবাদিক এবং সর্বদা নতুন নতুন খাবারের খোঁজে ঘোরে।

দীপক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি আরও ভেবে দেখি। তবে হ্যা, এ বিষয়ে আর কাউকে একটি কথাও বলিসনে।'

কেদারবাবাকে একবারই দেখেছে দীপক দিন পাঁচেক আগে। সাধুবাবা সেইদিনই সদ্য এসেছেন বোলপুরে। বোলপুর স্টেশনের এক প্রান্তে হরিণের চামড়া মাটিতে পেতে তার ওপর সোজা হয়ে বসেছিলেন সন্ন্যাসী। কাছে কম্বলের আসনে বসেছিল তার এক চেলা। সাধুবাবার চেহারাটি নজরে পড়ার মতো। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ। রং গৌর। খাড়া নাক। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। কপালে তেল সিঁদুরের ফোটা এবং ভস্মরেখা। মাথায় লম্বা চুলের ওপর গেরুয়া পাগড়ি জড়ানো। মুখে গো ও লম্বা দাড়ি। চুল-দাড়িতে কিঞ্চিৎ পাক ধরলেও দেহে বার্ধক্যের ছাপ নেই। পরনে হাঁটুল গেরুয়া আলখাল্লা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

সাধুর চেলাটির বয়স ঢের কম, যুবকই বলা চলে। তার গায়েও গেরুয়া আলখাল্লা। তাব মাথার চুল ছোট এবং সাদা কাপড়ের পাগড়ি। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। মাঝারি লম্বা। গাট্টা জোয়ান। সাধুদের পাশে রাখা ছিল দুটি ঝোলা, দুটি কমণ্ডলু এবং দু'খানা মোটা তেল-চক'টকে বাঁশের লাঠি। অয়েকজন কৌতুহলী দশক অবাক হয়ে দেখছিল তাদের। সাধু উদাস স্থির নয়নে তাকিয়ে ছিলেন দূর আকাশের পানে। সাধুর সঙ্গীর দৃষ্টি কখন তার গুরুর ওপর, কখনও চকিতে ঘুরে আসছিল আশেপাশে।

দীপক আধমিনিটটাক থেমে থেমে নবাগত সাধু ও তার চেলার ওপর চোখ বুলিয়ে চলে গেছল নিজের কাজে।

ওই সাধুর আর সাক্ষাৎ না পেলেও ওঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পৌঁছেছিল দীপকের কানে। সাধুটির নাম কেদারবাবা। ওর চেলার নাম হরি ব্রহ্মচারী। বোলপুর শহরে উনি দিব্যি জমিয়ে বসেছেন। কয়েক বাড়ি গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ ইত্যাদি করেছেন। আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন। সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলা হিন্দি দুই ভাষাই খাসা বলেন। ভজন গানও করেন। স্টেশনে তাদের একদিনের বেশি কাটাতে হয়নি। বোলপুরের মন্দিরগুলি দর্শন করতে করতে মুখুজেদের প্রাচীন শিবমন্দির দেখে সাধুর ভারি পছন্দ হয় এবং আপাতত ওই মন্দির সংলগ্ন অতিথিশালায় চেলাসহ আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণত তিনি পাঠ-টাঠ বা গান করেন সকালবেলা। তারপর টো টো করে ঘুরে বেড়ান। ওই সময় প্রধানত শহরের কাছাকাছি গ্রামের মন্দির ও পুণ্যস্থানগুলি দেখে বেড়ান। হিন্দু মুসলমান বা যে কোনো সম্প্রদায়ের পুণ্যস্থান দেখা এবং সেগুলির ইতিহাস শোনায় নাকি তার বিশেষ আগ্রহ। কখনও বা নির্জন জায়গায় ধ্যানে বসেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সাধুজি নাকি করতলের রেখা দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎও বলতে পারেন। তবে সহজে রাজি হন না এই বিদ্যা জাহির করতে।

দীপক কেদারবাবা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেনি। তবে একটা ব্যাপার শুনে সাধুর ওপর তার শ্রদ্ধা জেগেছিল। কেন্দারবাবা নাকি কোনো টাকাকড়ি বা দামি জিনিস প্রণামী হিসেবে গ্রহণ করেন না। নিজের ও শিষ্যের অতি সাদাসিধে আহারের প্রয়োজনে কিছু চাল আটা, সামান্য তরারি বা টল গ্রহণ করেন না।

কেদারবাবা সম্বন্ধে বোলপুরের বাসিন্দাদের রীতিমতো ভক্তি জেগেছে। তবে তার সঙ্গী শিষ্যটির ওপর অনেকেই বিরূপ। লোকটি নাকি বড় কাটখোটা। গুরুকে আগলে আগলে রাখে এবং অনেক সময় দর্শনপ্রার্থীদের কড়া ভাষায় হাঁকিয়ে দেয়।

দীপক চিন্তা করে কে এই সাধু এবং তার চেলা? ছদ্মবেশী চোর-ডাকাত নাকি? কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছেন এখানে। থানায় খবর দিই যদি? উহু, এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হবে না। যদি ছোটনের চোখের ভুল হয়? মিছিমিছি এমন জঘন্য অপবাদ দিলে কেদারবাবার ভক্তরা দীপককে আর আস্ত রাখবে না। সুতরাং নিজে দেখেশুনে, প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হয়ে তবে পুলিশে রিপোর্ট।

বিকেলে বঙ্গবার্তা’র পিওন এসে দীপককে জানাল, 'বাবু ডেকেছেন।' অর্থাৎ সম্পাদকের তলব।

‘বঙ্গবার্তা'র মালিক এবং সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি তার ছোট্ট অফিস কামরায় থমথমে হাঁড়িপানা মুখে চেয়ারে বসেছিলেন। কৈবল তিনি ফোসফোস করে নিশ্বাস ফেলছেন, ছটফট করছেন।

কুঞ্জবিহারী মাঝবয়সি। মাথায় খাটো, শ্যামবর্ণ, দৃঢ়কায় ব্যক্তি। পরনে ধুতি শার্ট। পাশের ঘরে ভবানী প্রেসের কাজ চলছে খটাখট শব্দে। ওই প্রেসেই ছাপা হয় বঙ্গবার্তা। ভবানী গ্রেসেরও মালিক কুঞ্জবিহারী। দীপক সম্পাদরে ঘরের দরজা ঠেলতেই তিনি হাঁক ছাড়লেন— 'এসো। কাম-ইন।'

পঞ্চ সামনের চেয়ারে বসতে না বসতেই কুঞ্জবাবু একখানা খবরের কাগজ তার সমুখে টেবিলে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'এই দেখ । দেখেছ?'

পিক এক নজরে দেখল, সেটি 'সমাচার'-এর সদ্য প্রকাশিত সংখ্যা। সমাচারও

বোলপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এটিও বঙ্গবার্তার মতন একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং বঙ্গবার্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওই সংখ্যাটি এখনও পড়েনি দীপক। তাই সম্পাদকের এত উত্তেজনার কারণটা ক—

-বুঝে থতমত ভাবে জিজ্ঞেস করল-“কী ব্যাপার?”

‘ব্যাপার এই।' খেকিয়ে উঠলেন বঙ্গবার্তার সম্পাদক এবং ওই সমাচার-এর প্রথম পৃষ্ঠার এক জায়গায় আঙুল ঠেকালেন। দীপক দেখল, কালো চৌকো মোটা দাগের ঘেরার মধ্যে বড় বড় হরফে ছাপা এক ঘোষণা। পাঠকদের জানানো হচ্ছে যে দু'সপ্তাহ পর থেকে সমাচার-এ প্রকাশিত হবে এক অভিনব কাহিনি। বিষয়-জনৈক পকেটমারের আত্মকথা।

‘এই স্টোরি বেতে শুরু করলে আর কি কেউ বঙ্গবার্তা কিনবে? সব পাঠক টেনে নেবে ওরা। হতাশ সুরে জানালেন কুঞ্জবিহারী। ‘এমন পকেটমার ওরা পেল কোথায়?” দীপক অবাক, নির্ঘাৎ নিজেরাই বানাবে।

হতে পারে। হয়তো দু-চার কথা শুনেছে কোনো পকেটমারের মুখে, বাকিটুকু হবে নিজেদের কারসাজি। পকেটমারটির আসল নাম না দিলেই হল। কে আর চ্যালেঞ্জ করছে? তা আমরাও তো বানাতে পারি এমন কিছু। আমাদের কি ইমাজিনেশন নেই? দেখো দীপক, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান দরের কিছু ছাড়তে না পারলে বঙ্গবার্তা ডুববে। হুম খানিক 'ভুরু কুঁচকে গুম মেরে থেকে, নিজের কপালে বার কয়েক ডট পেনের টোকা মেরে কুঞ্জবিহারী বলে উঠলেন, “ননা, এত সহজে হার মানা চলবে না। ফাইট চাই ফাইট। একটা কিছু ভাব দীপক, খুব ইন্টারেস্টিং। ইয়াং-ম্যান, তুমি আমাদের বেস্ট রিপোর্টার। তোমার মাথা খেলে। পারলে তুমিই পারবে। আ-হু-ছা, প্রফেশনে রয়েছে বা রিটায়ার করেছে এমন কোনো ডাকাতের সঙ্গে তোমার চেনা নেই? তার কিছু লাইফ-হিস্ট্রি আদায় করতে পারলে বাকিটা তোমার কলমের জোর। ইচ্ছেমতে রং চড়াবে। ডাকাতের আত্মকাহিনি।' সমাচারকে টেক্কা দিতে বঙ্গবার্তার সম্পাদক বুঝি মরিয়া।

দীপকের মাথায় চকিতে খেলে যায় এক আইডিয়া। লোরবাৰা সম্বন্ধে যা সন্দেহ হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, মার দিয়া কেল্লা। দুর্দান্ত খবর হবে। সমাচার-এর পিপকেটুকে টক্কর দেবে অনায়াসে। সাধুকে স্বচক্ষে দেখছে গোটা বোলপুর। সুতরাং কেসটা জমবে বেশি। দীপক তার মনের ভাব লেশমাত্র প্রকাশ না করে শুধু বলল, “দেখি চেষ্টা করে, কী করা যায় ?

‘হা, হাঁ, করো চেষ্টা। তবে মনে রেখো সময় খুব কম। কুঞ্জবিহারী দীপকের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন। দীপক উঠে পড়ল।

বাড়ি ফিরে দীপক ছোটনকে আড়ালে ডেকে বলল, “শোন্ কেদারবাবাকে ওয় করতে হবে। কোন কোন বাড়িতে যাচ্ছেন, কী করছেন? সমস্ত খুটিনাটি। আঁচ করতে হবে ওঁর আসল মতলবটা কী? কখনও তুই যাবি। কখনও আমি।'

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ মুখুজ্যে বাড়িতে হাজির হল দীপক।

এককালে মুখুজ্যেরা রীতিমতো ধনী পরিবার ছিল। এখন অবস্থা পড়ে গেছে একেবারে। শহরের এক কোণে পাঁচিলঘেরা মস্ত কম্পাউন্ডের মধ্যে তাদের দোতলা অট্টালিকা শিবমন্দির, অতিথিশালা, পূজামণ্ডপ ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্র জরার ছাপ। মেরামতির অভাবে বহু জায়গায় পাচিল ভাঙা দেয়াল পলস্তারা খসা, বাড়ির ফোকরে ফোকরে আছে বট-অশ্বথের চারা। একদা শৌখিন বাগান

এখন আগাছা-ভর্তি বাড়ির এলাশয় সুর দিয়ে গেছে চওড়া পাকা রাস্তা, অন্য ধারে একটা সরু গলিপথ।

হঙ্গারবাবা মন্দিরের সামনে খোলা বাঁধানো চাতালে বসেছিলেন বাৰু হয়ে। শিরপাড়া কা। দুই হাত হাঁটুতে ঠেকানো। মুদিত নয়ন। ইতিমধ্যে তিনটি স্থানীয় ভক্ত এসে আটছেন। তারা বসে আছেন সাধুবাবার কাছে। শিষ্য হয়ে কিছু দূরে ফুল তুলছে। দীপক গুটিগুটি গিয়ে বসল একপাশে। খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল সাধুকে।

একটু বাদেই কেদারবাবা চোখ খুলে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'জয় শংকর।'' তারপর তিনি হাসিমুখে আগন্তুকদের মুখের ওপর একবার চোখ বোলালেন। সবাই হাতজোড় করে নতমস্তকে প্রণাম জানালেন সাধুজিকে। দীপকও তাই করল।

প্রথমেই কথা বললেন সোনা-রূপার বাবসায়ী নিবারণবাবু। আর্জি জানালেন যে আগামীকাল সাধুবাবা তার বাড়িতে গীতা পাঠ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন। কেদারবাবা রাজি হলেন। আর একদফা প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন নিবারণবাবু।

এবার কেদারবাবার কাছে একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তুললেন পণ্ডিতমশাই। আলোচনা শুরু হল। চলল আধঘন্টাটাক। এর পর কেদারবাবাকে একবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন অপর এক ব্যবসায়ী খটমলজি। উদ্দেশ্য বোঝা গেল, বাড়ির কিছু লোকের হাত দেখানো অর্থাৎ ভাগ্য জানা। কেদারবাবা তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন না। খানিক চুপ করে থেকে - বললেন যে, পরে ভেবে স্থির করবেন যাওয়া সম্ভব হবে কিনা।

কেদারবাবা সবিনয়ে বললেন যে এখন তিনি বিদায় নেবেন। কারণ হরেন সাধুখা মশায়ের বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করবেন আজ সকালে।

অন্যান্যদের সঙ্গে দীপকও সাধুকে প্রণাম করে উঠে পড়ল। দীপক কিন্তু বাইরে গেল না। সামান্য ঘুরে ঢুকে পড়ল মুখুজ্যে বাড়ির অন্দরে। মুখুজ্যে গিন্নির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা আছে।

বিধবা সৌম্যদর্শন বৃদ্ধা মুখুজে পৃহিণী একা বসেছিলেন দোতলার বারান্দায়। দীপককে দেখে আহবান জানালেন—'এসো বাবা, অনেক দিন পরে। কেমন আছ? বাড়ির খবর ভালো?”

দীপক মুখুজ্যে গৃহিণীকে প্রণাম করে বসল কাছে। বলল, 'আয়ে ভালোই আছি। কেদারবাবাকে দেখতে এসেছিলাম।'

বাবাজির নাম শুনেই মুখুজ্যে গিন্নি কপালে জোড়হাত ঠেকালেন ভক্তিতে। বললেন, “আহা মহাত্মা ব্যক্তি। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিছুই তো সেবা করতে পারি না।

দীপক বুঝল মুখুজ্যে গিন্নিকে একেবারে বশ করে ফেলেছেন শোরবাবা। তার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ আলোচনা এখানে চলবে না। সে এটা-সেটা কথার পর বলল, 'আচ্ছা মাসিমা, পুরনো আমলের পুরনো ডিজাইনের গয়না এখনও কিছু আছে আপনাদের?" 'আছে বাবা সামান্যই। নাতনির বিয়ের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। ওইটুকুই যা সম্বল।”

একদিন এসে দেখব। ওসব পুরনো ডিজাইন তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের লকার থেকে বাড়িতে আনলে খবর দেবেন আমায়।

‘গয়না ব্যাঙ্কে তো নেই। বাড়িতেই আছে, সিন্দুকে। তুমি যেদিন ইচ্ছে দেখতে পার।”

'আ, সেকি! বাড়িতে রেখেছেন। চোর-ডাকাতের কী উপদ্রব! সিন্দুক ভাঙতে কতক্ষণ? বাড়িতে একটিও সমর্থ পুরুষ নেই। বাড়ির জানলা দরজা অনেকগুলোই নড়বড়ে।'

‘আমার যে বাবা ব্যাঙ্কে লকার নেই। ‘আত্মীয়-স্বজন কারও লকারে রেখে দিন। ‘কাছাকাছি আত্মীয় বলতে এক ভাইপো আছে বর্ধমানে। তার লকার আছে শুনেছি। ‘বেশ, পাঠিয়ে দিন তার কাছে। আর যদি না পাঠাচ্ছেন, গয়নাগুলো বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখুন। চোর পড়লে প্রথমেই তো সিন্দুক খুঁজবে।

ভীত মুখুজ্যে গিন্নি বললেন, “ঠিক বলেছ বাবা, তাই রাখব লুকিয়ে।।

বাড়ি ফিরে দীপক ছোটনকে বলল, 'সাধুখাঁদের বাড়িতে এখন চণ্ডীপাঠ করবেন কেদারবাবা। তুই যা ওখানে। ভালো করে দেখেশুনে এসে রিপোর্ট করবি।।

কিঞ্চিৎ দমে গেল ছোটন। ডাংগুলি খেলার কী হবে? যা হোক গোয়েন্দাগিরির খাতিরে সে আজ আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হল।

ঘণ্টা দুই বাদে ছোটন ফিরল ব্যাজার মুখে। অতি একঘেয়ে কেটেছে সাধুখাঁর বাড়িতে। পাঠ অবশ্য খুব জমেছিল। প্রচুর শ্রোতা হয়েছিল। তবে ছোটন মাথামুণ্ডু বোঝেনি ওসব তত্ত্বকথা। তার বয়সি কেট অতক্ষণ থাকেনি। একটাই নতুন খবর —বোলপুর থানার দারোগার স্ত্রী পাঠ শুনে ঝুলোঝুলি করেছেন সাধুবাবাকে একবার তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কেন্দারবাবা প্রথমটায় রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে বলেছেন যে, কিছুদিন বাদে যাবেন।

দীপক ভাবল, সেরেছে। স্বয়ং দারোগা গিন্নি কুপোকাৎ। এখন ওই সাধুর নামে নালিশ করলে দারোগাসাহেব উল্টে তাকেই না হেনস্থা করেন? মোক্ষম প্রমাণ না মিললে কেদারবাবার বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করে লাভ নেই।

ছোটন জানাল যে, আসছে কাল নিবারণ স্বর্ণকারের বাড়ি সে পাঠ শুনতে যেতে পারবে না। কারণ ওদের বাড়ির ছেলে বঙ্কার সঙ্গে মাত্র তিন দিন আগে তার খুব একচোট হয়ে গেছে। আড়ি চলছে। দীপক অগত্যা ভেবে বলল, “তাহলে ওখানে তুমাকে পাঠাই।”

ছোটনের বছর তিনেকের ছোট বোন কুমাকে গোপনে ডেকে দীপক অল্প কথায় বুঝিয়ে দিল তার প্ল্যান। ঝুমা শুনেই একপায়ে খাড়া। চোখ বড় বড় করে বলল, বাবাজির দড়ি ধরে একবার টান মেরে দেখব নাকি, সত্যি না ফল।'

টানবি কী ভাবে?' ছোটনের প্রশ্ন। ঝুমা বলল, “কেন, প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খাবার ভান করে ওঁর দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ব।' 'না, না, বাধা দিল দীপক, যদি খুব শক্ত করে লাগানো থাকে? যদি ঠিকমতো টানতে

পারিস, খুলবে না। আর যদি দাড়িটা সত্যি হয়? হয়তো দু-একগাছা মাত্র ছিড়ে আসবে। তখন মহা কেলেংকারি হানে। ভক্তরা বকেয়কে তাড়িয়ে দেবে তোকে।

কেদারবাবাও তোর। মতলব আঁচ করে সাবধান হয়ে যাবে। হয়তো পালাবে। উধাও হবে বোলপুর থেকে।

'তাবে তো ভালোই হয়,' বলল মা।

দীপক ঘাড় নাড়ে। তার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ভাঙে না। কেদারবাবা ঘাবড়ে গিয়ে কোনো দুষ্কর্ম না করে নিরামিষ পিট্রান দিলে তার বঙ্গবার্তায় লেখাটা যে জমবে না। ঠিক অপরাধ করার সময় ওকে হাতেনাতে ধরতে পারলে সোনায়-সোহাগা। আর তা নয়তো যনি চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপি জাতীয় কিছু করে হাওয়া হল বাবাজি তখন সে পুলিশকে অনেক তথ্য জোগাতে পারবে। সাধুবাবার শরীরে কতগুলি বিশেষ চিহ্ন দীপক লক্ষ করে রেখেছে। সেই সূত্র ধরে পুলিশ হয়তো তখন খুজে বের করতে পারবে ওকে। দাগী অপরাধীদের গুটিনাটি বর্ণনা লেখা থাকে পুলিশের দপ্তরে। এসব খবর দিলেও জমে যাবে নেদারবার কাহিনি।

মা ফিরে এল একদম ভিন্ন মেজাজে। কেদারবাবার প্রশংসায় মুখর। আহা কী চমৎকার বলেন, আর খুব পণ্ডিত। একটা গান গাইলেন। কী মিষ্টি গলা! উনি কক্ষনো চোর ছ্যাচড় হতে পারেন না।'

ছোটন রেগে বলল, ''জানিস অনেক ঘাঘু ক্রিমিনাল বেশ লেখাপড়া জানে। গান আনে। তাই তোর মতন হাঁদাদের ধোঁকা দেয়।'

ঝুমা তর্ক জোড়, ওঃ তুমি ভারি চালাক! কাকু, আমার কিন্তু মনে হয় না উনি খারাপ লোক।

তবে ঝুমার কাছে একটা দামি খবর পাওয়া গেল। খোলভুসির মস্ত কারবারি হাটিবাবুর স্ত্রী নাকি এক হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন হিমালয়ে কেদারবাবার মঠের জন। বাবাজি বলেছেন যে মঠের জন্য এখন অর্থের প্রয়োজন নেই, তবে তিনি একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করছেন। দরকার হলে সেই উদ্দেশ্যে নেবেন দান।

দীপক 'ভাবল ই, এবার মতলবটা টের পাওয়া যাচ্ছে, ধুরন্ধর ব্যক্তি। প্রথমে নির্লোভ মহাপুরুষ সাজছেন। এরপর অনাথ আশ্রমের নাম করে দেদার টা তুলে চম্পট দেবেন।

পর পর দুদিন সকালে দীপক কেদারবাবকে পর্যবেক্ষণ করতে টু মাল মুখুজ্যে বাড়িতে। দ্বিতীয় দিনে এক ভদ্রলোক এলেন কেদারবাবুর কাছে। মাঝবয়সি। শ্যামবর্ণ। পরনে হাফ-শার্ট ও খাটো ধুতি। পায়ে চল। মোটা বুরুশের মধ্যে গোফওলা জোয়ান রাশভারী চেহারা। লোকটিকে বোলপুরে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না দীপক। ভদ্রলোক চারধার দেখে নিয়ে সাধুবাবাকে প্রণাম করে উঠোনের এক কোণে বসলেন এবং চুপচাপ অন্যদের সঙ্গে সাধুবাবার কথা শুনতে লাগলেন।

হবি ব্রহ্মচারী বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। নতুন আগন্তুক। চট করে উঠে গিয়ে হরিকে ডেকে নিয়ে খানিক তফাতে গেল। নিচু স্বরে অল্প কথা হল দুজনে। অচেনা ভদ্রলোক ফের এসে বসলেন উঠোনে।

দীপকের কৌতুহল হল। সে সরে গিয়ে বসল নতুন লোকটির পাশে। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কোথেকে আসছেন?”

ভলোক কিঞ্চিং ইতস্তত করে বললেন, ‘পাই।' ‘ও, সিউড়ি লাইন? বাবাকে দর্শন করতে এসেছেন?' ‘হ্যা, মানে বিশেষ প্রয়োজনও বটে। আমার এক মাত্র পুত্রটিকে নিয়ে বড়ই অশান্তি ভোগ করছি। তাই সাধুবাবার উপদেশ নিতে এসেছি, কোনো উপায় যদি বলেন? একটু গোপনে, কথা বলতে চাই।

‘কেদারবাবার কথা জানলেন কী ভাবে?” ‘আমার পরিচিত একজন বোলপুরে থাকেন, তার কাছে শুনলেম।'

ভদ্রলোক গম্ভীর বিরস মুখে নীরব হলেন। বোঝা গেল, অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন এবং 'আর বেশি কথা বলতে ইচ্ছুক নন।

আধঘন্টাটাক বসে দীপক উঠে পড়ল। তার মনে কেমন সন্দেহ। সে এক চক্কর ঘুরে হাজির হল বন্ধু পরাগের বাড়ি। পরাগদের বাড়ি দোতলা। ছাদে চিলেকোঠায় থাকে পরাগ। দীপক সোজা পরাগের কাছে হাজির হয়ে থোষণা করল, আমি তোর এখানে বসে একটা রিপোর্ট লিখব। বাড়িতে বড্ড গোলমাল, একগাদা কুটুম এসেছে, বউদির বাপের বাড়ির লোক। নিরিবিলি না পেলে আমার লেখা বেরোয় না। তুই আপাতত কেটে পড়। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরিস।' “বেশ, লেখ।' ভালোমানুষ পরাগ ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

পরাগ বেরিয়ে যাওয়া মাত্র ঘরের দরজা বন্ধ করে পশ্চিম দিকের জানলাটা প্রায় ভেজিয়ে দিয়ে, সামান্য একটু ফাক রেখে তাতে চোখ লাগিয়ে দাঁড়াল দীপক। এই জানলা দিয়ে মুখুজ্যে বাড়ির শিবমন্দির ও সংলগ্ন উঠোন দেখা যায়। দীপক কেদারবাবুর ওপর নজর রেখে অপেক্ষায় রইল।

ক্রমে স্থানীয় ভক্তরা একে একে বিদায় নিলেন। তখন পাইবাসী সেই ভদ্রলোক গিয়ে বসলেন সাধুর কাছে। আর একদল প্রণাম জানিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে কী জানি একটা বের করে ডান হাতের তালুতে রেখে দেখালেন কেদারবাবুকে। সাধুজি একবার সেটি দেখে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন। এরপর দুজনে কী সব কথাবার্তা হল। ওই সময় হরি গেটের কাছে দাড়িয়ে যেন পাহারা দিতে লাগল। সতর্ক চোখে লক্ষ করতে লাগল চারধার। মিনিট দশেক কথার পর পড়ুইবাসী উঠে পড়লেন। ধীরপায়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখে অদ্ভুত লাগল, যাওয়ার সময় তিনি সাধুবাবাকে প্রণাম জানালেন না। কেদারবাবাও উঠে ঢুকে গেলেন অতিথিশালায়। | দীপক দুদ্দাড় করে নেমে পরাগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলল নিজের বাড়ির দিকে। পথে ছোটনের দেখা মিলে গেল। দীপক ব্যস্ত হয়ে বলল, “ছোটন, স্টেশনে চ। তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি এক ভদ্রলোককে। ওকে ফলো করতে হবে। লক্ষ করবি বাসে না ট্রেনে কীসে ওঠেন? সিউড়ি লাইনের বাসে উঠলে তুইও উঠবি। লক্ষ রাখবি উনি কোথাকার টিকিট কেনেন। দেখা হয়ে গেলে নেমে পড়িস। ফিরতি বাসে এসে আমায় রিপোর্ট করবি। এই নে দু-টাকা। তোকেও তো টিকিট কিনতে হবে যা হোক একটা, আর ফেরার ভাড়া।

ঘণ্টাখানেক বাদে ছোটন এসে জানাল যে সেই ভদ্রলোক সিউড়িগামী বাসে। উঠেছিলেন এবং সিউড়ি অবধি টিকিট কেনেন। ব্যাপারটা দেখে নিয়ে ছোটন বল্লভপুরে নেমে পড়ে।

তাহলে পাইয়ের গল্প মিথ্যে বানানো। লোকটি নির্ঘাৎ কেদারবাবার গ্যাং-এর লোক। কোনো ষড়যন্ত্র করতে এসেছিল। দীপকের মন বলে, আজ রাতেই কিছু একটা ঘটবে। আজ রাতেই আসরে নামবেন কেদারবাবা।

দীপক বিকেলে ছোটনকে বলল, “শোন্, আজ রাতে আমি মুখুজ্যে বাড়ির ওপর নজর রাখব লুকিয়ে। কিছু একটা ঘটতে পারে।

‘আমার খুব ভয় করছে কাকু, যদি তেমার বিপদ হয়?'

"রিপোর্টারের কাজে রিস্ক নিতেই হয়, দৃঢ়স্বরে জানাল দীপক, 'যদি ভোরের মধ্যে বাড়ি ফিরি, তুই বরং থানায় খবর দিস।

দীপক মাকে বলল, 'এক বন্ধুর বাড়িতে গান শুনতে যাব আজ রাতে। কখন ফিরব ঠিক নেই। গেটের তালার ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে যাব।'

মুখুজ্যে বাড়ির একধারে সরু গলি। ওই গলির ওপর মুখুজ্যে বাড়ির পাশে এক পুরনো বাড়ির রোয়কে থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাড়িয়ে দীপক। রাত প্রায় দশটায় এসেছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এই উ রোয়াক থেকে মুখুজ্যে বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে মন্দিময় ও চত্বরের অংশ দেখা যায়।

ক্রমে চারপাশ একেবারে নিঝুম হয়ে আসে। গলিপথে লোক চলাচল থেমে যায় প্রায়। দীপক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শরীরের খোলা জায়গাগুলি জ্বলে যাচ্ছে মশার কামড়ে। বেশি হাত-পা নাড়তে ভরসা হয় না, পাছে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্ধের সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠছে রাস্তার ধারের ড্রেন থেকে। শছেই ভোবা থেকে ভেসে আসছে অজর ব্যাঙের গলা-সাধার রব। কানে আসছে আরও কিট-পতঙ্গের বিদঘুটে ডাক। অন্ধকার রোয়াকটায় বিষাক্ত গৰু ৰা বিছে মনি ওঠ? বলে বাড়িতে নজার ব্যাওতে বখতে দীপক ক্ষণে ক্ষণে নিজের চারধারে দুটি ছোরায় সাতভাবে। টর্চ জাল, থপায় নেই। আকাশে আধখানা চাদ। তবে মেঘ থাকায় জ্যোৎস্না ফোটেনি মোটে। শিবমন্দিরের আশে পাশে বারকয়েক দেখা গেল ছায়ামূর্তির ঘোরাফেরা, তবে তাদের চেনা গেল না।

সময় যেন আর এগোয় না। উত্তেজনা ও আশঙ্কায় দীপকের শরীর টানটান, নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি কানে বাজে। আরও অনেকক্ষণ কাটল এই অসহায় অবস্থায়।

সহসা দীপক দেখে মুখুজেদের পাঁচিল টপকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল এক ছায়ামুর্তি। অস্পষ্ট চাদের আলোয় চিনল তাকে, হরি ব্রহ্মচারী। হরি দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে গলিপথ ধরে। সে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর দীপক অনুসরণ করল তাকে, যথাসম্ভব পথের ধার ঘেঁষে বাড়িগুলির ছায়ার আড়ালে আড়ালে নিঃসড়ে। জুতোটা হাতে নিল, পায়ে শব্দ হয়।

কিছুদূর সোজা গিয়ে বার দুই বাঁক খেয়ে দীপক হাজির হল তালপুকুরের ধারে। জায়গাটা অতি নিজনি। মস্ত পুকুর ঘিরে বড় বড় গাছের তলায় ঘুটঘুটে

অন্ধকার। এর পরেই পথ গিয়েছে রেললাইনের ধারে ধারে।

হরি সহসা অদৃশ্য। তালপুকুরের পাশে আত্মগোপন করল নাকি? ও কি টের পেয়েছে দীপরে পিছু নেওয়া?

বিমূঢ় দীপক খানিক এগিয়ে থেমে যায়। এদিক সেদিক তাকায়। জায়গাটার বদনাম আছে। সন্ধের পর মাঝে সাঝে ছিনতাই হয়েছে এখানে। রেললাইনের কাছে গজিয়ে উঠেছে, একটা ব্যক্তি এবং কিছু সস্তা চায়ের দোকান। রাতে সেসব দোকানে নাকি বাজে লোকেরা আক্ষা হয়। অন্ধকারে ভদজনে তাই এলাকাটা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। দীপক কয়েক পা ইতস্তত ঘুরে একটা গাছের ছায়ায় নিথর হয়ে দাড়িয়ে থাকে প্রতীক্ষায়। কখন ফের আবির্ভূত হবে হরি? হঠাৎ পেছনে মৃদু খসখস আওয়াজ। ঘাড় ফেরানোর আগেই দীপক প্রচণ্ড আঘাত পেল মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারাল।

চেতনা ফিরতে দীপক টের পেল, একটা অন্ধকার ঘরের মেঝেতে সে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার হাত-পা-মুখ বাঁধা। মুখের ভিতর কাপড় গোঁজ। মেঝে এবড়োখেবড়ো। ঘরের একটা জানলা খোলা বা পান্নাহীন। সেখান দিয়ে রাতের আকাশের এক টুকরো দেখা যাচ্ছে। কতক্ষণ কেটেছে কে জানে? মেঘে ঢাকা চাদের ক্ষীণ আভা আকাশে।

ঘরের বাইরে কয়েকজনের চাপা গলার কথাবার্তা দীপকের কানে আসে। 'এই চল আর দেরি করিস নে। ‘এত রাতে ডাকাডাকি করলে বাবু চটে যাবে। ‘তা কী করব? এই ছোঁড়াটাকে নিয়ে কী করব জেনে আসতে হবে তো?”

“আরে ধুর, দে খতম করে। লাশ পুতে দিই। বাবুকে জানার দরকারটা কী? বেটা মহা শয়তান। ফলো করছিল আমাকে। দেখিস বাবুও ঠিক তাই অর্ডার দেবে।'

'না না, তবু জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। শেষমেশ যদি নিজেদের বুদ্ধি কাটিয়ে ঝামেলায় পড়ি? বাবু ফায়ার হয়ে যাবে। নে চল, ওঠ।'

খোলা জানলায় একজনের মুখ উকি মারে ঘরে। বাইরে ফের কথা শোনা যায়, 'বেটার এখৎ জ্ঞান ফেরেনি। চ ঘুরে আসি।

কয়েকজনের পদশব্দ মিলিয়ে যায়।

এবার দীপক প্রাণপণে তার পিছমোড়া করে বাঁধা দুহাত খোলার চেষ্টা শুরু করে। ভীষণ . কঠিন বাঁধন। টানাটানিতে গা কেটে বসে যায় দড়ি তবু বাঁধন আলগা হয় না।

সহসা জানলায় কারও ছায়ামুর্তি। দীপক মুহূর্তে কাঠ। তারপরই টর্চের তীব্র আলোর ঝলক পড়ে দীপকের গায়ে কয়েক পলকে জন্য। চোখ ধাধিয়ে গিছল দীপকের। তবু তার ঠাওর হয় জানলায় সাজানো লোকটি হরি। সর্বনাশ, ও নিশ্চয়ই পাহারায় ছিল বাইরে। ঘরে নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে দেখে গেল। বুঝল যে দীপকের হুঁশ ফিরেছে। জানলা থেকে ছায়ামূর্তি সরে যায়।

দীপক ফের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে। খুব নিঃশব্দ। হরি যেন টের না পায়। একবার এই ঘর থেকে বেরুতে পারলে একা হরিকে ঘায়েল করে পালানো তার পক্ষে কিছু কঠিন হবে না। তবে সময় খুব কম। ওদের দলের লোক ফিরে আসার আগেই পালাতে হবে। নইলে হয়তো মৃত্যু আহে অদৃষ্টে।

আরও কিছুক্ষণ কাটে। সহসা বাইরে মোটর গাড়ির আওয়াজ। গাড়িটা থামল এই ঘরের সামনে। ভারি ভারি জুতোর পদধ্বনি এগিয়ে আসে। দীপকের বন্দিশালার দরজার শিকল খোলে-শুনাৎ। জোরালো টর্চের আলোয় উল্লসিত হয় ঘর।কয়েকজন ঢাকে ঘরে। পুলিশ! তাদের একজন বোলপুর থানায় সেকেন্ড অফিসার, কনস্টেবলরাও দীপকে চেনা।

একজন সেপাই চটপট ছুরি দিয়ে দীপরে বাধন কেটে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।—'লেগেছে কোথাও ?' জিজ্ঞেস করেন সেকেন্ড অফিসার।

মাথার পিছন দিকে টনটনে ফোলা জায়গাটায় একবার আঙুল বুলিয়ে দীপক মার্ক নাড়ে, নাঃ, তেমন কিছু নয়। তারপরই সে নিজের ব্যথা ভূলে প্রবল উত্তেজনায় চেচিয়ে ওঠে, ওদের অ্যারেস্ট তে পেরেছেন? ‘কাদের?” অফিসারের প্রশ্ন।

“ওই কেদারবাবা আর তার শিষ্য হরি। ওরা ভণ্ড সাধু। ফলস্। আসলে ডেঞ্জারেস ক্রিমিনাল। হরিকে ফলো করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা। ও বাইরে গার্ড দিচ্ছিল।

দীপক হুড়হড় করে বলে যায়, সে কেমন করে বন্দি হল এবং এই ঘরের বাইরে গুণ্ডাগুলোর কথাবার্তা।

সেকেন্ড অফিসার একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এখন আপনি বাড়ি যান। পোঁছে দিচ্ছি। পরে এ বিষয়ে কথা হবে।'

রেললাইনের ধারে পোড়ো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসে সবাই।

পুলিশ-জিপ দীপককে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। দীপক বাড়ির গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিচের তলায় তার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। সদর দরজা খুলে দিল ছোটন।

'ছোটন, তুই'! দীপক অবাক। 'আমি জেগেছিলাম কাকু। বড্ড ভয় করছিল, এখনও ফিরছ না কেন? কাকু, তোমার কী হয়েছে?' দীপকের বিপর্যস্ত চেহারা দেখে ঘাবড়ে যায় ছোটন।

‘খুব বেঁচে গেছি রে। কাল বলব সব। এখন তুই শুতে যা। হারে, তুই বুঝি টেলিফোন করেছিলি থানায় আমার দেরি দেখে ?”

‘কই না তো!

‘ও, তাহলে? আচ্ছা তুই যা।'

একটা ব্যথা কমার ট্যাবলেট খেয়ে দীপক শুয়ে পড়ে। মগজে নানান চিন্তা পাক খায়। পুলিশ কীভাবে তার খোঁজ পেল? কিছু একটার সন্ধানে বেরিয়েছে পুলিশ। ব্যাপারটা কী? কেদারবাবার গ্যাং কি ধরা পড়ল? ছটফট করতে করতে ক্লান্ত দীপক কখন ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে।

দীপকের যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। রোদ উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল থানার উদ্দেশে। খানিক যেতেই দশরথ গোয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ। দশরথ বলল, বাবু, শুনেছেন, একগাড়ি পুলিশ এসেছে। নব সামন্তবাবুর বাড়িতে ঢুকেছে। রেললাইনের ধারে কয়েকজন দোকানদারকে ধরেছে।

দীপক হনহন করে চলল সামন্ত বাড়ির দিকে। মুখুজ্যে বাড়ির প্রায় সামনাসামনি বড় রাস্তার ওপরে নব সামন্তর দোতলা বাড়ি। নিচতলায় তার দোকান। নব সামন্তর বয়স প্রায় চল্লিশ, তামাকপাতা ও বিড়ির ব্যবসা আছে। বেশ পয়সাওলা লোক। বোলপুরে নতুন এসেছেন। মাত্র বছর দুই।

যেতে যেতে দীপক ভাবল, নব সামন্তর বাড়িতে পুলিশ কেন? তাহলে মুখুজ্যে বাড়ি নয়, সামন্ত বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি করেছে কোরবাবার গ্যাং।

সামন্ত বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। কৌতূহলী কিছু দর্শক তফাত থেকে দেখছে। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসছে হাঁক-ডাক, বুটজুতো পায়ে অনেকের চলাফেরার শব্দ। সদর দরুজার ঠিক সামনে দাঁড়ানো দুটি লোক দীপকের নজর কাড়ে। দুজনেই আধাবয়সি, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী। পরনে তাদের শার্ট, ট্রাউজার্স ও শু্য। ফিটফাট। ভারিক্কি ধরন। একজন দীপকের পরিচিত। সদর শহর সিউড়িবাসী জেলা পুলিশের বড়কর্তা খোদ এস, পি, সাহেব। দীপক টুক করে এস, পি.-র সামনে হাজির হয়ে বলল, নমস্কার স্যার, কী ব্যাপার?'

এস. পি. মাথা ঝাকিয়ে বললেন, 'হ্যাল্লো রিপোর্টার। সার্চ হচ্ছে। ডাগত গাজা আফিম এমনকী হেরোইন রাখত লুকিয়ে। দু'তিনটি ডিস্ট্রিক্টে চালান।

সেয়ানা পার্টি। ঘাঁটিটা বোলপুরে সন্দেহ করেছিলাম। এবার ধরা পড়ল। গ্যাং লিডার সামন্ত সমেত অনেকে অ্যারেস্টেড হয়েছে।

পাশের ভদ্রলোকটিও নিশ্চয় পুলিশ অফিসার। দীপক নমস্কার করল তাঁকে। এস, পি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—“ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি চিফ মিঃ দত্ত। আর ইনি হচ্ছেন একজন রিপোর্টার।।

‘জানি, জানি', মৃদু হেসে বললেন মিঃ দত্ত, বঙ্গবার্তার দীপক রায়।'

কৌতুহলী দীপক মিঃ দত্তর পানে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকেই চমকে উঠল। ভদ্রলোকের

দাড়ি-গোঁফ কামানো, পরিষ্কার মুখ। কিন্তু ওঁর বাঁ চোখের কোণে ওই কালো তিলটা কেন? সঙ্গে সঙ্গে তার নজর চলে যায় দত্তর ডান হাতের তর্জনীর দিকে। সেই অস্বাভাবিক লম্বা তর্জনী, মধ্যম আঙুলের প্রায় সমান সমান এবং ডান

হাতের কজির কাছে একটি পুরনো ক্ষতচিহ্ন। হতভম্ব দীপক অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল, ‘কেদারবাবা না?'

‘রাইট’, গম্ভীরভাবে জানালেন মিঃ দত্ত, তবে এখন আমি আর বাবা-টাবা নই, স্রেফ কেদারনাথ দত্ত। এস. পি.-র ঠোটে হাসির ঝিলিক খেলে। আর হরি?” আমতা আমতা করে দীপক। ‘অফ কোর্স পুলিশের লোক। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। আপাতত সার্চ পার্টির সঙ্গে সামন্ত বাড়ির ভেতরে আছে, বললেন মিঃ দত্ত। দীপক বোঝে, তাকে উদ্ধার করতে কে থানায় খবর দিয়েছিল। স্বয়ং ওই হরি।

আরও একটা রহস্যের কিনারা পায় না দীপক। কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে নিন দত্তকে, 'স্যার, লোকাল থানা কি জানত আপনাদের আসল পরিচয় ?”

উত্তর হয়, ‘নো, মাত্র গতকাল জেনেছে। আপনার মতো ওরাও আমাদের "" সন্দেহের চোখে দেখছিল। মিঃ দত্তর মুখে চাপা কৌতুক।

খাতা চুরি রহস্য - অজেয় রায় Khata Churir Rahassa by Ajeo Ray

এক

সন্ধ্যা নেমেছে। গরম কাল।

দক্ষিণ কলকাতায় যতীন দাস রোডে একটা ছোট বাড়ির দোতলায় পুলকের ড্রইংরুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিল পুলক আর জয়। পুলকের বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গড়ন। ধারালো মুখ। জয়ের বাসা হবে পচিশ-ছাব্বিশ। লম্বায় সে পুলকের কাছাকাছি তবে কিঞ্চিৎ রোগাটে। ফর্সা রং। হাসি হাসি সুশ্রী মুখ।

মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। তবে সেদিন বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় গরমটা একটু কম। পুলকের পুরনো কাজের লোক হরিহর একটা ট্রে এনে রাখল সামনের টেবিলে। ট্রেতে দু'কাপ ধূমায়িত চা এবং প্লেটে অনেকগুলো সন্য ভাজা বড় বড় বেগুনি।

‘ফাসক্লাস।' জয়া একটা গরম বেগুনি তুলে কামড় দিয়ে বলল, “কী করে বুঝলে হরিদা, চায়ের সঙ্গে এখন ঠিক এই জিনিসটাই যে চাইছিল মন?"

হরিহর একগাল হেসে বলল, “তা অনেকদিন দেখছি তো, ইচ্ছেটা বুঝি।"

বেগুনি শেষ। কাপের চা-ও শেষ হয়ে এসেছে। গল্প করতে করতে জয়ে বলল, 'পুলকদা, চলো না ক'দিন বেড়িয়ে আসি কোথাও ? অনেক দিন বাইরে যাইনি। রাজগির যাবে?' ‘তা মন্দ নয়, পুলক রাজি, আজ নয়, কালকে প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে।'

জয় লক্ষ করছিল যে পুলক মাঝে মাঝেই দেওয়াল ঘড়িটার দিকে নজর করছে। ও কোথাও বেরুবে নাকি? না কাউকে আশা করছে?

সাতটা বাজার কয়েক মিনিট আগে নিচে কলিং বেলটা বাজল। হরিহর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ফিরে এল হাতে একখানা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে। বলল, 'এক ভদ্রলোক বলছেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। 'কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে চেয়ারে আধশোয়া পুলক সোজা হয়ে বাসে হরিহরকে বলল, ‘‘হু, ভদ্রলোককে নিয়ে এসো এখানে।'

ও তাহলে এর অপেক্ষাই করছিল পুলকদা। ভাবে জয়। টেবিলে রাখা কার্ডখানায় সে চোখ বোলায় কৌতূহলে। নামটা ইংরেজিতে ছাপানো—মার্কো ডা গশ। ঠিকানাটা ভবানীপুরের। এ আবার কোন্ জাতের লোক?

মাকে ডা গাশ ঘরে ঢুকলেন। লোকটি মাঝারি লম্বা। গাঁট্টাগোট্টা। মাথায় ধবধবে ঘন সাদা চুল। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। রং তামাটে। পরনে দামি ট্রাউজার্স ও শার্ট। পায়ে দামি জুতো। লোকটিকে দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। চেহারায় বেশ একটা ভদ্র ছাপ। তবে গম্ভীর বদন, যেন একটু বিষয়। কপালে ভাঁজ। চিন্তিত ভাব। বয়স মনে হল পঞ্চাশের ওপরে। ধীর পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পুলক আর জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন।

পুলক ডাল ইংরেজিতে, ‘আসুন মিস্টার গ। বসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

খাল চুরি রহস্য। ২৩৭ নিস্টার গশ একটা চেয়ারে বসেন শান্ত ভাবে। তারপর পুলককে জিজ্ঞেস করলেন পরিস্কার বাংলায়, 'আপনি কি পুলক রায়? অনুসন্ধানী মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ?’’।

এবার পুলক বাংলাতেই জবাব দেয় মৃদু হেসে, 'আজ্ঞে হ্যা। নিচে দরজার পাশে নেন প্লেটটা পড়েছেন বুঝি? দেখুন ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা বাটা আমার পছন্দ

নয়। নিজেকে আমি বলি অনুসন্ধানী। অবশ্য বলতে পারেন গজটা একই। হা বলুন, আপনার প্রবলেমটা কী? ক্লান্ত শরীরেও যখন এসেছেন, দরকারটা নিশ্চয় খুব জরুরি। বেশ অবাক হয়ে মিস্টার গশ বললেন, "আমার শরীর যে-ভালো নয় ফেলেন কী

বুঝেচি। পুলক ঠোটে একটু হাসি টেনে মাথা কঁকিয়ে জবাব দেয় শুধু। ফের বলে— 'ই বলুনমিস্টার গশ জয়ের দিকে চেয়ে কিঞ্চিৎ দোনামনা করতে থাকেন কথা বলতে।

পুলক বোঝে সমস্যাটা। স্মিত হেসে বলে, পরিচয় করিয়ে দিই। ওর নাম জয় দত্ত। ইতিহাসের রিসার্চ স্কলার। কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে বেজায় শখ। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন। ওর সামনে যে কোনো গোপন কথা নিঃসংকোচে বলুন।"

মিস্টার গশ জয়ের দিকে চেয়ে একবার মাথা ঝাকালেন। তারপর পুলককে বললেন, "হ্যা একটা প্রবলেমে পড়েছি। খুব সিরিয়াস প্রবলেম। আমাদের হোটেলে একজন যান মাঝে মাঝে। মিস্টার ভার্মা, বিজনেসম্যান। তিনি একদিন আপনার কথা বলেছিলেন। খুব প্রশংসা করেছিলেন। ওর কী একটা কেস নাকি আপনি সলভু করে দিয়েছেন।

পুলক ঘড়ি নেড়ে বলল, 'বুঝেছি। তা আপনার কেসটা কী?

মিস্টার গশ মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে কপালে আরও কয়েকটি রেখা ফেলে ধীরস্বরে বললেন, 'দেখুন আমার একটা খাতা হারিয়েছে। আসলে চুরি গিয়েছে। ওই খাতাটা উদ্ধার করতে চাই।"

কীসের খাতা?' প্রশ্ন করে পুলক।

রান্নার খাতা।

রান্নার খাতা চুরি! রীতিমতো অবাক হয়ে বলে পুলক। 'হ্যা, তাতে শ"খানেক রান্নার প্রসেস লেখা আছে। আমার নিজের হাতে লেখা। হলুদ রঙের শক্ত মলাটের বেশ মোটা খাতা। ছাত্রর যেমন একসারসাইজ বুক ব্যবহার করে ক্লাসে নোট লিখত সেই রকম। আমার কাছে খাতাটা খুবই মূল্যবান। কারণ ওর আর কপি নেই আমার কাছে। ও খাতার মূল্য যে কতখানি তা যে কেউ বুঝবে না।

বুঝবে, যারা আমার মতো রান্নার লাইনে আছে। তাদের কাছে ওই খাতার মূল্য একটা দামি হীরে-পান্নার চেয়ে কম নয়।

'এক মিনিট। পুলক আগন্তুকের কথায় বাধা দেয়। তারপর বলে—“আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন। বাংলা দেশে অনেকদিন আছেন বুঝি?”

মার্কো ডা গশ একটুক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভালো বাংলা বলব না। কেন? খাঁটি বাঙালির ছেলে।

পুলক অবাক হয়ে বলল, 'বাঙালির ছেলে! আপনার নামটা দেখে কিন্তু মনে হয়েছিল আপনি গোয়ানিজ। পর্তুগিজ ঘেষা নাম। অবশ্য হাবেভাবে ঠিক মিলছিল না।'

হো হো করে হেসে ওঠেন গশ সাহেব। অতঃপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'সবি। ভলটা মশাই অনেকেই করে। এই ভিজিটিং কার্ডে মা ছাপা আছে ওটা আমার প্রলের নাম। খাতের সুবিধের জন্যে নিয়েছি। আমার আসল নাম মশাই কলস যোয়। আর ঠাকুমার দেওয়া নাম। দেশ এই পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলায়। ওই নামটাই বললে কর নিয়েছি মার্কো-ডা-গশ। হা ঠিক ধরেছেন, গোয়ানিজ টাইপই বটে।'

এবার হাসির পালা পুলক এবং মেয়র। পুলক সি করে, নাম বলার কারণ ও মিস্টার গশ মিত মুখে বললেন, 'কারণ আমার প্রফেশনে গোয়নিজ কুকদের ভারি কদর। তবে ইচ্ছে করলে আমি পাজা গোনিজ সাজতে পারি। আমার চেহারায় নাকি ওদের সঙ্গে মিল আছে। প্রায় পনেরো বছর গোয়ায় ছিলাম, ও দেশের ভাষা এবং ধনধারণ তখনই রপ্ত করে নিয়েছি। তবে শুধু গোয়ানিজ নয়, আমি আরও কয়েকটা ভাবা মোটামুটি বলতে পারি, কিছুটা পড়তেও পারি—ইংরেজি-হিন্দি-উ-মারাঠি- ওড়িয়া। এছাড়া কিছুটা ফ্রেঞ্চ ইতালিয়ান আর আরবিও জানি।

বাঃ!' তারিফ করে পুলক।

"পেটের দায়ে শিখেছি মশাই', বলেন কর্মদাস ঘোষ ওরফে মার্কো-ডা-গশ, ভারতে নানা জায়গায় ঘুরেছি হোটেলে চাকরি নিয়ে। নানা জাতের লোকের সঙ্গে মিশেছি। ফ্রান্স ইতালি আরবদেশেও গিয়েছি থেকেছি কয়েক বছর।'

'আপনাকে তাহলে কী নামে ডাকব?” জয় রহস্য করে জানতে চায়।

উত্তর হয়, মার্কো গা বা কর্মদাস ঘোষ, যা খুশি। আমি যে সমাজে সাধারণত মিশি সেখানে মার্কো বা গশ নামেই আমি পরিচিত। তবে দোহাই বাইরের লোকের সামনে আমায় কুর্দিাস নামে ডাকবেন না। এটা একেবারে আমার ঘরোয়া নাম। শুধু নিকট আত্মীয়রাই অামায় ওই নামে চেনে। বাইরের লোক আমার ও নামটা জানেও না।' ‘যদি মার্কোবাবু কিংবা গশমশাই বলি?' জয় মজা করে।

'না না বিচ্ছিরি শোনাবে', আপত্তি করেন মার্কো ডা গ, শুধু মার্কো বা গশ বলেই ডাকবেন।'

‘‘আপনার প্রফেশন কি কুকিং?' জিজ্ঞেস সুর পুলক।

‘‘ইয়া', সায় দেন মার্কো, আমি একজন রাঁধুনি। মানে কুক। রান্নাই আমার পেশা এবং নেশা। সামান্য ছোট্ট হোটেলে কাজ শুরু করেছিলাম। আপাতত আমি একটা থ্রি-স্টার হোটেলের শেফ অথাৎ হেড-কুক। হোটেলে হোটেলে রান্নার চাকরির সুবাদেই আমার নানা দেশে ভ্রমণ। বিদেশেও গিয়েছি ওখানে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় চাকরি নিয়ে।

হোটেলের হেড-কুক! পুলকদের মুখে ফুটে ওঠা বিচিত্র ভাব বহুদর্শী কর্মদাস ঘোষের চোখ এড়ায় না। তাই বুঝি তিনি একটু হেসে বললেন, 'রাধুনিগিরি করি বটে, তবে পড়াশোনাটা যে একদম করিনি তা নয়। গ্রাজুয়েশনটা করেছি। তবে ছোট থেকেই আমার রামার খুব শখ। কোনো নতুন রান্না বা খাবার খেতে ভালো লাগলেই ত শিখে ফেলতাম। নতুন রান্না আর নতুন খাবার তৈরির চেষ্টাও করতাম। আমার এক কাল ছিলেন খাদ্যরসিক এবং রন্ধনরসিক। তিনি আমায় অ্যাডভাইস দেন—কেন মিছিমিছি অফিসে কলম পিষে জীবনটা নষ্ট করবি? তোর যাতে আসল ন্যাক সেই লাইনে যা। উন্নতি করবি। কাজ করে আনন্দও পাৰি। রান্নাও তো একটা আর্ট রে। বড়ো বড়ো হোটেলের ভালো ভালো কুলদের কত মাইনে জানিস? অনেক চাকুরে অফিসারদের চেয়ে বেশি। তেমনি তাদের ডিমান্ড।

দেশে বড়ো বড়ো হোটেল লজের সংখ্যা কত ভেবে দেখ। কোনো দিন তোর চাকরির অভাব হবে না। তবে লাইনটা বাজলে একেবারে প্রফেশনাল ভাবে ভালো মতো শিখে এগোতে হবে। তহুই উন্নতি। পরে বুঝেছিলাম, কাকার উপদেশগুলো কত কাজের। রামা নিয়ে শখও মিটেছে, রোজগারও কনকরিনি। আমার মতো

অর্ডিনারি গ্রাজুয়েট, যার খুটির জোর নেই, অফিসের চাকরি করে এত রোজগার কখনওই করতে পারতাম না।'

'কাকার পরামর্শেই গ্রাজুয়েশনের পর রান্নার কোর্সে ভর্তি হয়ে অনেক দেশি-বিদেশি রান্না শিখলাম। বাবা মা একটু গাইগুই করেছিলেন প্রথমে। হেলের এ কীটট শখ! কিন্তু আমার জেদ দেখে শেষটায় আর বাধা দেননি। কাকাও তাদের বুঝিয়েছিলেন।

'রান্নার কোর্স করে বুঝি হোটেলে চাকরি নিলেন?' প্রশ্ন করে জয়। গতানুগতিকতার বাইরে এই বিচিত্র স্বভাবের মানুষটির প্রতি তখন তার খুবই কৌতুহল জেগেছে।

'হ্যা। ইন্ডিয়া বিরাট দেশ। কত রকম লোক এখানে। কতরকম তাদের জিভের স্বাদ আর খাদ্যবস্তু। সে সব রান্না যতটা পারি শিখব এই আশায় নানা প্রভিন্সে ঘুরেছি হোটেল কুকের চাকরি নিয়ে। ওই সব রকমারি রান্না নিয়ে নিজের খেয়াল খুশি মতো এক্সপেরিমেন্টও চালিয়েছি, কিছুটা স্বাদ বদলাতে, নতুনত্ব আনাতে। যেখানেই গেছি সেখানকার হোটেল, রোস্তোরা, প্রাইভেট বাড়ি, যেখানেই নতুন ধরনের পছন্দসই খাবারের সন্ধান পেয়েছি তা শিখে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইন্ডিয়ার বাইরে বিদেশেও গিয়েছি প্রধানত এই উদ্দেশ্যে। অবশ্য বিদেশে গেলে মোটা মাইনে জুটেছে উপরি লাভ হিসেবে।

'আপনার খাতা হারানোর ব্যাপরটা কী? পুলক মন স্বরে প্রশ্ন করতেই যেন চটক ভাঙে মিস্টার গশের। রন্ধন বিদ্যেটা যে উনি মনেপ্রাণে ভালোবাসেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ওই কথা বলতে গিয়ে দেখা করার আসল উদ্দেশ্যটাই যেন হারিয়ে গিয়েছিল তার। মন থেকে। এবার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ভেবে নিয়ে ফের বলাতে শুরু মুরেন— দেখুন আগেই বলেছি, ওই হারানো খাতাটায় লেখা আছে বহু রান্নার রেসিপি ও প্রসেস। ওগুলো সাধারণ মামুলি খাবার নয়। সব স্পেশাল ডিশ। ইভিয়ার নানা প্রদেশের রান্না। কত জায়গা থেকে যে জোগাড় করেছি। কেবল ভারত থেকে নয়, বিদেশে জোগাড় করা খাবারের রান্নাও আছে। যেমনটি পেয়েছি শুধু তেমনটি লেখা নয়। ওইসব খাবারগুলোর রান্না নিয়ে নিজে নিজে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছি। খাবারগুলোর টেস্টও খানিক বদলেছি। যাতে এক দেশের খাবার অন্য দেশের লোকেরও খেতে ভালো লাগে। মানে অনেক রান্নায় চেঞ্জ করেছি। বলতে পারেন ইমপ্রুভ করেছি। আমার বহু বছরের কালেকশন, এক্সপেরিমেন্ট আর রিসার্চের রেজাল্ট ডিটেলসে লেখা আছে ওই

খাতায়। এখন আমার বয়স ফিফটি ফোর। বাইশ-চব্বিশ বছর বয়স থেকে এটা আমার হবি। দুঃখের বিষয় ওই খাতার লেখাগুলোর কোনো কপি নেই আমার কাছে। কোনো রান্না মপ্লিট হয়েছে মনে হলে তার রেসিপি আর গোটা প্রসেস ওই খাতায় গুছিয়ে লিখে রেখে তার রাফ নোটগুলো ফেলে দিয়েছি। তাই ওই খাতাটা যাওয়া মানে আমার বহু বছরের সাধনা নষ্ট হওয়া। এখন চেষ্টা করলেও এই খাতার বেশির ভাগ রান্নার খুঁটিনাটি আর মনে করতে পারব না। এ যে আমার কত বড় লস্।

বাঃ লোকটি শুণী বটে। ভাবে জয়। কার মধ্যে যে শ গুণ লুকিয়ে থাকে? ঠিকঠাক সময় উৎসাহ আর সুযোগ পেলে তার বিকাশ ঘটে। মহাভারতের ভীমও তো পড়েছি রন্ধনবিদ্যায় এক মস্ত গুণী ছিলেন। সে আপশোস ভরে জিজ্ঞেস করে মার্কোকে, ইস মনে করতে পারবেন না? আচ্ছা, ওই খাতায় লেখা রান্নাগুলো আপনি করতেন না কখনও?

করতাম,' জবাব দেন মার্কো, ‘হোটেলে আমায় স্পেশাল মেনু রাধার দায়িত্ব দেওয়া হলে ওই খাতা থেকে বেছে নিয়ে দু একটা আইটেম করতাম। তবে সে তো কালে ভদ্রে। সাধারণত কয়েকটা চলতি বারেই অর্ডার হত বেশির ভাগ সময়। খাতার অন্তত অর্ধেক রান্না ফাইনালি খাতায় টুকে ফেলার পর আর দ্বিতীয়বার বেঁধে লোককে খাওয়ানোর চান্স পাইনি। সেগুলোর ডিটেলস তো কোনোমতেই আর মনে করতে পারব না।'

মার্কো বিষভাবে বললেন, ‘জানেন ইচ্ছে ছিল যে আর কয়েক বছর বাদে চাকরি থেকে রিটায়ার করে একটা রান্নার বই লিখব। তাতে ওই খাতার রান্নাগুলো থাকবে স্পেশালি। এক নামকরা পাবলিশার্স আমায় অফার দিয়ে রেখেছে বইটার জন্য। বইয়ের কাজে হাত দিলেই রয়াল্টির মোটা টাকা অ্যাডভান্স দেবে তাও বলেছে। সব ভেস্তে গেল।

কথাগুলো শেষ করে মার্কো অবসন্নভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে নিলেন। পুলক বলল, আপনাকে বেশ ক্লান্ত লাগছে।'

মার্কো বলল, 'হ্যা সত্যি আমি টায়ার্ড। সবে জ্বর থেকে উঠেছি। তবু আজ ছুটে এসেছি। নইলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।”

পুলক বলল, 'তাহলে একটু রেস্ট নিয়ে নিন। চা-টা খাবেন কিছু? ‘খাব। এই সময় আমি একবার চা খাই। আর শুধু দুটো বিস্কুট দিতে পারেন।' মার্কোর চোখ বুজে যায়। চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেন।

হরিহর চা বিস্কুট নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিলেন মার্কো। বিস্কুট দুটো খেলেন। তার ক্লান্ত ভাবটা একটু কাটে।

দুই

মার্কেকে কিঞ্চিৎ তাজা দেখে পুলক জিজ্ঞেস করে, “সেই খাতাটা হারাল মানে চুরি গেল। কী ভাবে?”

মার্কো জবাব দিলেন, 'খাতাটা চুরি হয়েছে কয়েক দিন আগে আমার জ্বরের সময়। পাঁচ দিন আগে আমার হোটেলে নিয়ে যাই খাতাটা'— ‘কোন হোটেলে? জানতে চায় পুলক। 'কুতুব হোটেল। যেখানে আমি চাকরি করি এখন। ধর্মতলায়।' বুঝেছি,' ঘাড় নাড়ে পুলক, তারপর? ‘খাতাটা দেখে একটা স্পেশাল ডিশ বানাই। সেদিন বিকেল থেকেই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরি গায়ে তখন বেশ জ্বর। মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। হাত ব্যাগ থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিস বের করে শোবার ঘরে টেবিলের ওপর রাখি। তার মধ্যে পার্স আর খাতাখনাও ছিল। তারপর কোনোরকমে জামা কাপড় পাল্টে একটা মাথাধরার ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়। এমন ঘরের দরজার ছিটকিনি লাগাতেও ভুলে যাই। ঘুম মোটে হয় না। ছটফট করেই রাতটা কাটে। সকালে আমার সাতে তা যখন ডাকে আমায় তখন আমার গায়ে হাই টেমপেরেচার। আচ্ছন্ন ভাব। ভরত ভয় পেয়ে আমার ক'জন রিলেটিভকে খবর দেয়। আমার হোটেলেও টেলিফোন করে জানায়।"

বাড়িতে আপনি একা থাকেন?' প্রশ্ন করে পুলক। “হ, আপাতত এই। আর ওই ভরত থাকে। আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে বছর তিনেক হল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। ওরা থাকে সিঙ্গাপুরের। বছরে দু-তিনবার আসে আমায় দেখতে। বাড়িটা আমার নিজের। বছর দশেক আগে কিনেছিলাম। আমি কলতায় এসেছি বছর দুই। বহুকাল বাইরে বাইরে কাটিয়ে মনে হল যে শেষ বয়সটা দেশে কাটাই, আংয়িদের কাছাকাছি। তাই বে কম মাইনের চাকরি নিয়ে চলে এলাম।

‘আমার দুই ভাগনে থাকত আমার বাড়িতে। বড়টি বছর দেড়েক হল চাকরিতে ট্রান্সফার হওয়ায় ফ্যামিলি নিয়ে চলে গিয়েছে দিল্লি। আর ছোট তারককেআমি বাড়ি থেকে সরিয়েছি বাধ্য হয়ে মাস ছয়েক আগে।

‘কেন? পুলক জানতে চায়।

‘ওর স্বভাবের জন্যে। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরত প্রায়ই। ওর কাছে আজেবাজে টাইপের লোক আসত। হুল্লোড় করে তাস খেলত। আমার অসুবিধা হচ্ছিল। কয়েকবার ওয়ানিং দিয়েছি ঠিকভাবে চলতে, শোনেনি। তাই ওকে চলে যেতে বলেছিলাম। ওই পীড়াতেই একটা ঘর ভাড়া করে থাকে তারক। এখনও বিয়েটিয়ে করেনি। তবে আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে। টাকাপয়সার টান তো লেগেই আছে। ধার চায় হরদম। উড়নচণ্ডী নেচার। ধার দিই, মাঝেসাঝে। শোধ অবশ্য করে না। সে আশাও করি না।'

কী কাজ করে আপনার ভাগনে তারক?' জিজ্ঞেস করে পুলক। "বিজনেস করে। তবে কেবলই ব্যবসা পাল্টায়। কিছুই ওর দাঁড়ায় না। ফাকিবাজি করে কি আর ব্যবসা হয়?

‘তারপর, জ্বরের সময় কী হল? আগের প্রসঙ্গের খেই ধরিয়ে দেয় পুলক।

‘‘হ্যা দুটো দিন জ্বরের ঘোরে আর মাথা তুলতে পারিনি। ইতিমধ্যে অনেকে আমায় দেখতে আসে। ডাক্তারও আসে। ওষুধ পড়ে। তৃতীয় দিন জ্বর ছাড়ে। কিছু খেতেও পারি। ফোর্থ ডে-তে বিছানায় বসে লক্ষ করি যে টেবিলে রান্নার খাতাটা নেই। বাকি সব জিনিস রয়েছে। অবশ্য পাসটায় কিছু টাকা ছিল। পরে খুলে দেখেছি, টাকাও নেই; তে টাকা গিয়েছে যাক। কিন্তু রান্নার খাতাটা নেই দেখে কী বলব ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়লাম। খুজলাম, কিন্তু ঘরে কোথাও পেলাম না। ওই টেবিলেই রেখেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। ভরতকে জিজ্ঞেস করলাম। সে কোনো হদিশ দিতে পারল না। কী সর্বনাশ হয়েছে বুঝতে পেরে আর একদিন মাত্র রেস্ট নিয়ে দুর্বল শরীরেই চলে এসেছি আপনার কাছে। মার্কো অসহায়ভাবে পুলকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

‘মানিব্যাগে কত টাকা ছিল? প্রশ্ন করে পুলক।

‘বেশি নয়, গোটা পঞ্চাশ।’’

ভরত বিশ্বাসী?"

"হ্যা খুবই বিশ্বাসী। আমার কাছে আছে প্রায় দশ বছর। ওর কাছে ঢের বেশি টাকা জমা রাখি সংসার খরচ হিসাবে। পরে হিসাব দেয় খরচের। টাকা সরাচ্ছে কখনও সন্দেহ হয়নি। আমার বাড়ির বাজার হাট কেনাকাটি, বিল মেটানো, ভরতই প্রায় সব করে ওই জমা রাখা টাকা থেকে।

রান্নার খাতাটা বাড়িতে রাখেন কোথায় ?" পুলক জানতে চায়। 'আমার শোবার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে। ড্রয়ারে চাবি দেন?

'হোটেলে নিয়ে যান খাতাটা? 'যাই কদাচিৎ। সাধারণত আমি ওই খাতা থেকে কোনো আইটেম বানালে, কাগজে আলাদা করে রান্নাটা টুকে নিয়ে যাই। খাতাটা নিই না। তবে কখনও-সখনও তাড়াহুড়োয় রান্না টুকতে সময় না পেলে খাতাটা নিয়ে গিয়েছি হোটেলে। খাতা দেখে রান্নার কাজ হয়ে গেলেই খাতাটা রেখে দিই হোটেলে আমার প্রাইভেট রুমে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে। অনেক বছর আগে খাতাটা একবার চুরি করেছিল আমার এক কলিগ। তবে চট করে টের পেয়ে। যাই। তারপর ওর ঘর সার্চ করে খাতা উদ্ধার করি। তখন থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছি। একটু বাঁকা হেসে মার্কো বললেন—অবশ্য বাতাটা চুরি করে কেউ লাভ করতে পারবে , যদি না তার কোড ল্যাংগুয়েজ অর্থাৎ লেখার সাংকেতিক অর্থ উদ্ধার করতে পারে।"

"মানে?" দারুণ অবাক হয়ে বলে পুলক। আর জয়ও চমকে ওঠে শুনে। | রহস্যময় ভঙ্গিতে মার্কো জানালেন, 'খাতাটা আমি নিজে হাতে লিখেছি ইংরেজিতে। তিন রকম রঙের কালিতে লেখা আছে রান্নাগুলো। লাল, কালো আর নীল। হয়তো কোনো আইটেম লেখা হয়েছে খানিকটা নীল আর খানিকটা লাল কালিতে। ফাউন্টেন পেনে বা ডট পেনে। আবার কখনও নীল লাল কালো তিন রঙেই লেখা আছে কোনো আইটেমের কিছু কিছু অংশ। ওই লেখার রঙেই লুকিয়ে আছে কোড মানে সংকেত।

কী রকম?' প্রচণ্ড কৌতূহলে প্রশ্ন করে জয়। মার্কো বলতে থাকেন, 'খাতায় নানা দেশের যুড আইটেমগুলোর রান্নার ডিটেলস-এর বেশি অংশই লেখা আছে নীল কালিতে। নীল কালিতে লেখার মধ্যে কোনো গোপন। ব্যাপার বা কোড নেই। যে

ভাবে রাখতে হবে ঠিক তাই আছে লেখায়। কিন্তু অল্প কিছু কিছু অংশ লেখা হয়েছে লাল বা কালো কালিতে। ওই লাল বা কালো কালির ব্যবহারেই শুকিয়ে আছে কোড মানে গোপন সংকেত। সাধারণত রান্নার রেসিপি অর্থাৎ তেল ঘি নুন মশলার মাপগুলো লেখা হয়েছে লাল বা কালো কালিতে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যে রেসিপিগুলো যাতে ভালোভাবে নজরে পড়ে তাই অন্য রঙের কালি ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। লাল কালির লেখা বোকাচ্ছে একটা কোডকে। আর কালো কালির লেখা বোঝাচ্ছে, আর এক রকম সাংকেতিক মপিকে।' | 'খাতায় কোড ব্যবহার করেছি তা আপনাদের বলব না খুলে। তবে একটা উদাহরণ। দিলে ধরতে পারবেন ব্যাপারটা। এই ধরুন লাল কালিতে লেখা কোনো মাপ মানে হয়তো। আসলে ওই মাপের অর্ধেক। যদি লাল কালিতে লেখা থাকে কোনো রান্নায় লাগবে এক কেজি সরষের তেলঃ তাহলে সেই রান্নায় আসলে দিতে হবে পাঁচশো গ্রাম সরষের তেল। | 'আর কালো কালিতে লেখা মানে হয়তো বোঝাচ্ছে লেখা মাপের চার ভাগের তিন ভাগ। অর্থাৎ কালোতে এক কেজি তেল লাগবে লেখা থাকলে ধরতে হবে আসলে রান্নায় দিতে হবে সাড়ে সাতশো গ্রাম তেল।

'কোন কালির বেলায় কী গোপন কোড বা মাপ সেটা জানি শুধু আমি নিজে। আর কেউ

জানে না। আবার কিছু কিছু রান্নার দরকারি জিনিস লেখা আছে ক্যাপিটাল লেটার্সে। মানে

খাতা চুরি গহস্য।। ২,৪৩ বড় হাতের, অক্ষরে। তারমধ্যেও লুকিয়ে আছে গোপন সংকেত। যার অর্থ জানি শুধু আমি।' | 'ওই খাতার বেশির ভাগ স্পেশাল আইটেম করার সময় রেসিপি মানে মশলাপাতিগুলো আমি নিজের হাতে মেশাতাম রান্নায়। খেয়াল রাখতাম যাতে অন্য কেউ ধরতে না পারে। কাজেই খাতাটা হাতে পেলেই কেউ যে চট করে তাই থেকে রান্নাগুলোর খুঁটিনাটি জেনে ওই খাবার বানিয়ে স্লেবে সে ভয় নেই।'

বাঃ বুদ্ধিটা তো দারুণ করেছেন। জয় মুক্তকণ্ঠে প্রশংস করে। মার্কো একটু কিন্তু কিন্তু ভাবে বলেন, 'বুদ্ধিটা ঠিক আমার নয়, রবার্টের। 'কে রবার্ট? প্রশ্ন করে পুলক।

রবার্ট ডি সুজা। গোয়ানিজ। আমার ক্লাজ ফ্রেন্ড। গোয়ায় ওর মস্ত অ্যাগ্রিকালচারাল ফার্ম আছে। নানা ফলের বাগান। অবস্থা খুব ভালো। ধনী বলা যায়। ওর সঙ্গে গোয়াতেই আলাপ। ফুল ফল গাছপালা ছাড়াও ওর আর একটা প্রচণ্ড শখ-বান্না। ওর কিচেনে আমরা দুজন কত যে রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করেছি। দেশি বিদেশি কত চালু রান্নার হেরফের ঘটিয়ে খাবারগুলোকে নতুন স্বাদ দিয়েছি। ও সে সময় গুলো আমাদের কী আনন্দে যে কাটত।

'রবার্ট এই কোড ল্যাঙ্গুয়েজের বুদ্ধিটা দিলেন কেন?' পুলক মার্কের স্মৃতি রোমন্থনের উচ্ছাসে বাধা দেয়। | মার্কো একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'আগেই বলেছি, ওই খাতাটা একবার চুরি হয়েছিল। তখন আমি গোয়ায়। একটা মাঝারি হোটেলে কাজ করি। হেড-কুকের প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওই রান্নার খাতাটায় তখন সবে লিখতে শুরু করেছি। জমানো টুকরো টুকরো নোটস থেকে খাতাটায় ফেয়ার করে টুকছি। হেডকুক গঞ্জালেস আমায় খুব ভালোবাসত। মাঝে মাঝে আমায় স্বাধীনভাবে দু-একটা স্পেশাল ডিশ করতেও দিত। আমি ছাতাটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে দেখে দেখে রান্না করতাম।' | ওই হোটেলে আর একজন ছোকরা কুক ছিল-দেশাই। সে লক্ষ করেছিল ব্যাপারটা। একদিন সে হোটেলে আমার টেবিলের ওপরে রাখা খাতাটা শ্রেয় না বলে নিয়ে মানে বলা উচিত চুরি করে নিজের ঘরে নিয়ে যায় পড়তে। ওই হোটেলের গায়েই একটা ঘরে থাকত দেশাই। ভাগ্যিস আমি সঙ্গে সঙ্গে টের পাই-খাতা মিসিং। একটু আগে দেশাইকে দেখেছি আমার টেবিলের কাছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘরে গিয়ে ওকে হাতেনাতে ধরি খাতাটা সমেত।"

রবার্ট ব্যাপারটা জানতে পেরে এই কোড ল্যাঙ্গুয়েজের বুদ্ধিটা দেয়। কিছু কিছু অংশ কোডে লিখতে। যাতে খাতাটা চুরি হলেও চোর রান্নাগুলো চুরি করতে না পারে। আর সাবধানে রাখতে খাতাটা। কারণ হোটেলে-কুক মহলে আমার এই রান্নার খাতার খ্যাতি ঠিকই ছড়াবে।'

মার্গে কেট অপ্রতিভভাবে বললেন, 'রবার্টের পরামর্শেই আমি একটা অন্য প্রফেশনাল নাম নিই। রবার্টই ঠিক করে দেয়া নামটা-মার্কো-ডা-গ। আমার অরিজিনাল ফ্যামিলি নামের আদলে। সত্যি এতে কাজ হয়েছে। বেশির ভাগ লোকই আমায় গোয়ানিজ ভাবে। আর হোটেল ব্যবসায় গোয়ানিজ কুকের খুব ডিমান্ড। নাম পাল্টানোর পরেই আমি টপাটপ বেশি মাইনের কাজ পাই বড় বড়

হোটেলে। খানিকটা ওই নামের জোরেই। কারণ গোয়ানিজ কুক থাকলে হোটেলের প্রেস্টিজ বাড়ে।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে মার্কো ফের হাঁপিয়ে পড়েন। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে চুপ করে দম নেন।

পুলক খানিক অপেক্ষা করে বলে, “দেখুন মিস্টার গ, আপনার ওই খাতা যে কেউ নেবে না। আপনার লাইনেরই কেউ খাতাটা চুরি করেছে। এখন বলুন, আপনার এই রান্নার খাতার পরিচয় কলকাতায় আপনার লাইনের কে কে জানে?

মার্কো একটু চিন্তা করে বললেন, অন্তত দুজনের কথা আমি জানি। কুতুব হোটেলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট রতনলাল মহাপাত্র আর ক্যালকাটা হোটেলের চিফ কুক হরিরাম শর্মা। এ দু’জন অবশ্যই জানে আমার খাতার কথা।'

কী করে জানল? আপনি নিজে বলেছেন তাদের?”

না, তবে এখন গোল্লা-দিল্লি-হায়দরাবাদের অনেক হোটেল স্টাফই জানে আমার এই খাতার কথা। হয়তো তাদের থেকে ওদের কানে এসেছে। ‘ওরা যে জানে তার প্রমাণ কিছু পেয়েছেন?"

পেয়েছি। একদিন হোটেলে বসে আলগা পাতায় একটা রান্না টুকছিলাম ওই খাতা থেকে। রতনলাল হুট করে আমার রুমে ঢুকে াছে এসে বলল—এই বুঝি আপনার সেই বিখ্যাত রান্নার খাতা? ভুরু কুঁচকে তাকাতে ও সরে পড়ে।'

রতলালের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?' 'বাইরে ভালোই। তবে কুতুবের চিফ কুকের পোস্টটাও পাবে আশা করেছিল। আমায় বাইরে থেকে এনে বসিয়েছে। তাই আমার ওপর চাপা রাগ থাকতে পারে।' 'আর হরিরামের সঙ্গে?"।

হরিরামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। তবে লোকটা হিংসুটে স্বভাবের বলে ওকে এড়িয়ে চলি। হরিরাম আমার বাসায় কয়েকবার গিয়েছে। ও নাকি গোপনে আমার কাজের লোক ভরতকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, আমার যে একখানা মোটা হলুদ মলাটের খাতা আছে সেটা আমি রাখি কোথায়? ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রাখি কি? ক্যালকাটা হোটেল আমায় অফার দিয়ে রেখেছে ওদের হোটেলে শেফ হিসাবে জয়েন করার জন্য। মনে হয় হরিরাম তাই আমার ওপর প্রসন্ন নয়। তবে ব্যালকাটা হোটেলে জয়েন করার ইচ্ছে আমার নেই। কুতুবে

আমি বেশ আছি। কুতুবের ম্যানেজার বিক্রম সিং আমায় খুব পেয়ার করে।' ‘আপনার জ্বরের সময় রতনলাল, হরিরাম দু'জনেই কি এসেছিল আপনাকে দেখতে? হ্যা দু'জনেই এসেছিল। ভরত বলেছে। মার্কো আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'যেই চুরি রুক খাতাটা পেয়ে তার লাভ হবে না, যতক্ষণ না সে কোডগুলোর রহস্য আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু চুরি ধরা পড়ার ভয়ে বা রাগের মাথায় যদি সে খাতাখানা ডেসট্রয় করে ফেলে? আমার এত বছরের পরিশ্রম সাধনা জলে যাবে। খাতাটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে দিন প্লিজ।

পুলক আশ্বাসের সুরে বলে, 'অত হতাশ হবেন না। যে চুরি জরেছে সে খাতাটার মূল্য বোঝে। নেহাত বেকায়দায় না পড়লে সেটা নষ্ট করবে না। খাতা চুরি আপনি যে টের পেয়েছেন সেটা আপনি বাইরে একদম প্রকাশ করবেন না। বরং নিশ্চিত ভাব দেখাবেন যেন খাতাটা ড্রয়ারেই আছে। আচ্ছা আপনার আত্মীয় কেউ জানে ওই খাতাখানার পরিচয় ?”

‘না। মুখ ফুটে বলিনি কাউকে। তবে দুই ভাগনে আন্দাজ করতে পারে ওটায় রান্না লেখা আছে। আমায় নিশ্চয় দেখেছে ওটা পড়তে। ওটায় লিখতে। “হুম।” পুলক চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাকিয়ে বলে, আপনি এখানে এসেছেন কীসে?"

মার্কো বললেন, ‘ট্যাক্সিতে। আমার নিজের গাড়ি আছে। কিন্তু এখন গাড়িটা খারাপ, তাই ট্যাক্সিতে এসেছি।

পুলক বলল, “ঠিক আছে হরিকে বলছি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। বাড়িতেই থাকবেন। দরকার মতো ফোন করব বা আমি নিজে যাব আপনার কাছে। মন শক্ত রাখুন। মাকে বিদায় নিলেন।

তিন

মার্কো-ডা-গশের আগমনের পরদিন। পুলক সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরল ঘণ্টা দুই বাদে। বাড়ি এসে দেখে যে হয় তার ড্রইংরুমে তরিবত করে চা এবং পাঁপড় ভাজা সাঁটাচ্ছে হরিহরের বদান্যতায়। "কি, মার্কোর কেস নিয়ে ঘোরাঘুরি করছ বুঝি?' প্রশ্ন করে জয়।

‘হরিহর চা', হাঁক দিয়ে পুলক চেয়ারে বসে বলে, 'একটু বাদেই মার্কের কাছে যেতে হবে, যাবে নাকি সঙ্গে?'

জরুর।' জয় রাজি। সে মিচকে হেসে বলে, 'পুলকদা তোমার এই কেসটা কিন্তু তেমন প্রেস্টিজের নয়। সামান্য হলুদ মলাটের রান্নার খাতা, চপ কাটলেট স্যুপ বানাবার ফর্মুলা —নাঃ পাঁচজনকে বলার মতো নয়।'

পুলক গম্ভীর ভাবে বলে, 'কেসটা অত হেলাফেলা করো না হে। দেখা জায়, চুরি হয়েছে তার বাজার দাম কত তাই নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। যাই চুরি হোক না কেন, চোরকে ধরা বা জিনিসটা উদ্ধার করা কতটা শক্ত কাজ সেটাই আমার কাছে বিচার্য। সেটাই আমার চ্যালেঞ্জ। সেই অনুসন্ধানেই আমার আনন্দ। একখানা অতি সাধারণ দেখতে খাতাকে যে কোনো জায়গায় বইখাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। আবার চট করে পুড়িয়ে ছিড়ে নষ্ট করে ফেলা যায়। কাজেই ওই খাতা উছার মোটেই সহজ কর্ম নয়। ধরা পড়ার ভ্যা হলেই চোর কিন্তু খাতাটা নষ্ট করে চুরির প্রমাণ লোপ করে দেবে। তাই খুব সাবধানে এগুতে হবে। চোর যেন টের না পায় তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। বুঝে রিস্কটা ?" 'তা বটে।' জয় সায় দেয়।

চা শেষ করে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। পৌছয় মার্কোর বাড়িতে ভবানীপুরে। ছোট দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় একটা পান সিগারেটের দোকান।

কলিংবেল টিপতে ভরত দরজা খোলে। গশ সাহেব তখন বিছানায় শুয়ে। খবর পাঠানো হয়-উনি যেন নিচে না নামেন, পুলকরাই ওপরে যাচ্ছে।

কর্মদাস ঘোষ ওরফে মার্কো-ডা-গাশকে রীতিমতো ক্লান্ত বিধবত দেখাচ্ছিল। শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিকভাবেই যেন তিনি বেশি বিপর্যস্ত। বালিশে ঠেস দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিষয় হেসে তিনি পুলকদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'আপনার সঙ্গে আপনাদের হোটেল ম্যানেজার মিস্টার সিং-এর সম্পর্ক কেমন? সোজাসুজি কাজের কথায় আসে পুলক।

মার্তে জবাব দেন, আমাদের রিলেশন খুব ভালো। বন্ধু বলতে পারেন। সিংজি নিজেই আমায় অফার দিয়ে কানপুর থেকে এখানে আনিয়েছেন।'

উনি আপনার রান্নার খাতা সম্পর্কে কিছু জানেন?' মনে হয় না। 'অসুখের সময় উনি আপনাকে দেখতে এসেছিলেন এখানে? 'হা একবার এসেছিলেন। তবে ফোনে প্রতিদিনই খোঁজ নেন।

'বেশ ওর সঙ্গে প্রাইভেটলি দেখা করতে চাই ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে। কুতুব হোটেলের আর কেউ যেন না তা টের পায়। আপনি মিস্টার সিংকে ফোন করে আমার পরিচয় জানিয়ে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিন। ফোনে খাতাটার কথা বলার দরকার নেই। শুধু বলবেন, আপনার একটা দামি জিনিস হারিয়েছে, আর আমায় সেটা উদ্ধারের ভার দিয়েছেন। সাক্ষাতে সব খুলে বলা যাবে।'

মার্কো বলল, ‘‘সিংজির সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আমার বাড়িই বেস্ট প্লেস। আমি সিংজিকে এখুনি ফোন করছি।' মার্কে বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে বিক্রম সিং-এর সঙ্গে কথা শুরু করলেন।

কথার শেষে মার্কো জানালেন, "সিংজি আজ রাত আটটায় আমার বাড়িতে আসবেন বলেছেন। আধ ঘণ্টার বেশি থাকতে পারবেন না। হোটেলের দায়িত্ব আছে তো।'

'বেশ, আমি আটটার আগেই চলে আসব এখানে। পুলক জানিয়ে দেয়। তারপর বলে, ‘‘আচ্ছা ক্যালকাটা হোটেলের মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

মার্কো বললেন, 'ওদের কারও সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। হোটেলের চাকরিতে আছি বলেই যেটুকু পরিচয়। স্রেফ প্রফেশনাল সম্পর্ক। তবে ক্যালকাটা হোটেলের ম্যানেজার মিটার ব্যানার্জি আমার রান্নার ফ্যান। তাই হোটেলে চিফ-কুকের অফারটা দিয়ে রেখেছেন।

পুলক বলল, 'ব্যস, আর এখন কথা নয়। রাতে যখন আসব বাকি কিছু কথা হবে। আপনি এখন রেস্ট নিন। | সে রাতে মার্কোর বাড়িতে পুলক একাই গিয়েছিল। মার্কো ও বিক্রম সিং-এর সঙ্গে পুলকের কী কথা হয় জয় জানে না। পুলক নিজে থেকে জয়কে সঙ্গে যেতে বলেনি তাই জয়ও তার সঙ্গ ধরার ইচ্ছে প্রকাশ করেনি।

পরদিন ভোরে পুলক জয়কে টেলিফোনে ডাকল। পুলক কয়েকটা জায়গায় যাবে, জয় সঙ্গে থাকলে ভালো হয় - ওই মার্কের সেটার ব্যাপারে। জয় তো উন্মুখ হয়েই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়।

থামতো সকাল দশটায় পুলকের বাড়ি এসে জয় দেখে যে ওর বাড়ির সামনে পুলকের ছোটকাকার মারুতি ভ্যানখানা দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার সমেত। পুলকের কাকার গাড়িতেই বেরল দু'জনে। পুলক পরনে বেশ দামি শার্ট ও ট্রাউজাস চড়িয়েছে।

মুচকি হেসে বলল একবার, 'বুঝলি, বড় হোটেলে অর্ডার দিতে গেলে ভালো ড্রেস আর গাড়ি ছাড়া ঠিক মানায় না।।

পলকদের গাড়ি থামল চৌরঙ্গি এলাকায় ক্যালকাটা হোটেলের সামনে।

রিসেপশনে ম্যানেজারের খোঁজ করতে মিস্টার ব্যানার্জি হাজির হলেন। ব্যানার্জি সাহেব রাশভারী মানুষ। শার্ট-প্যান্ট-টাই পরা। ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন পুলকদের, ঝ দরকার?

পুলক বলল, 'আমাদের বাড়িতে একটা ছোট পার্টি হবে। এখান থেকে দুটো মোগলাই ডিশ নিতে চাই। শুনেহি, আপনাদের হোটেলের নাম আছে মোগলাই খানায়।'' "কী কী খাবার?'' জানতে চান ম্যানেজার। লখনউ মাটন বিরিয়ানি আর বোগদাদি শাহি কাবাব। ব্যানার্জি বললেন, "বিরিয়ানিটা হবে কিন্তু বোগদালি কাবাব আমরা করি না।' 'আপনাদের চি-কুককে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না যদি তিনি জানেন? ওল্ড দিল্লিতে এক হোটেলে খেয়েছিলাম এই কাবাব। দারুণ খেতে। 'অলরাইট ডাকছি। ওরে হরিরামজিকে ডাক তো'—

ক্যালকাটা হোটেলের শেফ হরিরাম শর্মা এলেন। বেঁটে মোটা লালচে চেহারা। মাংসল মুখখানা যেন রাগী রাগী।

হরিরাম অর্ডারটা শুনে একটু ভুরু কুঁচকে জানালেন, 'ববাগদাদি শাহি কাবাব হবে না। ও আমি জানি না। ই, নাম শুনেছি বটে।

একেবারে পারবেন না? যদি কারও থেকে জেনে নিয়ে বানিয়ে দেন। ঠিক দিল্লির হোটেলটার মতো স্বাদ না হলেও কাছাকাছি হলেও চলবে।

নেহি সাব। ও কাবাব হোবে না।' হরিরাম সাফ নাকচ করে দেয়। "আচ্ছা এই কাবাব কলকাতায় কেউ করে?' পুলক জানতে চায়। 'নেহি মালুম।' হরিরাম ঘাড় নাড়ে।

পুলক ব্যানার্জিকে বলল, 'সরি মিস্টার ম্যানেজার, তাহলে এখন আপনাদের অর্ডার দিচ্ছি না। দেখি খুজে ওই কাবাব কেউ বানাতে পারে কিনা? দুটো ডিশ এক জায়গা থেকে পেলে আমার সুবিধে হয়। যদি বিরিয়ানিটা এখান থেকে নিই, পরে জানাৰ। থ্যাংকিট।'

পথে গাড়িতে জয় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে পুলককে, কী ব্যাপার, পার্টি কীসের?' 'মানে হল এত ভালো ভাবে বি.এ. পাশ করল। ওকে খাওয়াব বলেছিলাম। সেটা পাওনা আছে।

"তোমার ভাগনি পুতুল?' "হ্যা। তোমার আর রুপারও নেমন্তন্ন থাকবে।"

'ত ওই বোগদাদি কাবাবটা কেন? পাওয়া যাচ্ছে না যখন, অন্য কিছু অর্ডার দিতে পারতে।' 'নাহে। ওই বোগদাদি কাবাব আমি খাওয়াবই।'

জয় এবার পুলকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলে, 'বুঝেটি, ওই কাৰাৰে কোনো রহস্য আছে। একটু খোলসা করো দেখি?

পুলক কিন্তু খোলসা করে না। শুধু মুচকি হেসে বলে, 'আছে, আছে—পরে জানতে পারবে। চলো এবার কুতুবে ঢোকা যাক।

গাড়ি তখন কুতুব হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলক জয় ভিতরে ঢুকে হোটেলের ম্যানেজারে খোঁজ করল। কুতুবের ম্যানেজার বিক্রম সিং মধ্যবয়সি দীর্ঘকায় সুপুরুষ প্রসন্নবলন পাঞ্জাবি পুরুষ। পুলকরা শাঁসালো খদ্দের ভেবেই যেন তিনি দু'জনকে সাদরে বসালেন অফিস ঘরের এক কোনায় কথাবার্তা বলতে। কিন্তু পুলকের সঙ্গে যে গত রাতেই তার আলাপ পরিচয় হয়েছে ঘুণাক্ষরেও তেমন কোনো ইঙ্গিত দিলেন না। পুলকও তা প্রকাশ করল না। বিক্রম সিং রুথ বলছিলেন ভাঙা ভাঙা বাংলায় ও ইংরেজিতে।

পুলক ক্যালকাটা হোটেলে যেমন বলেছিল তেমনি এখানেও লখনউ মাটিন বিরিয়ানি আর বোগদাদি শাহি কাবাবের অর্ডার দিতে চাইল নিজের বাড়িতে একটা ঘরোয়া পাটি উপলক্ষে। সিংজি একটু ভেবে বললেন, আমি ঠিক বলতে পারছি না ডিশ দুটো করা যাবে কিনা?"

পুলক বলল, আপনাদের চিফ-কুক মার্কো গশ কিন্তু আমায় একবার বলেছিলেন, অর্ডার দিলে এই ডিশ দুটো বানিয়ে দিতে পারেন। আমি খোঁজ নিতে

এসেছিলাম।” ‘কদ্দিন আগে? “এই মাসখানেক আগে।

বিক্রম সিং বললেন, মার্কো যখন বলেছিল করা যাবে তখন নিশ্চয় করা যেত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মার্কো অসুস্থ, ছুটিতে আছে।

পুলক বলল, 'আর কোনো কুক নেই যিনি ডিশ দুটো তৈরি করতে জানেন? সিংজি বললেন, “দেখি রতনলালকে ডাকি। মার্কোর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট।

রতনলাল এল। নোগা ছোটখাটো চেহারা। মাঝ বয়সি। ভাঙাচোরা মুখখানায় কেমন বিরক্তি ভাব।

রতনলাল অর্ডারটা শুনে বলল, "বিরিয়ানিটা পারব। তবে বোগদাদি কাবাবের গ্যারান্টি চট করে দিতে পারছি না। অনেক দিন আগে শিখেছিলাম খাবারটা। নোট করে রেখেছিলাম। যদি নোটগুলো খুজে পাই মোটামুটি বানিয়ে দেব। বিকেলে আসুন একবার, ফাইনাল জানাব। “ঠিক আছে, তাই আসব, পুলক উঠতে উঠতে বলে, “আসলে যার পাশ করা উপলক্ষে পার্টি তাকে ওই কাবাবটা খাওয়াব বলে আশা দিয়েছি। এখানে না পেলে অন্য জায়গায়

খুজতে হবে।”

খদ্দের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় বুঝি বিক্রম সিং পুলকের সামনেই রতনলালকে উৎসাহ দিলেন, রতন ট্রাই ইওর বেস্ট। তোমার ওপর আমার কনফিডেন্স আছে।”

ফিরে যেতে যেতে জয় বিরক্ত হয়ে বলল, আচ্ছা রহস্যময় কাবাব বটে! ওর জন্যে এত ঘোরাঘুরি?”

পুলক মাথা ঝাকিয়ে বলে, 'বাবা, ওই কাবাব না চাখলে রহস্যটা ঠিক ধরতে পারবে

বিকেলে কুতুব হোটেল থেকে ঘুরে এসে পুলক জয়কে খুশি হয়ে জানাল যে রতনলাল। আশা দিয়েছে যে ওই বোগদাদি কাবাব বানিয়ে দেবে।

একদিন বাদেই পুতুলের পাশ করায় সেলিব্রেশন হল পুলকের বাড়িতে। সন্ধ্যায় পুতুল, পুতুলের ছোট ভাই বাচ্চু আর পুতুলের বন্ধু অর্চনায় এল। আর এল

জয় এবং তার বোন দপা।

অনেক গাল-গল্প, গান, হই-চই-এর পর রাতে খাবার পালা। কুতুবে দুই স্পেশাল আইটেম ছাড়াও হরিহর বাড়িতে বানিয়েছে—শি-ফ্রাই আর চাটনি। দোকান থেকে এসেছে আইসক্রিম।

খাবার টেবিলে সবাই বসার পর একটা ঢাকা দেওয়া চিনেমাটির পাত্র খুলতেই বিরিয়ানির এমন সুগন্ধ ছড়াল যে সবার জিভে জল এসে গেল, পেটে খিদে চনমন করে উঠল।

আর একটা পাত্রের ঢাকনি খুলতে, তাতে উকি দিয়ে জয় বলল, "এটায় কি বোগদাদি কাবাব নাকি?"

পুলক মাথা নেড়ে বলল, নাঃ কুতুবের বোগদাদি নয়, এটা আমিনিয়া রেস্টুরেন্ট থেকে আনা অন্য রকম কাবাব। কুতুবেরটা যাচ্ছেতাই বানিয়েছে রতনলাল। ওটা মুখে দেওয়া যায় না। ঝাল মশলায় গড়াগড়ে। ও পয়সা আমার জলে গেল। ম্যানেজারকে আমি কমপ্লেন করেছি। ম্যানেজার লজ্জিত হয়েছেন। কাবাবের দাম কিছু কম নেবেন বলেছেন। আর রতনলালকে ধমকাবেন। কেন সে ভালো মতো না জেনে বানাতে গেল। তবে বিরিয়ানিটা ফাসক্লাস বানিয়েছে। বোগদাদি কাবাব নেই তোমাদের বরাতে কী আর করা?'

যাহোক বোগদাদি স্পেশালের অভাবে নেমন্তন্নে কিছু মাত্র থামতি হয়নি। পরম তৃপ্তিতে পেট পুরে খেল সবাই।

চার

পুলক যেদিন নেমন্তন্ন খাওয়াল পুতুলের পাশ করা উপলক্ষে তার পরদিন সকাল দশটা নাগাদ মার্কো হাজির হলেন কুতুব হোটেলে। নিজের গাড়িতে নয় ট্যাক্সিতে। খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে হোটেলে ঢুকলেন। বোঝা যায় তখনও তিনি খুবই দুর্বল।

মার্কোকে দেখেই ছুটে এল ম্যানেজার বিক্রম সিং।

মার্কো বললেন, 'একটা জিনিস বোধহয় ফেলে গেছি। যেদিন জ্বর হয় সেই রাতে। সেটা খুঁজতে এসেছি।'

'কী জিনিস?"

'তেমন কিছু দামি জিনিস নয়। একটা নোট বই। খাতা। কোথায় যে রেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না। দেখি আমার রুমে।

হোটেলের তিনতলায় একটা ছোট ঘরে বিশ্রাম নিতেন মার্কো। দরকারে রাতেও থেকে যেতেন ওই ঘরে। মার্কো সেই ঘরে গিয়ে খুললেন টেবিলের ওপরে, টেবিলের ড্রুয়ারে নোট বইটা পেলেন না। হোটেল স্টাফদের যাকে সামনে পেলেন তাকেই জিজ্ঞেস করলেন—"একটা হলুদ রঙের মলাটের বাঁধানো খাতা দেখেছ কি? কিচেনে বা আমার রুমে হয়তো ফেলে গিয়েছি।'

কেউ খাতাটার হদিশ দিতে পারল না।

রতনলালও মার্তোর সঙ্গে খানিক খুজল খাতাটা। জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার সেই রায়ার খাতাটা বুঝি? কোথায় ফেললেন?'

মার্কো চিন্তিত ভাবে বলেন, সেটাই ঠিক মনে করতে পারছি না। সেদিন শরীরটা এত খারাপ লাগছিল যে কোনো ইশই ছিল না। এখানে ফেললাম? না নিউ মার্কেটের দোকানে। বাড়ি যাওয়ার পথে নিউ মার্কেটে একটা দোকানে ঢুকেছিলাম কফি কিনতে। দেখি সেখানে। আমার নিজের গাড়ি খারাপ থাকায় সেদিন ট্যাক্সিতে এসেছিলাম। ট্যাক্সিতেই ফিরি। ট্যাক্সিতেই খাতাটা রয়ে গেলে অবশ্য আর আশা নেই। ট্যাক্সিতে বসে একবার কফির প্যাকেট আর খাতাটা বের করেছিলাম একটা বিল খুঁজতে। বাড়িতেও পাচ্ছি না। যাকগে আমার খাটুনি বাড়ল।" 'খাটুনি বাড়ল কেন?" 'অরিজিনাল খাতা থেকে আবার ঢুকতে হবে তাই।'

'আপনার হারানো খাতাটায় তো অনেক ভালো ভালো রান্না লেখা ছিল? অনেক স্পেশাল ডিশ।

'তা ছিল।' একটু রহস্যময় হেসে বলেন মার্কো, তবে ও খাতা আর কারও হাতে পড়লে তার কোনো লাভ হবে না।

'কারণ ওই খাতার রান্নাগুলোর রেসিপি আর মাপগুলো সাংকেতিক কায়দায় লেখা আছে। সেই সাংকেতিক ভাষা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সুতরাং ওই খাতার লেখা ফলো করে কেউ রান্না করতে চেষ্টা করলে উল্টো পাল্টা স্বাদ হবে

খাবারের। অবশ্য খুব মেহনত করলে কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা ধরা যায়। তবে তা লাল কালিতে লিখেছি। ওই লাল কালির লেখায় লুকিয়ে আছে কোড।

রতনলাল চমৎকৃত হয়ে বলে, বাঃ আচ্ছা বুদ্ধি করেছেন, বটে। তা কোড ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপিগুলো লিখলেন কেন? খাতা চুরির ভয়ে?'

"ঠিক ধরে,' সায় দেন মার্কে, গোয়ায় থাকতে খাতাখানা একবার চুরি হয়েছিল। আমার হোটেলের এক ছোকরা বাবুর্চি খাতাটা চুরি করে। আমার রান্নাগুলো মেরে দেওয়ার তালে ছিল। চট করে টের পেয়ে ওর ঘর থেকে উদ্ধার করি খাতাটা। তারপরেই বুদ্ধিটা আসে। মাঝে মাঝে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপি লেখা। আমার অনেক কষ্টে জোগাড় করা সব রান্না, আন্যে বাটপারি করে তা জেনে ফেলবে। এটা অসহায়। তখন থেকে দুটো খাতা তৈরি করেছি। একটায় লেখা আছে রান্নাগুলো ঠিকঠাক সোজা ভাষায়। অন্যটায় সংকেতে। রেসিপিগুলো কোড ল্যাঙ্গুয়েজে। আসল খাতাটা রাখি আমার ঘরে স্টিল আলমারির লকরে। আর নকল খাতাটা মানে কোডে লেখা খাতাটা থাকে টেবিলে। ওটা হোটেলেও আনি দেখে তো, ওই থেকে কোনো স্পেশাল রান্নার সময়। তাই আবার একটা নকল। খাতা তৈরি করতে হবে আর কী। ওই হলুদ মলাটের খাতাটার মতো। আসল খাতাটা নিয়ে ঘোরাঘুরি রিস্কি। কোথাও হারিয়ে ফেলি বা চুরি হয়ে যায় যদি? থাকগে ওই হলুদ মলাটের যতটা নজরে পড়লে দিও আমায়।

আপনার এই কোডে লেখা নকল খাতাটার রহস্য বোধহয় আর কেউ জানে না, তাই ?' জিজ্ঞেস করে রতনলাল।

এ হবাব দেন, বাইরের লোক কেউ জানে না। তবে ঘরের লোক মানে আমার #জন জানে। ওদের সামনে একদিন বলেছিলাম কোডে রেসিপি লেখা খাতাটার মার্কো ম্যানেজারের থেকে আরও কয়েকদিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

সেদিনই পুলক জয়কে রাত ন'টা নাগাদ ফোন করে ডেকে পাঠাল। জয় তার বাড়ি আসতেই বলল, "চল মাকোর কাছে ঘুরে আসি। জরুরি দরকার। পুলকের মোটরসাইকেল চেপে রওনা দেয় দু'জন।

মার্কোর ঘরে ঢুকেই পুলক জিজ্ঞেস করল, তারককে কেমন দেখলেন?'

মার্কো বলল, খুব সিরিয়াস ইনজুরি নয়, তবে কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। মাথায় চারাট স্টিচ দিয়েছে। রড-টড দিয়ে মেরেছিল। আর নাক ভেঙে গিয়েছে ঘুসিতে।

'কে মেরেছে স্বীকার করেছে?

'পুলিশের কাছে করেনি। বলেছে, গিরিশ পার্কের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। দুটো লোক ছিনতাই করবে বলে ধরেছিল ওকে। ও বাধা দিতে মেরেছে। শ'পাঁচেক টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। আমি ওর বেডের পাশে বসে আস্তে করে যেই বলেছি, জানি কে মেরেছে, রতনলালের লোক। অমনি তারকের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। যেন ভীষণ ভয় পেয়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়েই চোখ বুজে ফেলল। আপনার অনুমানই ঠিক। ওকে রতনলালের লোকই ঠেঙিয়েছে।'

'কী ব্যাপার? কেন মেরেছে তারককে? খুলে বল কেসটা। নইলে ছাড়ছি না।' জয় রেগে বলে ওঠে।

'আরে বলতামই তোমায়, পুলক জয়কে ঠান্ডা করে আজ নয় তো কাল। অনুমানগুলো। ঠিকঠাক লাগছে কিনা দেখে নেওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।'

'বেশ শুনি এবার।' জয়ের তর সইছে না।

পুলক বলল, ''আজ সন্ধেবেলা রতনলালের দু'জন ভাড়াটে গুন্ড তারককে আচ্ছা ঠেঙিয়েছে। তারক আপাতত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বেডে শুয়ে আছে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে।

''কেন মেরেছে?

''খুব সম্ভব জেনেশুনে কোডে লেখা, কাজে লাগবে না, এমন একটা রান্নর খাতা রতনলালকে সাপ্লাই করে মোটা টাকা নেওয়ার অপরাধে।

'কোডে লেখা, মানে মার্কোর হারানো খাতা?'

''হ্যা তাই।

ওটা তারক চুরি করে রতনলালকে দিয়েছে?

“হ্যা।

‘প্রমাণ কী পেয়েছ?”

‘প্রমাণ বোগদাদি শাহি কাবাব।

ও দিল্লির হোটেলে খাওয়া তোমার সেই ফেভারিট কাবাব? যেটা বানাতে গিয়ে রতনলাল গুবলেট করেছিল?

পুলক হেসে বলল, 'নাঃ ওটা আমি দিল্লির হোটেলে খাহিনি। সত্যি বলতে কি কমিন কালেও খাইনি ও কাবাব। এই কাবাব মিটার গশের হারানো খাতার একটা স্পেশাল আইটেম। এই টোপ দিনেই আমি বুঝলাম যে খাতাটা কার কাছে আছে।' “কী রকম?’ জয় একটু আঁচ করে ব্যাপারটা, তবু বিশদে জানতে চায়।

পুলক বলল, “প্ল্যানটা মিস্টার গশের সঙ্গে পরামর্শ করেই করি। খাতাটা যে চুরি করেছে সে নিশ্চয় খাতাটা পড়বে। বোগদাদি শাহি বাবের মাটিাও তার নজর এড়াবে না। খাতায় নাকি প্রথম দিকেই আছে রান্নাটা। ও খাল যার হেফাজতে, বোগদাদি কাবাব অর্ডার দিলে ক্রেডিট দেখাতে সে ওটা বানাবার চেষ্টা করতে পারে খাতা দেখে দেখে। - “তুমি তো সঙ্গে ছিলে জয়। ক্যালকাটা হোটেলের হেডকুক হরিরামের হাবভাব দেখে তো মনে হল যে বোগদাদি কাবাবের সে নামই শোনেনি। বানাতেও লনে না। সুতরাং বুঝলাম, মিস্টার গশের খাতা ওর কাছে নেই। তখন গেলাম কুতুবে। আমাদের দ্বিতীয় সাসপেক্ট রতনলালের কাছে।

হু বুঝচি। মাথা নাড়ে জয়।

'কুতুবের ম্যানেজার সিং জানতেন আমি আসব। আমি মিস্টার গশ আর সিংজি মিলে প্লানটা ছকেই রেখেছিলাম। দারুণ অভিনয় করলেন বটে সিংজি। রতনলাল ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ফাদ। ফলে রাজি হয়ে গেল কাবাবটা বানাতে এবং মসল। সেই কাবাব হাতে পেয়েই ছুটেছিলাম মিস্টার গশের কাছে। গসাহেব, কাবাবের স্বাদটা কী রকম হয়েছিল?

'জঘন্য।' মুখ বিকৃত করেন গশ, রতন একটা ইডিয়ট। রেধে কি নিজে টেস্ট করেনি? আশ্চর্য! তাহালেই বোঝা উচিত ছিল যে খাবারটা যা ল হয়েছে। এই গুণ

নিয়ে উনি আবার শেফ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ওকে কুক থেকে বেয়ারা করে দেওয়া উচিত।' 'আচ্ছা আপনি তারককে সন্দেহ করলেন ভাবে? কৌতুহলী মার্কো জানতে চান।

পুলক জবাব দেয়, কারণ 'ভরতের কাছে খোঁজ করে জেনেছিলাম যে রতনলাল দু'বার আপনাকে দেখতে আসে। কিন্তু সেই দু'বারই ভরত আপনার ঘরে ছিল। খাতাখানা টেবিলে থাকলেও ভরতের চোখ ফাকি দিয়ে সেটা সরানো খুব রিস্কি ব্যাপার। তখনই হঠাৎ মনে হল, খাতাটা আর কাউকে দিয়ে চুরি করায়নি তো রতন? কাকে দিয়ে। প্রথমেই সন্দেহ পড়ল তারকের ওপর। ওকে টাকা দিয়ে হাত করা অতি সহজ। তাছাড়া জ্বরের সময় আপনার মানিব্যাগ থেকে টাকা চুরি গিয়েছে জেনেও তারকের ওপরই সন্দেহ হয়। তাই অনুমানটা সত্যি কিনা বুঝতে আপনাকে দিয়ে নাটক করলাম মিস্টার শাশ। যেন খাতাটা খুজতে হাজির হলেন কুতুবে। কৌশলে রতনলালকে জানিয়ে এলেন খাতার রান্নাগুলোর রেসিপি যে কোডে লেখা তা জানত আপনার ভাগনে তারক। মিস্টার গশ, খবরটা শুনে রতনলালের মুখের ভাব কেমন হয়েছিল?

গশ বললেন, 'আমি আড় চোখে লক্ষ করেছি। শুনেই রতনলালের মুখ কেমন কঠিন হয়ে গেল। আর সে রাতেই মার খেল তারক।'

'রতনের পাঠানো গুণ্ডা তারককে ঠেঙিয়েছে জানলে কী করে? প্রশ্ন করে আয়।

পুলক জানাল, কারণ আমার লোকেরা গত কয়েকদিন ধরে সমানে নজর রাখছে রতনললি আর তারককে। দু'জনের সমস্ত গতিবিধি। আমায় রিপোর্ট দিচ্ছে। ওরাই আমায় খবর দেয়া। আজ বিকেলে রতনলাল রাস্তায় বেরোয়। ওর বাড়ির কাছে পার্কে দুটো গুন্ডা দর্শন লোকের সঙ্গে কীসব কথা বলে। তারপর হেঁটে চলে যায়। তাদের মধ্যে একটা লোক মোটর সাইকেল চেপে বেরিয়ে যায়। অন্যজন পার্কেই ঘাপটি মেরে বসে থাকে। এই অবধি দেখে আমার স্পাই রতনের পিছু নেয়।”

'ওদিকে তাককে যে নজর রাখছিল সে রিপোর্ট করে, মোটর সাইকেলে আসা একটা অচেনা লোকের পেছনে চেপে তারক বেরিয়ে যায় এই রাত আটটা নাগাদ। মোট সাইকেলে যে এসেছিল তার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় পার্কের মোটর সাইট্রিস্টের বর্ণনা। রতনলাল যাদের সঙ্গে কথা বলেছে তাদেরই একজন। বোঝা

যাচ্ছে, মোটর সাইকেলে চড়িয়ে পার্কে এনে লোক দুটো উত্তম-মধ্যম দেয় তারককে।

“মানে 'ভুল খাতা দেওয়ার শাস্তি? জয় মুচকি হেসে বলে। “আন্দাজ করছি তাই। রতনলালের নির্দেশে। পরে জানা যাবে সব।'

মার্কো ভীষণ রেগে গরগর করে উঠলেন, শয়তান তারককে আমি আর কখনও আমার বাড়িতে ঢুকতে দেব না। একটা পয়সাও আর সাহায্য করব না। অকৃতজ্ঞ স্কাউনড্রেল।'

পুলক বলল, 'অসৎ সঙ্গ আর বল নেশা, দুটোই মানুষের সর্বনাশ করে। নিজেকে না। বদলাতে পারলে তারকের ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে আরও। যাকগে, তারকের যা হয় হবে, আপাতত রান্নার খাতাটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা দরকার।'

মার্কো চিন্তিত ভাবে বললেন, হ্যা তাই। রতনলাল ঘাবড়ে গিয়ে খাতাটা নষ্ট না করে ফেলে। হয়তো বুঝেছে, আমরা ষড়যন্ত্রটা আঁচ করেছি।”

‘সেইজন্যই তো পাঠালাম আপনাকে। খাতার রেসিপিগুলো যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা সে খবরটা ওকে শুনিয়ে দিতে।'

‘সেকি কোডে লেখা জানিয়ে দিয়েছ? কী কাণ্ড?” আঁতকে ওঠে জয়। “আরে বুদ্ধ, কোডটা তো জানানো হয়নি। লেখাটা কোডে এটুকু শুধু বলা হয়েছে।' আশ্বস্ত করে পুলক। “কেন?' জয় দিশা পায় না।

কারণ তাহলে রতনলাল কোড উদ্ধারের চেষ্টা করবে। ফলে ক'দিন সময় হয়তো পাব হাতে। গতকালই আমার ইনফর্মার খবর দিয়েছে, তনলাল খাতাটা জেরক্স করিয়ে ফেলেছে। এই ভয়ই করছিলাম। জেরক্স করিয়ে রেখে খাতাটাও না নষ্ট করে ফেলে প্রমাণ। ললাপের জন্যে। আমার লোক অনেক খুজে খুজে সন্ধান পেয়েছে কোথায় ও জেরক্স করিয়েছে। নিজের পাড়া থেকে অনেক দূরে একটা দোকানে।' ‘আঁ জেরক্স করে ফেলেছে? মাই গড।' মার্কো আতঙ্কিত।

স্থ। জানাল পুলক, জানি না ইতিমধ্যে খাতাটা নষ্ট করে ফেলেছে কিনা? মিস্টার পাশ আপনি তো ওকে বলেছেন লাল কালিতে লেখা মাপগুলোর সাংকেতিক অর্থ আছে। জেরক্স কপিতে লাল নীল কালির তফাত ধরা পড়ে না। যদি খাতাটা

এখনও থাকে, সংকেত উদ্ধার না করা অবধি রতনলাল সেটা নষ্ট করবে বলে মনে হয় না। তবু যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। প্ল্যান করে ফেলা যাক। কালই অ্যাকশনে নামব।'

তিনজনে গুজগুজ করল আধঘণ্টা মতো। তারপর! পুলক ও জয় বিদায় নিল।

পাঁচ

সকাল আটটা নাগাদ। পুলক ও জয় হাজির হল কুতুব হোটেলে। তারা ম্যানেজারের খোঁজ করতে বিক্রম সিং এসে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাদের, আসুন স্যার। হ্যা, সেদিনের কাবাবের দাম কিছুটা লেস করে দেব বলেছিলাম, সে টাকাটা নিয়ে যান। বিরিয়ানিটা তে ভালো লেগেছে?' "বিরিয়ানি ফাসক্লাস হয়েছিল। প্রশংসা করে পুলক। 'আসুন আমার চেম্বারে, এক কাপ কফি খেয়ে যান। সিংজি আহবান জানান। 'আবার কফি কেন ? পুলক ইতত করে।

"কেন খুব তাড়া? না হায় গরিবের সাথ আড্ডা দিয়ে গেলেন কফি খেতে খেতে। বোঝা গেল যে বিক্রম সিং অতি দক্ষ ম্যানেজার। খদ্দেরকে ভবিষ্যতের জন্য তুষ্ট রাখতে ওস্তাদ।

কফি পান করতে করতে বিক্রম সিং তার দেশ হরিয়ানার গল্প শুরু করলেন। চমৎকার রসিয়ে কথা বলেন মানুষটি।

মিনিট পনেরো বাদে হঠাৎ সিংজির কামরায় গটগটিয়ে ঢুকলেন মার্কো-ডা-গশ।

'হ্যাল্লো মার্কো! লাফিয়ে ওঠেন বিক্রম সিং,

'বাঃ ফিট হয়ে গেছ ?"

'দু-এক দিনের মধ্যেই জয়েন করব। আচ্ছা রতনলাল এসেছে? 'এসেছে। 'ওর সঙ্গে প্রাইভেটলি একটু কথা বলতে চাই।'

মার্কো আর সিংজির চোখে চোখে কী এক ইশারা খেলে যায়। বিক্রম সিং বললেন, 'তো 'ইখানেই বাত চিত করতে পার। আমি রিসেপশন কাউন্টারে যাচ্ছি। পাঠিয়ে দিচ্ছি রতনলালকে।'

সিংজি উঠে পড়ে। পুলক আর জয়ও উঠে পড়ে। পুলক কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে বেশি দূর যায় না। কয়েক পা গিয়ে থেমে দেওয়ালে টাঙানো একটা নোটিশ দেখতে থাকে এক মনে। জয়ও নোটিশটা পড়ার ভান করে। তাদের পাশ দিয়ে চলে যায় রতনলাল, ঢুকে যায় সিংজির কামরায়। পুলক ও জয় নিঃশব্দে গিয়ে দরজার কাছে আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতে।

রতনলাল উফুল্ল ভঙ্গিতে মার্কোকে বলল, "বাঃ মিস্টার গশ, আপনি সুস্থ হয়ে গিয়েছেন দেখছি। ডেকেছেন আমায়?

'হু, বস।

দু'জনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে টেবিলের দু পাশে। মার্কোর গম্ভীর ভাব দেখে রতনলাল নার্ভাস হয়ে ইতিউতি চায়। মার্কো কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে রতনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, রতন আমার খাতাখানা যে ফেরত দিতে হবে।'

কী খাতা?' চমকে ওঠে রতনলাল। 'বোকা সেজো না। কী খাতা তুমি ভালো ভাবেই জানো। আমার চুরি যাওয়া রান্নার খাতা। বাঁধানো। হলুদ মলাটের।

"সে থাতার আমি কি জানি? আপনি তো বললেন সেটা কোথায় হারিয়েছে, মনে করতে পারছেন না।

'সরি হারায়নি। আমার ঘর থেকে চুরি হয়েছে আমার অসুখের সময় এবং সেটি তোমার কাছে আছে। ঠান্ডা দৃঢ় গলায় জানালেন মার্কো।

কী আমায় চোর বলছেন? আমি কিন্তু ম্যানেজারকে কমপ্লেন করব।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে বলতে রতনলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে দরজার দিকে ঘুরে দেখে যে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলক, আর তার পেছনে জয়।

আপনারা?' ভুরু কে দেখতে দেখতে রতনলাল বলে, 'ও আপনার সেই কাবাব আর বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছিলেন। এখানে কী করেছেন?

পুলক এক পা ঘরে ঢুকে দরজা আগলে রেখেই বলল—আমি অনুসন্ধানী পুলক রায়। বলতে পারেন একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মিস্টার গশ আমকে

অ্যাপয়েন্ট করেছেন ওঁর হারানো রান্নার খাতাটা উদ্ধার করে দিতে। এই আমার কার্ড। পুলক নিজের নাম ঠিকানা ছাপা কার্ড এগিয়ে ধরে।

কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে রতনলাল পুলকের কার্ডটা নিয়ে একবার চোখ বুলায়। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে কয়েকবার। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ঠোট বেঁকিয়ে বলে, 'তা মিস্টার ডিটেকটিভ খাতাটার হদিশ পেয়েছেন?

পুলক বলল, 'নাঃ হাতে পাইনি এখনও, তবে জানতে পেরেছি কোথায় আছে।”

“কোথায় ?

“এই যে মিস্টার গশ যা বললেন, আপনার হেফাজতে।

দেখুন মশাই টিকটিকিই হোন আর গিরগিটিই হোন, প্রমাণ ছাড়া কাউকে চোর বললে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেস করা যায়। সেটা জানেন কি? পথ ছাড়ুন। যত পাগলের প্রলাপ। রতনলাল গরগর করে রাগে।”

‘সরি। পথ ছাড়ব না, পুলক দৃঢ়কণ্ঠে জানায়, ‘হা প্রমাণ আছে বলেই অভিযোগ করছি।'

‘কী প্রমাণ?' চেঁচিয়ে ওঠে রতনলাল। তার হাবভাব তখন যাঁদে পড়া হিংস্র জন্তুর মতো। পারলে পুলকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে জোর করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পুলক যথেষ্ট লম্বা ও শক্তিশালী। সেই তুলনায় রতনলাল নেহাতই ছোটখাটো দুর্বল। এর ওপর পুলকের সঙ্গে রয়েছে জয়। তাই নিজেকে কোনো মতে সামলে নেয় রতনলাল।

এক নম্বর প্রমাণ,' বলতে বলতে পুলক তার শার্টের বুক পকেট থেকে একটা উত্ত করা কাগজ বের করে এবং কাগজটা খোলে। ফুলস্কেপ সাদা কাগজের একটা পাতা, তাতে

কালো কালি দিয়ে হাতে লেখা ছোট ছোট অক্ষরে। লেখা কাগজটা রতনললের নাগালের বাইরে তুলে দেখিয়ে পুলক নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, “চিনতে পারেন, কী এটা?

কাগজটা দেখেই রতনলালের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তবু যেন জোর করে বলে ওঠে, কী এটা? জানি না।

'আনেন। জানেন বইকি। নিজের হাতের লেখা চিনতে পারছেন না? এটা বোগদাদি শাহি কাবাব বানানোর প্রণালী লেখা। মিস্টার, গশের খাতা থেকে নিজের হাতে টুকে এনেছিলেন। যেটা দেখে রান্না করে আমার অর্ডার সাপ্লাই করেছেন। পুলক বেশ রসিয়ে বলে।

"কী যা তা বকছেন?' খেকিয়ে ওঠে রতনলাল।

কী বকছি তা আপনি ভালোই জানেন। শুনেছি রায়ার পর অনেক খুজেছিলেন লেখাটা। দুঃখের বিষয় পাননি। হয়তো ভেবেছিলেন, বাজে কাগজ ভেবে কেউ ফেলে দিয়েছে। কিন্তু ওটি যে এমন মারাক জায়গায় পৌছে গিয়েছে তা কল্পনাও করেননি। তাই ?" রতনলাল কোনো জবাব না দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পুলক আবার বলে, "লেখাটা পাবেন কী করে? এটা যে চুরি হয়েছিল। মার্কোর খাতা চুরির মতোই। আর চুরিটা করে আমার এজেন্ট ঝন্টু।

ঝন্টু !" নিচু গলায় চাপা রাগে উচ্ছারণ করে রতনলাল। "আজ্ঞে হ্যায়', পুলক মাথা হেলায়, কুতুবে সদ্য অ্যাপয়েন্টেড রান্নার জোগানদার।

'দু নম্বর প্রমাণ পুলক ঘোষণা করে, মিস্টার গশ মানে মার্কোর খাতার লেখা আপনি জেরক্স করিয়েছেন যেখান থেকে সেই জেরক্স সেন্টারের মালিকের সাক্ষ্য। আপনার চেহারা, খাতাখানার চেহারা এবং তার বিষয়বস্তু ওই জেরক্স সেন্টারের মালিক কাসেম আলির স্পষ্ট মনে আছে। এমনকী ক' পৃষ্ঠা জেরক্স করিয়েছেন দু দফায় তাও ভোলেননি আলি সাহেব। সব জানিয়েছেন।

যত্ত সব বানানো গলো। রতনলাল নস্যাৎ করে দেয় অভিযোগ। "তিন নম্বর প্রমাণ আরও মারাত্মক। পুলক বিন্দুমাত্র না দমে বলে চলে, 'তারক স্বীকার করেছে যে আপনার জন্যেই সে খাতা চুরি করেছিল। আর আপনার লোকই তাকে মেরেছে।'

'আঁ তারক!' থমথমে হয়ে যায় রতনলালের মুখ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "কে তারক? আমি চিনি না কাউকে ওই নামে। আমায় যেতে দিন। পথ ছাড়ুন।

'সরি। মার্কোর খাতা অক্ষত দেহে ফেরত না পাওয়া অবধি আপনাকে এখানে অপেক্ষা। করতে হবে।'

"আমায় জোর করে আটকাচ্ছেন? আমি পুলিশে কমপ্লেন করব।' গজগজ করে ওঠে। রতনলাল—'মিস্টার গর্শ আপনার ডিটেকটিভকে সরান, নইলে বিপদে পড়বেন।

মার্কো নির্বিকার ভাবে বসে থাকেন। পুলক রতনলালের হুঁশিয়ারিতে কোনো পাত্তা না দিয়ে আবার বলে, "চট সুরে একটা চিঠি লিখে দিন আপনার স্ত্রীকে। পত্রবাহকের হাতে মার্কোর খাতাটা দিয়ে দিতে লিখুন। এখান থেকে ফোন করে স্ত্রীকে বলে দিন চিঠি নিয়ে লোক যাচ্ছে। ঋতুই যাবে আপনার চিঠি নিয়ে। তা এখানে পৌঁছলে তবে আপনার মুক্তি। 'আমাকে যেতে দিন। আমি ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করব। গর্জে ওঠে রতনলাল।

পুলক সবিনয়ে নিবেদন করল, কোনো লাভ নেই মশাই! ম্যানেজার সিংজি সবই জানেন। তাঁর মদত না থাকলে কি আর তার হোটেলে আপনাকে আটকাতে পারি?'

'আমি এক্ষুনি পুলিশে কমপ্লেন করব। ষড়যন্ত্র করে আমায় হোটেলে আটকে রাখার জানো। ছেড়ে দিন আমায়।' রতনলালের তেজ কমার লক্ষণ নেই।'

তা করতে পারেন বইকি, পুলক ব্যঙ্গের সুরে বলে, তবে ফর ইওর ইনফর্মেশন, পুলিশে কমপ্লেন আমরা আগেই করে রেখেছি। আপনার বিরুদ্ধে মার্কের খাতা চুরির কারণে। প্রমাণ-টমান সমেত। আপনার বাড়ি থেকে খাতাটা উদ্ধারের জন্য সার্চ ওয়ারেন্টও রেডি করে রেখেছে পুলিশ। আমরা সিগনাল দিলেই সার্চ হবে।

রতনলাল তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় পুলক আর মার্কোর দিকে। "কি বিশ্বাস হচ্ছে না? পুলকের কণ্ঠে বিপ; অলরাইট। আপনার বাড়ির এলাকার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ও.সি.কে ফোন করছি। তার সঙ্গে কথা বলে সত্যি মিথ্যা যাচাই করে নিন।।

পুলক সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করল-কে সরকার? আমি পুলক। তুমি ভাই রতনলালবাবুকে মার্কো-ভাগশের চুরি যাওয়া রান্নার খাতাটার ব্যাপারে একটু সমঝিয়ে দাও। আমার কথায় তো উনি পাত্তাই দিচ্ছেন

না।'... পুলক রিসিভারটা রতনলালের হাতে দিতে দিতে বলে, এক সময় পুলিশে চাকরি করেছি তো, তাই অনেক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার দোস্তি আছে।'

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার দারোগা রতনলালাকে কী বললেন ফোনে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু দেখা গেল যে শুনতে শুনতে রতনলাল একেবারে চুপসে গেল। কাপ হাতে সে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

খানিকক্ষণ মাথা নামিয়ে চুপচাপ থেকে রতনলাল ধীরে ধীরে বলল, 'আমার স্ত্রী জানে খাতাটা কোথায় আছে।' পুলক বলল, তাহলে চিঠিতে ডিরেকশন দিয়ে দিন, খুঁজে দেবেন।'

রতনলাল অনুনয়ের সুরে বলে, আমায় কার সঙ্গে যেতে দিন বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে খাতা দিয়ে দেব ওর হাতে। নইলে আমার স্ত্রী খুঁজে পাবে না। গাদা বই-খাতার পিছনে ওটা লুকনো আছে আলমারিতে।

যাক বাবা খাতাটা নষ্ট করেনি।' পুলকের কানের কাছে ফিসফিস করে জয়।

পুলক মাথা ঝাকিয়ে খুশিটা জানান দেয়, তারপর রতনলালকে বলে, 'সরি, আপনাকে গেনো মতেই এখন খাতার কাছে যেতে দেওয়া যাবে না। কারণ সামান্য সুযোগ পেলেই হয়তো আপনি খাতাটা নষ্ট করে ফেলবেন প্রমাণ লোপ করতে।' তারপরেই পুলক কড়া সুরে ধমকায়, 'দেখুন প্রচুর বাজে সময় খরচ করেছেন। আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। চিঠি লিখলে বাধ্য হব পুলিশকে সার্চ করার অনুরোধ করতে। তবে ভালোয় ভালোয় খাতা পেয়ে গেলে মিস্টার গশের ইচ্ছে নয় আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করতে। কী চান চটপট ঠিক করুন।

রতনলাল এবার হাল ছেড়ে দেয়। বলে ওঠে, “দিন কাগজ কলম।

মিনিট পনেরো বাদে রতনলালের চিঠি নিয়ে হস করে মোটর বাইকে চেপে বেরিয়ে যায় ঝন্টু। পুলক ফের প্রশ্ন করে রতনলালকে, 'তারককে মার খাওয়ালেন কেন। ভুল খাতা দেওয়ার অপরাধে?”

হ্যা তাই। ফুসে ওঠে রতনলাল, 'সাংকেতিক ভাষায় লেখা জেনেও নগদ হাজার টাকা " আগাম নিয়ে ওই বোগসি খাতাটা গছালো। অ্যাডভান্সের টাকাটা ফেরত চেয়েছিলাম বলে আবার গরম দেখায়। আবার চুক্তির বাকি টাকাটা ডিমান্ড করে।

ওর এত বড় সাহস! ওকে যে খতম করে দিইনি ওর বাপের ভাগ্যি। জোচ্চোর কাহাকা।'

অগ্নিশর্মা রতনলালের পিছনে মার্কোর ঠোটে বাঁকা হাসি ফোটে। আর রতনলালের মুখোমুখি পুলক ও জয় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য অবলম্বনে কোনো মতে হাসি চাপে। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে ঝন্ট। বাঁধানো হলুদ মলাটের মোটা একখানা খাতা সে তুলে দেয় পুলকের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে তার বোকা বোকা মুখের একখানা হাসি উপহার দেয় রতনলালকে। প্রতিদানে রতনলাল তাকে বিষাক্ত দৃষ্টি হানে।

পুলক মার্কোকে খাতাটা দিয়ে বলল, “দেখুন ঠিক খাতা তো?'

মার্কো পরম যত্নে খাতাটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মাথা নেড়ে জানায়—হ্যা।'

“কি লস্ট কুকিং বুক মিলা?' দরজার কাছে শোনা গেল বিক্রম সিং-এর গলা। তিনি ঘরে ঢোকেন।

রতনলাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে একবার আড় চোখে দেখে নিয়ে সিংজি বললেন, 'মার্কো তুমি কি রতনের এগেনস্টে পুলিশ কেস করবে?'

‘না।' জবাব দেয় মার্কো, তাহলে ওর কেরিয়ার একদম বরবাদ হয়ে যাবে। খাতা না দিলে অবশ্য তাই করতাম।' ‘আমি কিন্তু এই বেইমানকে আর হোটেলে রাখতে পারব না।' সিংজি কঠোর স্বরে জানালেন-“রতন তোমায় এক হপ্তা টাইম দিচ্ছি। অন্য কোথাও নোকরি খুঁজে নাও। ফিউচারে সমঝে চললে এই খাতা চুরির কথা কাউকে বলব না। এটা গ্যারান্টি দিচ্ছি।

রতনলাল মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায়। মার্কো-ডা-গশ অর্থাৎ কর্মদাস ঘোষ মশায়ের ঘরে জমায়েত হয়েছে পুলক আর জয়। রান্নার খাতা চুরির কেসটা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। তারই ফাকে হঠাৎ মার্কো একটা ব্যাঙ্ক চেক ড্রয়ার থেকে বের করে পুলকের হাতে দিয়ে সংকোচে জানালেন—আমার যে উপকার করলেন তার জন্য এই সামান্য ঋণশোধ। | জয় আড় নয়নে দেখল চেকটা। টাকার অঙ্কটা রীতিমতো মোটা। সে ছদ্ম অভিমান ভরে বলে ওঠে, ব্যস, টাকায় ফিজ দিলেই সব ঋণ শোধ হয়ে গেল বুঝি? মার্কো থতমত খেয়ে বললেন, সরি। আর কিছু যদি? বলুন প্লিজ।

জয় মিচকে হেসে বলল, “সেই বিখ্যাত বোগদাদি কাবাবটার স্বাদ কিন্তু আজও পাইনি।

হো হো করে হেসে মার্কো বললেন, ‘অফকোর্স পাবেন বইকি। নিশ্চয়ই খাওয়াব। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। কবে খাবেন? কতজন খাবেন? নেমন্তন্ন করে রাখছি। হুকুম করুন স্যার। আমি রেডি।

খুনে বৈজ্ঞানিক অন্তর্ধান রহস্য - অজেয় রায় Khune Baigganik Antordhan Rahassa by Ajeo Ray

খুনে বৈজ্ঞানিক অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের আগে এই রহস্য সমাধানের নায়ক বাবলু ও সিরাজ কীভাবে গোয়েন্দাগিরিতে এল তা জানানো দরকার।

বাবলু ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ছিল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির ভক্ত। খেলাধুলায় চৌকস আর বেজায় ডানপিটে। গল্পের বই পড়ার ঝোক থাকলেও সময় বেশি পেত না পড়ার। ক্লাসের পড়াও যে রয়েছে। অন্তত মোটামুটিভাবে পাশ করা চাই। ডিটেকটিভ বই কিছু পড়লেও তাই নিয়ে আগে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু তার পরমবন্ধু ও সহপাঠী সিরাজের কল্যাণে বাবলু পুজোর ছুটির সময় বেশ কিছু রহস্যময় গোয়েন্দা গল্প পড়ে ফেলে চমকৃত হয়। মনে ধরে যায় গোয়েন্দাদের ব্যাপার-স্যাপার। এরপর ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যেতে বাবলু চুটিয়ে গোয়েন্দা গল্প পড়ে, গ্রামের লাইব্রেরি থেকে এবং এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে। মগজে গজগজ করতে থাকে গল্পের বইয়ের নানা গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ। বিচিত্র সব অপরাধের বৃত্তান্ত এবং সেইসব কুকীর্তি ধরে ফেলার রকমারি কৌশল। শুধু বাঙালি গোয়েন্দাদের কথা নয়, অনুবাদের মাধ্যমে সে পড়ে ফেলে। অনেক বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনিও। , পড়তে পড়তে বাবলুর শখ, চাপল যে শুধুমাত্র ছাপার অক্ষরে অন্য গোয়েন্দাদের বাহাদুরি জেনে কী লাভ? হাতে কলমে নিজেও কাজে নামব। থিওরি থেকে প্র্যাকটিস। মনের এই প্রবল বাসনা সে জানাতে চলল বন্ধু সিরাজের কাছে।

সিরাজ লেখাপড়ায় দারুণ। ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। তবে সে গোবেচারি ভালোমানুষ নয় মোটেই। সে প্রচুর গল্পের বই পড়ে। ক্ষুরধার বুদ্ধি তার।

ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে বাবলু-সিরাজদের গ্রাম পারুলডাঙা। সিরাজকে তার বাড়ি থেকে ডেকে এনে গ্রামে এক অশ্বথ গাছতলায় বেদিতে নিরালায় বসে বাবলু ঘোষণা করল, আমি ডিটেকটিভ হব। ঠিক করে ফেলেছি।'

'আঁ ডিটেকটিভ! তুই?' সিরাজ চমকায়। 'কেন, আমি পারব না?' বাবলু ক্ষুব্ধ।

না না তা বলছি না। মানে তোর তো অন্য অ্যাম্বিশন ছিল। হয় নামকরা ফুটবল প্লেয়ার হবি, নয়তো জাহাজের নাবিক। হঠাৎ মত বদলালি যে?"

এই লাইনটাই আমার বেশি পছন্দ হচ্ছে। বাবলু দৃঢ় স্বরে জানায়।

কার কোথায় প্রতিভা লুকিয়ে থাকে সব সময় কি আগে থেকে তা টের পাওয়া যায়? বুঝলি সুযোগ আর চেষ্টায় কত মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়...' গত বার্ষিক পরীক্ষায় রচনার জন্য মুখস্থ করা কটা লাইন তাক বুঝে ঝেড়ে দেয় বাবলু। হা হা তা তো বটেই।" সায় দেয় সিরাজ।' বাবলু বলে চলে, "এই যেমন ধর জগন্নাথপুরের ডোম্বল যে কোনোদিন মিলিটারি হয়ে ইউনিফর্ম পরে, বুট মশমশিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে, ভেবেছিল কেউ? ওর চেহারাটা লম্বা চওড়া কিন্তু নেহাতই গোবেচারি ক্যাবলা। গায়ের লিকলিকে ছোঁড়াগুলো অবধি ওর ওপর মাতব্বরি ফলাত। সৎ মায়ের গঞ্জনায় বেচারা বাধ্য হয়ে ঘর ভয়ে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আর্মিতে ঢোকে। কোনো মতে টিকেও যায়। আর স, গায়ে ওর কী খাতির। ও নিজে ডেকে দুটো কথা বললে ওর সমবয়সিরা গদগদ গত যায়। ছুটিতে বাড়ি এলে কতজন আসে ওর খোঁজখবর নিতে। ডোম্বলের এখন তলোয়ারের মতো মোচ। আর কী স্মার্ট চালচলন! বাংলা হিন্দি ইংরিজিতে বুলি ছোটায়। সত্যি সত্যি একটা যুদ্ধও নাকি লড়েছে। ডোম্বলের সৎ মা এখন একদম টাইট। ও বাড়ি এলে যেন কৃতার্থ। চা চাইলেই বানিয়ে দেয়।

সিরাজ মনে মনে ভাবে, ইস গাদাগাদা গোয়েন্দা গল্প গিলে বাবলুর মাথাটি বিগড়েছে। বাইরে অবশ্য সে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, 'তা কোনো ট্রেনিং নিবি নাকি এ লাইনে?"

‘কিসসু দরকার নেই। বাবলু উড়িয়ে দেয় প্রস্তাব। বলে, ‘দেশি বিদেশি সব ডিটেকটিভ একটি মোদ্দা বাণী দিয়েছেন—চোখ কান খোলা রাখ। মগজের বুদ্ধিকে খেলাও। ব্যস, তাহলেই বেশির ভাগ রহস্যের সমাধান মিলবে। আমি এই উপদেশই ফলো করব।

সিরাজ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, “বেশ তবে কাজে নেমে পড়। আপিস কোথায় করবি? কলকাতায়?

‘না। এখুনি কলকাতায় যাওয়া অসুবিধে, থতমত খায় বাবলু, ভাবছি আপাতত এখানেই।

‘রাইট'। সিরাজ উৎসাহ দেয়, এখানেই হাতেখড়ি হোক। পাড়াগা বলে অবহেলা করিস। আমাদের পারুলডাঙায় আর আশেপাশের গ্রামে কী রহস্যের অভাব? কত অপরাধ ঘটছে এখানে তার সব কি কিনারা হয়? বড় শহরে কিছু ঘটলেই খবরের কাগজে বেরোয়। তাই লোকে জানতে পারে। গ্রামদেশের বেশিরভাগ খবরই কাগজে ছাপে না। গ্রামের বহু রহস্যজনক ঘটনা রীতিমতো জটিল। অপরাধবিদ্যায় এখানকার লোকের এলেম কিছু কর্ম। ট্রেনিং পিরিয়ডে সে সব রহস্যের কিছু সমাধান করতে পারলে তোর ভিত খুব মজবুত হবে।

‘ঠিক বলেছিস। বাবলু ভারি খুশি।

সিরাজ বলল, ‘তা অ্যাসিস্ট্যান্ট কাকে নিচ্ছিস?' ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট?

হ্যাঁ। একজন সহকারী না থাকলে কি গোয়েন্দাকে মানায়? বইয়ে দেখিসনি, দেশি বিদেশি প্রায় সব বাঘা বাঘা ডিটেকটিভের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। নইলে যে গোয়েন্দার দর কমে যায়।

তা বটে। কিন্তু আমি সহকারী পাব কোথায়? একটু দমে যায় বাবলু।

‘আমাকে দিয়ে চলবে?' যেন দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করে সিরাজ।

‘যা ঠাট্টা করছিস?”

'ঠাট্টা নয় রে। সিরিয়াসলি বলছি।'

‘তুই আমার সহকারী হবি?

খেপেছিস? তোর যা বুদ্ধি, আর এ লাইনে পড়াশোনা, বরং আমার সহযোগী হতে পারিস। মানে আমরা হব জোড়া ডিটেকটিভ পার্টনার।

‘না ভাই আমার সহকারী হওয়াই ভালো। পার্টনার হয়ে কাজ নেই। তোর নাম হলে আমার নামটাও জানবে লোকে। দরকার হলে আমি সাধ্যমতো বুদ্ধি জোগাৰ, হেল্প করব।”

বাবলু মনে মনে হাঁপ ছাড়ে। কারণ সিরাজ পার্টনার হলে সে কি আর পাত্তা পেত? সিরাজ নামে সহকারী, আর কাজে সহযোগী হলেই তার সবচেয়ে সুবিধে।

বাবলু বিপুল উৎসাহে রহস্য-সন্ধানে নেমে পড়ে গোয়েন্দাগিরিতে হাত পাকাতে।

দিন কয়েক বাদে, এক ছুটির দিন সকালে বাবলু হাজির হল সিরাজের কাছে। তার চোখ মুখ থমথম করছে। সিরাজ বোঝে যে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। কারণটা জানতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। বাবলু উত্তেজিত গলায় বলে, 'জানিস গত পরশু আমাদের গ্রামের লাইব্রেরি থেকে একটা গল্পের বই হারিয়েছে। খুব সম্ভব চুরি হয়েছে। কেসটা আমি তদন্ত করব ঠিক করেছি। উদ্ধার করব বইটা।'

কী বই?' জিজ্ঞেস করে সিরাজ। নাম খুনে বৈজ্ঞানিক। লেখক মেঘনাদ। পড়েছিস বইটা ?”

উঃ দারণ বই। ছোটদের রহস্য উপন্যাস। পড়তে পড়তে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। গা শিউরে ওঠে। মাত্র তিন মাস আগে কেনা হয়েছে বইটা। গ্রাহকদের মধ্যে, মানে আমাদের মাতো ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে বইটা নিয়ে। যে নিচ্ছে বইটা সে নিজে ততা পড়ছেই কয়েকবার, তার বাড়ির অন্য সব ছোটরা পড়ছে। মায় সে বাড়ির বেশির ভাগ বড় অবধি বইটা না পড়ে ছাড়ছে না। ভজা তো আবার লুকিয়ে ভাড়া খাটিয়েছে বইখানা।।

‘ভাড়া? কী রকম? সিরাজ অবাক।

‘ভজা নিজে পড়ে, তার বাড়িতে দিয়েছিল। শর্ত বইটা মাত্র একবেলা রাখতে পারবে পড়তে। আর তার বদলে ভেজাকে দুটো বেগুনি খাওয়াতে হবে, বদির দোকানে গরম ভাজা। আর একথা কাউকে বলা চলবে না। বেচারি “কেষ্ট তাড়াতাড়ি খুনে বৈজ্ঞানিক পড়ার লোভে সেই শর্ত মেনে বেগুনি খাইয়েছে ভজাকে। লাইব্রেরি থেকে বইখানা পেতে তার তখনও ঢের দেরি। ওই বই নিয়ে লাইব্রেরির সামনে একদিন তুমুল ঝগড়া লাগে। তখনই কেষ্ট ফাস করে দেয় ভজার কীর্তি।

লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবু তাই নিয়ম করেছেন যে অন্য বই সাতদিন রাখতে পেলেও তিন দিনের বেশি রাখতে পারবে না ওই বইটা। নেহাত আমার সঙ্গে গোপালবাবুর এক বেশি জানাশোনা আছে তাই লাকিলি বইখানা আসা মাত্র পড়তে পেয়েছিলাম। কের পড়ব বলে ডিমান্ড দিয়ে রাখি চার দিন আগে। ভেবেছিলাম এবার পেলে তোকেও পড়া।

কী ভাবে হারাল বইটা? প্রশ্ন করে সিরাজ।

‘গতকাল একজন বইটা ফেরত দেয়। সেইদিনই বিজয়ের নেওয়ার পালা। লাইব্রেরিয়ান ওঁর টেবিলের একপাশে রেখে দেন বইটা। ঘণ্টাখানেক বাদে বিজয় এসে চাইলে দেখা যায়। যে নেই। উধাও। অনেক খুজেও আর বইটা পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে গোপালবাবু ওর খাতায় বইটার নামের পাশে লিখে দিয়েছেন লস্ট। বললেন, 'অনেক বই-ই এমনি হারায়। বিশেষ করে যেগুলোর চাহিদা বেশি। কখন যে কে টুক্ করে তুলে নিয়ে যায়! আমি একা আর কত নজর রাখব? যা হোক আমি কিন্তু ছাড়ছি না।”

কীভাবে এগুবি ভেবেছিস?” সিরাজের কৌতুহল।

‘শুধু ভাবিনি। কাজেও এগিয়েছি খানিকটা। গোপালবাবুর থেকে খুনে বৈজ্ঞানিকের ডিমান্ড লিস্টটা চেয়ে নিয়েছি। ওটা দেখলেই বোঝা যাবে কার কার এই বইটা পড়তে বিশেষ আগ্রহ। খুব সম্ভব তাদেরই কেউ সরিয়েছে। এদের পিছনেই আমি তদন্ত করব। মানে ইনভেস্টিগেশন।

‘ক’জন বইটা চেয়ে নাম লিখিয়েছে?”

“গত পরশু অবধি তেরোজন ছিল ডিমান্ড লিস্টে। এর মধ্যে দু'জনকে বাদ দিচ্ছি। বিজয় আর আমি। বাকি এগারোজন যে কেউ অপরাধী হতে পারে।”

কীভাবে ইনভেস্টিগেশন করবি?”

উপায় একটা ভেবেছি।' বাবলুর ঠোটে রহস্যময় হাসি ফোটে কিন্তু আর মুখ খোলে। বোঝা গেল যে সে তার তদন্ত পদ্ধতি আপাতত গোপন রাখতে চায়।

সিরাজও এই নিয়ে আর জোরাজুরি করে না। শুধু বলে, 'বইটা ফেরত দেওয়ার ঘন্টাখানেক বালে আবিষ্কার হয় যে বই উধাও। তাই তো?”

“তাহলে ওই সময়ের মধ্যে যারা বই নিয়েছে তাদের মধ্যে একবার খোঁজ করে দেখতে পারিস। যদি কেউ ভুল করে বইটা নিয়ে গিয়ে থাকে।

বাবলু বলল, ‘ভুল করলে নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যেই ভুলটা ধরা পড়বে। তখন বইটা ফেরত দিয়ে যাবে।'

‘অত তাড়াতাড়ি ভুল ধরা নাও পড়তে পারে, সিরাজের সংশয়, অনেকে লাইব্রেরি থেকে বই এনে অনেকদিন স্রেফ ফেলে রাখে না উল্টিয়ে। “বেশ তাদের কাছে খোঁজ করব।' বাবলু সায় দেয়।

এরপর দুই বন্ধুতে কয়েকদিন আর এ বিষয়ে কথা হয় না। বাবলুর সদাই কেমন ব্যস্তসমস্ত ভাব। সিরাজ জানে ও ঠিক নিজেই বলবে তদন্তের ফলাফল।

পাঁচ দিন বাদে স্কুল ছুটির পর বাবলু সিরাজের সঙ্গ ধরল। খানিক পাশাপাশি হাঁটে

‘খোঁজ পেলি বইটার?’ সিরাজ নিজেই জানতে চায়।

‘নাঃ। বই চেয়ে যারা নাম লিখিয়েছিল তাদের এগারো জনকে বাজিয়ে দেখেছি। কিন্তু তেমনি কোনো কু পাইনি। অবশ্য একটা কেস বাদে। ‘কীভাবে বাজালি? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলি নাকি?

"খেপেছিস। আমি কী অতই বন্ধু। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে কি চোর স্বীকার করবে? আমি অন্য কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওই বইটার কথা তুলেছি। বইয়ের

গল্পটা ওরা জানে কিনা পরখ করেছি। যে বইটা পড়েনি তার পক্ষে গল্পটা না জানাই স্বাভাবিক। তাই না?'

'বটেই তো। তারপর?'

কারো সঙ্গে খেজুরে আলাপ করতে করতে ফট করে বলেছি, আচ্ছা ডক্টর মুস্তাফির কোন চোখটা জানি কাচের ছিল?'

'ডক্টর মুস্তাহিক কে?'

''রতনগড়ের মালিক। আধা উন্মাদ নিষ্ঠুর অতি প্রতিভাবান এক সায়েনটিস্ট। ওই তো খুনে বৈজ্ঞানিক। যে মানুষ জাতটাকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখে। একটার পর একটা মানুষকে সে রতনগড়ে নিয়ে যায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে গোপনে। তাদের ওপর অদ্ভুত সব এক্সপেরিমেন্ট চালায়। তার ফলে বন্দি মানুষগুলোর প্রাণ বলি দিতেও তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। আবার কাউকে জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা ডক্টর মুস্তাফির সেই ভয়ংকর শিকারি কুকুরটার কী নাম যেন? এমনি সব ছোটখাটো কিন্তু অব্যর্থ ফাদ-পাতা প্রশ্ন। গল্পটা ভালো করে না জানলে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

'বাঃ দিব্যি কৌশল করেছিলি। তা কী রকম উত্তর পেলি?"

''দশজন আমার প্রশ্নের জবাবই দিতে পারেনি। তাদের ভেতর সাত জন বলেছে তারা গল্পটার কিছুই জানে না। তবে শুনেছে অন্যের মুখ থেকে। এখন নিজে পড়তে চায়। ডিমান্ড দিয়ে রেখেছে। কিন্তু লম্বু খোকা ঠিক উত্তর দিয়ে দিল।

'অমনি ওকে চেপে ধরলাম। কী করে জানলি তুই? বইটা তো এখনও লাইব্রেরি থেকে পাসনি। তখন বলে কিনা, বইটা ও পড়ে ফেলেছে ছোটনের বাড়িতে বসে। খুব তাড়াহুড়ো করে লুকিয়ে। ও নাকি ছোটনের বাড়ি গিয়েছিল। দুজনে একসঙ্গে টিউশনি পড়তে যাবে, তাই। ছোটন তখন চান করছে। তারপর ভাত খেল। ছোটনের খাটের ওপর বইখানা ছিল। দেখেই লম্বু খোকা বইটা পড়তে শুরু করে। গোগ্রাসে গিলে শেষ করে। কিন্তু নিজের বাড়িতে আনতে পারেনি বইটা। দেয়নি ছোটন। আর একবার ধীরেসুস্থে পড়ার তার ভারি।

হারিয়েছে। খুব আপশোস করল তাই। আমার কিন্তু ধারণা ওটা ওর ভান। ওই কালপ্রিট। নইলে অত নার্ভাস হল কেন? ওই চুরি করেছে বইখানা। আমার প্রশ্নের

জবাবটা বোস বেরিয়ে যেতে ওই সব বানিয়ে বানিয়ে বলল। আবার বলে কিনা লাইব্রেরিয়ানকে বলিস

আমি বইটা একবার পড়ে ফেলেছি। তাহলে বই খুঁজে পেলে আমায় আর দিতে চাইবে না। যারা মোটে পড়েনি তাদের আগে দেবেন।'

সিরাজ ভেবে বললে, 'খোকার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছোটন তো নিয়েছিল বইটা। ওই ঘরেই তখন ছিল কি বইটা? ছোটনকে জিজ্ঞেস করিস। তুইও তো একবার পড়েছিস কিন্তু সাধ মেটেনি। তাই ফের পড়তে চাইছিস।'

বাবলু জোর দিয়ে বলে, "উহু, থোকাটা মিটমিটে শয়তান। ও একবার কাগনের স্ট্যাম্পের অ্যালবাম দেখতে দেখতে তা থেকে দুটো স্ট্যাম্প সরিয়েছিল। পরে ধরা পড়ে যায়। চুরিবিদ্যেয় বেটা পোক্ত। আমি ওকে নজরে রাখছি। সুযোগ পেলেই ওর ঘরে গিয়ে ওর বই টই সার্চ করে দেখব গোপনে। আনিস সেদিন বই হারানোর সময়ও লাহরীরতে ছিল কিছুক্ষণ।'

তাই নাকি? এবার সিরাজও সন্দিগ্ধ। সে বলে, "আচ্ছা যারা ওই দিন, ওই সময়ে বই ইস্যু করেছিল তাদের কাছে খোজ নিয়েছিলি? মানে যদি কেউ ভুল করে নিয়ে গিয়ে থাকে?

হ্যাঁ, নিয়েছি। মোট দশজনের কাছে। লাভ হয়নি। উল্টে বিমানসারের কাছে আচ্ছা ধ্যাতানি খেলাম এই নিয়ে।'

"বিমানস্যার? মানে আমাদের বাংলার টিচার বিমানবিহারী বসু?"

"হ্যা হ্যা। আর কটা বিমানস্যার আছে পারুলডাঙায়।' 'কেন কী বলেছিলি?

'কি আবার। সবাইকে যা বলেছি—একটু দেখবেন স্যার খুঁজে, লাইব্রেরির একটা গল্পের বই, নাম খুনে বৈজ্ঞানিক, আপনার বইয়ের সঙ্গে মিশে কি চলে এসেছে ভূলে? ব্যস শুনেই উনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। এমনিই তো রাগী মানুষ। কড়া গলায় বললেন, আমি সেদিন ভুল করে কোনো বেশি বই আনিনি। বরং ভুল করে আমার একটা ইস্যু করা বই সেদিন ফেলে এসেছিলাম লাইব্রেরিতে। পরে গিয়ে নিয়ে আসি বইটা। বাংলা প্রবন্ধের বই। তোমায় কে পাঠিয়েছে?"

লাইব্রেরিয়ান? ওর তো যত সন্দেহ আমার ওপর। যত্ত সব'।

‘ বারে। আমি তো পালিয়ে বাঁচি। কী মেজাজ!

উনি বুঝি বই ফেলে এসেছিলেন ভুলে?”।

‘হা। লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবু বললেন, বিমানস্যার প্রায়ই বই ইস্যু করে লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে রাখেন। তারপর পত্রিকা-টত্রিকা পড়ে বই 'ভূলে ফেলে রেখে চলে যান। উনি তো দুটো বই পান একসঙ্গে। কখনও একটা, কখনও বা দুটো বই-ই ফেলে রেখে গিয়েছেন। পরে খেয়াল হলে এসে নিয়ে যান। এই নিয়ে গোপালবাবু একবার অনুযোগও করেছেন বই হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে। তাই বিমানস্যার গোপালবাবুর ওপর চটে ছিলেন। সুযোগ পেয়ে আমার ওপর ভালো ঝাড়লেন। যাকগে লম্বু খোকাকে আমি ওয়াচ করব। আর ভেবেছি, যে সব ছেলে সেদিন লাইব্রেরিতে ছিল তাদের মধ্যে কারো চুরিটুরি করার রেকর্ড থাকলে তাদের ওপরেও নজর রাখব। মোট কথা খুনে বৈজ্ঞানিক অন্তর্ধান রহস্য আমি সলভ করবই।' দৃঢ়স্বরে নিজের সংকল্প জানিয়ে বাবলু বিদায় নিল।

কয়েকদিন বাদে। সন্ধের পর গ্রাম নিঝুম হয়ে গিয়েছে। সিরাজ পড়ছিল নিজের ঘরে বসে জানলার কাছে। বাবলুর ডাক শুনে বেরিয়ে এল। আজ স্কুলে বাবলুর সঙ্গে তার বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। এমন অসময়ে হঠাৎ? সিরাজের ঘরে ঢোকে দু'জনে। ফাকা ঘরে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে বাবলু বলে ওঠে, “জানিস খুনে বৈজ্ঞানিক পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এমন একটা দারুণ খবর ঘোষণা করার সময়েও তার চোখে-মুখে ফোটে না কোনো উচ্ছ্বাস বা আনন্দ।

কী করে?' সিরাজ উত্তেজিত।

নিস্পৃহ বাবলুর জবাব, বিমান্যার নাকি নিয়ে গিয়েছিলেন ভুল করে। আজ বিকেলে লাইব্রেরিতে এসে ফেরত দিয়ে গেলেন।

‘ভুল করে। কিন্তু তোকে যে বলেছিলেন, '

“হ্যা, সেদিন নিজের ইস্যু করা একটা বই ভুল করে লাইব্রেরিতে ফেলে গিয়েছিলেন। ঠিকই। কিন্তু গতকাল রাতে নিজের ঘরে টেবিলে বইপত্তর ঘাটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করেন মুনে বৈজ্ঞানিক। কী করে যে বইটা ওখানে এল উনি নাকি বুঝেই উঠতে পারছেন না।

তবে মনে করছেন যে ওঁরই ভুল। কারণ যে বইটা ফেলে এসেছিলেন সেটা আর গুনে বৈজ্ঞানিক-এর সাইজ আর বাধাইয়ে ভীষণ মিল। দুটোর মলাটের রং-ও এক। হলদে।'

খুনে বৈজ্ঞানিক বাধানো বই?'

'মাস দুয়েকের ভেতর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বইটার মলাট ছিড়ে যায়, বাঁধাই আলগা হয়ে যায়। তখন বাধাতে হয়। মলাটের ওপর অবশ্য বড় বড় করে বইয়ের নাম লেখা আছে।'

কীভাবে হল ভুলটা?'

'বিমানস্যার বলছেন যে লাইব্রেরির বইয়ের সঙ্গে আরও কয়েকটা বইখাতা নিজের বাড়ি ফিরে পড়ার টেবিলে নামিয়ে রেখেই উনি একবার মুদির দোকানে যান দেশলাই কিনতে। বাড়িতে বলে দিয়েছিল দেশলাই কিনে আনবেন, ভুলে গিয়েছিলেন আগে কিনতে। বাড়ি ফিরেই মনে পড়ে। দোকান থেকে এসে লাইব্রেরির বই দুটো আলাদা করতে গিয়ে দেখেন দুটোর মধ্যে একটা বই রয়েছে। অন্য বইটার জন্যে তেমন খোঁজাখুজি না করে তক্ষুনি ছোটেন লাইব্রেরিতে। আগেও এমন কাণ্ড হয়েছে। বইটা পেয়েও যান লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে। এখন অবশ্য স্যারের মনে হচ্ছে, প্রথমবার বাংলা প্রবন্ধর বদলে গুনে বৈজ্ঞানিকই এনেছিলেন। আর তাড়াহুড়ো করে রাখার সময় বাড়িতে টেবিলে খুনে বৈজ্ঞানিক সরে গিয়ে অন্য বইয়ের ভিতর মিশে যায়। জানিস বিমানস্যার কৌতুহলী হয়ে। কাল রাতে গুনে বৈমানিক পড়ে ফেলেছেন। আজ ফেরত দেওয়ার সময় এমন উদ্ভট যাচ্ছেতাই বাল্যশিক্ষার অনুপযুক্ত ৰই লাইবেরিতে রাখা উচিত নয়, এইসব উপদেশ ঝেড়ে গেলেন লাইব্রেরিয়ানকে। তবে বইখানা ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে কিঞ্চিৎ লজ্জাও প্রকাশ করেছেন। তখন আমি লাইব্রেরিতে ছিলাম, তাই শুনলাম সব।

সিরাজ ভুরু কুঁচকে বলল, "বিমানসার প্রথমবারে ভুলে খুনে বৈজ্ঞানিক নিয়ে গিয়েছিলেন হতে পারে। তাড়াতাড়ি রেখে বেরুনোর কারণে বইটা পাশে সরে গিয়েছিল, তাও সম্ভব। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে বইখানা স্যারের নজরে পড়ল না? যখন ওটা ওর টেবিলেই ছিল। এটা কেমন জানি অদ্ভুত ঠেকছে। উহু, মনে হচ্ছে ব্যাপার অন্য কিছু। 'আচ্ছা বিমানস্যারের ছেলে নন্তু কি খুনে বৈজ্ঞানিক-এর জন্যে ডিমান্ড দিয়ে রেখেছে?

হা। ওর নম্বর ছিল সাত।' জানায় বাবলু। ‘তুই ওর কাছে বইটার কথা পেড়েছিলি?”

কী বলেছিল নশ্ব?” ও বলেছিল বইখানা ও দেখেছে, কিন্তু হাতে পায়নি। পড়াও হয়নি। গল্পটা ও জানে । তবে শুনেছে দারণ গল্প।'

সিরাজ বলল, বলছিস খুনে বৈজ্ঞানিক-এর মলাটের ওপর নাম লেখা আছে। দু'দিকেই?

না শুধু সামনের দিকে মলাটের ওপর।

সিরাজ বলল, “দেখ বাবলু, আমার মনে হচ্ছে নন্তু বইটা সরিয়েছিল স্যারের টেবিল

খুনে জৈনিক হবেন রহস্য। ১৫৯ থেকে লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে বুনে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই উল্টিয়ে রাখা ছিল। স্রেফ ইটার সাইজ আর মলাটের রং দেখে স্যার ওটা প্রবন্ধের বই ভেবে ভুলে নিয়ে আসেন। নামটা তার পড়েননি। লাইব্রেরিতে নির্ঘাৎ স্যারের বইখাতার গায়েই ছিল খনে বৈজ্ঞানিক। বিমানস্যার বাড়ি এসে বইটই নামিয়ে রেখে দোকানে যেতেই নন্তু ঠিক এই ঘরে ঢুকেছিল। নন্তু খুনে বৈজ্ঞানিক এর চেহারা আগে দেখেছিল, মানে বাঁধাইয়ের পরে। তাতেই সন্দেহ হয় মলাট দেখে। স্যার ধপ্ রে বহই নানাবার ফলে হয়তো শুনে বৈজ্ঞানিক পাশে উল্টিয়ে পড়ে। অর্থাৎ এবার সামনের দিকটা ওপরে। যেদিকে নান লেখা আছে বইয়ের। যেভাবেই হোক খুনে বৈজ্ঞানিক দেখে চিনে ফেলে নন্থ। বোঝে বাবা ভুল করে এনেছে। এমন ভুল তো হরদম হয় স্যারের। সঙ্গে সঙ্গে নন্তু বইখানা সরায়। নিয়ে কেটে পড়ে ঘর থেকে। তাই বিমানস্যার দোকান থেকে ফিরে আর বইটা দেখেননি। ভাবেন, আর একখান বই ফেলে এসেছেন ভুলে। পড়া শেষ হয়ে গেলে কদিন বাদে নড় খুনে বৈজ্ঞানিক ফের বাবার টেবিলে রেখে দেয়। তারপর স্যারের নজরে পড়ে বইটা।'

সিরাজ বলে, 'শোন বাবলু তুই নস্তুকে চেপে ধর। দেখ ও অপরাধ স্বীকার করে কিনা? করবে না হয়তো। তখন দরকার হলে ভয় দেখাবি। বলবি, নন্দপুরের সাধুবাবা গুণে বলেছিলেন যে একটা ছেলে খুনে বৈজ্ঞানিক বইটা চুরি করেছে। বলৰি, তুই সাধুবাবার কাছে গিয়েছিলি বইটা হারাবার পর হদিশ জানতে। বইটা আর একবার পড়ার জন্যে খুব আশা করেছিলি কিনা। হারিয়ে যেতে মন ভারি

খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই সাধুবাবার কাছে গিয়েছিলি যদি চোরকে ধরে বইখানা উদ্ধার করা যায়, সেই মতলবে। সাধুবাবার এমনি অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনেছিলি। সাধুবাবা এই চোরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে নন্তর চেহারা বয়স অৰিকল মিলে যাচ্ছে। আর কাউকে অবশ্য এখনও বলিসনি কথাটা। দেখ ও কী বলে?

আর এই অস্ত্রে যদি কাজ না হয়, ওকে বলৰি, বিমানস্যারকে বলে দেব তুই খুনে বৈক্ষনিক পড়ার জন্য নাম লিখিয়ে রেখেছিস। সবাই জানে বিমানস্যার রহস্য ডিটেকটিভ গল্পের ওপর কী ভীষণ খাপ্পা। আর নন্তু ওর বাবাকে যমের মতো ভয় করে।”

পরদিন বিকেলে নদীর ধারে বসে আছে সিরাজ। দেখল যে বাবলু হনহন করে আসছে। বাব সিরাজের কাছে এসেই উৎফুল্ল স্বরে জানাল, 'তুই ঠিক ধরেছিস। তোর প্রথম অস্ত্রেই কেল্লা ফতে। নন্তই হাতিয়েছিল বইখানা। বিমানস্যার বই রেখে দোকানে গিয়েছেন, সেই ফাকে। নন্তু তখন ঢুকেছিল স্যারের পড়ার ঘরে। বইটার চেহারা দেখেই ওর সন্দেহ হয়। বইটা উল্টে দেখে স্বয়ং খুনে বৈজ্ঞানিক। ব্যস তক্ষুনি বইটা নিয়ে সরে পড়ে। বোকে, বাবা এটা ভুল করে এনেছে অন্য বই ভেবে। নন্তু দু দুবার পড়েছ ফেলেছে বইটা।'

‘আমি যখন ইনভেস্টিগেশনে গিয়ে ওর কাছে খুনে বৈজ্ঞানিক হারানো মানে চুরি যাওয়ার কথা তুলি, নন্তু নার্ভাস হয়ে সেদিনই বইটা রেখে দেয় ওর বাবার টেবিলে অন্য বইয়ের ভেতর গুজে। তবে বিমানস্যার খুনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন আরও তিন দিন বাদে।”

‘স্কুলে নন্তুকে জিজ্ঞেস করলি বুঝি? জানতে চায় সিরাজ।

‘হ্যা টিফিনের সময় ধরেছিলাম ওকে। নন্দপুরের সাধুবাবার কথা বলতেই ঘাবড়ে গিয়ে সব কবুল করে ফেলল। জানিস, নন্তু কাল আমায় বদ্যির দোকানের ভেজিটেবল চপ খাওয়াবে বলেছে। মানে ঘুষ আর কি? আমার মুখ বন্ধ করতে। যাতে ওর বাবাকে না বলে দিই বা আর কাউকে। ‘আঁ ভেজিটেবল চপ! শুধু তোকে? আর অ্যাসিস্ট্যান্ট বাদ?

“আরে না না। তোকেও খাওয়াতে হবে বলে রেখেছি। বলেছি, আমি ছাড়া কেবল মাত্র তুই জানিস ব্যাপারটা। তোর মুখও বন্ধ করা দরকার।'

যাক এবার তোর গোয়েন্দাগিরি সাকসেসফুল। উৎসাহ দেয় সিরাজ। ‘ধুৎ। বাবলুর আপশোস, ‘আমি আর ধরতে পারলাম কই? বিমানস্যার ভুল করলেন। আবার নিজেই নিজের ভুল বুঝে বই ফেরত দিয়ে গেলেন। আমার ক্রেডিট কোথায় ?

সিরাজ বলল, “তোর ক্রেডিট আছে বইকি। তুই তদন্তে নেমে নন্তুকে ওই বইটার কথা জিজ্ঞেস না করলে ও ঠিক গা মেরে দিত খুনে বৈজ্ঞানিক। মোটেই বাবার টেবিলে আর ফেরত রেখে আসত না।

‘তা হতে পারে। বাবলু কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হয়।

সিরাজ বাবলুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, আর কেস করে তোর ফিজও মিলল।

“ফিজ? ফিজ আবার, কী পেলাম? বাবলু ভুরু কোঁচকায়।

‘কেন ভেজিটেবল চপ। ওটা অবশ্য লাইব্রেরি কমিটিরও খাওয়ানো উচিত ছিল তোকে। যাকগে এবার ছেড়ে দে। পরে রেট বাড়াস।

‘ঠিক বলেছিস। বাবলু একগাল হাসে।

৭। হাঙর উপদ্রব রহস্য ৯। অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ

Golpa

You may like these posts

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment

Indian Writters

Indian Writers

Bd Writters

ঘোষ বাগানের দানো - অজেয় রায়
Ghosh Baganer Dano by Ajeo Ray

জ্যৈষ্ঠ মাস। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। লাভপুর লাইনের লাস্ট বাসটা সবে পেরিয়েছে।

বাসরাস্তার ধারে শিবপর চায়ের দোকানের ঝাপ আধখানা খোলা। ভিতরে তাসের আসর বসেছে লণ্ঠনের আলোয়। খেলুড়ে চারজন। শিবপদ স্বয়ং। এ ছাড়া ব্রজ দাস, কেষ্ট মণ্ডল ও জটাধর। খেলা চলছে ঘণ্টাখানেক। টুয়েন্টি নাইন। চলবে আরও খানিকক্ষণ।

এই চারটি মানুষেরই বেজায় তাসের নেশা। সন্ধ্যা হতেই বাকি তিনজন এক এক করে জমা হয় শিবপদর দোকানে। উসখুস করে। তারপর খদ্দেরের ভিড় কাটলেই বের হয় তাসের প্যাকেট। দোকানের ঝাপ আধখানা ফেলে চারজন গুছিয়ে বসে ভিতরে তক্তপোশের ওপর। মফস্বল গ্রাম বাংলা। পিচ-বাধানো বাসরাস্তার দু'ধারে বিস্তৃত খেতের জমি, পুকুর, বাগান। কোথাও কাকুড়ে খোয়াই ডাঙা। মাঝে মাঝে এক একটি জনবসতি। ছোট বড় গ্রাম শহর।

গরমকালে রাত আটটার পর বড় একটা খদ্দের জোটে না শিবপদর দোকানে। 'তাসুড়েরা তখন জুত করে খেলায় বসে। শিবপদ তখন ছুটি দিয়ে দেয় দোকানের ছোকরা কর্মচারীটিকে। দু-একজন ছুটকো খদ্দের এলে খেলার মাকেই মালিক

একাই তাদের আপ্যায়ন করে। হয়তো অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে খেলা। ফের শুরু হয়।

শিবপদর বয়স বছর চল্লিশ। তার তালুড়ে বন্ধুরা কাছাকাছি বয়সি। শিবপদর বাড়ি দোকানের লাগোয়া বাসরাস্তার পাশে। এই গ্রামটির নাম নতুনগ্রাম। ছোট গ্রাম। পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বাস। তবে বাস স্টপেজ হিসাবে নতুনগ্রামের গুরুত্ব আছে। এখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণে অনেকগুলো চওড়া মেঠো রাস্তা গিয়েছে দূর দূর গ্রামের দিকে। সারাদিনই এই স্টপেজে রাসযাত্রীর আনাগোনা। শিবপদর দোকান ছাড়াও এখানে আছে আরও একটা ছোট চায়ের দোকান। নতুন গ্রামের ই মুখুজ্যের। আর আছে একটা গমভাঙাই কল। সদ্য খুলেছে। তবে শিবপদর ছড়িা অন্য দুটো দোকানই সন্ধে নামলে বন্ধ হয়ে যায়।

মুলত চা-বিস্কুটের দোকান বটে শিবপদর। তবে সে কিছু মিষ্টি ও নোনতাও বানায়। এছাড়া তার দোকানটা হচ্ছে একটা সাইকেল স্ট্যান্ড। দূর গ্রাম থেকে যারা এখানে এসে বাস ধরে যায় ওদিকে বোলপুর বা উল্টোদিকে নানুর-কির্নাহার-লাভপুর লাইনে, কাজেকন্মে বা দৈনিক চাকরি বা ব্যবসা করতে, তারা অনেকে সাইকেলে এসে শিবপদর কাছে বাইক জমা রেখে যায়। কাজ শেষে বাসে এসে দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে গ্রামে ফেরে। দোকানের গায়ে ছোট এক খড়ের চালার নিচে থাকে তালামারা সাইকেলগুলো।

নিয়মিত যারা সাইকেল রাখে তাদের থেকে কিছু ভাড়া পায় শিবপদ। উপরি আয়। তার কোনো অসুবিধে নেই। কারণ তাসের নেশায় লাস্ট বাসটা অবধি সে তো থাকেই দোকানে। নেহাতই কোনো সাইকেল মালিক না ফিরলে শিবপদ তার গাড়িটা নিয়ে গিয়ে রাখে নিজের বাড়িতে।

নিবম রাত। তাঁসুড়েদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা ও মাঝে সাঝে উচ্চস্বরে কিছু বিতর্ক ছাড়া আর কোনো মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। কখনও কখনও পিচ রাস্তা দিয়ে খুস করে বেরিয়ে যায় মোটর গাড়ি-ট্রাক।

খেলতে খেলতে জটাধর হঠাৎ ঘাড় কাত করে মন দিয়ে কী শোনে। তারপর বলে, কীসের শব্দ হচ্ছে জানি।'' '। অন্যরাও কান পেতে সায় দেয়।

ঝনঝন্। ঘটাং টাং-আওয়াজটা এগিয়ে আসছে দ্রুতবেগে। অসমান মেঠো পথ দিয়ে সবেগে সাইকেল চালিয়ে আসছে কেউ। হরিপুরের দিক থেকে আসছে

শব্দটা। কী ব্যাপার?

ঘ্যাচ। সজোরে ব্রেক কষার আওয়াজ হয় দোকানের ঠিক সামনে। ঝনাৎ করে মাটিতে পড়ল একটা সাইকেল। শিবপদরা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কাপের একপাশের কোন তুলে হুড়মুড় করে ঢুকে টলতে টলতে সটান উপুড় হয়ে পড়ল একজন দোকানের মেঝেতে।।

ভৰা মণ্ডল।

থরথর করে কাঁপছে ভবা। গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। শিবপদরা লাফ দিয়ে এগোয়।

কেউ লাঠি মেরেছে। কিংবা ছুরি। ছেনতাই করেছে ডাকাতে।' ব্রজ নিশ্চিত কণ্ঠে ঘোষণা করে।

“না না। মারেটারেনি। গায়ে রক্ত কই?” জটাধরের প্রতিবাদ—অন্য কিছু ব্যাপার। জল দে শিগগির।

শিবপন তাড়াতাড়ি মগে করে জল আনে। ভবাকে চিৎ করে দিয়ে ওর মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দেওয়া হয়। কিছু একটা ঘটেছে সাংঘাতিক সন্দেহ নেই। তবে দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। 'ভবা মণ্ডল থাকে হরিপুরে।

মাত্র মিনিট দশেক আগে ভবা নেমেছিল লাভপুর লাইনের বাস থেকে। ও বোলপুর শহরে গিয়েছিল। শিবপদর দোকান থেকে তার সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছিল হরিপুর। মুখে জলের ছিটে পেয়ে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলল ভবা। ঘোলাটে নয়নে দেখল শিবপদলের। উঠে বসে। কেষ্ট এক গেলাস জল দিতে ঢকঢক করে খায়। অতঃপর তার গলা দিয়ে ভয়ার্তস্বরে যে কথাটি বেরোয় তা শুনে অন্যরা হতভম্ব।

‘আঁ। ভূত!’ চারজনই চমকে ওঠে, “কোথায়? তক্তপোশে বসে কঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে যে অদ্ভুত ঘটনা বলল ভবা তার

সারমর্ম এই

শিবপদর দোকান থেকে সাইকেলে উঠে হরিপুরের দিকে যাচ্ছিল ভবা। যে রাস্তা ধরে "নের পর দিন গিয়েছে। চিকে জ্যোৎস্নায় দিব্যি দেখা যাচ্ছিল পথ। তাই টলেনি। 'রে বাতাস বইছে। খোশমেজাজে গুনগুন করে গাইতে গাইতে প্যাডেল মারছিল।

মনে ঘুরছে বাড়িতে কিছু কাজের কথা। পদ্মদিঘির পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, সহসা রাতের অন্ধতা ভেঙে কেমন একটা চাপা অদ্ভুত বিকট হাসির আওয়াজ কানে যেতে খাত তুলে পুকুরপাড়ে তাকিয়েই তার আকেল গুড়ুম।

কিছুটা সামনে, দিঘির উচু পাড়ে বিশাল এক ছায়ামূর্তি। অন্তত দু মানুষ লম্বা। প্রকাণ্ড মাথা। চুলের গোছা উড়ছে। দু হাত নাড়তে নাড়তে সেটা নামছে ধীরে ধীরে। পাড় বেয়ে নিচে। নিঃশব্দে। গোটা দেহটা মিশকালো। চলনের ধরনটা অদ্ভুত। ভবা দিঘির ধারে ওইখানে পৌছানোর সময় ঠিক এটা তার ঘাড়ে এসে পড়ত।

ঝপ করে সাইকেলে ব্রেক কষে নেমে পড়েছিল ভবা। বিস্ফারিত চোখে মূর্তিটা দেখেছিল চার-পাঁচ সেকেন্ড। জমে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। ওটা যে কোনো জীবন্ত প্রাণী নয় তার সন্দেহ ছিল না। নির্ঘাৎ ওটা ভূত দানো পিশাচ জাতীয় কিছু। অশরীরী। ভবা অজ্ঞানই হয়ে যেত ভয়ে। কোনোরকমে মরিয়া হয়ে সে সাইকেলটা ঘুরিয়ে উঠে পড়ে ঊর্বশ্বাসে প্যাডেল মারে। কীভাবে, কতক্ষণে যে পৌঁছেচে দোকানে হুঁশ নেই। শুধু মনে হচ্ছিল যে এই বুঝি কারও হিমশীতল আঙুলের মুঠি আঁকড়ে ধরবে তার ঘাড়।

ভবা তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করে যে এক গেলাস জল খান।

শিবপদর চোখাচোখি করে। চারজনের মনে একই প্রশ্ন। এতকাল ওই রাস্তা দিয়ে কত লোক যাতায়াত করেছে রাতবিরেতে কিন্তু ভূত-প্রেতের দেখা পায়নি তো কেউ! ভৰা মলও প্রায়ই ফেরে রাত করে। নেহাত ভিত বলা যায় না লোকটিকে।

‘আমি ভাই ও পথে একা ফিরছি না। মানে আজ রাতে। ভীত কণ্ঠে জানায় ভবা। “তাহলে কী করবে?” শিবপদ চিস্থিত। “এই দোকানেই শুয়ে থাকি রাতে। | ‘বাড়িতে ভাববে না?' ‘তা ভাববে বই কি! কী করা?”

কেষ্ট গজগজ করে ওঠে—ভূত-ফুত সব বাজে। চাদের আলোয় কলা বা খেজুর গাছের পাতা নড়তে দেখে ভুল করেছে। আচমকা দেখলে এমনি মনে হয় অনেক সময়।

'না ভাই, সত্যি বলছি। স্পষ্ট দেখলুম। গাছ-টাছ নয়। এগুচ্ছিল। ভবা কাতরে প্রতিবাদ জানায়।

আসলে কেষ্ট দাস চটেছিল ভবার ওপরে। খেলায় হারছিল কেষ্ট। অল্প কয়েক পয়েন্টে। আর আধঘন্টাটাক খেলা হালে হার মেকআপ করে জিতে যেত হয়তো। ভবা দিল সব ভণ্ডুল করে। হারলে কেষ্টর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আপাতত ভবা যদি এখানে ঠাই গাড়ে তাহলে খেলার দফা গয়া। কেবল ভূতের গল্পই চলবে।

কেষ্ট বলে ওঠে, 'চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। দিঘিটা পার করে দিই।' ‘পোঁছে দিবি?' শিবপদ ইতস্তত করে, 'তবে আর একজন কেউ যাক সঙ্গে। নইলে তোকে একা ফিরতে হবে। জটা যাবি?”

‘নাঃ, যা দরকার?' মুখে সাহস দেখালেও কেষ্টর হাবেভাবে বোধ হল যে জটা সঙ্গে শোল মন্দ হয় না।

“ঠিক আছে, চ। জটাধর নাজি।

পনেলোর মধ্যেই ফিরছি। ফিরে এসে আবার খেলব।' জানাল টে।

জিন রওনা দিল সাইকেল চেপে।

নিট পনেরো নয়। কের ও জটাধর দোকানে ফিরল প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে। কাপতে কাপতে। দুদ্দাড় করে সাইকেল চালিয়ে।

তারা দু'জনেও দেখেছে সেই ছায়া দানবকে। তবে দিঘির পাড়ে নয়। পদ্মদিঘি পাশ কাটিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে গিয়েছিল তিনজনে। অলৌকিক কারও দেখা মেলেনি। কিন্তু হরিপুরের কাছাকাছি গিয়ে তাদের নজরে পড়ে দূরে তালভাঙার খোলা মাঠে এক আচ্ছা বিরাট মূর্তি। যেমন বর্ণনা দিয়েছিল ভরা।

সেই বানোটা ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছিল রুপোলি চাঁদের আলোয়। একবার খনখনে গা শিউরানো হাসির শব্দ শোনা গেল। ওর অট্টহাসি। ক্রমে মুর্তিটা গিয়ে মিলিয়ে

গেল দিঘির দক্ষিণে ঘোষ বাগানের ভিতরে।

বহুক্ষণ কাঠ হয়ে নজর করেছে তিনজন। কিন্তু সেই ভৌতিক দানোর দেখা আর মেলেনি। অবশেষে ভরসা করে দোকানে ফিরেছে কেষ্ট ও জটা। ভবা অবশ্য চলে গিয়েছে হরিপুর।

সেদিন আর তাসের আসর বসল না।

বোলপুর শহর। সাপ্তাহিক বঙ্গবাতরি অফিসে উকি দিল দীপক। পাশে ভবানী প্রেসের কাজ চলছে খটাখট শব্দে। ভবানী প্রেসের মালিক এবং বঙ্গবার্তার সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তার ছোট্ট কামরায় বসেছিলেন নিজের চেয়ারে। মাঝবয়সি শ্যামবর্ণ গাট্টাগোট্টা কুলবিহারীর পরনে ধুতি শার্ট। মাথা ঝুকিয়ে গোল গোল চোখে শুনছিলেন সামনে বসা এক ভদ্রলোকের কথা। দীপক দরজা ঠেলতেই কুপ্রবাবু বলে উঠলেন-“এসো দীপক। তোমার কথাই ভাবছিলাম।' . দীপক ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, ‘আলাপ করিয়ে নিই। ইনি হচ্ছেন শ্রীতারকনাথ ঘোষ। বাড়ি নতুনগ্রাম। আমার বিশেষ পরিচিত। আমাদের বঙ্গবার্তার গ্রাহক। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার। ভেরি ভেরি প্রমিসিং ইয়ংম্যান!

তারকনাথ ও দীপক পরস্পরকে নমস্কার জানায়। বছর পঞ্চাশের ছোটখাটো নিরীহ দর্শন তারকনাথ সসম্ভ্রমে দীপরে পানে চেয়ে কাঁচুমাচুভাবে হাসলেন।

কুঞ্জবিহারী দীপককে বললেন, ‘তারকবাবু কম বলছিলেন জানো? ওদের গ্রামের কাছে সম্প্রতি 'ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। ঠিক উপদ্রব বলা উচিত নয়। আবির্ভাব হচ্ছে। যে সে ভূত নয়। বিরাট সাইজ। দানো বলা যায়। ধারে গছে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে তাকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। কী বলো?'

সব গ্রামেই ওরকম ভূত দেখা যায়। নীরস কঠে দীপকের মন্তব্য। না না। আমাদের গায়ে আগে কখনও ভূত-টুত দেখা যায়নি। এই হপ্তাখানেকের

একদম হঠাৎ। লোকে খুব ভয় পেয়েছে। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান তারকনাথ, হরপুরের পথে কেউ একলা যেতে ভরসা পাচ্ছে না। অনেকে নিজের চোখে দেখেছে কিনা।

‘একটা কাজ কর না দীপক,' বলে ওঠেন কুঞ্জবিহারী, একদিন চলে যাও ওখানে। খোঁজখবর করো। যারা দেখেছে তাদের ইন্টারভিউ নাও। ভূতটার ডেসক্রিপশান। তার বিচরণক্ষেত্রের বর্ণনা। হঠাৎ এই ভৌতিক আবির্ভাবের কারণটা কী হতে পারে? খাস একটা নিউজ হবে। বেশিদূর তো নয়। এখান থেকে বাসে বড়জোর ঘন্টাখানেক। ‘আবার ভূত? পারব না।' দীপকের সাফ জবাব।

‘আহা, তোমার যে এ লাইনে হাতযশ আছে। তাই তো বলছি তোমায়। এরপর সম্পাদক মহাশয় চোখ ছোট করে, পুরুষ্টু ঝোলা গোঁফজোড়াটি নাচিয়ে রহস্যময় সুরে বললেন, 'আর যদি সম্ভব হয় তেনাকে একবার দর্শন করেও আসতে পারো।

"তিনি কি আমায় দর্শন দেবেন? মনে হয় না। তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে দীপক। ‘আহা-হা, ট্রাই করতে দোষ কী? লা ফেভার করলে দেখে ফেলতে পারো। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। স্বয়ং রিপোর্টার দেখেছে। জম্পেশ একখানা স্টোরি হবে বঙ্গবার্তায়।

‘হাঁ।' নাক দিয়ে একটা শব্দ করে দ্বিতীয় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেয় দীপক। তবু ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে না করতে পারে না। হাজার হোক সম্পাদরে অনুরোধ। | ‘বেশ, যাব।' দীপক রাজি। তারপর সে তারকবাবুকে জিজ্ঞেস করে—“কাল থাকবেন গ্রামে?

না। পরশু আসুন, রোববার। জানালেন তারকবাবু। “হ্যা, চলে যাও পরশু,' উৎসাহ দেন কুবাবু, ‘তারকবাবু, দীপকের সঙ্গে ওখানকার লোকের আলাপ টালাপ করিয়ে দেবেন। একটু সাহায্য করবেন।'

রবিবার সকালে চা খেতে খেতে নিজের মনে গজগজ করে দীপক, যত্তসব। বোগা ব্যাপার।'

বছর যোলো বয়সি ভাইপো ছোটন আর তার ছোট বোন ভাইঝি ঝুমা লক্ষ করছিল। দীপককে। হোটন জিজ্ঞেস করে, গ হয়েছে কাকু?”

"আর বলিস কেন?' দীপক গজরায়, কোন গ্রামে ভূত দেখা গিয়েছে, আমাকে তাই কভার করতে যেতে হবে। আরে বাবা, বাংলাদেশের সব গাঁয়ে ঝোপেঝাড়ে আর পুরনো বাড়িতে তো লোকে হরদম ভূত দেখে। এডিটর আমায় পেয়ে বসেছে। বেকার খাটাবে।”

কাকু, আমি যাব। ভূত দেখব।' ছোটন লাফিয়ে ওঠে। ‘কাকু, আমিও যাব। কখনও ভূত দেখিনি। কুমাও নাচে।

‘ভা। ছোটন দাবড়ে দেয় বোনকে, অন্ধকারে উঠোনে যেতে ভয় পায়, আবার ভূত দেখবেন।' ‘হা হা, তুমি কেমন বীরপুরুষ, জানা আছে। ঝুমা দমে না।

দীপক থামায় দু'জনকে, দূর দূর 'ভূত কে দেখবে? রাতে থাকছি না। একটু খোঁজখবর নিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসব।”

কাকু, আমায় নিয়ে চলো না, জায়গাটা দেখে আসি।' ছোটনের আবেদন।

তা মন্দ নয়। ভাবে দীপক। একা একা একঘেয়ে লাগতে পারে। তবু ছোটন সঙ্গে থাকলে দুটো গল্প করা যাবে। সে বলল, 'আচ্ছা চ। বেলা দশটা নাগাদ খেয়েদেয়ে বেরিয়ে

‘কাকু, আমিও যাব।' ঝুমার আবদার।

না। তোমার মাস্টারমশাই আসবেন আজ দুপুরে। আজ থাক। ‘যাও, যাও। হতাশ মা দানাকে ভেচায়, ‘ভুত যখন ঘাড় মটকাবে বুঝবে ঠেলা।” “বিনে ভূত বেরোয় না। বিজ্ঞ ছোটনের মন্তব্য।

বেলা এগারোটা নাগাদ ছোটনকে নিয়ে দীপক পৌছে গেল নতুনগ্রামে। তারবাবুর সঙ্গে দেখা করল। তারকনাথ দীপককে নিয়ে এলেন শিবপদর দোকানে। পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবপদর সঙ্গে। ভবা মণ্ডল তখন ছিল সেখানে। দোকানে বসে দু’জন অন্য গ্রামের লোক তখন বিস্ফারিত নেত্রে গিলছিল ভবার ভূত দেখার অভিব্রতা।

ঘোষবাগানের দানো—এই নামেই খ্যাতিলাভ করেছে ওখানকার অশরীরী সেই দানব ছায়ামূর্তি। যে বিচরণ করে রাতে। ঘোষবাগানের কাছাকাছি দিঘির গায়ে অথবা তাকে দেখা গিয়েছে ঘোষবাগানের পূর্বে তালডাঙার প্রান্তরে।

ঘোষবাগানের সানো বা ভূতের আবির্ভাবে শিবপদর সোনায় সোহাগা। কারণ এর ফলে তার দোকানে বিক্রি বেশ বেড়েছে। পাঁচ গাঁয়ের লোক হাজির হচ্ছে নতুনগ্রাম স্টপেজে। শিবপদর দোকানে বসছে খানিক। আসল উদ্দেশ্য, ঘোষবাগানের দানোর গল্প শোনা। এই সূত্র ধরেই উঠছে নানা লোকের যত শোনা

ও দেখা ভূতুড়ে কাহিনি। যক্ষ রক্ষ পিশাচ দানো মামদো বেক্ষদত্যি পেতনি শাকচুন্নিদের নিয়ে হরেক গা ছমছম দমবন্ধ করা গল্পে দিনভর সরগরম থাকে দোকান। সঙ্গে চা বিস্কুট মিষ্টি নোনতার সদ্ব্যবহারও চলে।

ঘোষবাগানের সানোর প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ভবা মণ্ডলই আসর জমিয়েছে বেশি। কারণ সেই দেখেছে প্রথম এবং তার অবসরও প্রচুর। তাকেই বেশি পাওয়া যায়। শিবপদর দোকানে।

কেট ও জটাধর ব্যস্ত মানুষ। সন্ধের আগে তারা বড় একটা আসতে পারে না দোকানে। আরও একজন ওই দানোকে দেখেছে বটে সচক্ষে। কেতুপুরের ভরত সর্দার। কিন্তু সে চাকরি করে বর্ধমানে। সপ্তাহে একদিন মাত্র বাড়ি আসে। ফলে ভবাই জাঁকিয়ে বসেছে।

ভবা থিয়েটারে পার্ট করত। এলেমটা পুরো কাজে লাগাচ্ছে। যোষবাগানের সানো দেখার গল্প শুরু করলে শ্রোতাদের আর নড়তে দেয় না। প্রায় প্রতিদিনই তার গল্পে রং চড়ছে। ঠান্ডা নিরীহ শিবপদকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। তবে কেষ্ট বা জটাধর হাজির থাকলে সে মোটেই খুশি হয় না। কারণ আসরটা তখন দখল করে নেয় ওরা কেউ। প্রথম ভূত দেখার পর কম্পিত বিপর্যস্ত ভবার উফশাসে দোকানে আগমন দিয়ে শুরু হয় কাহিনি। ভবা তখন কেটে পড়ে।

জনাথের 'অফশোস, ইস, কেন সেদিন গেলাম না ভৰাকে পৌছতে! তাহলে কি এমন অগ্রাহি সইতে হয়। কেউ তাকে পৌঁছে না, ভবা, কেই বা জটাকে পেলে। | শিবপদর অবশ্য এসব গৌরবে মাথাব্যথা নেই। সে শুধু শুনে যায়। কিছু বাড়তি রোজগার হচ্ছে। এতেই সে খুশি।

তবে রাতে হরিপুর যাওয়ার শর্ট কাট রাস্তায় যাত্রী কমে গিয়েছে একদম। আঁধার "মলে কেউ আর ও পথে একলা মাড়ায় না। অন্তত দু-তিনজন একসঙ্গে মিলে তবে যায়। খেলাগান, পথদিঘি, ভালডাঙার ধার দিয়ে-রামনাম জপতে জপতে।

শিবপদর দোকান প্রায় ফাকাই থাকে সন্ধের পর। ফলে দোকানে তাসের আড্রা বসে তাড়াতাড়ি।

শিবপদ কেষ্ট জটাধর ব্রজ-চারজনই নতুনগ্রামের বাসিন্দা। তাই তাদের রাতে ঘরে ফিরতে অসুবিধা নেই। বাস রাস্তার উত্তরে ঘোষবাগান, হরিপুর, কেতুপুর। আর দক্ষিণে নতুনগ্রাম।

তবে অন্য পথে চললেও, রাতে বেরুলে গোটা অঞ্চলের লোকেরই গা শিরশির করে। পথে কোনো ছায়া নড়তে দেখলে বা কোনো বিদঘুটে আওয়াজ কানে গেলেই আঁতকে ওঠে।

কাগজের রিপোর্টার শুনে দীপকের চারপাশে ভিড় জমল। দীপক দোকানে বসে ভবা শিবপদ এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে নোট নিল। নিউজটা বানাতে কাজে লাগবে। তারপর সে বলল, 'ভূতটির বিচরণক্ষেত্রগুলি দেখতে চাই। প্রথমে যাব ঘোষবাগান। আমার সঙ্গে যদি কেউ আসেন দেখিয়ে দিতে--

দোকান তখন প্রায় ফাঁকা। ভবা এবং আরও জনাকয়েক দুপুরে খেতে গিয়েছে ঘরে। তারকনাথ ভিতু মানুষ। দিনেরবেলাতেও তার ঘোষবাগানে ঢুকতে ভয়। আমতা আমতা করে বলল, 'আমার একটু কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে। শিবপন, তুমি যদি ভাই কাউকে দাও ওঁর সঙ্গে!

শিবপদ বলল, “ঠিক আছে, নকুল যাবে। আমার ভাগনে। নকুল, তোর ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছে তো? বেশ। বাবুদের সঙ্গে যা। খোলা মাঠে ঘোরাবিনে বেশি। যা রোদ্র।

নকুল বছর পঁচিশের যুবক। ছিপছিপে শক্ত গড়ন। রং কালো। সুশ্রী হাসিহাসি মুখখানী। পরনে লুঙ্গি ও শার্ট। খালি পা।

নকুলের সঙ্গে চলল দীপক ও ছোটন। শিবপন দোকানে ঝাপ ফেলে খেতে গেল। ‘তুমি কী করো? যেতে যেতে নকুলকে জিজ্ঞেস করে দীপক।

“আজ্ঞে, অনেক কিছু। মুচকি হেসে জবাব দেয় নকুল।

মানে?

‘এই যেমন ফিরি করি। বেলুন, প্ল্যাসটিকের খেলনা, ডুগডুগি, তালপাতার টুপি, হুইসিল-এমনি সব। শীতকালে মেলায় মেলায় ঘুরি। বোলপুর শহরেও যাই।

লটারির টিকিটও বিক্রি করি। মামাকেও সাহায্য করি দোকানের কাজে। বোলপুর থেকে মালপত্তর কিনে আনি দোকানের। চাষের কাজেও হাত লাগাই। বেকার তো। নানা ধান্দা করি।”

লেখাপড়া?'

স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।

কলেজে পড়লে না কেন?

‘অনেক খরচ।' নকুলের মুখ ঈষৎ ম্লান হয়।

দীপক আঁচ করে অভাবী সংসারের সমস্যা। এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। বাস রাস্তা থেকে ঘোষবাগানের দূরত্ব অন্তত আধ মাইল। পথের দু'ধারে বসতি নেই। শুধু চাষের খেত। তখন শস্য নেই মাঠে। এবড়ো-খেবড়ো খটখটে মাঠ। মোষবাগান।

ঠিক পথের ধারে নয়। চলার পথ থেকে প্রায় শ'তিনেক হাত তফাতে। মাঝখানে একটা শুকনো নালার খাত। আর কিছু ধেনো জমি।

পরদিঘির দক্ষিণে প্রায় বিঘে দেড়েক উঁচু জমির ওপর ঘোষবাগান। সেখানে পাঁচটি প্রাচীন আমগাছ এবং দু'টি কাঁঠালগাছ। উঃ, কত আম!” বলতে বলতে ছোটন সাঁ করে একটা ইট ছুড়ল আমল লক্ষ্য করে।

“আঃ, কী হচ্ছে? ধমক দেয় দীপক। তারপর ওপরে দেখতে দেখতে বলে, 'বাঃ, খুব আম হয়েছে! ভালো জাতের মনে হচ্ছে।

‘হ্যা, ল্যাংড়া আর গোলাপখাস। কলমের গাছ। জানায় নকুল। দুটি গাছে মস্ত মস্ত কাঠাল কুলছে প্রচুর।

‘এই বাগানের মালিক কে? প্রশ্ন করে দীপক।

‘মামা। ‘মানে শিবপদবাবু?

“হ্যা।” ঘাড় নাড়ে নকুল। বলে, 'মামার তো চাষের জমি খুব অল্প। এই আম কাঠাল বেচে আর দোকানের আয়ে কোনোরকমে চলে। এই বাগান করেছিলেন

মামার ঠাকুরদা। দিঘিটাও তিনি কাটিয়েছিলেন। তার অবস্থা খুব ভালো ছিল। মামার আসল বাড়ি হরিপুর। মামা ভারি ভালো মানুষ, তাই অন্য শরিকরা জবরদস্তি করে আর ঠকিয়ে নিয়েছে মামার পাওনা বেশির ভাগ সম্পত্তি। মাম তাই রাগ করে নতুনগ্রামে এসে ঘর করেছে। ওই দিঘিটারও ভাগ আছে মামার। সামান্য অংশ। তা দিঘি মজে গিয়েছে। মাছ হয় না। কাটানো হয়নি বহুকাল। মামা মামি, ওদের চার ছেলেমেয়ে, তার ওপর আমরা তিনজন। আমি, মা, বোন। বড় সংসার।'

'তোমার বাবা নেই? 'না। বাবা হঠাৎ মারা যেতে খুব কষ্টে পড়েছিলুম। তখন মামা এনে এখানে রাখল।'

আমগাছ দেখতে দেখতে নকুল বলল, গাছের ফল রাখা কি সোজা ব্যাপার? বড্ড চুরি হয়। এখন পাকার টাইম। এখনই বিপদ বেশি। আগের বছর অর্ধেক আম-কাঠাল চুরি হয়ে গেল। এবার দিনরাত পাহারা দিচ্ছি। দিনে মামার বাগাল ছেলেটা থাকে, রাতে আমি। তবে এ কদিন আর রাতে থাকছি না বাগানে। মানে ভূতের ভয়ে। তাই শুধু দিনে ডিউটি দিচ্ছি।'

বাগানের মাঝে দেখা গেল খড়ে ছাওয়া এক ছোট্ট কুটির। ভিতরে হাত দেড়েক উচু একটা বাঁশের বেথি। চারটে খোটার ওপর গায়ে গায়ে লাগানো বাঁশের কঞ্চি পেতে তৈরি। একটি লোক কোনোরকমে শুতে পারে তাতে। এক কোণে কিছু কাঠকুটো ঘুটে ঘড় জড়ো করা। মাটিতে একটা উনুন বানানো হয়েছে।

উনুনটা দেখিয়ে নকুল বলল, ''রাতের ঘুম তাড়াতে চা বানিয়ে খাই। ওই বেঞ্চিটায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। রাতে একটু করে ঘুমিয়ে নিই, আর জেগে উঠে হাঁক পারি। অভ্যেস করে নিইচি। চোরে ভাববে যে গোটা রাত ঠায় জেগে আছি,' মুচকি হাসে নকুল, তবে ঠিকমতো ঘুম কি আর হয় ? বাগান থেকে বেরিয়ে দিঘির পাড়ে দাঁড়াল তিনজন।

মস্ত দিঘি। এখন অনেকটা বুজে এসেছে। দীঘির মাঝখানে সামান্য একটু জল। বাকিটায় শুকনো কাদা। দিখিতে পদ্মফুল আর নেই। কলমি নটে ইত্যাদি নানারকম শাকে প্রায় ঢেকে

৩২৪ । বৃহস। সমগ্র গিয়েছে দিঘিগর্ভ। পাড়ের ঢালে হলুদ ফুলে ভরা প্রচুর কন্টিকারির ঝোপ। দিঘি ঘিরে অনেকগুলো কলাগাছি আর লম্বা লম্বা নারকেল

গাছ।

দিঘির পাড়ে পাড়ে হাঁটে তিনজন। | সোজা উত্তরে একটা বড় গ্রাম। গাছপালায় ঢাকা। ফাকে ফাকে কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে।

“ওই গ্রামটা কী?” দেখায় দীপক।

‘হরিপুর, জানাল নকুল, 'আর ওই দূরে বাঁ দিকে ওটা কেতুপুর। রাতে এখন লোকে দিঘির পাশ দিয়ে শর্ট কাটে হরিপুর যেতে ভরসা পায় না। তাই কেতুপুরের কাছ দিয়ে গিয়ে। ঢোকে। অনেকটা ঘুরপথে।' | নতুনগ্রাম থেকে চওড়া মেঠো রাস্তাটা ঘোষবাগানের কাছাকাছি এসে দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা শাখা পদ্মনিধিকে পাক খেয়ে চলে গিয়েছে উত্তরে হরিপুর। অন্যটা গিয়েছে উত্তর-পশ্চিমে কেতুপুর।

পদ্মদিঘি আর ঘোষবাগানের পুৰে জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে রুক্ষ পতিত ভাঙা ভূমি। লোকে বলে তালডাঙা। প্রায় মাইল খানেক বিস্তৃত। সেখানে। কোথাও সমতল কঠিন কালচে মাটি। কোথাও বা উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো কঁাকর বালি নুড়ি মেশানো খোয়াই। ওই ডাঙায় কিছু তাল ও খেজুরগাছ ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদ নেই।'

নকুল দেখাল, 'ওই যে দূরে ডাঙার শেষে, বাসরাভার কাছে গ্রাম। ওর নাম ইসলামপুর।'

“এখানে শ্মশান-টশান আছে?' দীপকের প্রশ্ন। “আছে। হরিপুরের শ্মশান আর ইসলামপুরের গোরস্থান। এই ডাঙার সীমানাতেই।' ‘ভূতটাকে ঘোষবাগানের দানো নাম দিয়েছে কেন?' দীপক কৌতূহলী। নকুল বলল, “লোকে ভাবছে যে ঘোষবাগানেই ওর আস্তানা। তাই “আচ্ছা, ভবা মণ্ডল বলছিলেন যে এখানে নাকি একটা খুন হয়েছিল?

‘হা। গত বছর। তালডাঙায় ওইখানে একটা মৃতদেহ পড়েছিল। পুলিশ বলেছিল, লোকটা দাগি ডাকাত। ওর দলের লোকেই নাকি ওকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল এখানে। কয়েকন গ্রেফতারও হয়েছিলতারপর হতে অনেক মাস কেটেছে। কোনো গোলমাল হয়নি। এখন হঠাৎ?

দীপক চারধার দেখল খানিকক্ষণ খুটিয়ে। তারপর বলল, ‘চল ফেরা যাক।' তার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

নতুনগ্রামে ফিরে দীপক ছোটনকে বলল, 'তোকে বোলপুরের বাসে তুলে দিলে, একা ফিরতে পারবি?'' “কেন পারব না। কিন্তু তুমি?'' ভাবছি থেকে যাই এখানে রাতটা।'' বুঝেছি। ভূত দেখবে? ‘একটা ট্রাই করব। কাকু, আনিও থাক। ‘নো। এই বয়সে ভূত দেখার শখে কাজ নেই। শোন, বাড়িতে মানে দাদা-বউদিকে খবরদার বলবিনে আমি কেন এখানে রয়ে গেলাম। ঝুমাকে বারণ করে দিৰি বলতে। বললে কিন্তু কোনোদিন আর আইসক্রিম খাওয়াব না, মনে রেখো।

ছোটন চলে গেল বোলপুর।

দীপক শিবপদকে বলল, “আজ রাতে আমার একটা শোবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন? একটা খাট হলেই চলবে।'

‘এখানে থাকবেন! শিবপদ অবাক। “হ্যা। আজ রাতে একটু বেরোব। যদি আপনাদের ভূতের দর্শন পাই। তারপর তো আর ফেরার বাস পাব না। তাই রাতটুকু কাটাতে

‘এটা কিন্তু মশাই ঠিক হবে না। শিবপদ বাধা দেয়। “দেখুন, আমি রিপোর্টার। এমন রিস্ক ঢের নিয়েছি। আমার নার্ভ বেশ স্ট্রং।'

একটু চুপ করে থেকে শিবপদ বলল, রাত সাড়ে ন'টা-দশটা অবধি আমার দোকান খোলা থাকে। তাস খেলি। তার মধ্যে ফিরলে এখানেই শুতে পারেন। ওই তক্তপোশে। আর যদি দেরি হয় ?' সে ভাবনায় পড়ে। | ব্যস ব্যস। দশটাই যথেষ্ট। তার মধ্যে দেখা পাই ভালো। নইলে ফিরে আসব। সারারাত জাগার ইচ্ছে নেই মোটেই। পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হতে পারে। একটু অপেক্ষা করবেন প্লিজ।

রাত আটটা নাগাদ শিবপদর দোকানে পাঁউরুটি, আলুর দম ও রসগোল্লা খেয়ে দীপক নৈশ অভিযানে রেডি। নকুল বলল তাকে, টর্চ এনেছেন?' “টর্চ? নাঃ। টর্চ কেন? দিব্যি চাদের আলো রয়েছে।'

মানে, চাদের আলোয় তো স্পষ্ট দেখতে পাবেন না। বাগানে দিঘির পাড়ে বড় বড় সাপ ঘোরে। বিষাক্ত গোখরো, কেউটে। তাই বলছি।'

ভূতের ভয়ে না হোক, সাপের কথায় ঘাবড়ে গেল দীপক। আমতা আমতা করে বলল, তাহলে তো বাগানে বা পুকুরপাড়ে না যাওয়াই উচিত। কী বলে? রাস্তা থেকে দেখৰখন। তবু একটা টর্চ থাকা ভালো। জোগাড় করে দিতে পার একটা ?”

‘দেখি। চলে যায় নকুল।

ইতিমধ্যে শিবপদর দোকানে এসে জুটেছে ব্রজনাথ, কেষ্ট ও জটাধর। তাস খেলার। লোভে। জটা উপদেশ দেয়, মশাই সাবধানে ঘুরবেন। ভূত সাপ কেউ ফ্যালনা নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে তাই বলছি। গোয়ার্তুমি করে একটা বিপদ ঘটালে মুশকিলে পড়ে যাব সবাই।'

“না না। সে ভাববেন না। সাবধান হব বইকি।' আশ্বাস দেয় দীপক। নকুল একটা টর্চ এনে দেয়। তবে সেটার আলোর জোর খুব কম।

নতুনগ্রাম থেকে হরিপুর যাওয়ার রাস্তাটা পদ্মণীঘির গা ঘেঁষে গিয়ে যেখানে উত্তরে ঘুরে সিধে গিয়েছে সেই বাকে হাজির হল দীপক। সেখান থেকে দিঘির পাড়, ঘোষবাগান এবং তালডাঙা—এই তিনের অনেকটা অংশ দেখা যায়। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসল সে জুত করে।

ক্রমে চাদ ওপরে ওঠে। শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি। হালকা জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি রহস্যময়। আলোআধারির জগৎ। মেঘহীন আকাশে হীরের কুঁচির মতো ঝকঝকে অসংখ্য তারা।

বাতাস উঠেছে। তাই গরমের ঝাঝটা কমেছে। দিবি আরাম লাগছে ভোলা জায়গায়।

কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে একটি অস্বস্তি ক্রমে বাড়তে থাকে দীপকের মনে। উঃ, চারধার কী নি। শুধু কানে আসে অসংখ্য ঝিঝির তীব্র একটানা ঐকতান। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু শব্দ। রাতে নির্জন পাড়াগাঁ অঞ্চলে সে কম ঘোরেনি। ভয়ও পেয়েছে কখনও কখনও। তেমনি এক ভয় বা অস্থির ভাব যেন বড় বেশি চেপে বসছে আজ।

কোনো সড়সড় মড়মড় আওয়াজ পেলেই দীপক টর্চ ফেলে দেখছে আশেপাশে। ঘোলাটে আলোর বৃত্তয় হাত দশেকের বেশি নজর চলে না।

কতক্ষণ দীপক এমনিভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। বুঝি একটু ঝিমুনি এসেছিল। সহসা একটা আওয়াজে চটক ভাঙে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল বাগানের কাছে দিঘির পাড়ে বিরাট এক ছায়ামূর্তি। কোনো মানুষ অত লম্বা হতে পারে। প্রকাণ্ড মাথা। আবছা চন্দ্রালোকে বোঝা যায়, তার গোছা গোছা চুল উড়ছে বাতাসে। দুলছে হেলছে শরীর। সুদীর্ঘ হাত দুটো নাড়ছে এলোমেলো।

ধীরে ধীরে চলছে মূর্তিটা। ঝোপঝাড়ের গা দিয়ে কিন্তু কোনো শব্দ নেই। একবার একটা আওয়াজ শোনা গেল। অপার্থিব খনখনে চাপা হাসি। যেন হাসছে ওটা। দেখতে দেখতে সেই দানব মূর্তি অদৃশ্য হল ঘোষবাগানের অন্ধকারে।

আরও মিনিট পনেরো বসে রইল দীপক একই জায়গায় কাঠ হয়ে। তারপর উঠে শুটি শুটি হাঁটতে শুরু করে নতুনগ্রামের উদ্দেশে। শিবপদর দোকানের আলো দেখার পর তার যেন ধড়ে প্রাণ এল।

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী টেবিলে প্রচণ্ড এক চাপড় মেরে হুংকার দিলেন—‘কনগ্রাচুলেশনস দীপক। স্টোরিটা ফাসক্লাস হয়েছে। ঘোষবাগানের দানো। হইচই পড়ে গিয়েছে। এ হপ্তায় বঙ্গবার্তার বাম্পার সেল। কত চিঠি পাচ্ছি জানো?

‘চিঠি? কী চিঠি লিখছে?’ দীপক কৌতূহলী। ‘ফর এ্যান্ড এগেনস্ট। কেউ খুব প্রশংসা করেছে লেখাটার এবং রিপোর্টারের সাহসের। কেউ আবার গালমন্দ করেছে। লিখেছে—মিথ্যে। বানানো গপ্পো।

কী বানানো? তেতে ওঠে দীপক। ‘আহা, চটছ কেন? 'তর্ক জমলেই তো নিউজের দর বাড়ে। তবে বিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি। অনেকে খোঁজখবর নিচ্ছে ব্যাপারটার। দীপক বলল, 'আমি কিন্তু আর ওমুখো হচ্ছি না। একবার দর্শনই যথেষ্ট। “না না, তোমার আর যাওয়ার দরকার কী? যার ইচ্ছে হবে সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে, সে নিজে যাক। সম্পাদক ফতোয়া দিলেন।

আরও দিন দশেক কাটল।

এক সকালে ভবানী প্রেসের পিয়ন এসে জানাল দীপককে, ‘এভিটারসাব আপনাকে ডেকেছেন। জরুরি দরকার।'

কী ব্যাপার? দীপক তখুনি ছোটে। সম্পাদকের কুঠরিতে বসেছিলেন নতুনগ্রামের সেই তারকনাথ। দীপক ঢুকতেই

কুঞ্জবিহারী গমগমে গলায় বলে উঠলেন, “শোন হে দীপক, তারবাবু কী বলছেন?' বলে তিনি নিজেই গড়গড় করে কিছু খবর শুনিয়ে দিলেন—

নতুনগ্রামে নাকি 'ভূতের ব্যাপারটা আরও জমেছে। এমনকী বঙ্গবার্তার দৌলতে কলকাতা থেকে একজন রিপোর্টার গিয়েছিল ব্যাপারটার খোজ করতে। খুব গুজব রটেছে।

‘আমি আসার পর আর কেউ 'ভূত দেখেছে?’ দীপক জিজ্ঞেস করে। ‘দেখেনি কেউ। তবে শুনেছে দু'জন। জানালেন তারকনাথ। ‘শুনেছে মানে? হাসি ?”

'হা, হাসি। তাছাড়া বাগানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনেছে জোরে টানা দীর্ঘশ্বাস। কিংবা যেন ফুসছে কেউ। একেবারে ভুতুড়ে আওয়াজ। দুজন একসঙ্গে যাচ্ছিল। শব্দটা কানে যেতেই তারা প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে পালায়।

‘আহা, আসল কথাটাই যে বলা হল না। বাধা দেন কুঞ্জবিহারী, ‘জানে দীপক, এবার ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কী ভাবে?'

‘ওঝা ডেকে কাড়ফোক করা হয়েছে দু'দিন আগে,' বললেন তারকনাথ, 'অনেক খরচা করে মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়েছিল। নামকরা ওঝা। নতুনগ্রামের বলাই আর ইসলামপুরের হাবিব—এই দুই ছোকরাই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল। চাঁদা তুলেছে গায়ে গাঁয়ে। অনেকেই দিয়েছে। হরিপুরের লোকেই বেশি। ওদেরই তো বেশি অসুবিধে হচ্ছিল। ও, ওঝার কি চেহারা! মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। লম্বা চুল। ইয়া জোয়ান। লাল লাল চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোটা। বাজখাই গলা। গায়ে লাল কাপড়, লাল ফতুয়া। মাথায় লাল ফেট্টি।'

'সারা সকাল কত কী যে করল। খুব মন্ত্র আওড়ালো। সংস্কৃত বাংলা হিন্দি। মন্ত্রের কী তেজ। ওহ্। সরষে ছিটিয়ে, গণ্ডি কেটে গেছে ঘোষবাগান, পদ্মদিঘি আর তালডাঙায় যে জায়গাগুলোয় দানোটার ঘোরাফেরা। বলে গিয়েছে যে এবার বাগান ছেড়ে পালাবে বাছাধন।

এই অঞ্চলই ছেড়ে যাবে। অন্য কোথা থেকে তাড়া খেয়ে এসে ঘোষবাগানে আস্তানা গেড়েছিল। বিষম প্রকৃতির দানো ভূত। এখনও কারও ক্ষতি করেনি বটে, তবে কত ঠিক ভবিষ্যতে। অতৃপ্ত আত্মা। হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যায় মানুষের ওপর। যাক, এখন বাঁচোয়া।'

তারপর রেজাল্ট কী? আর ভূত দেখা যায়নি? জানতে চায় দীপক।

'নাঃ। এই দু'দিন তো দেখা যায়নি। অট্টহাসি বা ফোস-ফোসানিও শোনা যায়নি। অবিশ্যি এখনও হরিপুরের শর্টকাট পথে তেমন লোক চলছে না ভয়ে। তাবে দূর থেকে নজর রাখছে।'

দীপক ভুরু কুঁচকে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, আজ হবে না। কাল যাব একবার আপনাদের ওখানে। ব্যাপার স্যাপার দেখতে।

"ভেরি ভেরি গুড', টেবিল চাপড়ালেন কুঞ্জবিহারী, 'নিউজটা ফলো করা উচিত। জানতাম, শুনলে তুমি ঠিক যাবে আবার।' পরদিন সকালে দীপক গেল নতুনগ্রামে। নাঃ, গতকালও রাতে অলৌকিক কিছু দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি।

দিনভর গমগম করছে শিবপদর দোকান। নকুল এক বাঁকে হাসিমুখে জানিয়ে গেল দীপককে, 'স্যার, আর এক মাস এমন চললে মামা একখানা কোঠাঘর তুলতে পারবে। জানেন, ওঝা যেদিন এল দোকানে, লাভ হয়েছে তিনশো টাকা প্রায়। চা টিফিন মিল সাপ্লাই। মামা আর আমার তো কিছু দেখারই ফুরসত মিলল না।'

দীপক যখন ঘোষবাগানে ঘুরঘুর করছে, তখন বাগানের বাইরে দুটি যুবক ফিসফিস করছে। বলাই আর হাবিব।। বলাই বলল, "আপদ তো চুকল। এবার কাজ সারি? হাবিব চিন্তিতভাবে বলল, আর ক'টা দিন যাক। ভিড় কাটুক।' ঘণ্টা দুই সেখানে কাটিয়ে দীপক বোলপুরে ফিরে এল। দীপত্র পরদিন ফের গেল নতুনগ্রামে। দুপুরে।

নাঃ, গত রাতেও দানোর দেখা মেলেনি। কোনো বিদঘুটে শব্দও শোনেনি কেউ। আগের রাতে তিনজন লোক সাহস করে জোট বেঁধে হরিপুরে গিয়েছে দিঘির পাশ দিয়ে শর্ট-কাটে। নিরাপদেই। লোকের ভয় ভাঙছে। | দীপক শিবপদর দোকানে বসে প্ল্যান ভঁজছে যে ওঝার কেরামতি নিয়ে আজ একটা লিখে ফেলব

বোলপুরে ফিরে। এমন সময় বাস থেকে একজন নামল, যাকে দেখে তার পিত্তি জ্বলে গেল।

সমাচারের রিপোর্টার মন্টু। সাপ্তাহিক সমাচারও বোলপুর থেকে প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গবার্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

মন্টু দীপককে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এই যে। এলাম। মন্টুর কাধে ঝোলানো ক্যামেরাটা দেখিয়ে দীপক গভীরভাবে বলল, ভূতের ছবি

'নাঃ। তেমন ক্যামেরা পাচ্ছি কই ?

মন্টু মিচকে হাসে, এই বাগান-টাগানের ছবি নেব। তুমি তো হে ফার্স্ট রাউন্ডটা মাত করে দিয়েছ। দেখি সেকেন্ড রাউন্ডে আমি কিছু করতে পারি কিনা? আজ রাতে এখানে থাকছ নাকি?'

'হম। ঠিক করিনি। তুমি?' ''ভাবছি থেকে যাব।' দীপক কিঞ্চিৎ দ্বিধায় ছিল রাতে থাকবে কিনা? তক্তপোশে শুয়ে মশার কামড় খেয়ে অনিদ্রায় কাটানো মোটেই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। কিন্তু সে তখুনি স্থির করে ফেলে মনে মনে, রাতটা এখানেই কাটাব। যদি কিছু আজ স্পেশাল ঘটে, মন্টু একা লিখে ক্রেডিট নেবে? কভি নেভি।

রাত আটটা নাগাদ শিবপদর দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে দীপক গুটিশুটি বেরিয়ে পড়ে। ঘুরঘুর করে কাছাকাছি। লক্ষ রাখে মন্টু কোথায় যায়।

একটু বাদেই সে দেখল যে মন্টু হরিপুরের রাস্তা ধরে হাঁটা দিল। অর্থাৎ ওই পথের কোথাও বাসে ভূত দেখার তালে আছে। দীপক সে ধারে গেল না। পিচ রাস্তা ধরে খানিক পুবে হেঁটে 'তালডাঙায় নামল। বসল একটা ঝোপের আড়ালে।

নিশুতি থমথমে রাত। তারা-ফুটফুটে আকাশে ঝকঝকে চাদটা প্রায় বালার মতো গোল। রুপোলি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটেছে। দীপকের কানে এল কারও হেড়ে গলার গান। নজর করে দেখল যে একজন আসছে গাইতে গাইতে হরিপুরের দিক থেকে তাড়ভাঙ্গ ভেদ করে।

আগন্তুক গায়ক পল্টুন আলি।

পল্টন কাঠ মিস্ত্রি অর্থাৎ ছুতোর। সে এখানে ছিল না মাসখানেক। হুগলিতে গিয়েছিল কাজ করতে। দু-তিন দিন আগে ফিরোছে, বাড়ি ইসলামপুরে। এসে শুনেছে সব। ঘোষবাগানের দানোর কথা। ওঝা ডাকা—ইত্যাদি এবং হয়তো এবার পালিয়েছে দানোটা।

পল্টনের যাত্রার শখ বেজায়। সে ক্ল্যারিওনেট বাজায় যাত্রাদলে। দেশে ফিরেই সে রিহার্সাল দেওয়া শুরু করেছে হরিপুরে তাদের পার্টির মহড়ায়। রিহার্সাল শেষে ফিরছে এখন।

পল্টনের ভয়-ডর কম। তাছাড়া ভূতের দেখাও মিলছে না কয়েকদিন। সে তাই নিশ্চিন্তে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে আসছে তালডাঙার ভিতর দিয়ে ইসলামপুর যাওয়ার শর্ট-কাট পায়ে চলার পথ ধরে। ঘুরপথেও যাওয়া যায় তালডাঙা এড়িয়ে। তবে কী দরকার অযথা সময় নষ্ট। খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে।

পল্টন যখন ডাঙার মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে এসেছে তখনই দেখা গেল ঘোষবাগানের দানোকে। দিঘির গা বেয়ে নামছে ডাঙায়।

পল্টন প্রথমে খেয়াল করেনি। মশগুল হয়েছিল গানে। সঙ্গের কুকুর শেরুর গরগর্জন শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখেই থমকে দাঁড়াল। শেরু পল্টনের 'ভীষণ ভক্ত। প্রায় সব সময়ে সঙ্গে ঘোরে। জাতে দেশি বটে কিন্তু ইয়া তাগড়া। তেমনি তেজি। কয়েকবার শের পল্টনকে সাবধান করে দিয়ে সাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

পল্টন কয়েক মুহূর্ত ওই নিজনি প্রান্তরে সেই ঘোর কালো চলমান সাক্ষাৎ বিভীষিকাকে দেখে ‘হয়া আল্লা' বলে পিছু ফিরে মারল টেনে দৌড়।

দীপক আবছা দেখতে পেল যে বহুদূরে আর একটি মানুষ গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে পাই পাই করে ছুটে মিলিয়ে গেল নতুনগ্রামের দিকে। ও নির্ঘাৎ মন্টু।

দীপকও উঠে পালাবে ভাবছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সে হাঁ।

পল্টন পালাল বটে কিন্তু পল্টনের বাঘ কুকুর শেরু ঘাউ ঘাউ করে ঢাক ছেড়ে সোজা তেড়ে গেল দানোটার দিকে। আরে মরবে যে কুকুরটা!

এরপর দ্বিতীয় চমক। দীপক দেখল যে ঘোষবাগানের দানো পালাচ্ছে। বুঝি শেরর তাড়া খেয়ে লগবগ করতে করতে। খানিক পিছনে হেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুটে আসছে দীপক যেখানে বসে সেই দিকেই। হঠাৎ দানোটা একটা বেঁটে খেজুরগাছকে জড়িয়ে ধরল। এরপরই শোঁ শোঁ করে একটা তীক্ষ্ণ টানা শব্দ।

অদ্ভুত সেই আওয়াজটা শুনে থমকে গেল শেরু। পরক্ষণে সে বেজায় ভড়কে পিছু ফিরে মারল ছুট। ওর প্রভুর পথেই।

এসব দেখে দীপকের দেহ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। উঠে পালাবে যে সে শক্তিও নেই।

দানোটা তার থেকে মাত্র হাত চল্লিশ তফাতে। তার কেমন ভয় হল যে এখন উঠে পালাতে গেলে ভূতটার নজরে পড়ে যাবে। সে কাঠ হয় দেখে।

দীপক লক্ষ করে যে খেজুরগাছ জাপটানো দানোটা হঠাৎ আকারে ছোট হচ্ছে। ক্রমে ছোট হতে হতে প্রায় মিশে গেল মাটিতে। শো শো শব্দটা তখন থেমে গিয়েছে।

তী'রু চোখে নজর করে দীপক। দেখে, 'ওই খেজুরগাছের তলায় কে একজন নড়াচড়া করছে। কোনো মানুষ। এমন কিছু বড়সড় চেহারা নয় মানুষটার।

প্রচণ্ড কৌতুহলে গুড়ি মেরে এগোয় দীপক নিঃসাড়ে। কাছে গিয়ে ঝপ করে টর্চ মারে লোকটার গায়ে। আজ সে নিজের টর্চ এনেছে।

গায়ে আলো পড়তেই লোকটি চমকে মুখ ফেরায়।।

দীপক থ। এ কী! এ যে নকুল। লুঙ্গি ও শার্ট পরা। সে দুই লাফে গিয়ে নকুলের হাত চেপে ধরে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি? এখানে কী কচ্ছ?'

নকুল অসহায়ভাবে বলে ওঠে, 'স্যার, আলো নেবান প্লিজ। বলছি সব।

দীপক নকুলের হাত ছেড়ে দিয়ে লক্ষ করে, মাটিতে শায়িত বিরাট লম্বা এক দেহ। মানুষের মতো মনে হচ্ছে তবে আকারে যেন দানব। আলখাল্লা জাতীয় পোশাক পরনে। নিথর।

কী এটা?" দীপক প্রশ্ন করে। "আজ্ঞে ঘোষবাগানের দানো। মিনমিন করে নকুল। 'ইয়ার্কি হচ্ছে,' বলেই দীপক টর্চ ফেলে মূর্তিটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকায়।

বীভৎস এক দানব মুণ্ড। কুচকুচে কালো চামড়া। ভাটার মতো লাল লাল চোখ। চিরকুট ধবধবে সাদা রাক্ষুসে দাঁতের সারি। মাথায় চুলের গোছা। গলা থেকে কালো রঙের বিশাল আলখাল্লায় ঢাকা গোটা দেহ।

"প্লিজ স্যার, আললা নেবান।' কাতরে ওঠে নকুল।। দীপক টর্চ নেয় এবং বোঝে নিজের ভুল।

ওটা কোনো মুণ্ড নয়। গাঢ় নীল গোল মস্ত বেলুনের ওপর হাতে আঁকা ভূতুড়ে মুখ। সত্যি চুল নয়। সরু সরু কালো রঙের কাগজের ফালি সাঁটা মাথায়।

দীপক বসে পড়ে চিৎ হয়ে শোয়া মূর্তিটা ঘেঁটেঘুটে টিপেটুপে দেখে। ফিনফিনে আলখাল্লাটার তলায় মনে হল একটা লম্বা মোটা বেলুন। তার ডগায় বাথা মুণ্ড আঁকা বেলুনটা। গলা মানে দুই বেলুনের জোড়ের কাছে কঞ্চির ফ্রেমে আটকানো লম্বা কালো। আলখাল্লাটা। সরু লম্বা দুটো বেলুন বাঁধা রয়েছে কাধের কাছে। যেন হাত। তাদের একটা ফেসে চুপসে গিয়েছে। পা বলে কোনো বস্তু নেই। একটা ভারি লাঠি, চাপানো রয়েছে মূর্তিটার গলার কাছে। 'এ যে বেলুন ভূত?' দীপক স্তম্ভিত। "আজ্ঞে তাই।" কাচুমাচুভাবে সায় দেয় নকুল। 'তুমি বানিয়েছ? 'আরে হ্যা। মানে এই বড়ি আর মাথাটা গ্যাস বেলুনের। তবে হাত দুটো গ্যাসের নয়,

অর্ডিনারি বাতাস বেলুন। আমি তো বেলুন বিক্রি করি। ঘরেই থাকে নানারকম বেলুন। গ্যাস সিলিন্ডারও থাকে।'

'গ্যাস বেলুন তো। তাই এই সরু দড়িটা দিয়ে বেঁধে ধরে থাকি নিচে। নইলে ছাড়লেই মুণ্ডসুদ্ধ জামা পরানো বডিটা হস করে উড়ে যাবে।'

'ও, এই বেলুন ভূত দেখিয়ে তুমি লোককে ভয় দেখাচ্ছ?" 'আর।' নকুল মাথা চুলকায়। 'কারণটা কী?' দীপকের স্বর কঠিন হয়।

'বাধ্য হয়ে স্যার', নকুল করুণ গলায় বলে, 'বাগানের ফল বাচাতে। এই বলাই আর হাবিব দুটো মহা চোর। গত বছর ওরাই সাফ করে দিয়েছিল বাগানে। হাতে-নাতে ধরতে পারিনি অবিশ্যি। তবে খবর পেয়েছি। এবারও দেখছিলাম যে

কেবলই দুটো ঘুরঘুর করছে বাগানে। কাহাতক আর রাত জেগে পাহারা দেওয়া যায়। এরা তাকে তাকে ছিল। এক রাত পাহারা না থাকলে বা বেশি ঘুমলেই ফুল সায্য করবে।

একদিন ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে দুটোরই খুব ভূতের ভয়। তখন আইডিয়া খেলল মাথায়। এক একদিন চুপিচুপি এসে অন্ধকারে বাগানে বসে বেলুনগুলো ফুলিয়ে ভূতটা বানাই। বাগান থেকে বেরিয়ে নিচু হয়ে ওটাকে খানিক উড়িয়ে লম্বা জামাটার আড়ালে আড়ালে দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে হাঁটি। কারও চোখে পড়ে যায়। ভূত-প্রেত দানো ভাবে। বিটকেল হাসি-টাসিও দিই। আবার বেলুন থেকে গ্যাস বেরুবার শব্দেও লোক ভয় পায়। গ্যাস সিলিভারটা বাগানে কুটিরের ভিতর গর্তে লনো থাকে।'

‘আজ দেখলাম যে শয়তান দুটো শলা করছে গোপনে। ভয় হল, আজ হয়তো ফুল চরি যাবে। ভূতের ভয়টা কেটেছে কিনা। তাই আজ 'ভয়টা ফের চাগিয়ে দিলাম। কিন্তু পল্টনের কুকুরটা যা। বেটা সাংঘাতিক। দানো-ফানো মানে না! ভাগ্যিস কামড়ায়নি। ইস্, খেজুর কাটায় লেগে ভূতের পোশাকটা ছিড়ে গিয়েছে। একটা হাত ফেসেছে। 'কিন্তু লোকের যে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে? ধমকে ওঠে দীপক।

আর বড়জোর দিন পনেরো স্যার,' নকুল অনুনয় করে, তার মধ্যে আম-কাঠাল সব নেমে যাবে। তার 'আমি নিজে ফের ওঝা ডেকে আনব। মানে অন্য ওঝা। দেখবেন তার মন্ত্রের জোর। ঠিক দানোটা পালাবে। অন্তত বছরখানেকের মতো।' ফিক করে হেসে ফেলে নকুল।

‘হু। মনে রেখ। নইলে কিন্তু দীপক ওয়ার্নিং দেয়।

‘যে আজ্ঞে।' নকুল ঘাড় নাড়ে।

“মামা জানে তোমার কার্তি?”

‘আজ্ঞে না।' বলেই নকুল হামলে পড়ল দীপকের পায়ে, "প্লিজ স্যার, বলবেন না। কাউকে। তাহলে মারা পড়ব। মামা আর আমার মুখদর্শন করবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' অভয় দেয় দীপক।

নকুল বলল, 'স্যার, এবার এগুলো গুটিয়ে ফেলি।

সে কিছু খুটখাট করে। কয়েকবার শোঁ শোঁ শব্দ হল বেলুন থেকে গ্যাস বা হাওয়া বেরুবার। চোপসানো বেলুনগুলো এবং আলখাল্লা দড়ি ইত্যাদি গুটিয়ে নিয়ে সে ভরল একটা ব্যাগে। তারপর বলল, 'স্যার, এবার তবে যাওয়া যাক। আপনি তো দোকানে যাবেন। আমি একটু ঘুরে বাড়ি ঢুকব লুকিয়ে।”

‘চল। দীপক পা চালায়।

শিবপদর দোকানে পৌঁছে দীপক দেখল যে সেখানে হুলস্থূল চলছে। তক্তপোশে জবুথবু হয়ে বসে আছে শ্রীমান মন্টু। তার গা-মাথা জামা-প্যান্ট সব ভিজে জবজবে। চোখে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। তাকে ঘিরে চারজন তাস-খেলুড়ে তো রয়েছেই, গ্রামের আরও কয়েকজন জুটেছে। সবাই উত্তেজিত সুরে কথা বলছে।

শিবপদর কাছে জানল দীপক, মন্টু নাকি হাউমাউ করে দোকানে ঢুকে আছড়ে পড়ে তক্তপোশে। তারপরই অজ্ঞান হারায়। জলের ঝাপটা দিতে ইশ ফিরেছে। দীপককে দেখে মন্টু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'দেখেছ? উঃ, ডেঞ্জারাস!'

কোনোরকমে হাসি চেপে একবার মাথা ঝাকিয়ে দীপক গম্ভীরভাবে বসল তক্তপোশের কোনায়।

মন্টু কাদো কাদো স্বরে বলে ওঠে, আমার ক্যামেরাটা? কোথায় যে পড়ল? অসহায়। চোখে সে তাকায় সবার পানে। অর্থাৎ কিনা, দয়া করে কেউ যদি তার ক্যামেরাটি উদ্ধার করে এনে দেয়।'

কারও কিন্তু এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দীপক বলল, ক্যামেরা কেউ নেবে না। খুব ভোরে গিয়ে খুজে নিও।' হতাশ মন্টু ধপ করে শুয়ে পড়ল। দীপকের মাথায় তখন দারুণ একটা স্টোরি ঘুরছেঘোষবাগানের দানোর পুনরায় আবির্ভাব। প্রেতদর্শনে সমাচারের রিপোর্টারের নিদারুণ দুর্দশা। তার প্রাণভয়ে পলায়ন। পতন ও মুছা। ক্যামেরা হারানো-ইত্যাদি।

কাল বাড়ি ফিরেই লিখে ফেলবে।

Golpa

চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধন - অজেয় রায়
Chowdury Barir Guptadhon by Ajeo Ray
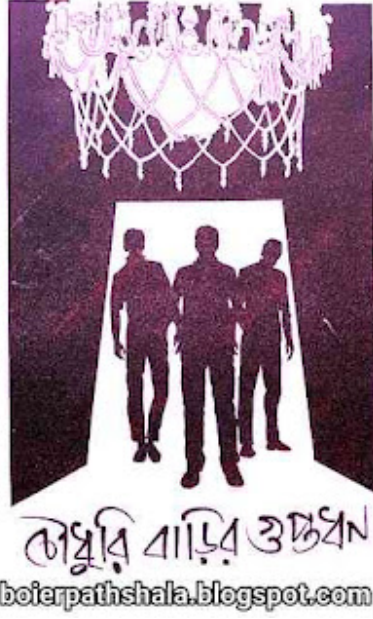
এক

দুপুর প্রায় দুটো। চড়া রোদ। একটা শুড়ি পথ দিয়ে গোপনে শিব চৌধুরির বাগানে ঢুকল। মাথার ওপর বড় বড় গাছের ডালপাতার ঠেসাঠেসি। পথের দুপাশ থেকে ঠেসে এসেছে ঝোপঝাড়আলকুশি, বিছুটি, বুনোকুল। এইসব গাছের ডালপাতা লাগলে গা ছিড়ে যায়, চুলকায়, জ্বলে। শিবের হাতের একটা ধারালো কাস্তে। বিপজ্জনক গাছের ডাল সমেত পড়লেই এক কোপে উড়িয়ে পথ সাফ করে। বিষাক্ত সাপ কম নেই এখানে। হাতে তাই অস্ত্র থাকা ভালো।

বৈশাখ মাসের গোড়া। ঝোপঝাড় কম। বর্ষা এলে এ পথে যাওয়াই যায় না। চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামল শিব। চারপাশে কয়েকটা মোটা মোটা গাছের গুড়ি খাড়া উঠেছে। তাদের মাঝে মাটিতে বুনো ঝোপ প্রায় নেই। খানিকটা গোল জায়গা সান বাঁধানো। মাঝে ছোট পাথরের বেদি। তারই ওপর পা গুটিয়ে বসে শিব তাকাতে থাকে চারধারে।

আঃ কী সব গাছ! আম, কাঁঠাল, জামরুল, সবেদা, নারকেল—কী নেই! সব সেরা জাতের।

আমই আছে অন্তত পাঁচরকম। এমন ল্যাংড়া এই তল্লাটে আর নেই। প্রায় দশ বিঘা এলাকা জুড়ে বাগান।

মাঝখানে বিশাল চৌধুরি বাড়ি। চারধারে ইটের পাঁচিল ছিল। এখন সে পাঁচিলের অনেক অংশই ভাঙা। যেকোনো দিক দিয়েই ঢোকা যায় বাগানে, বাড়ির এলাকায়।

বাড়ির পশ্চিমে আর উত্তরে ফলের গাছ বেশি। দক্ষিণে, দেউড়ির ফটক অবধি রাস্তার দু'ধারে ছিল বাহারে ফল পাতার গাছ।

নরনারায়ণ চৌধুরি এই অট্টালিকা ও বাগান তৈরি করেন-বীরভূম জেলায় ময়ুরাক্ষী নদীর পাশে এই গ্রামে। একশো বছরেরও বেশি আগে। চৌধুরিরা তখন এই অঞ্চলের জমিদার। রমরমা অবস্থা। বাগানের শখ চৌধুরিদের সবারই। দূর দূর দেশ থেকে গাছ এনে লাগানো হত। কিন্তু এখন অবস্থা পড়ে যেতে বাগানের আর যত্ন হয় না। ছোট বড় বুননা গাছ বেড়ে উঠেছে। নতুন চারাও আর লাগানো হয় না। আজ চৌধুরিদের জমিদারি গিয়েছে। ধান জমিও আছে ছিটেফোটা মাত্র। তবে চৌধুরিরা এখনও এই বাগানটা আঁকড়ে রেখেছে।

দোতলা চৌধুরি বাড়িটা দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাক দিয়ে। বাগানের মতোই তার অবস্থা আজ জীর্ণ। দেয়ালের পলেস্তারা খসেছে। দরজা জানলার রং উঠে গিয়েছে। সারি সারি জানলার কপাট বন্ধ—কোনোটা বা ভেঙেও গিয়েছে।

লোকজনের সাড়া মেলে না। মনে হয় বুঝি কেউ থাকে না।

ভূতুড়ে বাড়ি। শুধু অজস্র পায়রা, শালিক, টিয়াপাখির ডাকে মুখরিত। তবু লোক আছে।

পঁচাত্তর বছরের কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরি। তাঁর বিধবা কন্যা ও দুটি ছেলেমানুষ নাতি নাতনি এবং তাদের কাজের লোক বৃদ্ধ তারাপদ। এই বিরাট অট্টালিকার মধ্যে ওই গুটিকয়েক মানুষ কীভাবে দিন কাটায় কেউ তার খবর রাখে না। ওপরে তাকায় শিব। আম আর লিচুর ভারে ডাল নুইয়ে পড়েছে। এখন কাচা।

একটা আম নুন দিয়ে চাখব নাকি? লোভ হলেও ইচ্ছেটা দমন করে শিব। বুড়ো কেষ্ট চৌধুরি বেজায় বদরাগী। বাগানের ফলে কাউকে হাত দিতে দেয় না। বাগানে লোক ঢুকলেই তেড়ে যায়। তবে এখন ঘোর দুপুর। বুড়ো নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে।

অবশ্য শিব ইচ্ছে করলেই পকেট ভর্তি আম নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়তে পারে। চৌধুরিমশাই টেরটি পাবে না আসল অপরাধী কে?

গাঁয়ে এমন কোনো রসাল গাছ নেই যার ফল শিব চেখে দেখেনি। যার ডালে সে ওঠেনি। এ জন্য বাড়িতে নালিশও হয়েছে কয়েকবার। বাবার কাছে শাস্তিও পেয়েছে।

তবে ক্লাস টেনে ওঠার পর শিব নিজেই এই ফল-টল চুরি কমিয়েছে। নিজেকে এখন সে বড় বড় ভাবে। সামনের বছর স্কুল ফাইনাল দেবে। দোষ করলে বাবার হুকুমে কান। ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেই সব চেয়ে তার মানে লাগে। বিশেষত সাত বছরের ছোট বোনের চোখের সামনে। তার চাইতে বরং ঘা কতক দিয়ে দিক আড়ালে, তাও সয়। | ইস, দেবুটা এল না। চৌধুরি বাগানে ঢুকতে ও চায় না। দেবুর প্রপিতামহ মানে ঠাকুঁদার বাবা ছিলেন চৌধুরিদের নায়েব। কিন্তু এখন চৌধুরিদের সঙ্গে দেবুদের বিশেষ বনিবনা নেই।

ডালে ডালে শিবের নজর ঘুরছে। খুঁজছে কাঠবেড়ালির ছানা। অনাথ একটা কাঠবেড়ালির বাচ্চা পুষেছে। কী সুন্দর। কেমন তার সারা গায়ে ঘুরে বেড়ায়। ক্লাসে অবধি নিয়ে আসে। তাই শিব হন্যে হয়ে খুঁজছে কাঠবেড়ালি। আজ রবিবার, ছুটির দিনে সেই খোজে এসেছে।

কচি বাগদী বলেছে, চৌধুরি বাগানে সে কাঠবেড়ালির বাচ্চার ডাক শুনেছে।

কিছু কিছুকিছু—একটা মোটাসোটা লেজফুলো কাঠবেড়ালি মুখে কী জানি নিয়ে সামনে আমগাছটার একটা ফোকরে ঢুকল। তারপর বেরিয়ে এল। ফের কিছুক্ষণ বাদে সে খাবার নিয়ে ঢুকল গর্তে। খাবার রেখে বেরিয়ে এল। নির্ঘাৎ ওই গর্তে ওর বাচ্চা আছে। খাবার দিয়ে আসছে।

শিব কান পাতল। কিন্তু কাঠবেড়ালির বাচ্চার ডাক বুঝতে পারল না। কচির মতো কান নেই তার। ওরা ঠিক ধরে। বার কয়েক ব্যাপারটা লক্ষ করে উঠল শিব। আম গাছটা বেয়ে

চড়তে শুরু করল তরতর করে। ফোকরটা বেশ উঁচুতে। লক্ষ্যে পৌঁছনো তত সহজ হল না। মাঝামাঝি যেতেই ছুটে এল ধেড়ে কাঠবেড়ালি। মা-বাবা হবে বোধহয়। গায়ের রোয়া ফুলিয়ে দাঁত খিচিয়ে কী তার গর্জন! দিল বুঝি কামড়ে। এই সঙ্গে কোথেকে জুটল কয়েকটা কাক। বোধহয় বাসা আছে গাছে। কা কা না করে মহা শোরগোল তুলল তারা। সে বেরিয়ে যায় মাথার পাশ দিয়ে। মতলব ঠোকরাবার।

শিব একটু একটু করে ওঠে আর হাত ছুড়ে ভয় দেখিয়ে আক্রমণ ঠেকায়। গর্তে কাছাকাছি পৌঁছেছে।

হঠাৎ-

এই ছোঁড়া, গাছে উঠেছিস কেন? নাম্ শিগগির।—হুংকার শুনে চমকে শিব দেখে নিচে। স্বয়ং কেষ্ট চৌধুরি। মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। চৌধুরিমশায়ের গায়ে ফতুয়া, খাটো ধুতি, পায়ে শুড়তোলা চটি। মাথা জোড়া টাক চকচক করছে। ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল। নাকে ভোললা গোল চশমার ওপর দিয়ে কটমট করে শিবের দিকে তাকিয়ে আছেন। এককালে সুপুরুষ ছিলেন। এখন শরীর ভেঙে গেছে—শীর্ণ কুঁজো।

হাতে বেতের লাঠিটা উচিয়ে আবার হুংকার ছাড়লেন চৌধুরি—নাম বলছি বদমাইস কোথাকার। আম চুরি ? দেখাচ্ছি মজা।

খানিক হতভম্ব হয়ে থাকে শিব। একবার ভাবল কিছুটা নেমে গুড়ি থেকে এক লাফে মাটিতে পড়ে মারবে দৌড়। তারপর ভাবল, আমি তো আর চুরি করতে আসিনি। বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। ভালোভাবে চলে যেতে দেবে।

খুব ভদ্র ভাবেই জানাল শিব,—আজ্ঞে, আমি আম পাড়তে আসিনি। কাঠবেড়ালির বাচ্চা খুঁজছিলাম।

ফের মিথ্যে কথা, গর্জন ছাড়েন চৌধুরি : গাঁয়ের ছেলেগুলো সব গোল্লায় গিয়েছে। বাপ মায়ের শিক্ষা নেই। লেখাপড়ার বালাই নেই। কেবল টো-টো আর চুরি চামারি।

কথাটা গায়ে লাগল। শিব দৃঢ়স্বরে বলল, "আজ্ঞে আমি পড়াশোনা করি। ক্লাস টেন-এ পড়ি। আর বলছি তো আমি আপনার আম চুরি করতে আসিনি।

তবে রে আবার তক। তোকে আজ পুলিশে দেব। বল তোর বাপের নাম কী?—চৌধুরি আগুন হয়ে লাঠি নাড়িয়ে শাসাতে থাকেন কান ধরে নিয়ে যাব তোর বাপের কাছে।

শিব দেখল বেগতিক সত্যি থানা পুলিশ হলে বা বাবার কাছে নালিশ গেলে তার দুর্ভোগ,আছে। তার কথা হয়তো বিশ্বাস করবে না কেউ। সে সুড়সুড় করে নেমে

আট দশ হাত ওপরে থাকতে মারল লাফ। মাটিতে পড়েই দে ছুট। রে—রে-করে কয়েক পা তেড়ে গেলেন চৌধুরি। কিন্তু ও ছেলেকে ধরা তার কম্ম নয়। শিবের কানে পিছন থেকে ভেসে এল কিছু কটুবাক্য।

চৌধুরির চোখের আড়াল হয়ে শিব গতি কমিয়ে হনহনিয়ে চলল হেঁটে। রাগে তার মাথা ঝা ঝা করছে। এর শোধ নিতে হবে।

উঃ! শিব দত্তকে কখনও এমন অপমান সইতে হয়নি—আর কিনা স্রেফ বিনা অপরাধে। আজ রাতেই সে চৌধুরি বাগান সাফ করে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে কেষ্ট চৌধুরি ঠিক তাকেই দায়ী করবে। তার বাড়িতে নালিশ জানাবে। হাজার হোক চৌধুরি মশাই মানা লোক। তার বাবা বেজায় চটে যাবেন।

দেবুকে চাই। হ্যা, দেবু, তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। শিবের সঙ্গে পড়ে। দেবু শান্তশিষ্ট। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়, শিবের মতো ডানপিটে নয়। কিন্তু দেবুর দুষ্টবুদ্ধি দারুণ। বাইরের কেউ না জানুক শিব জানে। ও কতবার লোককে জব্দ করেছে, কেউ টেরটি পায়নি।

শিবের মাথা গরম। বুদ্ধির প্যাচের চেয়ে তার হাত চলে বেশি। কিন্তু এই জায়গায় তা করে লাভ নেই। চৌধুরি মশাইকে জব্দ করতে হবে অন্য কোনো উপায়ে। দেবু ঠিক জুতসই কিছু বাতলাবে।

দুই

কী রে পাগলের মতো চললি কোথায়? – দেবুর গলা শুনে শিব থমকে দাঁড়ায়। দেখে, অশ্বথ গাছের গোড়া ঘিরে বাঁধানো গোল বেদিটায়, গাছে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে দেবু। হাতে একটা বই। ছায়ায় বসে বই পড়ছে।

-তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বলল শিব।

কেন? - শিবের চোখ মুখের ভাব দেখে দেবু বলল: বস্ বস্। কী হয়েছে?

খোলা বইয়ের ভাঁজে একটা শুকনো অশ্বত্থ পাতা রেখে চিহ্ন দিয়ে মুড়ে রাখল দেবু। শিব একনজরে দেখল বইয়ের মলাটটা—ভয়ংকর দাঁত বারকরা বিরাট এক সাপের ছবি। নাম-পদ্মরাগ বুদ্ধ। নির্ঘাৎ কোনো অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য গল্প। দেবু এইসব গল্পের পোকা। কোথেকে যে জোটায়!

বেশি গল্পের বই পড়লে বাড়িতে আপত্তি করে। তাই ছুটির দিনে লুকিয়ে এইখানে পড়ছিল। বইটা চেয়ে নিয়ে পড়তে হবে। এসব বই পড়তে তারও খুব ভালো লাগে। তবে সময় করে উঠতে পারে না বেশি।

বেদিতে বসে ফোস ফোস করে নিঃশাস ছেড়ে শিব বলল, “ওই কেষ্ট চৌধুরি।

-কেন? কী হল? শিব গড়গড় করে বলে যায় তার হেনস্তার কাহিনি। সব শুনে দেবু বলল, হু।

—হহু, মানে?

—মানে ভদ্রলোককে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—আলবাৎ। কিন্তু কীভাবে?

—দেখি ভেবে। ব্যস শিব নিশ্চিন্ত। সে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। দেবু গম্ভীর মুখে ভাবতে বসে। ভূতের ভয় দেখাব?

—ধড়মড় করে উঠে বলল শিব। -কীভাবে?

—রাতে ওর বাড়িতে ইট পাটকেল ছুড়ব। সাদা কাপড় জড়িয়ে বাগানে ঘুরব রাতে, বিকট ডাক ছাড়ব নাকি সুরে।

নীরবে ঘাড় নাড়ল দেবু, গাঁয়ে হইচই হবে। ধরা পড়ে যাবি। হতাশ হয়ে ফের গড়িয়ে পড়ে শিব।

পেয়েছিস কিছু?—লাফিয়ে উঠল শিব।

—মাথায় এসেছে একটা। আচ্ছা চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের ব্যাপারটা শুনেছিস?

– শুনেছি বইকি। কেষ্ট চৌধুরি নিজেই তো জাক করে বলেছেন কতজনকে। আমার কাকার কাছেই বলেছেন একদিন। চৌধুরিদের এক পূর্বপুরুষ নাকি ওই বাড়িতে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন। সেটা খুঁজে পেলেই ফের ওদের অবস্থা ফিরে যাবে। যত গুলতাপ্পি।

নারে, গুল নয়। হয়তো সত্যি।দেবু বলে: বিষ্ণু চৌধুরি, মানে এই কৃষ্ণ চৌধুরির বাবা নাকি লুকিয়ে রেখেছিলেন অনেক ধনরত্ন। দেশভ্রমণে গিয়ে তিনি হঠাৎ মারা যান। বাড়ির কাউকে বলে যাননি সেই গুপ্তধনের হদিশ। আমার কর্তাবাবা মানে ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন বিষ্ণু চৌধুরির নায়েব। তিনি হয়তো জানতেন খোজ। কিন্তু বিষ্ণু চৌধুরি দেশভ্রমণে যাওয়ার মাস খানেক বাদে তিনি হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে গত হন। তিনিও এ বিষয়ে কিছু বলে যেতে পারেননি। বাড়িতে এসব গল্প কিছু কিছু শুনেছি। গায়ে অনেকেই দেখেছি, বিশ্বাস করে এসব কথা। ঠিক আছে, এটাকেই কাজে লাগাব। এখন যা। আজ দুপুর তিনটের সময় আসিস। তাল পুকুরের ধারে, তেঁতুল গাছটার নিচে। তখন ফাইনাল হবে।

তাল পুকুরের পাশে ঝকড়া তেঁতুল গাছটার নিচে শিব দুটো থেকেই হাজির। জায়গাটা একদম নির্জন। শুধু দু-একটি বউ-ঝি বাসন নিয়ে আসছে মাজতে। দূরে কয়েকটা রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে। গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে শুয়ে শিব আকাশ পাতাল ভাবে, কী কৌশল ভাবছে দেবু? কিছুই সে আঁচ করতে পারে না।

হেলতে দুলতে দেবু এল ঠিক তিনটেয়। বসল গাছের নিচে। হল?—শিবের আর তর সয় না।

জবাব না দিয়ে দেবু জামার বুক পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে শিবের হাতে দিয়ে বলল, “দেখ।

কাগজখানা খুলে তাকিয়ে শিবের ভুরু কুঁচকে গেল। এ আবার কী! এক্সারসাইজ খাতার সাদা পাতায় অদ্ভুত কিছু নকশা। কালি দিয়ে আঁকা। তার মুখ দিয়ে বেরল,-ধুস।

ভালো করে দেখ। কিছু বুঝতে পারিস?—দেবুর স্বর গম্ভীর।

এবার খুঁটিয়ে নজর করল শিব।—পাতা জোড়া চৌকো দাগ। তার ভিতর এক কোণে আধ ইঞ্চি লম্বা ছোট্ট এক আয়তক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্রের নিচে লেখা—বাগানঘর। চৌকো দাগের চারপাশে, চারটি অক্ষর—উ দ পু প। একটা সরু জোড়া দাগ চৌকোর মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত গেছে। চৌকোর ভিতরে কতগুলো একই ধরনের ছবি ছাতার মতো। তার ভিতর কিছু কিরিকিরি দাগ। শিব বুঝল গাছ। তার ছোট বোন এইভাবে গাছ আঁকত।

চৌধুরি বাড়ির নকশা নাকি? চৌধুরিদের বাগানের কোণে একটা মস্ত ভাঙাচোরা ঘর আছে। বাসের অযোগ্য। ওটার নাম নাকি বাগানঘর। সরু জোড়া দাগ বোধহয় ফটক অবাধ রাস্তার চিহ্ন। ছাতার মতো গুলো বোধহয় বাগানের গাছ। যদিও সবকটা একই রকম দেখতে। উ দ পু প মানে নিশ্চয় উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম। দুটো গাছের ডালপালা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। তাদের একটার নিচে লেখা—আম। অন্যটার নিচে লিচু।

আমগাছটার এক জায়গায়, দুটো ডালের জোড়ে লাল কালি দিয়ে ছোট্ট গোল আঁকা। এই দুই গাছের মাঝে একটা সোজা দাগের যোগ। দাগের গায়ে লেখা : ৪০। নকশার নিচে দুটো ইংরিজি অক্ষর-v.c.। বুঝছিস কিছু?—দেবু জিজ্ঞেস করে।

—মনে হচ্ছে নকশা। চৌধুরি বাগানের।

—আর কিছু?

গুপ্তধনের নকশা নাকি?

তাই মনে হচ্ছে? বাঃ! তবে তো মার দিয়া কেল্লা! গুপ্তধনটা কোথায় আছে ধরতে পারছিস?

নকশাটা আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে শিব বলল,- এই লাল গোল চিহ্নে। মনে হচ্ছে এখানে—তাই বোঝাচ্ছে।

কারেক্ট। ব্যস, তোর যা মনে হচ্ছে অন্যদেরও তাই হবে।

—কিন্তু এই নকশা বানাল কে?

—আমি। -কেন?

—দেখতেই পাবি। আচ্ছা আমাদের পলাশপুরে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামায় কে কে? মানে, কথাটথা বলে এই নিয়ে?

কেন রে?

—মাথামুন্ডু বোঝ না শিব।

—আহা বল না ছাই।

বলছি পরে কারণটা। একটু ভেবে শিব বলল,-মদন দাস। —হুঁ, চলবে। লোকটার টাকার খাই আছে। আর?

—শ্রীপতি চাটুজ্যে।

—উহু, চলবে না। বেজায় কুঁড়ে। মোটে উজুগি নয়। কেবল চণ্ডীতলায় বসে আড্ডা মারে। তারপর?

-বাঁকা ঘোষ। একদিন কাকার কাছে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের গপ্পো করছিল।

—বেশ, বেশ। লোকটা ধান্দায় ঘোরে, চলবে। আর? আর নাম চট করে মনে আসে না শিবের।

রেগে গিয়ে বলে,-হেঁয়ালি রাখ। তোর মতলবটা কী?

গাঁয়ের লোককে গুপ্তধনের নকশা গছাব। মানে যারা এর লোভ ছাড়তে পারবে। —ঠিক খুঁজবে। -তোর এই নকশা দেখে লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

দূর বোকা, তাই কী করে। বিশ্বাস করবে এমন নকশা দেখাব। আমার বাড়িতে পুরনো আমলের অনেক বই খাতা কাগজ আছে। সেই কত্তা বাবার আমলের। নিচের তলায় একটা গুদাম ঘরে আছে। এক আলমারি ভর্তি বই—বাংলা, ইংরিজি ও সংস্কৃত ভাষায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, পুরাণ কত রকম বই। গল্পের বইও আছে। আর আছে কত্তা বাবার নিজের হাতে লেখা কয়েকখানা খাতা। লাল কাপড়ে মোড়া এত্তবড় খেড়োর খাতার সাইজ। তাতে কবিতা, মজার ছড়া, ধাঁধা, গুরুগম্ভীর রচনা, গান কত কী লেখা। কয়েকটা খাতায় আছে হিসাবপত্র। আলমারিতে চার পাঁচ সেট বাঁধানো পুরনো পত্রিকাও আছে—বঙ্গদর্শন, সখা আর মুকুল পত্রিকা। একটা বড় কাচের দোয়াত আর দুটো পালকের কলম আছে। ওই খাতা থেকে সাদা পাতা কেটে নেব। তাতে নকশা আঁকব খাগের কলম দিয়ে। সেই নকশা রেখে দেব জালায় চালের ভিতর। কিছুদিন থাকলে কালির দাগ খুব পুরনো মনে হবে—পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যাবে। শুনেছি এইভাবে দলিল জাল করে পুরনো বলে চালায়। সেই নকশা দেখলে কারও আর সন্দেহ থাকবে না।

—কিন্তু এতে লাভ?

—হবে, হবে, দেখবি। মাসখানেক টাইম নেব। তদ্দিনে আমটাম ভালোই পাকবে। চৌধুরি বাড়িটা একটু লুকিয়ে দেখে খোজটোজ নিয়ে নকশা বানাব। তুই বরং গোপনে খবর নে, কে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের কথা খুব বিশ্বাস টিশ্বাস করে।

দেবু বলেছে বটে কিন্তু ব্যাপারটা যে কী দাঁড়াবে এবং তাতে চৌধুরিমশায়ের উপর কীভাবে শোধ নেওয়া যাবে শিবের মাথায় বিশেষ ঢুকল না। আর বেশি জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয় না। দেবু চটে যাবে। তাকে বুদ্ধ বলবে।

কিন্তু একটা কৌতুহল যে না মিটলেই নয়,—আচ্ছা এই দুটো গাছের মাঝে দাগের গায়ে চল্লিশ লেখা। মানেটা কী? দূরত্ব।বলল দেবু। —চল্লিশ ইঞ্চি, ফুট না গজ? —সেটাই তো রহস্য। কেউ জানে না। শুনে শিব হাঁ। তারপর আমতা আমতা বলে, ‘‘আচ্ছা নকশার নিচে এই ইংরিজি অক্ষর দুটোর মানে?

ভি এবং সি। অর্থাৎ ইংরিজি বানানে বিষ্ণু চৌধুরি নামের প্রথম দুটো অক্ষর। অর্থাৎ এই নকশা যে স্বয়ং বিষ্ণু চৌধুরি বানিয়েছেন তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

তিন

সকাল প্রায় সাতটা। মদন দাস তার বাড়ির সামনে বসে বিড়ি খাচ্ছেন।

বছর চল্লিশ বছর। খাটো কৃষ্ণবর্ণ কুমড়ো গড়ন। খালি গা। লুঙ্গি পরা। গলায় কষ্টি। দাড়ি-গোঁফ চাঁচাছোলা। তেল চুকচুকে পাট করা চুল। সবাই জানে মদন দাস মহাজনা কারবারে বেশ দু পয়সা করেছে। বেজায় কিপটে।

শিব রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মদন দাসের সামনে থমকে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করল। তারপর মদন দাসের কাছে গিয়ে ডাকল, মদন কাকু।

-কীরে? আতিক হারু পাত্র দু মাস সুদ ঠেকায়নি। হারুর বাড়ির ওপর নজর রেখে বসে ছিলেন মদন দাস। হারু বেরলেই আজ ধরতে হবে। হারুর দরজা থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিলেন মদন দাস।

এই একটা জিনিস। মানে লেখা। মানে পেয়েছি। ঠিক বুঝছি না। ভাবছিলাম কাকে দেখাই। শিব জামার বুক পকেট থেকে দু-ভাজ করা একটা বিবর্ণ কাগজ বের করে এগিয়ে দেয়।

বেশ বিরক্ত হলেন মদন দাস। আঃ, এ ছেলেটা আবার কেন জুটল? এখন হারুর বেরুবার টাইম। নেহাত দত্ত বাড়ির ছেলে। তাই স্রেফ হাঁকিয়ে দিতে পারলেন না? আড়চোখে হারুর বাড়ির ওপর পাহারা রেখে বললেন—কই দেখি।

কাগজটা খুলে এক নজর দেখেই চমকে গেলেন মদন দাস। এ কী! খুব পুরনো নকশা মনে হচ্ছে। অদ্ভুত। চৌধুরি বাড়ির নাকি? বাগান ঘর আর কোথায় আছে তাছাড়া? এগুলো কি বাগানের গাছ? আম গাছের ডালে এই লাল গোল চিহ্নটার মানে?

এ-এটা তুই কোত্থেকে পেলি? -মদন দাসের চোখ টিউবলাইটের মতো জ্বলতে শুরু করেছে।

—আমি পাইনি। দেবু।

—দেবু? মজুমদার? প্রফুল্লদার ছোট ছেলে?

-হ্যা।

—ও কোত্থেকে পেয়েছে?

—ওদের বাড়িতে ওর ঠাকুর্দার বাবা মানে অমূল্যভূষণের অনেক পুরনো কাগজপত্র আছে। তার ভিতরে পেয়েছে। ও কিছু বুঝতে না পেরে আমায় দিল। আমিও তো কিছু বুঝছি না ছাই, মাথা-মুন্ডু। কোনো বাড়ির নকশা নাকি? আচ্ছা চৌধুরি বাগানে একটা বাগানঘর আছে না?

মদন দাস খাড়া হয়ে বসেন। অমূল্যভূষণ! মানে জমিদার বিষ্ণু চৌধুরির নায়েব! বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধন। একি সেই গুপ্তধনের নকশা? হতে পারে।

যখন অমূল্যভূষণ মারা যান বিষ্ণু চৌধুরি তখন বিদেশে। বিষ্ণু চৌধুরি আর ফিরলেন

খবর এল এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। হয়তো তিনি বিশ্বাসী নায়েবের কাছে জমা রেখে গিয়েছিলেন গুপ্তধনের নকশা। এমনি একটা কী বলেছিল বটে। VC. এই অক্ষর দুটোর মানে কী, বিষ্ণু চৌধুরি?

–কিছু বুঝলেন কাকা?

উহু! ভালো করে দেখতে হবে। এটা আমার কাছে থাক। বোধহয় জমি জায়গার নকশা। চৌধুরি বাড়ির হতেও পারে। নাও হতে পারে। তবে আধাখেচড়া কাজ। শেষ করা হয়নি। বলতে বলতে মদন দাস কাগজটা টুক করে লুঙ্গির ভঁজে লুকোলেন। নিতাই আসছে পথ দিয়ে।

শিবের পিঠে হাত বুলিয়ে মদন দাস বললেন, ঠিক আছে, তুই এখন যা। আমি উঠি। কাজ আছে।

মদন দাসের মুখ দেখে, শিব বুঝল, টোপ গিলেছে।

বেলা প্রায় নটা।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে আল পথ ধরলেন বাঁকা ঘোষ। বাঁকা ঘোষের চেহারাটা চোখে পড়ার মতো। বয়স বছর পঞ্চাশ। তালটেঙা। রোগা। কুঁজো। মুখ লম্বাটে। ছোট বক মতো গোঁফের ওপর ঝুলে পড়েছে লম্বা নাকটা। কুতকুতে চোখে ধূর্ত চাউনি। সর্বদা খাটো ধুতি আর হাফশার্ট পরনে। আর শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে হাতে একটা রঙচটা ছাতা। কেউ কোনোদিন ওঁকে সোজা হতে দেখেনি, তাই বাঁকা নামটাই চালু।

বাকা ঘোষের চাষবাস আছে। কিন্তু ওর রোজগারের আসল পথ দালালি এবং লোক ঠকানো। পয়সার গন্ধ পেলে ও পারে না এমন কাজ নেই।

বাকা ঘোষ হাটে চলেছেন। এক ভালোমানুষ চাষি, মেয়ের বিয়ের বাজার করবে। বাঁকা তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, রামপুরহাট বা সাঁইথিয়ার হাট নয়, তোমায় আমি খোদ কলকাতায় নিয়ে যাব। বড়বাজারে। দেখবে কত সস্তায় কেনাকাটা হয়। সস্তায় হতে পারে বটে তবে লাভের গুড় বাঁকা খাবেন। বেচারা চাষির কলকাতায় যাওয়ার হয়রানি হাবে সার। সেই চাযির সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারটা পাকা করার আশায় বাঁকা চলেছেন হাটে।

-জেঠু। ডাক শুনে পিছনে তাকিয়ে বাঁকা দেখলেন, মণিময় দত্তর ছেলে শিব। কখন ছেলেটা পিছু নিয়েছে খেয়াল করেননি। তিনি বললেন, কীরে? কোথায় চললি?

আজ্ঞে, পারুল ডাঙা। জেঠু এই একটা জিনিস। ভাবছিলাম, কাকে দেখাই। আপনাকে পেয়ে গেলাম, ভালোই হল। —শিব বুক পকেট থেকে একটা ভাজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দেয়: এই যে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নকশা নাকি?

যেতে যেতেই হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে এক নজর দেখেই থমকে গেলেন বাঁকা।

কী এটা! খুব পুরনো নকশা মনে হচ্ছে। হু, চৌধুরি বাড়ির। বাগানঘর, পদ্মদীঘি। দক্ষিণের ফটক, সব মিলে যাচ্ছে। এগুলি কি গাছের চিহ্ন? হারে শিব, এটা তুই কোত্থেকে পেলি! - প্রশ্ন করলেন বাঁকা ঘোষ।

আজ্ঞে, দেবুর কাছে। ওদের বাড়িতে একটা গুদাম ঘরে ওর কর্তাবাবা মানে অমূল্যভূষণের আমলে অনেক কাগজপত্র জমে আছে। ও সেখানে পেয়েছে। ও বলছিল, এটা চৌধুরি বাড়ির নকশা হতে পারে। বাগানঘর লেখা রয়েছে। আচ্ছা, এই লাল গোল। দাগটার মানে কী? তার পাশে সাত লেখা কেন? দেবু কিছুই বুঝতে পারছিল না কীসের নকশা। আমি চেয়ে নিলাম।

হুম। বাঁকা ঘোষের মাথায় বিদ্যুৎ খেলল। বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধনের নকশা নাকি? হতে পারে। দেশ ভ্রমণে যাওয়ার সময় নকশাটা বিশ্বস্ত নায়েবের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু চৌধুরির ছেলেগুলো ছিল উড়নচণ্ডী। ওদের মায়ের কাছে নকশা রেখে গেলেও ঠিক তারা বাগিয়ে ফেলত এবং সব উড়িয়ে দিত। জমিদার নায়েব দু'জনেই ফট করে মারা গেলেন। তাই নকশার কথাটা জানল না কেউ। এই লাল কালিতে গোল দাগটা কি গুপ্তধনের হদিশ? ব্যাপারটা দেখতে হবে তল্লাশ করে।

নকশাটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে বাঁকা বললেন, ঠিক বুঝচি না কীসের। পরে দেখব এখন।

চটপট পা চালালেন বাঁকা।

বাঁকা ঘোষের যাওয়ার দিকে মিটমিট করে খানিক তাকিয়ে থেকে শিব খুশিমনে পারুলডাঙা চলল। ওখানে হারুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঘণ্টাখানেক পর ফেরা যাবে। দু'দিন বাদে দেবু রিপোর্ট নিল।

—সব কটা প্ল্যান লেগেছে?

একটা বাদে।-বলল শিব।

—কে?

—ভজহরি মণ্ডল।

—দেখে টেখে ফেরত দিল। বলল, বাজে।

—বেশ ওটা নিয়ে পচা মিস্ত্রিকে ট্রাই করো। পচা না ধরলে মাধাই পাল। আচ্ছা তোর সঙ্গে রতিয়ার ভাব আছে?

—হু, আছে। এই তো গত মাসে দু'জনে মিলে নদীর ধারে জঙ্গলে একটা শজারু মারলাম।

—তোর কথা শোনে রতিয়া ?

—আলবৎ।

-বেশ। রতিয়াকে ডেকে আন্। আজই বিকেলে তেঁতুল তলায় একা।

-কেন? -কথা হলেই বুঝবি। রতিয়া বায়েন-দের ছেলে। শিবের বয়সি। প্রাইমারি স্কুলে দু-জনে কিছুদিন পড়েছে একসঙ্গে। রতিয়া অবশ্য পড়া ছেড়ে দিয়েছে। গরিবের ছেলে। মাঠে খাটতে হয়। গরু চরাতে হয়। পড়াশোনার সময় কোথায় তার। ছেলেটা দুর্দান্ত এবং বাউন্ডুলে। শজারু মারা, বেজির বাচ্চা ধরা—এসব কাজে ওর জুড়ি নেই। আগে শিব ওর সঙ্গে মাঠে ঘাটে কেবল টই টই করত। এখন আর অত মেশা হয় না। তবু নতুন কিছুর সন্ধান পেলেই রতিয়া এসে চুপিচুপি খবর দিয়ে যায়। দু’জনে কখনও কখনও অভিযানেও বেরোয়।'

রতিয়াকে কি কাজে লাগাতে চায় দেবু?

চার

বেলা দু-প্রহর।

সন্তর্পণে চৌধুরি বাগানে ঢুকল মদন দাস। পিছনে পিছনে বছর বারো তেরোর একটি ছেলে। ছেলেটা রোগা টিংটিঙে। পরনে শুধু মালকোচা মেরে পরা একটি গামছা।

মদন দাস তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলেন পশ্চিম ধারের গাছগুলোকে। আম এবং লিচু গাছ দু-সারি। প্রত্যেক সারিতে দশটা গাছ। একটা আম, পাশেরটা লিচু। এইভাবে পোতা। সারির প্রত্যেকটা গাছের দূরত্ব প্রায় সমান।

ফতুয়ার পকেট থেকে গজ ফিতে বার করলেন মদন দাস। নকশায় আছে ডাইনে লিচু গাছ থেকে বাঁয়ে আম গাছের দূরত্ব চল্লিশ।

কিন্তু কী চল্লিশ। ফুট না গজ? ফুটই হবে বলে মনে হচ্ছে। চল্লিশ হাতও হতে পারে, চল্লিশের পাশে আবার দুটো এমন আবছা অক্ষর যে পড়াই যাচ্ছে না।

মদন দাসের ধারণা বিষ্ণু চৌধুরির নকশায় আম গাছের ডালে লাল গোল চিতে অর্থ-ডালের ওইখানে কোনো ফোকরের ভিতর লুকনো আছে গুপ্তধন। এখন ঠিক গাছটাই বের করাই মুশকিল। সত্তর আশি বছর আগের সেই ডালের ফোকর এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে? হয়তো বা বুজে গিয়েছে। দেখে শুনে খুঁজে বের করতে হবে। ইতিমধ্যে আর কেউ পেয়ে গিয়েছে কি? বোধহয় না। তাহলে ঠিক রটে যেত।

কোন আম গাছটা? নকশায় দেখে বোঝার জো নেই। দেখা যাক মেপে। এছাড়া উপায় কী?

এই গুটে, ধর ফিতেটা।

একদিকে মদন দাস, অন্যদিকে সেই ছেলেটা ফিতে ধরে প্রথম সারির আম ও লিচু গাছগুলির মধ্যে দূরত্ব মেপে চলে।

একটা উনচল্লিশ ফুট। আর একটা আটতিরিশ ফুট। এই দুটোই সবচেয়ে কাছাকাছি। অতি প্রাচীন সব গাছ। গুড়িগুলো প্রকাণ্ড মোটা। হয়তো তখন দুই

গাছের দূরত্ব চল্লিশ ফুট ছিল। গুড়ির আয়তন বেড়ে এখন উনচল্লিশ বা আটত্রিশে দাঁড়িয়েছে। আপাতত প্রথম সারির এই দুটো গাছেই চেষ্টা করা যাক।

গুটে, এই আমগাছটায় ওঠ।—হুকুম দিলেন মদন 'দাস। গুটে সুরসুর হাত দিয়ে মস্ত মোটা গুঁড়িটা আঁকড়ে গিরগিটির মত তরতর করে গাছ। বেয়ে উঠতে লাগল। | মদন দাস বললেন, ‘‘দেখ তো গুড়ি থেকে দ্বিতীয় ডালের জোড়ে কোনো ফোকর আছে কিনা?

—অ্যাই! কেরে? হুংকার শুনে আঁতকে উঠলেন মদন দাস। খেয়েছে।

চৌধুরি বাড়ির দোতলায় একটা জানলা ফাক করে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কেষ্ট চৌধুরি!

টপ করে ঝোপের আড়ালে বসে পড়লেন মদন দাস। চৌধুরি মশায়ের চোখ গুটের দিকে। মদন দাসকে দেখেননি।

দিবাকর। এই দিবাকর। আম পাড়ছে। ধর ছেলেটাকে।বলতে বলতে চৌধুরি মশায়ের মুখ জানলা থেকে সরে যায়। বাড়ির ভিতর থেকে হাঁকডাক ভেসে আসে। কেষ্ট চৌধুরি আসছেন নিচে।

মদন দাস উঠে মারলেন দৌড়। ঝোপের আড়ালে গিয়ে পাঁচিল পেরিয়ে ওধারে। তারপর জোর হাঁটা। হাঁপাচ্ছেন। ঘামছেন দরদরিয়ে। কী করে বুঝব খিটকেল বুড়ো ভর দুপুরে না ঘুমিয়ে জানলা দিয়ে বাগান পাহারা দেয়।

গুটে ছোঁড়ার কী হল কে জানে? ধরা না পড়লেই বাঁচি। নাঃ পালাবে ঠিক। বেটাকে আগাম পঁচিশ পয়সা দিয়েছিলাম।—গেল জলে।

রোববার ফের চেষ্টা করা যাবে। ওই দিন সকালে কেষ্ট চৌধুরি হাটে যায়। ফিরতে বেলা হয়। আমি আর ঢুকছি না ভিতরে। বাগানের বাইরে থাকব। গুটেকে গাছে চড়া। গাছের ফোকরে যদি কোনো বাক্স টায় মেলে, নিয়ে এসে দেবে আমায়।

কেষ্ট চৌধুরির চিৎকার কানে এল। আম চোরের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করছেন। মদন দাস ভাবেন, ভাগ্যিস দেখেনি আমায়। গুটেকে ধমকে দিতে হবে,-ধরা পড়লে খবরদার আমার নাম করবি নে বা এই খোজাখুজির কথা বলবি নে। বরং

স্বীকার করে নিবি আম পাড়তে গিছলি। তার জন্যে দু ঘা খেলে সে আমি পুষিয়ে দেব।

অনেক তফাতে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শিব সমস্ত ব্যাপারখানা দেখছিল। এবার সে ছুটল দেবুর কাছে।

মার দিয়া কেল্লা!—শিবের সে কী উল্লাস: ওঃ, চৌধুরি মশাই যা খেপেছিল, যদি দেখতিস। বাগানময় লাঠি ঘুরিয়ে লাফাচ্ছেন আর চিল্লাচ্ছেন। চোর ধরতে না পেরে বেচারি দিবাকরকেই বকতে লাগলেন।

গাছে কে উঠেছিল। মদন দাস?—দেবু জিজ্ঞেস করে।

—দূর ! ওই মোটা গাছে উঠবে কি? ওর বাগাল গুটেকে তুলেছিল। দেবু ঘটনা সব শুনে বলল, -ও আবার ট্রাই করবে। তক্কে তক্কে থাক।

অন্দরমহলের বারান্দায় বসে লণ্ঠন জ্বেলে পড়ছিল তপু। চারদিক একেবারে নিঝঝুম। শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিটিক আর ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নেওয়া পায়রাদের মৃদু ছটফটানির শব্দ।

বাড়িতে সবাই ঘুমাচ্ছে। এক ঘরে দাদু। অন্য ঘরে মা এবং দিয়া। পাশেই তপুর বিছানা। বারান্দায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে দিবাকরদা। বেশি পড়া থাকলে তপু এমনি খাওয়ার পর রাতে বসে পড়ে। সোয়া দশটা। উঃ, চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

তপু ঘরে ঢুকল। টেবিলে বই আর শিখা কমানো লণ্ঠনটা রেখে একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি আসবে কি? জানলাটা বন্ধ করে শুই। নইলে বৃষ্টি এলে ছাঁট ঢুকবে ঘরে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল বাগানে একটা আলোর ঝিলিক। না, বিদ্যুৎ নয়। আবার আলোটা জ্বলছে নিভছে!

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে তপু। বাগান ঘরের ভিতর থেকে আসছে আলোটা। হ্যা তাই। কীসের আলো? কে ওখানে?

তপুর বুক ধড়াস ধড়াস করে। বাগানে ফল চুরি করতে এসেছে কেউ? না, চোর ডাকাত দুষ্টলোক ওখানে আস্তানা গেড়েছে? কী করবে? দাদুকে ডাকবে? নাঃ।

কাল একটা ছেলে আম চুরি করছিল দুপুরে। তাই নিয়ে চেঁচামেচি করে দাদুর ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ভালো ঘুম হচ্ছে না।

—দিবাকরদা। ও দিবাকরদা।। তপুর চাপা ডাকে দিবাকর চোখ খোলে, -কী? কী হয়েছে?

—একবার এসো আমার সঙ্গে।

দিবাকরের বয়েস হয়েছে। এখন চোখে কম দেখে। কানেও ভালো শোনে না। বুকে সাহস কমে নি। সে উঠে পড়ল।

আলো। বাগান ঘরে। ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বলল দিবাকর।

– কেন? কি হয়েছে ওখানে? দিবাকর মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই খারাপ লোক। নইলে জঙ্গলে পোড়ো ঘরে ঢকরে কে এত রাতে। বাইরে কিন্তু তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল,-কে জানে। একটা হাঁক দিই পালাবে।

—কিন্তু দাদু যে চমকে জেগে উঠবে। দাদুর শরীর খারাপ।

‘হু—দিবাকর ভেবে পায় না কী করবে। সদর দরজা খুলে নিচে গিয়ে দুজনে চোর তাড়ানোও খুবই বিপজ্জনক।

গুন্ গুপ—একরকম অদ্ভুত চাপা শব্দ কানে আসে। আবছা আলো দেখা যাচ্ছে বাগান ঘরের ভিতরে।

দিবাকর ভরসা হারায়, বাবুকে ডাকি।

দাদুকে ঘুম থেকে তুলে মোলায়েম ভাবে ব্যাপারটা জানাল তপু। যেন তিনি সহসা উত্তেজিত না হন। যেন কিছুই নয়। তারা এক্ষুনি ব্যবস্থা করছে। তবে চেঁচামেচি হলে দাদু যদি চমকে জাগে তাই ডাকা, বলে রাখা।

বাইরে শান্ত দেখাতে চেষ্টা করলেও কৃষ্ণ চৌধুরি মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। একী উৎপাত। নিশ্চয় চোর। ফল চোর। দিনে সুবিধে না হওয়ায় রাতে এসেছে।

কিন্তু শব্দটা কীসের? বড় অসহায় লাগে তার। একদিন চৌধুরি বাগানে না বলে ঢোকার মতো বুকের পাটা ছিল না কারো? আর আজ? বাড়িতে একটিও সমর্থ পুরুষ নেই।

মা আর দিয়াকেও জাগিয়ে ছিল তপু। যথা সম্ভব অভয় দিল। মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তবে দিয়া এক লাফে জানলায় এসে মহা কৌতূহলে বাইরে দেখতে থাকে।

চোর চোর!—সমবেত কণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার দিল তপু, দিবাকর, দিয়া এবং চৌধুরি মশাই। , অমনি বাগানের আলোটা গেল নিভে। তারপর ঘরের কাছ থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে আলোটা। জ্বলছে নিভছে। দ্রুত সেটা মিলিয়ে যায় চোখের আড়ালে। তপুরা সমানে চেচাচ্ছে। এই বিশাল এলাকার গাছপালা ভেদ করে আর্তনাদ কি বাইরে পৌছবে?

মিনিট পনেরো বাদে কয়েকটা আলো দেখা গেল। কয়েকজন ঢুকল বাগানে। তাদের হাতে টর্চ লণ্ঠন এবং লাঠি-সোটা। দলের সামনে বাঁকা ঘোষ। তার হাতে টর্চ এবং শাবল।

কী হয়েছে?—বাকা ঘোষ চেঁচান। দিবাকর ছাদ থেকে জবাব দেয়, বাবু, বাগানে লোক ঢুকেছিল। আলো ফেলছিল ওই বাগান ঘরে। কীসের শব্দ হচ্ছিল।| সাহস বটে বাঁকা ঘোষের। তৎক্ষণাৎ তিনি একাই সোজা বাগান ঘরের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভিতরে টর্চ ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে জানালেন,—কই কেউ নেই। পালিয়েছে।

আগাছা জঙ্গল ভেদ করে ওই ঘরের মধ্যে ঢোকার ইচ্ছে নেই কারো। সাপখোপ থাকতে পারে। বাইরে থেকেই ভিতরটা দেখা যাচ্ছে বেশ। কেউ নেই ঠিকই।

সদলবলে বাকা ঘরের চারধারে ঘুরে দেখলেন। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। গায়ের বদমাশ ছেলে ফল চুরি করতে এসেছিল। নারকেল বা ডাব কাটছিল বোধ হয়।

—বললেন বাঁকা। অন্যরা সায় দিল।

চৌধুরিবাড়ির কাছে গিয়ে বাঁকা হেঁকে বললেন,—নিচে নামবার দরকার নেই। আমরা দেখলাম খুঁজে কেউ নেই। কিছু হলে চিৎকার দিও। ভয় নেই। আমরা

আছি। চৌধুরি মশাই ঘুমিয়ে পড়ুন নিশ্চিন্তে।

ফিরে যেতে যেতে বাকা ভাবলেন, হতভাগা বুড়ো। রাতেও ঘুমোয় না। দুপুরেও তো জেগে জেগে বাগান পাহারা দেয় শুনেছি। মেঝের এক জায়গায় খোড়া হয়েছে। ওই লাইন। বরাবর আরও গর্ত করতে হবে। ঠিক কোথায় গুপ্তধনটা লুকানো আছে নকশা দেখে বোঝার উপায় নেই। শুধু বোঝা যাচ্ছে বাগান ঘরের মেঝেতে দক্ষিণ দেওয়াল থেকে সাত ফুট তফাতে। আর সাত হাত হলেই গেছি। এবার সাবধানে গর্ত করতে হবে—যেন শব্দ বেশি না হয়। ভাবতেই পারিনি ওই বাড়ি অবধি আওয়াজ পৌঁছবে। মনে তো হল সব নিশুতি! ঈহ বা পাটা যা জ্বলছে। পালাতে গিয়ে ছড়ে গিয়েছে শেয়াল কাটায়।

বাঁকা ঘোষ বলে গেলেন বটে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে কিন্তু সে রাতে চৌধুরি বাড়িতে কারওরই তাড়াতাড়ি ঘুম এল না। আশঙ্কা উত্তেজনায় চৌধুরি মশায়ের মাথাটা দপ দপ করে।

সকালে বাগানে বেড়াচ্ছিলেন কৃষ্ণ চৌধুরি। হঠাৎ মানিক দত্তর মুখোমুখি।

মানিকের বয়স বছর তিরিশ। ছোটখাটো রোগা। সম্পর্কে শিবের দাদা। তবে আলাদা বাড়িতে থাকে। মহা ধড়িবাজ। শিব জানে, বাবা যখন বাড়ি থাকে না তখন এসে মানিকদা তার ভালো মানুষ মায়ের কাছে “কাকিমা কাকিমা” করে নাকি কেঁদে প্রায়ই দু-চার টাকা লুকিয়ে বাগিয়ে নিয়ে যায়। সব বাজে ওজর। নেহাত জানাজানি হলে মা বকুনি খাবে তাই সে বাবার কাছে লাগায়নি। মায়ের কত কষ্টে জমানো পয়সা। শিব তাই দু’চক্ষে দেখতে পারে না ওকে। মানিক দত্ত হেট হয়ে চৌধুরির পায়ের ধুলো নিয়ে বলল,আজ্ঞে ভালো আছেন?

—আর ভালো। বয়স হয়েছে। এবার কোনদিন ভালোমন্দের বাইরে চলে যাব।

হেঁ হেঁ কী যে বলেন। আপনার এখনও স্বাস্থ্য চমৎকার।

তারপর এখানে! কী ব্যাপার? -বাগানে কাউকে ঢুকতে দেখলেই চৌধুরির সন্দেহ হয়।

-এই দেখছিলাম। ওঃ কী বাগান ছিল। আচ্ছা – এই টবগুলোতে কি গাছ ছিল?

যে কাকড় ফেলা রাস্তাটা বাগানের মধ্য দিয়ে চৌধুরি বাড়ি থেকে পাঁচিলের গায়ে গেট অবধি গিয়েছে, সেই পথের ধারে কাছাকাছি তিনটে চীনেমাটির ইটের ওপর বসানো। এখন গাছ নেই, খালি।

গোলাপ ছিল।—জবাব দেন চৌধুরি মশাই।

টবগুলো এখানেই আছে? মানে। আপনি কদ্দিন দেখছেন?

—তা ছোটবেলা থেকে।

ইস, কী দারুণ টবগুলো। কী চকচকে রং। কী দারুণ ডিজাইন। খুব দামি জিনি টবগুলো সত্যি সুন্দর। প্রায় তিন ফুট উঁচু। তেমনি আয়তন। গায়ে গাঢ় নীল নকশা।

চৌধুরি মশাই দেখতে দেখতে বলেন, —হুঁ।

জানেন, লাভপুরে একজন, বিনীতভাবে বলে মানিক: নতুন মস্ত বাড়ি করেছে। টবের গাছে বাড়ি সাজাচ্ছে। আমার কাছে খোজ করছিল পুরনো শৌখিন টব কোথায় পাওয়া যায়। এই টবগুলো দেখে লুফে নেবে। ভালো দাম দেবে। পড়েই তো আছে। দিন বিক্রি করে। বিক্রির নামে অহংকারে লাগলেও একটু চুপ করে থেকে চৌধুরি বললেন, -বেশ।

উৎফুল্ল হয়ে মানিক বলল, তাহলে একটু ধুয়ে মুছে সাফ করে দেখাতে হবে। দেখবেন কি জেল্লা খোলে। এমনি বাইরে পড়ে থাকা অবস্থা দেখলে কি আর এদের আসল রূপ বোঝা যায়। এখানে থাকলে তো ধুয়ে লাভ নেই। ফের নোংরা হয়ে যাবে। তুলে নিয়ে বারান্দায় শেডের নিচে রাখা যাক।

কে রাখবে? আমার লোক নেই।—জানালেন চৌধুরিমশাই।

সে আপনি ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা করব।—বলতে বলতে জড়িয়ে ধরে একটা টবকে তোলার চেষ্টা করে।

হাঁ হাঁ করে ওঠেন চৌধুরি, আহা করছ কী? পড়ে যাবে গড়িয়ে। যাবে ভেঙে। ভীষণ ভারী। আবার মাটি জমেছে ভিতরে। এ তোমার কন্ম নয়।

জামা কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ মানিক বলল,—ঠিক আছে, আজ। বিকেলেই আমি লোক নিয়ে আসব।

এত ইন্টারেস্ট কীসের? চৌধুরি ভাবেন। দাঁও মারবে বোধহয়। তা নিক। টবগুলো কাজে লাগে না। বিক্রি করে যদি কিছু আসে।

আর মানিক দত্ত ভাবে, শিবের দেওয়া নকশা দেখাচ্ছে ঢাকেন গড়ন, মস্ত একটা টবের নিচে পোঁতা রয়েছে গুপ্তধন। কিন্তু কোনটার তলায়? তাই টবগুলো সরানো দরকার।

এমন টব আরও ছিল? জিজ্ঞেস করে মানিক। ছিল আরও দুটো। ঝড়ে গাছের ডাল পড়ে ভেঙে গিয়েছে। —বললেন চৌধুরি।

—আহা-হা। অমন জিনিস। কোথায় ছিল সে দুটো।

—ঠিক মনে নেই—কাছাকাছি ওইখানটায় হবে।

যা বাব্বা! কেস আরও ঘোরালো হল। ভাবল মানিক। এই গাছগুলো কী?--একটা টবের পাশে দেখায় মানিক।

স্পাইডার লিলি।

“বাঃ সুন্দর ফুল। লাগাতে হবে।

-হ্যা। বাল্ব লাগাতে হয়। নিয়ে যেও তুলে। জঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

হেঁ, হে, কী বাগানই ছিল। আর ওই টবটার কাছে ওটা কী ফুল? নেওয়া যায়?

-ওটা টাইগার লিলি। বেশ নিও একটা বাল্ব। বিকেলে সত্যি সত্যি মানিক একজন লোক এনে টব তিনটে তুলে বারান্দায় রাখল।

দিবাকর টব ধুয়ে মুছে চকচকে করল। কিন্তু আর মানিকের পাত্তা পাওয়া গেল না। চৌধুরি ভাবলেন, হয়তো লাভপুরের লোকটা টব কিনতে রাজি হয়নি। | কয়েকদিন বাদে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলেন চৌধুরি মশাই। টবগুলো যেখানে বসানো ছিল সেই তিন জায়গাই খোড়া। ইট সরিয়ে মাটি খোড়া হয়েছে। হাত দুই গভীর। কিন্তু এই তিন জায়গার মাটি খোড়ার কারণ? শুধু

তাই নয়, যে 'টবদুটো ভেঙে গিয়েছে, সেগুলো যেখানে ছিল সেই জায়গাতেও চারটে গর্ত।

চারদিন বাদে কৃষ্ণ চৌধুরির নামে একটা পোস্টকার্ড এল। কালি দিয়ে গোটা গোটা করে লেখা-"মহাশয় চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের সন্ধান চলছে। সাবধান!"

ব্যস, আর কিছু নেই। চিঠিটা লাভপুরে পোস্ট করা। চৌধুরি মশাই চমকে গেলেন। এ চিঠির উদ্দেশ্য? আমাকে খ্যাপানো? উত্তেজিত করা? ঠিক খবর? কে লিখেছে? কথাটা সত্যি হয়ে থাকলে সন্ধানটা করছে কে? কোনো হদিশ মিলেছে কি? বাড়িতে কিছু কিছু রহস্যজনক ঘটনার মূল কারণ কি এই? চৌধুরি ভেবে কূলকিনারা পেলেন না। চিঠির কথা জানালেনও না কাউকে।

পাঁচ

শিব প্রাণপণে খুঁজছে। পথের ওপর চোখ রেখে এক পা এক পা করে চলেছে। তার একটা পাঁচ টাকার নোট কোথায় পড়ে গিয়েছে। ছোটকাকা উপহার দিয়েছিল টাকাটা শিবের জন্মদিনে।

গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে। দুপুরে বাংলা স্যারের কাছে কোচিং ক্লাস করতে গিয়েছিল শিব। তার ইচ্ছে ছিল ফেরবার সময় কালোর দোকানের বেগুনি খাবে। কিন্তু ফেরার পথে দেখে তাদের ক্লাসের ক'জন ছেলে মাঠে ফুটবল পিটছে। জুটে গেল সেও। বাড়ি ঢোকার একটু আগে মনে পড়ল—টাকাটা? বাংলা বই হাতড়ে দেখল নোটটা নেই। খেলতে নামার আগে নোটখানা পকেট থেকে বের করে বাংলা বইয়ের ভিতরে রেখেছিল। আসতে আসতে বই উল্টো করে ধরেছিল কখন, টাকা পড়ে গিয়েছে।

শিবের মনে ভারি আপশোস। ভেবেছিল পঞ্চাশ পয়সার বেগুনি খাবে আর বাকি পয়সা দিয়ে একটা পেন কিনবে। দাসুর দোকানে একটা চমৎকার পেন দেখে রেখেছে। চার টাকা দাম। মাঠের ধারে পড়লে কি আর পাবে টাকাটা? ঠিক কেউ তুলে নেবে।

উল্টো দিক থেকে একটা ছেলে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণ চৌধুরির নাতি—তপু। নাইনে পড়ে। ফর্সা রোগা সুন্দর দেখতে। ভালোমানুষ স্বভাব। শিব ওকে চেনে। তবে তেমন ভাব নেই। কী খুঁজছ শিবদা? তপু জিজ্ঞেস করল।

—একটা নোট পড়ে গিয়েছে।

—কত টাকার ?

—পাঁচ।

এইটে বোধহয়। —তপু একটা পাঁচটাকার নোট বের করে: পঞ্চানন তলায় মন্দিরের পাশে পড়েছিল।

হ্যা। ওখান দিয়ে এসেছি।

—শিবনোটটা ছিনিয়ে নেয়: এই তো কড়কড়ে, ঠিক আমারটার মতো। ওঃ বাঁচা গেল।

তপুর মুখও খুশিতে ভরে ওঠে। শিব স্কুলের নামজাদা ছেলে। স্কুল টিমের হট ক্যাপ্টেন। দারুণ স্পোর্টসম্যান। তাকে খুশি করতে পেরে তপু কৃতার্থ।

শিব তপুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, - থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ, আমি তো ভাবলাম গোল গচ্চা।

ছেলেটা সত্যি ভালো, শিব ভাবল। আর কারও নজরে পড়লে ঠিক মেরে দিত।

পরদিন শিব তপুকে ডাকল,—চল কালুর দোকানে বেগুনি খেয়ে আসি। আমি তোকে খাওয়াব।

তপু আপত্তি জানায়, না-না।

—আরে লজ্জা কী? তুই টাকাটা খুঁজে দিলি। এ তোর পাওনা।

তবু তপুর সংকোচ। শিব জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

দেবুর সঙ্গেও তপুর ভাব হল। নোটের ব্যাপারটা শুনেছিল দেবু। তপু ছেলেটি ভারি ভদ্র। তবে কেমন মনমরা ভাব। দেবুর কৌতুহল, তপুর কাছে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের ব্যাপারটা জানতে হবে।

কদিন বাদে এক বিকেলে তপুকে নদীর ধারে পেয়ে গল্প করতে করতে দেবু পাকড়ে ধরল। হারে তপু, তোদের বাড়িতে নাকি গুপ্তধন আছে?

তপু শুরু করে:

দাদুর বাবা বিষ্ণু চৌধুরি মারা যান মাত্র চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে। উনিশশো নয়-দশ সাল নাগাদ। খুব বুদ্ধিমান কর্মী পুরুষ ছিলেন। কলকাতায় কলেজে পড়েছেন। রেল কোম্পানিকে পাথর কুঁচি সাপ্লাই করে অনেক টাকা রোজগার করেন। জমিদারি বাড়ান। খুব দেশ ভ্রমণের শখ ছিল তাঁর।

একবার পূর্ববঙ্গে বেড়াতে গেলেন। দু'মাস পরে খবর এল মেঘনা নদীতে ঝড়ে নৌকো ডুবি হয়ে মারা গিয়েছেন। তখন আমার দাদুর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। দাদুর ওপরে দুই দাদা, তিন দিদি। যাওয়ার সময় দাদুর বাবা নাকি তার স্ত্রীকে বলে যান —কিছু সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছি। যদি আমার কিছু হয়, মানে যদি না ফিরি, নায়েব মশাই তা বের করে ভাগ করে দেবেন। উনি জানেন কোথায় রেখেছি।

লুকিয়ে রাখার কারণটাও বলেন। এর কিছুদিন আগে চৌধুরি বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা . হয়। যদি ফের ডাকাতি হয়। যদি ডাকাতরা সিন্দুক ভাঙে। যাতে সর্বস্বান্ত না হতে হয় তাই এই ব্যবস্থা। তখন নায়েব ছিলেন শ্রী অমূল্যভূষণ মজুমদার। দাদুর বাবা ওঁনাকে বড় ভাইয়ের মতো দেখতেন। নিজের স্ত্রী পুত্রের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করতেন।

অমূল্যভূষণ আমার কর্তাবাবা। মানে ঠাকুর্দার বাবা। খুব পণ্ডিত বিচক্ষণ লোক ছিলেন। বলল দেবু।

ঠা শুনেছি। বলল তপু: কিন্তু দুঃখের বিষয় দাদুর বাবা দেশ ভ্রমণে যাওয়ার মাসখানেকের মধ্যে নায়েব মশাই হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলে যাননি। দাদুর বাবার দুঃসংবাদ আসার পর সেই লুকোনো ধনরত্নের অনেক খোজাখুজি হয় কত। পাওয়া যায় নি। আজও পাওয়া যায়নি। দাদুর দুই দাদা ছিলেন বেজায় খরচে বিলাসী। তাদের জন্যই জমিদারি নষ্ট হল। জমি জায়গা বিক্রি হয়ে গেল। শেষে তারা সম্পত্তি টাকাকড়ি ভাগাভাগি করে নিয়ে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। শুধু দাদুই পড়ে রইলেন এখানে।

তোরা এখানে এলি কেন?—জানতে চায় দেবু: আগে কোথায় ছিলি?

তপু বলল, নানুর ওখানে। বাবা মারা যাওয়ার পর কাকারা খুব খারাপ ব্যবহার করছিলেন। তাই দাদু নিয়ে এলেন।

তোর দাদু কিন্তু বড় রাগী।—বলল শিব।

—আগে এমন ছিলেন না, মা বলে। শরীর খারাপ। অভাব। তাই।

—তোর মামা মামিরা আসে না?

একজনই তো মামা। আমেরিকায় থাকে। ছোটমাসি থাকে কলকাতায়। বড়মাসি কানপুরে। মাসিরা আসে কদাচিৎ, ওই পুজোর সময়। দু-তিন দিনের বেশি থাকে না। এখানে ইলেকট্রিক আলো নেই। অসুবিধা হয়। আচ্ছা তোদের গুপ্তধনের কোনো নকশাটক্সা ছিল?—দেবু জিজ্ঞেস করে।

-কই শুনিনি তো!

পরদিন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে সকাল ন'টার সময় বাড়ি ফিরছিল শিব। পথে তপুর সঙ্গে দেখা। কীরকম উস্কোখুস্কো চেহারা।

শিব বলল,—কোথায় চললি তপু?

অমনি তপু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। শিব থ, কী হয়েছে? চোখ মুছে তপু বলল,—দাদুর ভীষণ শরীর খারাপ।

—কী হয়েছে?

—খুব মাথায় যন্ত্রণা। ছটফট করছে। কাল রাতে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। তাই নিয়ে ---

—আঁ চোর!

-হা বৈঠকখানা ঘরে। ও ঘরের দেওয়ালে তিনটে হরিণের শিং টাঙানো আছে। মাথাসুদ্ধ শিং। বেশ উঁচুতে। তারই একটা ফেলেছিল। শব্দে আমরা জেগে যাই। খুব হইচই হয়। তারপরই দাদু অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিংটার পাশেই দেওয়ালে একটা মৌচাক হয়েছে। হয়তো মৌমাছির আক্রমণে শিংটা ফেলে দেয় চোরে। খুব মৌমাছি উড়ছিল ঘরে।

চোর! নির্ঘাৎ পচা মিস্ত্রি! ভাবল শিব। ওর নকশায় আছে বৈঠকখানায় হরিণের মাথার ভিতরে গুপ্তধন। তবে ঠিক কোনটার ভিতরে বোঝননা নেই।

তপু বলল,—দাদুর শরীরটা কিছুদিন ধরেই ভালো যাচ্ছে না। সারাদিন জেগে বাগান পাহারা দেয়। আবার এমনি সব কাণ্ড। একটুও রেস্ট হয় না। তোর দাদুর বড় বাগানের-বাই। কেউ ঢুকলেই যা তেড়ে আসেন।—শিব খোচা দিল।

আসলে দাদুর হাত প্রায় খালি। ওই বাগানের আয়ে মানে ফল বিক্রি করে আমাদের অনেকখানি সংসার খরচ ওঠে। দিবাকরদা বুড়ো হয়েছে। চোখে ভালো দেখে না। ওকে দিয়ে পাহারা হয় না। তাই দাদু নজর রাখে। আমরা বারণ করলেও শোনে না।

–এখন কোথায় যাচ্ছিস?

মদন দাসের বাড়ি। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়েছেন, লাভপুর থেকে আনতে হবে। হাতে একদম পয়সা নেই। মা একটা কানের দুল দিল সোনার। মদন দাসের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নেব। তারপর ওষুধ কিনতে যাব।

তপু চলে গেলে শিবের ভারি কষ্ট হল। ইস, ওর দাদুর যদি কিছু হয়, ভেসে যাবে বেচারিরা!

নাঃ! এই উৎপাত থামাতে হবে। কিন্তু কী করে?

দেবু শিবের মুখে সব শুনে বলল, সত্যি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। এবার এই উৎপাত থামানো দরকার। চৌধুরি মশায়ের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—কিন্তু কীভাবে?

—দেখি ভেবে। গাংডাগোলের কেস।

' —যদি গিয়ে সবাইকে সিধে বলি, মজা করছিলাম, —ওসব বাজে নকশা?

—তোর পিঠের ছাল তুলে নেবে। সব গিয়ে তোর বাড়িতে নালিশ করবে। বুঝবি। ঠেলা।

তা বটে।—শিব মুষড়ে পড়ে।

একটু ভেবে বলল দেবু, – ঠিক আছে একটা দিন টাইম দে। হ্যা একটা কথা মনে পড়ল। আমার সেই পিসতুতো দাদা, সেই যে গত বছর পুজোয় এখানে বেড়াতে এসেছিল। তিনদিন ছিল। কলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে কাজ করে। মাস তিনেক আগে আমায় একটা চিঠি দিয়েছিল। ওর এক বন্ধুর কিউরিওর ব্যবসা আছে। মানে পুরনো আমলের শৌখিন জিনিস কেনাবেচা করে। পিন্টুদা লিখেছে—চৌধুরিরা তো পুরনো ফ্যামিলি। ওদের বাড়িতে তেমন পুরনো জিনিস আছে কিনা খোঁজ নিতে। যেমন—ঝাড়লণ্ঠন, কাচ পাথর, চীনামাটির পাত্র, মূর্তি, ফার্নিচার, নকশা ভোলা কথা এমনি সব জিনিস। যদি চৌধুরিরা বিক্রি করতে রাজি থাকে পিন্টুদার বন্ধু এসে জিনিস দেখবে। পছন্দ হলে ভালো দাম দিয়ে কিনবে। এতদিন এই নিয়ে আমি গা করিনি। তা তপুদের যখন টানাটানি, দেখ না জিজ্ঞেস করে। ওসব জিনিস এখন কি আর কাজে লাগে? পড়ে পড়ে নষ্ট হয়।

রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ।

মদন দাস যথারীতি তার বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে বিড়ি টানছেন। নজর রাখছেন খাতকরা কেউ পেরোয় কিনা। যদি কিছু সুদ আদায় হয়। নইলে অন্তত তাগাদা লাগাব। এমন সময় শিব গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

—কী? কাচুমাচুভাবে শিব বলল, -মদনকাকু সেই নকশাটা, আপনাকে দিয়েছিলাম।

–ও হা। ভুলে গিয়েছি। আর দেখাই হয়নি। দেখব।

দরকার নেই। মানে ওটা বাজে। দেবু রগড় করতে গিয়েছিল আমায়।

অ্যা। মদন দাসের চোখ ছানাবড়া।

আজ্ঞে হ্যা। দেবুটা মহাপাজি। ভেবেছিল আমায় খুব ঠকাবে। ওটা নাকি গুপ্তধনের নকশা। চৌধুরি বাগানের। দেবুই ওটা বানিয়েছে। ভেবেছিল আমি খুঁজে মরব, মানে ওই নকশা দেখে। একটা ডিটেকটিভ বই দেখে বানিয়েছিল নকশাটা। গতকাল বলে কিনা, পেলি গুপ্তধন? যখন শুনল, আমি বুঝতেই পারিনি, আপনাকে দিয়েছি দেখতে, যা দমল না ---- হেঁ হেঁ। আজ নকশাটা ওকে ফেরত দিয়ে বলব—আমার গুপ্তধন চাই না, বরং তুই খুঁজে নে।

মদন দাস গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকে নকশাখানা হাতে নিয়ে এসে শিবকে দিলেন। একটিও কথা বললেন না।

শিব বলল,-ভাগ্যিস আপনি সময় নষ্ট করেননি এটা নিয়ে। আমার ভারি লজ্জা করছিল।

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে মদন দাস বললেন, - আরে দূর! আমার দেখেই সন্দেহ হয়েছিল—বাজে।

শিব এবার চলল বাঁকা ঘোষের উদ্দেশে। রবিবার বাঁকা ঘোঘ হাটে যায়। পথে ধরতে হবে। তারপর মানিক দত্ত এবং পচা মিত্তিরের পালা।

বিকেলে অশ্বথ বেদিতে গিয়ে শিব দেখল, দেবু অপেক্ষায় বসে। তার মুখ নড়ছে। হাতে এক ঠোঙা বেগুনি। শিব যেতেই ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, -নে একেবারে হাতে গরম।

টপ করে একটা বেগুনি তুলে কামড় দিয়ে শিব দু-খানা নকশা আঁকা কাগজ পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল।

দেবু বলল, —আর দুটো?

ধরেছিলাম। দিল না। বলল, হারিয়ে গিয়েছে। ওঃ মানিকদা যা খেকাল না। এই মারে কি সেই মারে। বলে, ইয়ার্কি হচ্ছিল। শাসিয়েছে, আমার বাবাকে বলে দেবে।

উহু, দেবে না।—বেগুনি খেতে খেতে নিশ্চিন্ত মুখে জানাল দেবু। কারণ লোকে তাহলে বুঝে ফেলবে ও কেন টব সরিয়েছে। সবাই হাসবে। ওর প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। এই আর এক রাউন্ড বেগুনি আন। বলেছিলি যে, প্ল্যান সাকসেসফুল হলে খাওয়াবি।

'যাক উৎপাত থামল। শিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু উৎপাতের আরও কিছু বাকি ছিল। শিবু বা দেবু কারওরই সে দিকটা খেয়াল হয়নি।

একটু বাদে তপু এল। দেবু বেগুনির ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "নে। একেবারে হাতে গরম।"

তপু বলল, পুরনো আমলের অনেক দামি শৌখিন জিনিস আমাদের বাড়িতে আছে বইকি। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু দাদুকে বিক্রির কথা বলতে আমার ভয় হয়। এখন জিনিসের ওপর ওর খুব টান। যদি রেগে যান শুনে? উত্তেজনা হলে শরীর খারাপ হবে। ভেবেছি দু-চারদিন বাদে মাকে দিয়ে বলিয়ে রাজি করাব। সত্যি জিনিসগুলো সব নষ্ট হচ্ছে। একে একে হারিয়েও যাচ্ছে।

কী কী আছে? দেবু জিজ্ঞেস করল।

সে অনেক কিছু। কাচ আর পোর্সিলিনের সুন্দর সুন্দর বাটি প্লেট। কাঠের মোমবাতি স্ট্যান্ড—দারুণ কাজ করা। পিতলের বড় বড় পিলসুজ। দুটো মস্ত ঝাড় লণ্ঠন আছে সাজঘরে। কী চমৎকার দেখতে। দাদুর ঘরে সিন্দুকেও অনেক পুরনো জিনিস আছে।

সাজঘর! তোদের বাড়িতে সাজঘরও আছে নাকি? কোথায়? - দেবু প্রশ্ন করে।

–খিড়কি সিড়ির মুখে দোতলায়।

সাজঘর কী?—শিব জানতে চায়।

তপু বলল,—এ ঘরে নানারকম সাজপোশাক থাকত। যেমন, ঘোড়ার সাজ, হাতির সাজ। বাড়িতে অনেক হাতি ঘোড়া ছিল যে তখন, আর থাকত বাড়ি সাজাবার জিনিস শামিয়ানার রঙবেরঙের কাপড়। দেশি বিদেশি ছবি, বাতি, এখন অবশ্য কিছুই প্রায় নেই। যা আছে ছেড়াখোড়া নষ্ট। উৎসবে বাড়ি সাজানোও আর হয় না।

তোদের সাজঘরেও কি এইসব আছে?—শিব জিজ্ঞেস করে দেবুকে।।

—নাঃ। আমাদেরটায় ছিল যাত্রার পোশাক। যাত্রায় লাগে এমন মুকুট, তিরধনুক, তরোয়াল, বর্শা। আমার ঠাকুর্দার দুই ভাই ছিলেন যাত্রা পাগল। এখন অবশ্য ওসব কিছুই নেই। এখন ওটা আমার পড়ার ঘর। তবে নামটা রয়ে গিয়েছে।

—আচ্ছা তপু, তোর দাদুর বাবা মানে বিষ্ণু চৌধুরির হাতের লেখা আমায় দেখাতে পারিস। বাংলায় কোনো চিঠি? কেন?—দেবুর বেখাপ্পা প্রশ্নে তপু অবাক।

-এমনি। দাদুর কাছে আছে হয়তো। কিন্তু—বোঝা গেল এই বিষয়ে দাদুকে বলতে তপুর দ্বিধা হচ্ছে ।

—এই দু-এক লাইন হলেই হবে। তপু একটুক্ষণ ভেবে বলল, কয়েকটা বই দেখেছি। বাংলায় ওর নাম সই করা। —বেশ। কাল আনিস একখানা। একবার দেখব।

পরের দিন তপু একখানা বই দিল দেবুর হাতে। বইটার আসল মলাট নেই। চামড়া দিয়ে চমৎকারভাবে বাঁধানো। বইয়ের নাম—কপালকুণ্ডলা। লেখক-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মলাটের পরের পৃষ্ঠায় বাঁকা গোটা গোটা অক্ষরে সই—শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরি। নামের নিচে তারিখ—১০ই ভাদ্র, ১৩০২। বইয়ের পাতাগুলো 'লালচে হয়ে গেছে।

দেবু সইটা দেখল। বইয়ের পাতা ওলটাল। তারপর বলল, বইটা একদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কাল ঠিক ফেরত দেব।

পরদিন তপুর বই ফেরত দিয়ে দেবু বলল, তপু ঝাড়লণ্ঠন দুটো একবার আমায় দেখাবি?

ওগুলো আনা শক্ত। বড্ড ভারী যে। তপু আমতা আমতা করে।

-না না আনতে হবে না। আমি গিয়ে দেখব। লুকিয়ে দেখে চলে আসব।

আমিও যাব।—শিব দৃঢ়স্বরে জানায়। দেবুর আচরণে সে রহস্যের গন্ধ পায়। কিন্তু লুকোচ্ছে ও।

বেশ। তবে নিয়ে যাব, কাল দুপুরে। -বলল তপু।

সাত

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটল।

নন্দস্যারের কাছে পড়ে ফিরছে শিব। হঠাৎ কানে এল শোরগোল চেঁচামেচি। চৌধুরি বাড়ির দিকে। শিব দৌড়াল।

চৌধুরি বাড়ি পৌঁছে শিব ভ্যাবাচ্যাকা। সাত আটটা হনুমান চৌধুরিদের বাগানে চড়াও হয়েছে। তারা পাকা পাকা আম খাচ্ছে মহা আনন্দে। যত না খাচ্ছে নষ্ট করছে ঢের বেশি। দু-এক কামড় খায় আর ছুড়ে ফেলে দেয়। | গাছের নিচে চৌধুরি মশাই, তপু, দিবাকর। তপুর বোন দূরে দাঁড়িয়ে। তপু আর দিবাকর প্রাণপণে ঢিল ছুড়ছে। চৌধুরি মশাই লাঠি তুলে ভয় দেখাচ্ছেন। চিৎকার করছে সবাই মিলে।

হনুমানগুলো এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফাচ্ছে। ঝাকি দিয়ে আম ফেলছে। কিন্তু পালাবার লক্ষণ নেই। মাঝে মাঝে আবার দাঁত খিচোচ্ছে। আম ছুড়ছে নিচে মানুষদের তাক করে। মজা দেখতে বাগানের বাইরে একগাদা গ্রামের লোক জুটেছে। কিন্তু তারা হনুমান তাড়াতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না।

শিব দেখল, কিছুদূরে ঝোপের আড়ালে চারটে ছেলে -হি হি করে হাসছে। তাদের একজন হচ্ছে রতিয়া। শিব তাদের কাছে গেল।

শিবকে দেখে রতিয়া একগাল হেসে বলল,—দেখ শিবদা কেমন রগড়। ওঃ অদ্দিন তক্কেতকে ছিলেন। কাল খবর পেলেম পাশের গায়ে একপাল হনু এয়েছে। ভোরে গিয়ে তেইড়ে তেইড়ে নিয়ে এইছি। ঠিক তোমরা যেমনটি চেয়েছিলে। কথা রেখিছি। কাঁঠাল খাওয়াতে হবে কিন্তু। শিবের মনে পড়ে গেল, রতিয়ার সঙ্গে তাদের এক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা।

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, এবার তাড়িয়ে দে, বড় ক্ষতি করছে। তোদর কাঁঠাল খাওয়াব ঠিক।

রতিয়া বলল,—তা একটু শিক্ষা হোক। তোমায় অপমান করে। দেখো বুড়োটি কেমন নেত্য করছেন; কিসসু লাভ নেই। রামভক্ত বিছুর জাত। ঢেলা ঘোড়াকে ওরা গেরাহাই করে না। শুধু ভয় এই অস্তরটিকে—রতিয়া তার হাতের গুলতিটা দেখাল।

হা, হা সে সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে। এবার তোরা হনু তাড়িয়ে দে। শিব কাতর অনুরোধ জানায়।

অমনি রতিয়ার দল রে-রে করে বাগানে ঢুকল।

গুলতি দেখামাত্র হনুমানের টনক নড়ল। তারা এগাছ ও গাছ লাফাতে লাফাতে বাগান

পেরিয়ে মাঠে নামল। তারপর লেজ তুলে লম্বা লম্বা লাফে খানিক ছুটে আবার উঠল অন্য গাছে। অদৃশ্য হল চোখের বাইরে। বতিয়ারা ঠায় তাদের পিছনে লেগে রইল। একেবারে গ্রাম পার করিয়ে দিয়ে আসবে বাবাজিদের। দুপুর আড়াইটে। চৌধুরি বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকল তপু, শিব এবং দেবু।

সবাই ঘুমুচ্ছে নাকি?—জিজ্ঞেস করল দেবু।

হ্যা।—তপু উত্তর দেয়।

—তোর দাদু? বাগান পাহারা দিচ্ছেন না?

—সকালে হনুমান নিয়ে হইহই করে দাদুর শরীরটা বেশ খারাপ। ডাক্তারবার এসেছিলেন। একদম রেস্ট নিতে বলেছেন। মা খুব রাগ করেছে। কী দরকার ছিল দাদর নিচে নামার?

সিড়ির মাথার দরজাটা খুলে উকি দিয়ে চারদিক দেখে তপু ইঙ্গিত করল,– এসো। পাশেই সাজঘর। দরজায় কড়ায় ঝুলছে প্রকাণ্ড এক তালা। তপু ফিসফিস করে বলল, —বন্ধ থাকে। আমি খুলে রেখেছি। দাদুর ঘর থেকে লুকিয়ে চাবি নিয়ে।

নিঝুম বাড়ি। টানা টানা বারান্দা। সার সার বন্ধ ঘর। পায়রার ববকুম আর শালিকের ঝগড়ার কিচমিচ আওয়াজ। সাজঘরের দরজার নিচে খানিকটা ভাঙা। দরজা ঠেলতেই শব্দ হল—কাচ।

তিনজনে ভিতরে ঢুকল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল। অন্ধকার ঘর। তপু বাইরের দিকের জানলার কপাট একটু ফাক করে দিল। অল্প আলো ঢুকল ঘরে।

ছোট ঘর। উঁচু ছাদ। দেয়ালে পোঁতা অনেকগুলো মোটা মোটা হক। দুটো হুকের বাঁকানো মাথায় আটকানো অবস্থায় ঝুলছে দুটি মস্ত মস্ত ঝাড় লণ্ঠন। ঘরের কোণে একটা বড় কাঠের সিন্দুক। একধারে স্তুপ করা গাদা রঙিন কাপড়। দেওয়ালে ভোলোনো ফ্রেমে বাঁধাই বড় বড় তিনটে হাতে আঁকা ছবি। কয়েকটা আরশোলা উড়ল ফরফরিয়ে। বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ। দেবু পকেট থেকে একটা টর্চ

বের করল। আলো ফেলতে লাগল ঘরের চারধারে। ঝাড়লণ্ঠনের ওপর আলো পড়তেই ঝকমক করে উঠল। আলো ঠিকরালো স্ফটিকের মণ্ডের মতো দেখতে পলা কাটা কাচের ভাললারে। অপূর্ব দৃশ্য।

দেবু সব দেখছে খুঁটিয়ে। ছাদের কাছে একটা ঘুলঘুলি। দুটো ইট দিয়ে তার ফাক বোজানো। বোধহয় যাতে পাখি না বাসা বাঁধতে পারে। টর্চের আলো স্থির হল ঘুলঘুলির ওপর। তপু একটা মই জোগাড় করতে পারিস? বলল দেবু।

—মই! না কোনো মই নেই দোতলায়।

কেন? –ওই ঘুলঘুলিটা দেখব।

-একটা উঁচু টুল আছে বারান্দায়। ওটায় চড়লে হাত পাওয়া যেতে পারে।

-বেশ চল, নিয়ে আসি। তিনজনে ধরাধরি করে টুলটা আনে। ঘরে ঢোকায়।

টুলে চড়ল দেবু। এক পা টুলে অন্য পায়ে একটা হুকে ভর দিয়ে কোনোরকমে নাগাল পেল ঘুলঘুলির - নে।

দেবু ওপর থেকে পরপর দুটো ইট নামিয়ে দেয়। ধরে শিব। সে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না।

একটা থলি নিল শিব। রেশমি কাপড়ের মাঝারি থলি। সঙ্গে সঙ্গে দেবু লাফিয়ে মেঝেতে নামে। থলিটা শিবের হাত থেকে নেয়।

কী আছে থলিতে? ঝনঝন করছে! বেশ ভারী। ভর্তি।

থলির মুখটা ফাক করে দেবু ভিতরে টর্চের আলো ফেলে। চকচক করে ওঠে গোল গোল হলুদ রঙের চাকতি।

এক মুঠো বার করে এনে চোখের সামনে ধরে দেবু বলল,—মোহর। এ জিনিস আমি দেখেছি। আমাদের বাড়িতে আছে কয়েকটা। উত্তেজনায় তার গলা কাপছে, বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধন। কী করে সন্ধান পেলি এখানে রয়েছে?—চেঁচিয়ে ওঠে শিব।

—একটা নকশা ছিল আলগা কাগজে, আমার কর্তা-বাবার গানের খাতার ভিতরে। তাতে আঁকা, একটা সিড়ি। সিড়ির পাশে একটা ঘর। ঘরের তলায় লেখা: সাজঘর। ঘরের দক্ষিণে দেওয়ালের মাথায় একটা চৌকো দাগ। ব্যস! আর কিছু নেই। ওই নকশাটা দেখেই বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধনের নকল নকশা বানাবার আইডিয়া আমার মাথায় আসে। অবশ্য তখন জানতামও না আসল নকশা কিছু আছে কিনা। যা হোক, কর্তাবাবার খাতার ভিতরে পাওয়া নকশাটা ভেবেছিলাম সেটা কর্তাবাবারই আঁকা। আমাদেরই সাজঘরের নকশা। কিন্তু পরে অন্য সন্দেহ হল। বিষ্ণু চৌধুরির হাতের লেখার সঙ্গে সাজঘর শব্দটা মিলিয়ে বুঝলাম এ লেখা বিষ্ণু চৌধুরির। কর্তাবাবার নয়। যদিও দু'জনের হাতের লেখায় খুব মিল। বুঝলাম এটাই হয়তো আসল গুপ্তধনের নকশা। বিষ্ণু চৌধুরি রেখে গিয়েছিলেন তার নায়েকের কাছে। নাঃ আর কথা নয়। ফোকরে আরও কী কী সব আছে। হাতে ঠেকল। বের করি।

দেবু ফের টুলে চড়ল।

সে এক এক করে নামিয়ে দেয়—প্রথমে একটা বড় কাঠের হাত বাক্স। তারপর আরও একটা রেশমি থলি। ভর্তি। ঝমঝম করে বাজল। মনে হল তাতেও আছে মোহর। এরপর একটা চৌকো ভারী ধাতুখণ্ড।

হাত বাড়িয়েই নিচ্ছে শিব। হঠাৎ তার পায়ের পাতার ওপর শিরশিরানি। কিছু একটা উঠছে। বিছে নাকি?

আঁতকে উঠে পা ঝেড়ে লাফিয়ে ওঠে শিব। ঠাস করে ফেলে দেয় ধাতুখটা। দেবুও চমকালো। তার পায়ের তলা থেকে টুলটা গেল পিছলে। টলে পড়তে পড়তে সে এক লাফে নিচে নেমে আসে। কিন্তু টুলটা কাত হয়ে পড়ল মেঝেয়। জোরে শব্দ হল।

খানিকক্ষণ তিনজনে নিথর। নাঃ বোধহয় শব্দটা শোনেনি কেউ। তপুর দাদুর ঘর দোতলায় বটে, কিন্তু কিছু দূরে।

তারপর বাক্সটা খোলা হল। টর্চের আলোয় দেখা গেল, বাক্স ভর্তি নানারকম সোনার জড়োয়া গয়না। দামি দামি পাথর বসানো। দশ বারোটা হীরে মুক্তো বসানো আংটি। ঝকমক করছে আলো পড়ে। ভারী ধাতুখটা সোনার বাট। অন্তত এক কেজি ওজন।

তপু, এবার তোদের অবস্থা ফিরল। খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল শিব। ক্যাচ।

তিনজনে এত তন্ময় ছিল, যে দরজা খোলার আওয়াজ তাদের কানেই যায়নি। ঘরে হঠাৎ আলো বেড়ে যেতে তিনজনে ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ চৌধুরি!

তপু কী করছিস? কে এরা?—চৌধুরিমশাই গর্জন করে ওঠেন।

তপু কাঠ। চৌধুরি মশায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি শিবের ওপর।

কী হল? জবাব দিচ্ছিস না যে? —গলার আওয়াজটা আর একমাত্রা চড়ল।

দাদু!—যেন সংবিৎ পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে তপু: এরা আমাদের গুপ্তধন আবিষ্কার করেছে। এই দেবুদা শিবদা। এই দেখ।

কৃষ্ণ চৌধুরি স্তম্ভিত! বাক্যহারা! নিস্পলক চোখে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন ঘরের নোংরা মেঝেতে ছড়ানো সেই বিপুল ঐশ্বর্যের সামনে।

টিয়া রহস্য - অজেয় রায় Tia Rahassa by Ajeo Ray

টিয়া রহস্য   অজেয় রায়

এক

দীপক দিন কয়েক বাইরে ছিল। দুপুরে বোলপুরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই সে সোজা চলল বঙ্গবার্তার অফিসে। বঙ্গবার্তার সে একজন রিপোর্টার।

ভবানী প্রেসের এক ধারে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তার অফিস। শ্রীনিকেতন রোডের ওপর লম্বা ঘরখানায় কালিঝুলি মাখা কয়েকজন কর্মী প্রেসের কাজে ব্যস্ত। রাস্তা থেকে প্রেসের বারান্দায় পা দিয়েই দীপক থমকে গেল। একী। খোলা বারান্দায় ছাদের হুকে বাঁধা দড়িতে ঝুলছে একটা পাখির খাঁচা। তার ভিতর দাঁড়ে বসে

একটি বড়সড় টিয়া পাখি। খাঁচার ভিতর ছোট ছোট বাটিতে রয়েছে ছোলা আর জল।

এ পাখিটা কার? এখানে কেন বাইরে বারান্দায়। যাওয়ার আগে তো দেখিনি? খাসা দেখতে পাখিটা। চকচকে সবুজ গা। লাল বাঁকা ঠোট। ঘাড় বেঁকিয়ে টেরিয়ে দেখছে দীপককে। হঠাৎ পাখিটা খুব দ্রুত খানিক তীক্ষ্ণ নাকি সুরে উচ্চারণ করে উঠল। 'কে কে কে'—অনেকবার।

অমনি প্রেসের পিয়ন হারু বারান্দায় উকি মারল। দীপক হারকে জিজ্ঞেস করল, 'পাখিটা কার? হারু আঙুল দেখাল বঙ্গবার্তার অফিস ঘরের দিকে। ওখানে বসেন ভবানী প্রেসের মালিক এবং সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা কাগজের মালিক ও সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি।

কুঞ্জবাবুর যে পাখির শখ আছে জানত না দীপক। তার ওপর আবার প্রেসের বারান্দায় যেন সবাইকে দেখাতে রাখা হয়েছে পাখিটা। দীপক প্রেসের ভিতর ঢুকে ঘরের এক কোণে কাঠের পার্টিশান ঘেরা সম্পাদক মশায়ের চেম্বারের সুইং-ডোর ঠেলল।

মধ্যবয়সি গাট্টাগোট্টা কুঞ্জবাবু তাঁর ছোট্ট কামরায় চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে প্রুফ দেখছিলেন। চশমার ওপর দিয়ে গোল গোল রক্তাভ চোখের দৃষ্টি হেনে হেঁড়ে গলায় দীপকের উদ্দেশে আধা গর্জন ছাড়লেন—এই যে ইয়ংম্যান, শ্রীমান দীপক রায়, তা অদ্দিন ডুব মারা হয়েছিল কোথায়?

দীপক বুঝল যে তার পদবিসুদ্ধ গোটা নাম ধরে ডাকার অর্থ সম্পাদকমশায়ের মেজাজ খিচড়ে আছে। সে চেয়ার টেনে সামনে বসে হাসি মুখে বলল, 'মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। অনেক দিন পর গিয়েছি। আসতে দিতে চায় না।

'পাখিটা কোত্থেকে পেলেন?' কৌতুহলী দীপক প্রশ্ন করে ফেলে। ''পেলাম মানে?' ফেটে পড়েন কুঞ্জবিহারী, উনি আমার ঘাড়ে চেপে বসেছেন।

উপকার করতে গিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি হে। এখন না পারছি ফেলতে, না পারছি রাখতে।'

'কী ব্যাপার?'' দীপক উদগ্রীব।

হাতের পেনটা খটাস করে টেবিলে রেখে, চেয়ারে গা এলিয়ে বিহারী জানালেন, "আর বলো কেন। পাঁচ দিন আগের ব্যাপার। ভোরে ছাদে উঠে পায়চারি করছি, কোথেকে ওই টিয়াটা উড়ে এসে বসল কার্নিশে। ভয় পাচ্ছে না। ঘাড় বেকিয়ে দেখছে আমায়, আবার কক্ কক্ করে ঝী সৰ বলছে। মজা লাগল। তারপর দেখি ওর পায়ে একটা পেতলের রিং পরানো। মনে হল কারও পোষা পাখি পালিয়ে এসেছে।'

"আগের দিন ছাদে ডালি শুকোতে দিয়েছিল। তাই কিছু পড়েছিল। পাখিটা নেমে তাই খুটে খুটে খেতে লাগল। বুঝলাম, ওর খিদে পেয়েছে। নিচে গিয়ে কিছু চাল আর গাম এনে দেখি পাখিটা তখনও রয়েছে। ছড়িয়ে দিতেই টপাটপ চাল গম সাবড়ে দিল। তখন ছাদে মোড়ায় বসে ডাকলাম, আঃ আঃ। গুটি গুটি পাখিটা এসে হাজির হল পায়ের কাছে।

'টিয়াটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। কিছু বলল না। একটু ভয় করছিল বটে। যা খন্সের মতো ঠোট। ঠোক্কর দিলেই গেছি। তারপর পাখিটা আর সঙ্গ ছাড়ে না।'

'ছাদ থেকে নেমে দোতলার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। বেরুব প্রেসে। পাখিটা উড়ে এসে ফের বসল, সামনের রেলিঙে। পাউরুটির টুকরো দিলাম। দিব্যি খেল। গটগট করে পায়চারি করতে লাগল বারান্দার রেলিং ধরে।'

'তখন আমার মাথায় একটা ভাবনা জাগল, পাখিটাকে বেড়ালে না ধরে। আমাদের পাড়ায় গুচ্ছের বেড়াল ঘোরে। কার পোষা পাখি? তাই এমনি মানুষ ঘেষা স্বভাব। বাড়িতে একটা পুরনো পাখির খাঁচা ছিল। তাইতে পুরে দিলাম পাখিটাকে। বাটিতে জল আর খাবার দিলাম। তারপর খাঁচা ঝুলিয়ে দিলাম বারান্দায়।

'গিন্নি আপত্তি করেছিল। আমার স্ত্রী পশু-পাখি পুষতে চায় না। বললাম, দুপুরে ফিরে ওটার ব্যবস্থা করব। কারও পোষা পাখি। পালিয়ে এসেছে। মালিককে খুঁজতে হবে।

'তা দুপুরে খেতে ফিরে দেখি গিন্নি ফায়ার। নাকি পাখিটা সমানে-কে কে আবার মাঝে মাঝে—'পুঁটি পুটি" বলে চেঁচিয়েছে।

‘তা আমার গিন্নির ছেলেবেলায় ডাকনাম ছিল পুটি। তাতেই খেপেছে বেশি। পত্রপাঠ পাখি বিদায় করতে হুকুম দিল।

‘তখন পাখিটা নিয়ে এলাম প্রেসে। খাঁচাস বাইরে বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখেছি যদি মালিকের চোখে পড়ে। বঙ্গবার্তায় পরপর দু'দিন বিজ্ঞাপনও দিয়েছি বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু চার দিন হয়ে গেল কেউ আসেনি টিয়াটা ক্রম করতে। আচ্ছা কাটে পড়েছি।'

দীপক বলল, “আহা ঝাটের কী? এখানে রইল না হয় ক'দিন। দুটো খেতে দেওয়া বই তো নয়। বেশ দেখতে পাখিটা।

নয় ঝাট ? তেড়েফুড়ে ওঠেন বুবার, রাতে তো এখানে রাখা যায় না। কেউ থাকে না প্রেসে। তাই হারুকে বলে ঠিক করেছি, ও পাখিটা বাড়ি নিয়ে যায় প্রেস বষ্টর সময়। ছোলা ছাত, লাটিয়া পাখির এইসব খাবার ব্যবস্থা হারই করে। তাই রোজ ওতে পাঁচ টাকা করে দিতে হয়। ডেইলি গচ্চা যাচ্ছে টাকাটা। ‘ডেইলি পাঁচ কেন?' দীপক অবাক হয়ে বলে।

কে জানে? হারই হিসাব করে বলল। তাই দিচ্ছি। কতটা নিজে মারে গড় লেহ। উপায় কী? এক এক সময় ভাবি চুলোয় যাক। দিই ছেড়ে। আবার মায়া হয়—পোষা পাখি। তেমন সতর্ক তো নয়। বেড়ালে খাবে কিংবা দুষ্ট লোকে ধরে বাজারে বিক্রি করে দেবে। কেমন হতে পাড়বে? যত্ন করবে কিনা কে জানে? গুম মেরে গেলেন কুঞ্জবিহারী।

দীপক কুবাবুর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করার আগেই তিনি ফের ফোস করে ওঠেন—আর এক ঝামেলা হয়েছে। জনে জনে জবাব দিতে দিতে জেরবার হয়ে গেলুম।

কুঞ্জবিহারী তার ঝাটা গোফ ফুলিয়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে নকল করেন—‘পাখিটা কবে কিনলেন?

কোথেকে?

কথা বলে?

কী খায়?

হেন তেন। ছাপার কাজে যারা আসছে তাদের প্রশ্ন তো আছেই। পথ-চলতি চেনা লোকও ঢুকছে এইসব প্রশ্ন করতে। কাজকর্মের ডিস্টারবেল। যাকগে, আর দুটো দিন দেখব। তারপর যেখানে হয় বিদায় করব পাখিটা।

দীপক বলল, "ও নিয়ে ভাববেন না। বিদায় করলে আমায় দেবেন। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। রাখব যদ্দিন না মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়। . গম্ভীর বদনে কুঞ্জবিহারী জানালেন, "শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। তা ডেইলি চার্জ কি ওই পাঁচ টাকা?' 'এক পয়সাও লাগবে না। দীপক গরম হয়ে জানায়।

ভেরি ভেরি গুড়। একগাল হেসে কুঞ্জবিহারী টেবিল থেকে ফের ঐফ তুলে নিয়ে বললেন, 'সঙ্গয় এসো একবার। কিন্তু কাজের কথা আহে।'

দীপক উঠছে, এমন সময় পিয়ন হারু এসে বলল, "এক বৈরাগীবাবু, ওই পাখিটা নিয়ে কী জানি বলছেন।

'বৈরাগীবাবু! সে আবার কী?" ধমকে ওঠেন কুঞ্জবিহারী। "আজ্ঞে তাই তো ঠাওর হল। গেরুয়া পরা। গলায় কণ্ঠী। কপালে তিলক। হাতে একতারা।

'কী বলছেন? জিজ্ঞেস করে দীপক। "আজ্ঞে লাচেন, উনি পাখিটা দেখেছেন কোন বাড়িতে। বটে বটে। নিয়ে এসে তাকে।' নির্দেশ দেন কুঞ্জবিহারী। হারু ভুল বলেনি। যে মানুষটি আবির্ভূত হলেন তিনি নিঃসন্দেহে একজন বৈরাগী। মাঝবয়সি প্রসন্ন হাসি হাসি মুখ। তিনি সম্পাদক কুঞ্জবিহারীর ঘরে ঢুকে নমস্কার জানালেন।

বসুন।' কুঞ্জবিহারীর ইঙ্গিতে দীপকের পাশের চেয়ারটায় বসলেন বৈরাগী। আপনার নাম?' জানতে চান কুর্থবাবু। 'আন্দ্রে পরান বৈরাগী। 'আপনি বাইরের পাখিটা দেখেছেন আগে? - 'আরে তাই তো মনে হচ্ছে। তাই কেন, আমার অনুমান ঠিকই। অমনি পায়ে আংটি

পরা। অমনি গড়ন। পাখিটা এখানে এল কেমনে তাই ভাবছিলেম অবাক হয়ে। তবে খাঁচাটা 'কোথায় দেখেছিলেন পাখিটা?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

সুরুলের পুব পাড়ায়। বলাই সরকারের বাড়ি। একতলায় ঝোলানো থাকত খাঁচাসুদু এই পাখিটা। হপ্তা দুই 'আগেও দেখেছি। ও পাড়ায় গান গাইতে যাই যে মাঝে মাঝে।

‘পাখিটা কার? বলাই সরকারের?' দীপক জিজ্ঞেস করে। ‘তা ঠিক জানি না। মনে হয় নিচের তলায় একটা ছেলে থাকত তার। ওরই ঘরের সামনে বারান্দায় তুলত খাঁচাটা।' বললেন পরান বৈরাগী।

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।' কুঞ্জবাবু হাতজোড় করে বিদায় জানান বৈরাগীকে, 'এই পাখির আসল মালিককে খুজছি। খবরটা পেয়ে খুব উপকার হল।'

পরাগ বৈরাগী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবিহারী টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, “যাক বাবা, অ্যাদ্দিনে হদিশ মিলল। ওহে দীপক, এখুনি চলে যাও দিকি বলাই সরকারের বাড়ি। পাখিটার গতি করো। হ্যা, মালিককে টুকে দিতে পার যে পাখিটাকে খাওয়ানোর খরচ গোটা কুড়ি টাকা আমার পকেট থেকে গিয়েছে।”

দুই

বলাই সরকারের বাড়ি খুঁজে বের করল দীপক।

ঘোট পুরনো দোতলা বাড়ি। নিচের তলা একদম বন্ধ। বাইরে বারান্দায় লাগোয়া ঘরখানা তালা মারা।

ও বলাইবাবু। সরকারমশাই'—অনেক ডাকাডাকির পর দোতলার জানালায় একজন শুকনো চেহারার বৃদ্ধ উকি দিলেন। বিরক্তি মেশানো খনখনে গলায় প্রশ্ন করা হল-কে?”

উফমুখ দীপক বলল, “আগে আপনার বাড়ি থেকে একটা টিয়া পাখি হারিয়েছে কি?”

তা বলতে পাচ্ছি না।' বৃদ্ধ নীরস গলায় উত্তর দেন। আপনাদের একটা টিয়া পাখি ছিল তো?”

“হ্যা। আমার নয় নগেনের। নিচে যে থাকে। আমার ভাড়াটে।

“তা নগেনবাবুর ঘর তো দেখছি বন্ধ। কখন আসবেন?”

‘তা বলতে পাচ্ছি না', বৃদ্ধের কণ্ঠে বিরক্তি উপচে পড়ে, লিখে গিয়েছে আসতে কদিন দেরি হবে।'

“উনি কি একাই থাকেন?”

তা।"

“উনি বুঝি বাইরে গিয়েছেন?

হু।

‘কোথায় ?

‘তা বলতে পাচ্ছি না।

এইভাবে কথা চালানো কষ্টকর। দীপক বিনীতভাবে বলল, আত্রে একবার যদি নিচে আসেন। আমি বহুবার্তার রিপোর্টার।

“রিপোর্টার। তা আমায় কী দরকার?' বৃদ্ধের ভুরু কোচকায়।

“আরে ওই টিয়াটা নিয়ে একটু কথা বলব, আর কিছু নয়। আমরা একটা টিয়া পাখি পেয়েছি। একজন বলল, সেটা নাকি আপনার বাড়িতে দেখেছে। তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।”

“আসছি। দাঁড়ান। বৃদ্ধ অদৃশ্য হলেন।

একটু বাদে নিচের তলার একটা দরজা খুলে বলাইবাবু বেরোলেন। পরনে লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি চাপানো। হয়তো ঘুম ভেঙে উঠে আসতে হয়েছে বলে বেজার মুখ।

দীপক জিজ্ঞেস করল, নগেনবাবু কি বাইরে গিয়েছেন?” ‘হ্যা, তাই তো লিখে গিয়েছে। চারদিন আগে ভোরে উঠে দেখি ওই দরজার নিচ দিয়ে গলানো নগেনের একটা চিরকুট। তাতে লেখা—কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। জরুরি। কাজ। কবে ফিরব ঠিক নেই। ব্যস, আর তার ঘরেও তালা দেওয়া।

নগেনবাবু কখন ঘরে ফিরেছিলেন সেদিন?

কখন ফিরেছিল জানি না। তবে অনেক রাতে। আমি শুয়ে পড়ার পর। নইলে ঠিক দরজা খোলার শব্দ পেতুম।'

নগেনবাবু পাখিটা কোথায় রাখতেন? “দিনের বেলায় ওই বারান্দায় ঝুলত খাঁচায়। রাতে ঘরে ঢুকিয়ে নিত।' নগেনবাবু আগেও তো বাইরে গিয়েছেন? “গিয়েছে। খুব কম। দু রাত্তির। গিয়েই পরদিন ফিরেছে। ‘তখন পাখিটা কোথায় থাকত?'

বোঝা যাচ্ছিল যে দীপকের জেরায় বৃদ্ধের মেজাজ গরম হচ্ছে। ভ্রুকুটি বাড়ছে। ভ্যাটকানো মুখে জবাব দিলেন, শুনেছি কোথাও রেখে যেত। কার কাছে বলতে পাচ্ছি ।' মহা মুশকিল। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে দীপকের মাথায়। বলল, ‘আপনি পাখিটা দেখলে চিনতে পারবেন সেটা নগেনের কিনা?' ‘তা পারব।'

তবে দাদা একটি অনুরোধ। আমার সঙ্গে একবার রিকশায় গিয়ে চট করে দেখে আসবেন ওটা নগেনের পাখি কিনা?

আপনাকে নিয়ে যাব আবার পৌছেও দেব। এই যাব আর আসব। বড়জোর আধঘণ্টা। আমাদের সম্পাদক কুঞ্জবাবু পাখিটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন। উনিই পাখিটা রেখেছেন কিনা। কী করবেন? ওঁর বাড়ি ছেড়ে নড়ছিল না টিয়াটা। পাছে বেড়ালে ধরে তাই খাঁচায় পুরে রেখেছেন। বোঝা যায় পোষা পাখি। মালিককে খোজ করছে। যদি ওটা নগেনবাবুর হয়, ক'দিন না হয় অপেক্ষা করি। নয়তো আরও খোজ করাতে হবে। প্লিজ। ভবানী প্রোসে আছে পাখিটা।'

‘ও, কুঞ্জ মাইতির কাছে। চলুন। মনে হল যে বৃদ্ধ কুঞ্জবাবুকে চেনেন বা নাম শুনেছেন।

পথে রিকশায় যেতে যেতে বলাই সরকার একটা নতুন খবর দিলেন—নাকি নগেন যাওয়ার আগের দিন রাত সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ একজন অচেনা লোক এসে নগেনের খোঁজ করে। তখনও অবশ্য নগেন বাড়ি ফেরেনি। নগেন কখন বাড়ি থাকে? কোথায় কাজ করে? এই সব জিজ্ঞেস করেছিল।

‘কত বয়স হবে নগেনবাবুর?' দীপক জানতে চায়।

‘এই আপনারই বয়সি। বছর পচিশ-তিরিশ।

'কন্দিন আছেন আপনার বাড়িতে?”

'এই বছরখানেক।'

‘লোকাল লোক?'

কোথায় বাড়ি ওঁর?”

'মগরা। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট।'

ভবানী প্রেসে খাঁচায় পোরা পাখিটি মনোযোগ দিয়ে দেখে বলাইবাবু ঘোষণা করলেন— ‘হু, নগেনের পাখিই বটে।

ফিরে যেতে যেতে দীপক জিজ্ঞেস করল বলাইবাবুকে, ‘পাখিটা কন্দিন এনেছেন নগেনবাবু?

“ মাস ছয়েক।'

‘পাখিটাকে যত্নআত্তি করতেন? ‘তা করত।

কতগুলো চিন্তা চকিতে গেলে যায় দীপকের মাথায়। রাতে তো পোষা পাখি খাচা বা ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না। মানে যারা নিশাচর নয়। তবে কি হাত ফসকে পালায়নি? পাখিটাকে ইচ্ছে করে বের করে দেওয়া হয়েছিল? কিন্তু কেন? কী এমন জরুরি দরকার? এভাবে ছেড়ে গেলে প্রিয় পাখিটা যে মারা পড়তে পারে তা না জানার কথা নয়। তবু গিয়েছে। কাউকে দিয়ে যাওয়ার ফুরসত অবধি মেলেনি। সেই রাতে যে লোকটা ডাকতে এসেছিল তার সঙ্গে এভাবে নগেনের উধাও হওয়ার যোগ আছে কি?

দীপক জিজ্ঞেস করে বলাইবাবুকে, “আচ্ছা যে লোকটি সেই রাতে নগণকে ডাকতে আসে সে কি ফের এসেছিল?”

‘তা বলতে পাচ্ছি না।' জবাব দেন বলাইবাবু, মানে আমি আর কিছু জানি না।'

নগেনবাবু কি রাত করে ফেরেন ?"

মাঝে মাঝে রাত করে। একা লোক, আচ্ছা-ফাজ্ঞা দিয়ে আসে।

'উনি করেন কী ?

রেডিও মেকানিক। তারা সাউন্ড নামে দোকানটায় চাকরি করে। ঘরে প্রাইভেট কাজও করে। এমনি বেশ ভালো ছেলে। কোনো গোলমাল ছিল না।'

'আপনি ওঁকে ভাড়া দিলেন কীভাবে', জানতে চায় দীপক, পরিচিত কেউ নিয়ে এসেছিল?'

'আলবা। রেফারেন্স ছাড়া উটকো লোককে আমি ঘর ভাড়া দিই না। নিচুপটির শিব ঘোষ মানে হরেন ঘোষের বেটা, রেডিও টিভির মেকানিক, সেই নিয়ে এসেছিল নগেনকে। একখানা ঘর চাই। বিয়ে থা করেনি। একা থাকবে। তারা সাউন্ডে চাকরি পেয়েছে। গ্যারান্টি দিল, ছেলে ভালো। ওর সঙ্গে কলকাতায় রেডিওর কাজ শিখতে গিয়ে চেনা। তাই দিলাম ভাড়া। তা অদ্দিন ছিল, গড়বড় কিছু দেখিনি।

বলাই সরকারের বাড়ি পৌঁছে দীপক ফট করে বলাইবাবুকে বলে বসল, 'পাখিটা আপনার কাছে রাখুন না। নগেনবাবু ফিরলে দেবেন।'

বলাইবাবু আঁতকে উঠলেন, 'খেপেছেন? বুড়ো-বুড়ি থাকি। পাখির ঝামেলা কে নেবে?'

'আচ্ছা সে যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে। নগেনবাবু ফিরলেই তাকে বলবেন যে পাখিটা আমাদের কাছে রয়েছে।'

বলাইবাবু বাড়ি ঢুকে গেলেন।

দীপক কিন্তু তখুনি বাড়ি ফিরল না। তার রিপোর্টার মন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। হঠাৎ নগেনের এমন চলে যাওয়ার কারণটা জানা চাই। সেই লোকটার সঙ্গে কি গেল কোথাও? বাড়ি না অন্য কোথাও ? দেখি এ পাড়াতেই একটু খোঁজখবর করা যাক। দীপক গুটিগুটি সামনের মোড়ে দোকানটার দিকে যায়। ওখানে চা-টার সঙ্গে দুপুরে রাতে ভাত-রুটিও মেলে। তাই রাত নটা সাড়েনটা অবধি দোকানটা খোলা থাকে। ওই দোকানের ছোকরা কাজের লোক রামু তার পরিচিত। বেশ চালাক-চতুর ছেলে। রামু, দোকানেই থাকে রাতে।

তিন রামু বলল, "হ্যা। একজন অচেনা লোক মঙ্গলবার রাতে খোঁজ করেছিল নগেনদার। মজা কি জানেন, তার একটু আগেই নগেনদা এই দোকানে ছিল। চা

খাচ্ছিল। নগেননা চলে যাওয়ার এই মিনিট পনেরো বাদে সেই লোকটা এল। খোঁজ করল—নগেনবাবু কখন ঘরে ফেরে রাতে।'

'বললাম, এই তো ছিল নগেনদা। রাতে যদি এখানে খায়, আসবে ন'টা নাগাদ।"

'লোকটা জিজ্ঞেস করল, আর কোথায় খায়? বললাম, কখনও বোলপুর হোটেলে, কখনও এখানে। মানে মুখ বদলায়।'

'আমি লক্ষ করেচি। রাত সাড়ে ন'টা অবধি লোকটা রাস্তায় একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। নগেনদা কিন্তু ফেরেনি। তারপর দেখিনি লোকটাকে।।

দীপক জিজ্ঞেসঁ করে, নগেনবাবু কখন ফিরেছে?" 'তা দেখিনি। তবে দশটার আগে নয়। ততক্ষণ আমি কাজ কলিম বাইরে। গেলে ঠিক দেখতাম। ওর ঘরের বারান্দায় পাখির খাঁচাটাও ঝুলছিল ততক্ষণ।।

নগেনবাবু কখন চলে গিয়েছে দেখেছ?"

তিন

রামু বলল, 'নাঃ। তবে রাত থাকতেই গিয়েছে। আমি ভোরে উঠে আগুন দিই, তার আগেই। তখন গেলে চোখে পড়ত। তারপর থেকেই তো দেখচি নগেনদার ঘর বন্ধ। দীপক জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সেই লোকটা আর নগেনবাবুর খোঁজ নিতে এসেছিল?

"কেমন দেখতে লোকটাকে?' 'ভদ্দরলোক। বেশ লম্বা চওড়া। রং কালো। দাড়ি গোঁফ আছে। খুব ঘন কালো চুল। লম্বা জুলপি। তবে কেমন জানি চোয়াড়ে টাইপ। জামা প্যান্ট পরেছিল। 'কত বায়েস ?" 'এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।

দীপক একটা টাকা বের করে রামুর হাতে দিয়ে বলল—"রাখ এটা। কালাম, তার, বকশিশ।

রামু টাকাটা তৎক্ষণাৎ পকেটে ভরে একগাল হেসে বলল—"রিপোর্টারদাদা আর কী খবর চাই? | দীপক বলল, "ওই লোকটা এলে বা নগেন ফিরলেই আমায় খবর দিবি, বুঝলি।"

‘জরুর। মিলেগা। ফাজিল রামু সেলাম জানিয়ে উত্তর দেয়। টিয়া পাখিটার গতি করার চাইতে অন্য চিন্তাই পেয়ে বসল দীপককে। নগেনের রহস্যময় অন্তর্ধান। সে এবার টু মারল নিচুপট্রির শিবু ঘোষের কাছে। | শিবু ঘোষ বাড়িতে ছিল না। সুরধ্বনি নামে রেডিও টিভির দোকানে সে কাজ করে। সেখানে পাওয়া গেল তাকে।

শিবু থোষ যুবকটি ভালো মানুষ টাইপের। দীপককে সে নামে চেনে। টিয়া পাখির ব্যাপারটা জানিয়ে নগেনের পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল-ওর সঙ্গে একটা ইলেকট্রনিক্স স্কুলে কাজ শিখেছিলাম কলকাতায়। তখনই খুব ভাব হয়েছিল। ভালো ছেলে ছিল। পাশ করে ও কলকাতায় একটা দোকানে চাকরি নিল। আমি চলে এলাম বোলপুরে। তারপর নগেনের সঙ্গে দেখা হত খুব কম।

'বছর তিনেক বাদে, একবার কলকাতায় গিয়ে শুনি এক দুঃসংবাদ। নগেন নাকি ডাকাতির কেসে বেসে গিয়ে জেলে রয়েছে। মামলা চলছে। কেন ও এমন কাজ করল। ভেবে পেলাম না। ও নিজে নাকি ডাকাতি করেনি। কিন্তু ও যে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল প্রমাণ হয়েছে। আর ওর ঘরে নাকি ডাকাতির মাল পাওয়া গিয়েছে। কেসটা হল— কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে তিন-চারজন লোক কায়দা করে দুপুরে ঢুকে বাড়ির কর্তা-গিন্নিকে মারধর করে প্রচুর টাকা আর সোদানা নিয়ে পালায়।

‘নগেন একটু শৌখিন ছিল বটে। আর ওর একটা সাধ ছিল নিজের দোকান করবে রেডিও-টিভির। হয়তো সেই টাকা জোগাড়ের লোভেই। তবে ও রাজসাক্ষী হওয়ায় সাজা বেশি হয়নি। মাত্র এক বছর।'

"এরপর নগেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল, বছর খানেক আগে বর্ধমান স্টেশনে। নগেন বলল যে, ও বর্ধমানে একটা রেডিওর দোকানে কাজ করছে। খুব লজ্জিত ও কুণ্ঠিত মনে হল তাকে। অকপটে স্বীকার করল যে, সে বদসঙ্গে মিশেছিল। তার মতিভ্রম হয়েছিল। বলল যে, আর কখনও সে এমন ভুল করবে না। কথায় কথায় বলল, বর্ধমানের দোকানটায় তার মাইনে বড় কম। তাই অন্য কোথাও কাজ খুজছে। আমার সাহায্য চাইল—কোনো কাজের খোঁজ আছে কিনা কিছু বেশি মাইনেতে। তবে অনুরোধ করল, সে যে জেল খেটেছে যেন সেটা খাস না করি। বর্ধমানেও বলেনি। জানাজানি হলে তার চাকরি থাকবে না। তাহলে তার বাড়ির লোক না খেয়ে মরবে। কারণ বাড়িতে সেই একমাত্র রোজগেরে। বিধবা মা আর অবিবাহিত বোন আছে দেশে। নগেনই তাদের একমাত্র ভরসা।'

‘করুনা হল। তাই ওকে বোলপুরে তারা সাউন্ডে একটা কাজ জুটিয়ে দিলাম খানিক বেশি মাইনেতে। খবর পেয়েছিলাম, ও বেশ ভালোই কাজ করছে। তবে ইদানীং আমি বড় ব্যস্ত থাকতাম, তাই ওর সঙ্গে দেখা হত কদাচিৎ। কী জানি কেন এমন হঠাৎ গেল ওভাবে।” শিবু ছোষ ব্যাপারটায় বেশ অবাক।

ওঁর বাড়ির ঠিকানা জানেন?' জিজ্ঞেস করে দীপক। ‘ঠিকানা? তা জানি। মগরা। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। স্টেশনের কাছে ওঁদের বাড়ি। মায়ের নাম বিভাবতী দেবী। আপনি কি ওর বাড়িতে চিঠি দেবেন?

‘তাই দেব ভাবছি।' বলল দীপক। হয়তো কোনো জরুরি কাজে হঠাৎ বাড়ি যেতে হয়েছে। পাখিটা নিয়েই হয়েছে সমস্যা। শিকু বলল, 'হ্যা, ওর খুব পাখির শখ। কলকাতায় মেসেও একজোড়া মুনিয়া পুষেছিল।” দীপকের ভাবনা অন্য খাতে বইতে শুরু করে।

একজন অচেনা লোক যে সেদিন খোঁজ করেছিল নগেনের সেটা শিবুকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। নগেনের পূর্ব ইতিহাস এবং আগন্তুকের বর্ণনা মিলিয়ে তার মনে হল যে, কোনো কুকর্মের ধান্দায় কি নগেন হঠাৎ বোলপুর ছেড়েছে? ওই কালো লম্বা দাড়ি-গোফওয়ালা লোকটার সঙ্গে। অসৎ সঙ্গে একবার জড়িয়ে পড়লে তার প্রভাব এড়ানো কঠিন। | সন্ধ্যায় দীপক ভবানী প্রেসে ফিরে রিপোর্ট করতে সম্পাদক কুপ্রবিহারী গোমড়া মুখে বললেন, “তাহলে? সেই নগেন না খগেন কবে ফিরবে, সেই অপেক্ষায় থাকতে হবে? ধুততেরি তার চেয়ে বরং দীপক আশ্বাস দেয়, ভাববেন না। আমি পাখিটা নিয়ে যাচ্ছি। আমার দুই ভাইপো-ভাইঝি ওকে মহা আদরে রাখবে। তবে মুশকিল হল—

দীপক চুপ করে যেতেই কুঞ্জবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন-“কেন, আবার মুশকিলটা কীসের? | ‘মানে ছোটন ঝুমা পরে পাখিটা ফেরত দিতে চাইবে কিনা সন্দেহ। দুটোই যা। পশু-পাখির ভক্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কুঞ্জবাবু জানালেন, সেটা তোমার ব্যাপার। আমার এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মালিককে পটাতে পারলে রাখবে পাখিটা।”

খাঁচাসুদ্ধ টিয়া নিয়ে দীপক সন্ধ্যায় বাড়ি ঢুকল। যা ভেবেছিল তাই। পনেরো বছরের ভাইপো ছোটন আর তেরো বছরের ভাইঝি ঝুমা একটু দমে গেল বটে,

তবে তখুনি পরিচর্যায় লেগে গেল পাখিটার। ঝুমার একটা মন্তব্য শোনা গেল, ‘দেখিস দাদা, ওর মালিক আর ফিরছে না।'

দীপকের মাথায় তখন প্ল্যান খেলছে-কাল-পরশুই যাৰ মগরা। টিয়ার মালিক উধাও হওয়ার রহস্যটা দিব্যি জটিল মনে হচ্ছে।

দীপক তারা সাউন্ডে খবর নিয়ে জানল যে একটা কালো লম্বা পান্টি-শার্ট পরা লোক গত মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ নগেনের খোঁজ করেছিল। তবে নগেন তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর তো ফেরেইনি। না বলে কয়ে এভাবে ছুটি নেওয়া। ওর মাইনে কাটা যাবে।

চার

মগরা স্টেশনের কাছে নগেন দাসের মা বিভাবতী দেবীর বাড়ি খুঁজে পেতে খুব অসুবিধা হল না দীপকের। জীর্ণ একতলা কোঠা বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়। তবে সামনে উঠোনটুকু তকতক করছে। মনে হয় এক এদের অবস্থা ভালো ছিল, এখন পড়ে গিয়েছে। সাদা থান পরা এক প্রৌঢ়া দাওয়ায় বসে কী জানি করছিলেন। দীপককে এগুতে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে তাকিয়ে থাকেন।

‘আপনি কি নগেন দাসের মা বিভাবতী দেবী?' নমস্কার করে বলে দীপক।। চকিতে ভদ্রমহিলা কেমন ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তবে ঘাড় নাড়েন সম্মতি জানিয়ে। নগেন দাস কি এখানে এসেছেন?' প্রশ্ন করে দীপক। আবার ঘাড় নাড়েন মহিলা। অর্থাৎ-না। ইতিমধ্যে একটি সুশ্রী যুবতী মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। তার পরনের শাড়ি প্রৌঢ়ার মতোই ময়লা।

'আমি বোলপুর থেকে আসছি। নগেন দাসের বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই', জানাল দীপক।

বিভাবতী এবার ভীত অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন—‘নে কেন?'

কোথায় বসা যায়? দীপক এদিক-সেদিক তাকাতে মেয়েটি একটি টুল এনে রাখে। তার ওপর বসে দীপক। মেয়েটি বোধহয় নগেনের বোন। উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি।

দীপক বলল, নগেন দাস তো বোলপুরে চাকরি করেন? ‘ই।” মৃদুস্বরে জবাব দেন বিভাবতী। নগেনবাবু কি কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি এসেছেন?'

না তো।'

“উনি গত মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ কোথাও গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন জানেন?”

‘আঁ।' মা মেয়ে দু'জনের কণ্ঠ থেকে যেন আর্তনাদ বেরোয়।

মেয়েটি বলে ওঠে, ‘সেকি এখনো ফেরেনি?” দীপক বুঝল যে নগেনের অন্তর্ধানে এরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। যেন কিছু একটা আশঙ্কা। করছে। কিন্তু একটা জোয়ান ছেলে না হয় ক'দিন বাইরে গিয়েছে তাতে এত নার্ভাস হওয়ার কারণ কী? দীপক চারপাশটা একবার দেখে নেয়। নাঃ তাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না। কাছাকাছি বাড়ি নেই। সে নিচু গলায় বলল, 'দেখুন নগেনবাবুর পূর্ব ইতিহাস আমি জানি। মঙ্গলবার রাতে তার হঠাৎ চলে যাওয়াটা বেশ রহস্যজনক। বোলপুরে কাউকে কিছু বলে যাননি। কিছু হদিশ পেতে পারি কিনা জানতে আপনার কাছে এসেছি।'

দীপক অল্প কথায় টিয়া পাখির সূত্র ধরে নগেনকে খোঁজ করার বৃত্তান্ত জানায়। সে রাতে যে একজন অচেনা লোক নগেনের খোঁজে এসেছিল, তাও বলে। জিজ্ঞেস করে, নগেনবাবু কোথায় যেতে পারে আন্দাজ করতে পারেন? কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি?”

মা-মেয়ে চোখাচোখি করে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। বিভাবতী দেবী বিড়বিড় করেন, কী জানি, কী জানি কোথায় গেল?"

দীপকের স্থির বিশ্বাস হয়, এরা কিছু চেপে যাচ্ছে। তবে নগেন উধাও হওয়ার ব্যাপারে এরা যে শঙ্কিত হয়েছে সেটা চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। দীপক এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করল বিভাবতী দেবীকে, 'আপনারা খী নগেনের কোনো বিপদের ভয় করছেন?

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বিভাবতী মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে করুণ স্বরে বললেন, হ্যা বাবা।

দীপক বলল, “দেখুন আগেই বলেছি আমি একজন রিপোর্টার। নগেনবাবুর বিপদে আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি খুশি হব। তাই কী আশঙ্কা করছেন যদি একটু খুলে বলেন। আচ্ছা আপনার ছেলে তার পুরনো অসৎসঙ্গ কি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন?" | বিভাবতী জোর গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যা বাবা, সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আর কখনও কুসঙ্গে মিশবে না। আমি নিশ্চিত জানি সেই প্রতিজ্ঞা ও ভাঙবে না। বাপ-মরা ছেলে মেয়ে দুটিকে আমি অনেক কষ্টে মানুষ করেছি। ওরা দুটিও আমায় খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে।' | ‘ওর কী বিপদের ভয় করছেন?' দীপকের চিন্তা এবার রহস্যে নতুন কিছু ক্লু পাওয়ার আশায় উন্মুখ হয়।

বিভাবতী দেবী নতমুখে কাতর কণ্ঠে বলেন, 'তুমি তো বাবা জানো, নগেন কর্মদোষে জেল খেটেছে। তবে সাজা বেশি হয়নি, রাজসাক্ষী হওয়ায়। ওর কাছ থেকে ডাকাতির অনেক মাল পাওয়া যায়। তাছাড়া ওর মুখে খবর পেয়েই ডাকাতির প্রায় বাকি সব মাল উদ্ধার করে পুলিশ। ডাকাতগুলোর শাস্তির প্রধান কারণও নগেনের সাক্ষী। জেলে যাওয়ার সময় ওই দলের পাণ্ডা নাকি নগেনকে ভয় দেখিয়েছিল যে জেল থেকে বেরিয়ে সে নগেনকে খুন করবে, এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে। ওই লোকটার জেল হয় হয় বছর। বছরখানেক আগে সেই সর্দারটা ছাড়া পেয়েছে। নগেন খেয়াল রেখেছিল কবে ওই লোকটা ছাড়া পাচ্ছে। নগেন জেল থেকে বেরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় আর বর্ধমানে কাজ

টিয়া রহস্য। ২৮১ করে। তারপর যায় বোলপুর। ভালো কাজ জানে বলে ওর চাকরির অভাব হয় না। তবে সে যে জেলখাটা আসামি সেটা গোপন রাখে। আগেকার চেনাশোনাদের থেকে দূরে থাকে। লজ্জায় বাড়িও আসত খুব কম। এলেও লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেত। টাকা পাঠাত মনি অর্ডারে। তবে বোলপুরে যাওয়ার পর এখানে চিঠি বা মনি অর্ডার করত না। পাঠাত ত্রিবেণীতে আমার এক সইয়ের কাছে। আমরা সেখানে গিয়ে নিয়ে আসতাম। পাছে এখনকার পোস্ট আপিস থেকে ওর ঠিকানা বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে। এখানে কেউ জানে না নগেন এখন কোথায় থাকে। | ‘দিন দশেক আগে একটা লোক আসে এখানে। নগেন কোথায় জানতে চায়। আমরা প্রথমে বলতে চাইনি। কারণ সেই দলের সর্দারটা যে জেল থেকে বেরিয়েছে, বলেছিল নগেন। শেযে লোকটা হুমকি দেয় যে নগেনের ঠিকানা না বললে আমাদের সর্বনাশ করবে। তখন ভয়ে বলতে বাধ্য হই নগেনের বোলপুরের ঠিকানা। লোকটা শাসিয়ে চলে যায়—ওর এখানে আসার কথা যেন কাউকে না বলি। আর ভুল ঠিকানা

দেওয়া হয়েছে বুঝলে আমাদের নিস্তার নেই।' | 'তা লোকটা চলে যাওয়া মাত্র আমি নগেনকে চিঠি দিয়ে জানাই খবরটা। কারণ লোকটার চেহারা দেখে সন্দেহ হয়েছিল যে এ সেই ডাকাত দলের পাণ্ডা। নগেনের মুখে তার বর্ণনা শুনেছিলাম যে। ওকে দলের লোক নাকি ওস্তাদ বলে ডাকত।'

'তা বাবা, তুমি যে লোকটার কথা বলা, যে নগেনের খোঁজ করছিল, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ওই সেই ওস্তাদ। জানি না নগেন ওর খপ্পর থেকে পালাতে পারল কিনা? না' বলেই বিভাবতী কেঁদে ফেললেন। অর্থাৎ নগেন যদি পালাতে না পারে ? যদি খুন হয়ে যায় ওস্তাতের হাতে ? ১ নগেনের অন্তর্ধানের এই নতুন কারণটা জেনে দীপক হতবাক। কী সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। বলে, 'অত দুশ্চিন্তা করবেন না। নগেনবাবু হয়তো আপনার চিঠি পেয়ে সতর্ক ছিলেন। ওস্তাদ যেতেই গা ঢাকা দিয়েছেন। একটা কথা বলে যাই। নগেনবাবুর কোনো খবর পেলে বা সেই ওস্তাদ ফের এলে আমায় তখুনি জানাবেন। আমার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি। হ্যা, ওস্তাদের বর্ণনাটা আর একবার ভালো করে বলুন তো।' বিভাবতী বললেন। মন দিয়ে শুনে নিল দীপক।

মগরা থেকে সোজা বোলপুরে ফিরল না দীপক। গেল কলকাতায়। লালবাজারে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এক অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার তার বিশেষ পরিচিত। তার সাহায্যে কিছু খবর জোগাড় করতে হবে।

পাঁচ

দীপক বোলপুরে ফিরতেই ছোটন মা তাকে চেপে ধরল।

কাকু নগেনের খবর পেলে? টিয়াটার কী হবে? ফেরত নেবে নাকি?" ছোটনরা জানত যে দীপক মগরায় গেছে নগেনের বাড়ি। দীপক অল্প কথায় তার অভিজ্ঞতা বলে।

শুনে ছোটন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক বাবা, পুঁটি তাহলে থাকছে? ইতিমধ্যে টিয়াটার নাম দেওয়া হয়ে গিয়েছে পুটি। ছোটন ঝুমা আবিষ্কার করেছে যে ওটাই নাকি তার আগের নাম। ওই নামে ডাকলেই ও সাড়া দেয়। দীপক বলল, কী করে বুঝলি যে থাকছে?

ছোটন বলল, 'বাঃ হয় নগেন খুন হবে, নয়তো প্রাণের ভয়ে আর এমুখো হবে না। পাখি ফেরত নেবে কী করে?

দীপক রেগে বলল, “তোরা তো আচ্ছা। পাখিটার লোভে একটা মানুষকে খুন করতে আপত্তি নেই!

ছোটন ঝুমা লজ্জার ভান দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হাসে।

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী তো দীপকের মুখে নগেন-বৃত্তান্ত শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। চেয়ার ছেড়ে আধখানা উঠে টেবিলে দুম করে এক ঘুসি বসিয়ে হুঙ্কার দিলেন, মার্ভেলাস। খুন। মার্ডার। নাটক জমে গিয়েছে হে। দীপক তুমি ফলো করে যাও। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় দেখে বঙ্গবার্তায় একখানা স্টোরি ছাড়বে। দুর্দান্ত হবে। কাটতি বেড়ে যাবে কাগজের। হুঁ হুঁ বাবা, ভাগ্যিস টিয়াটা আমার নজরে পড়েছিল, ধরলাম ভাগ্যিস। তাই তো এমন একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনার কু মিলে গেল। আচ্ছা, স্টোরিটার নাম কী দেওয়া যায় ? কপালে বার দুই পেনের টোকা মেরে সম্পাদকমশাই ঘোষণা করলেন—“হ্যা পেয়েছি। টিয়া রহস্য।

দীপক গেল নগেনের বাড়িওয়ালার কাছে।

বলাইবাবু তেড়েফুড়ে উঠলেন, “দেখুন মশাই নগেনের কাণ্ড। একজনের ট্রানজিস্টার সারাবে বলে ঘরে এনে রেখেছিল। নাকি দু'তিন দিনে দেব বলেছিল। সাত-আট দিন হয়ে গেল, বাবুর পাত্তা নেই। খুব হম্বিতম্বি করে গিয়েছে লোকটা। বলহিল, তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে তার ট্রানজিস্টার নিয়ে যাবে।

‘তা অবশ্য হতে দিইনি। তবে বলেছি, এ মাসের ভাড়া দেওয়া আছে। বারো দিন বাদে মাস শেষ। তদ্দিনে না ফিরলে সাক্ষী রেখে, তালা খুলে নিয়ে যাক তার রেডিও। আমার আপত্তি নেই। হ্যা, নগেনের একটা চিঠি এসেছে।

“চিঠিকই দেখি ?"

ইনল্যান্ডটা দিতে বলাইবাবু ইতস্তত করছিলেন। দীপক ভরসা দিল—“আমায় দেখাতে কোনো ভয় নেই। নগেনের এই হঠাৎ উধাও হওয়াটা বেশ রহস্যজনক। আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। ও বাড়ি যাইনি। ওর বাড়ির লোক জানে না ও কোথায় গিয়েছে। তারা খুবই চিন্তিত হয়েছে। বঙ্গবার্তার তরফ থেকে আমি ইনভেস্টিগেট করছি কেসটা। দরকার হলে পুলিশেও ইনফর্ম করব।”

সাহস পেয়ে বলাইবাবু দীপকের হাতে দিলেন চিঠিটা। দীপক ইনল্যান্ডটা খুলে দেখল যে এটা নগেনের মায়ের চিঠি। যে চিঠিতে তিনি নগেনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ওস্তান সম্বন্ধে। ডাক বিভাগের কৃপায় অ্যাস্পিনে এল চিঠিটা।

দীপক ভাবল, তবে তো নগেন সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়নি। ও তাহলে নির্ঘাৎ ওস্তানের আগমন লক্ষ করে গোপনে। হয়তো সে যখন সামনের দোকানটায় বসে চা খাচ্ছিল—তখন। তাই উঠে তড়িঘড়ি পালায়। তারপর ঘরে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু কথা হল যে নগেন কি ওস্তাদের চোখ এড়িয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছিল?

ওস্তাদ ধূর্ত বদমাশ। হয়তো আড়াল থেকে নজর রেখেছিল, নগেন কখন ঘরে ফেরে। তারপর পলাতক নগেনকে যদি সে ফলো করে? শেষে সুবিধা মতো কোথাও পেয়ে নিকেশ করে?

দীপক চায়ের দোকানেররামুকে ডেকে বলল, মনে রাখিস, যদি নগেন ঘরে ফেরে বা সেই কালো গুণ্ডা টাইপ লোকটা আসে, সঙ্গে সঙ্গে অমায় খবর দিবি। অমনি বকশিশ পাবি।" দীপক একখানা এক টাকার নোট রামুর হাতে দিয়ে বলল -"অ্যাডভান্স।

রামু অমনি একটা স্যালুট ঠুকে বলল, "জো হুকুম।

আরও এক সপ্তাহ কেটেছে। সম্পাদক কুঞ্জবিহারী প্রায়ই খবর নেন দীপকের কাছে, কীহে, টিয়া পাখির কেসটা কিছু এগোল?" 'নাঃ।' দীপক মাথা নাড়ে, 'তৰে অপেক্ষায় আছি। জাল পেতে রেখেছি।'

দীপক প্রত্যেক দিন অনেকগুলো দৈনিক খবরের কাগজ এনে উল্টেপাল্টে দেখে। একদিন কৌতুহলী ছোটন জিজ্ঞেস করল, 'কাকু, অতগুলো কাগজে কী পড়ো?'

দীপক বলল, কোনো বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কিনা খুঁজি। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিজ্ঞাপন দেয়। কখনও কখনও নিউজ হিসাবেও বেরোয়। এমন মৃতদেহ কাছাকাছি শহরে মর্গে রেখে দেয়। আমি কয়েকটা গিয়ে দেখেও এসেছি। নগেনের খোঁজ মেলেনি অবশ্য।' "তুমি কি ভাবছ সত্যি নগেন খুন হয়ে

যেতে পারে ?” “সে সম্ভাবনা খুবই, চিন্তিতভাবে জানায় দীপক। ‘যদি খুন না হয় নগেন ফিরবে?

ফিরবে তো মনে হয়। তবে কবে বলা যায় না। ওর কিছু জিনিসপত্র পড়ে আছে নিজের ঘরে। তাছাড়া রেডিওর দোকানে মাইনে বাবদ ওর কিছু টাকাও পাওনা আছে।"

“ফিরলে আর এখানে থাকছে না। টুক করে এসে জিনিসপত্র মাইনে নিয়ে পালাবে। খাঁচাসুদু পাখি নিয়ে যাবে কোথা?' ঝুমার মন্তব্য।

অর্থাৎ ওরা ধরে নিয়েছে যে, টিয়া পুটি ওদেরই সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা যে নাও হতে পারে কারণটা ভাঙল না দীপক, বেচারিরা দুর্ভাবনায় থাকবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গড়ায়?

আরও একবার দীপক কলকাতায় গেল লালবাজারে। বোলপুর থানার দারোগার সঙ্গেও দেখা করল। সেদিন সকাল এগারোটা নাগাল। দীপক বাড়িতে বসে খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিল। সহস্যা গেটের সামনে রামুর আবির্ভাব।

কীরে রামু?' জিজ্ঞেস করে দীপক। রামু দীপককে কাছে আসতে ইশারা করে। দীপক দ্রুত পায়ে তার কাছে যায়।।

রামু ফিসফিসিয়ে বলে, “সেই কালো লম্বা লোকটা এসেছিল খানিক আগে। আমায় জিজ্ঞেস করছিল, নগেনদা ফিরেছে কিনা। নগেনদার ঘরের সামনেটায় ঘুরে দেখল'

তারপর ?” তীব্র উদ্বেগ ফোটে দীপকের কথায়।

"চলে গেল।

“কোথায় ? কোন দিকে?'

রামু মিচকে হাসে। বলে—“রিপোর্টারদাদা, বকশিশ খেয়েছি, কাজে ফাকি পাবেন না। রামচন্দর সে পার নয়। এক কেজি পেঁয়াজ আনতে বলেছিল মালিক। লোকটা পা চালাতেই টপ করে পয়সা চেয়ে থলি হাতে লোকটার পিছু নিলুম। বাজারের দিকেই যাচ্ছিল লোকটা। দেখে নিলুম ও কোথায় ঢুকছে। “কোথায় ?'

ইন্ডিয়া বোর্ডিং হাউস। সটান ঢুকে গেল ভেতরে। একটু অপেক্ষা করে হোটেলটায় ঢুকে পড়লাম। আমার পাড়ার পঞ্চা কাজ করে ওখানে। তাকে জিঞ্জেস করতে বলল যে আজ সকালেই বাইশ নম্বর রুমে উঠেছে লোকটা। একাই। ব্যস, তার সোজা চলে এসেছি আপনার কাছে। এবার পেঁয়াজ নিয়ে ফিরব।”

দীপক জিজ্ঞেস করে, “লোকটার কপালে কাটা দাগটা লক্ষ করেছিলি? ‘আলবৎ। ‘লোকটা সন্দেহ করেনি তো ফলো করছিস। ‘খেপেছেন স্যার। অনেক দূর থেকে পথের লোকের ভিড়ে মিশে ফলো করেছি। রামুকে ধরা অত সোজা নয়।

রামু চলে যাওয়ার মিনিট কয়েকের ভিতর দীপক পথে নামল। সোজা গেল থানায়। আধঘণ্টার মধ্যে বোলপুর পুলিশ অ্যারেস্ট করল ওস্তাদকে ইন্ডিয়া বোর্ডিং থেকে। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা হল বটে জনতার মধ্যে—কে লোকটা? ব্যাপারটা কী? কিন্তু থানার দারোগা বিশেষ মুখ খুললেন না। শুধু জানালেন যে, লোকটা দাগি আসামি, পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, হেডকোয়ার্টার্সের ইন্সট্রাকশন ছিল একে অ্যারেস্ট করার। দুদিন বাদে দীপক ফের মগরায় হাজির হল বিভাবতী দেবীর কাছে। “এসো বাবা। দীপককে আহবান জানালেন বিভাবতী। মিনুও কৌতূহলী মুখে কাছে এসে দাঁড়ায়।

নাগেনের কোনো খবর পেলেন?' জানতে চায় দীপক। ‘কই না। তুমি কিছু পেলে?" বিভাবতী জিজ্ঞেস করেন। দীপক বলল, “আমি? হ্যা পেয়েছি।”

কী?” মা মেয়ে দু'জনেরই কণ্ঠে উদ্যেগ ভরা প্রশ্নটা বেরোয়। দীপক চট করে কোনো জবাব না দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনেরই মুখে তীক্ষ দৃষ্টি নোলা। তারপর ধীর স্বরে বলে, নগেনবাবু যে নিরাপদে আছেন কোথাও এটুকু আমি জানতে পেরেছি। তার ঠিকানাটা জানি না এখনও। তবে, সেটা আপনারা জানেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমরা। না না। প্রবল প্রতিবাদ করে ওঠে মা এবং মেয়ে। দীপক মৃদু হেসে বলল, আমার চোখকে ফাকি দিতে পারেননি। বেপাজ হেলের কোনো খবর না জানলে যতটা দুর্ভাবনা ফোটা উচিত ছিল তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখলাম না আপনাদের চোখেমুখে। আমি না হয় জানতে পেরেছি যে আপনার ছেলে এখনও জীবিত কিন্তু সে খবর তো আপনাদের কাছে পৌছবার কথা নয়। অন্তত আমি

যেভাবে জেনেছি। তার মানে আপনারা খবর পেয়েছেন অন্য সুত্রে। খুব সম্ভব নগেনবাবুই স্বয়ং আপনার ত্রিবেণীর সইয়ের বাড়িতে গোপনে চিঠি দিয়েছেন। তাই না?

মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে স্বীকার করেন নগেনের মা, "হ্যা বাবা, ঠিকই ধরেছ। তবে ওর ঠিকানাটা—' তিনি ইতস্তত করেন।

'ব্যস ব্যস, তার ঠিকানা আমি জানতে চাইছি না। আমি শুধু বলতে এসেছি যে, নগেনবাবুকে চিঠি লিখে কয়েকটা খবর জানিয়ে দিন।

'কী খবর?' মাথা তুলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করেন বিভাবতী।

দীপক বলল, "এক নম্বর। ওস্তাদকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ।

'আঁ সেকি! কেন?" মা মেয়ে চমকে ওঠে।

'কারণ ওস্তাদ জেল থেকে বেরুবার কিছু বাদে দল জুটিয়ে ফের এক জায়গায় ডাকাতি করে। পুলিশ তার প্রমাণ পেয়েছে। তাকে খুঁজছিল ধরতে। ওস্তন গা ঢাকা দেয়। তারপর দাড়িগোঁফ গজিয়ে চেহারা পাল্টায় খানিক। সেই চেহারা নিয়েই আসে আপনার কাছে। এরপর নগেনবাবুর সন্ধানে যায় বোলপুর। খুব সম্ভব প্রতিশোধ নিতে। সেদিন নগেনবাবু দৈবাৎ তাকে বাড়ির কাছে দেখেই চিনে ফেলেন। তাই সেই রাতেই প্রাণভয়ে পালান। ফলে বেঁচে যান। আমি ওস্তাদের ব্যাপারে কলকাতায় পুলিশ ডিপার্টমেন্টে খোজ নিতে গিয়ে জানতে পারি তার এই নতুন কীর্তি। মানে ফের ডাকাতির কথা। আমি বোলপুর থানাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। নিজেও চোখ রাখছিলাম। দু'দিন আগে ওস্তাদ আবার বোলপুরে নগেনবাবুর খোঁজ করতে আসার পরই সে অ্যারেস্ট হয়।"

'সুতরাং নগেনবাবু এখন নির্ভাবনায় বোলপুরে আসতে পারেন। তার জিনিসপত্র বাকি মাইনে নিয়ে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে বোলপুরে কাজও করতে পারেন। তাকে জানিয়ে দেবেন এসব। ভাগ্যিস আপনার চোখকে ওস্তাদ ফাকি দিতে পারেনি, তাই ওঁকে এ সহজে গ্রেফতার করা সম্ভব হল।

"ওঃ বাবা, কী যে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমায় যে কী বলে আশীর্বাদ করব। আনন্দে বিভাবতী দেবীর চোখে জল এসে যায়।

দীপক হেসে বলল, নগেনবাবুকে আর একটা কথা জানাবেন যে আমার একটি প্রার্থনা আছে। মানে, এটা ঠিক আমার প্রার্থনা নয়। বলতে পারেন আমার দুই ভাইপো-ভাইঝির আবদার, যারা নগেনবাবুর টিয়া পাখিটার দেখাশোনা করছে। পাখিটার ওপর ওদের ভীষণ মায়া পড়ে গিয়েছে। তাই যদি পাখিটা ওদের দান করেন নগেনবাবু, ওরা বড্ড খুশি হয়।

‘হ্যা বাবা, পাখিটা ওরা নিক, বিভাবতী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'আমি নগেনের হয়ে পাখিটা এদের দান করছি। তোমার এত বড় উপকারের এই সামান্য প্রতিদানটুকু দিতে পারব না। জানলে নগেন খুশি হয়েই তার টিয়েটা দিয়ে দেবে। তোমার ভাইপো-ভাইঝির কাছে ওটা সুখে থাকুক।

দীপক উঠল। তার কাজ হাসিল। এবার বঙ্গবার্তার জন্যে জমাটি একখানা লিখে ফেলা যাক।

সমাপ্ত

ডাক্তার কুঠি - অজেয় রায় Dakter Kuthi by Ajeo Ray

অন্ধকারেও বাড়িটা চিনতে,শেখরের ভুল হল না। গেটের দু পাশে দুটো খাড়া শাল গ উল্টো দিকে মাঠের মাঝে সেই বটগাছটা আরও ডালপালা ছড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে।

ক্যাচ!

শেখরের হাতের ঠেলায় পুরনো লোহার গেট মৃদু প্রতিবাদে পথ ছেড়ে সরে গেল চারপাশ নিঝুম। কোনো জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে আলোর রেশমার নেই। একটু এগিয়ে শেখর ডাকল—ব্রজদাদু! ও ব্রজদাদু!

কোনো উত্তর মিলল না।

অন্ধকার বারান্দায় উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শেখর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। দরজায় শিকল ভোলা এবং কড়ায় একটা মস্ত তালা লাগানো।

শেখর হতভম্ব হয়ে গেল। এমন অসময়ে কোথায় গেলেন ব্রজদাদু? গেটের বাইরে এসে পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসল সে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সামনে পিচঢালা চওড়া রাস্তাটা শহরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দুর পাহাড়ের কোলে। বসন্তকালের শুরু। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। রাত সাতটা না বাজতেই আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। আকাশে ক্ষীণ একফালি চাঁদ। এধারে লোকের বসতি খুব কম। ইতিমধ্যেই পথঘাট খাঁ খাঁ করছে। অনেক তফাতে তফাতে যে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ছে, সেগুলো গাছপালায় ঢাকা যেন জমাট কালো স্তুপ। দূরে আকাশপটে পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো রেখা।

দীর্ঘ পনেরো বছর আগে শেখর একবার এসেছিল এখানে। তখন তার বয়স কত হবে? এই দশ-এগারো বছর। দু'দিন ছিল দেওঘরে এই বাড়িতে।

ব্রজদাদু সম্পর্কে শেখরের মায়ের কাকা হন। দেওঘরে আছেন বহুকাল। বিয়ে থা করেননি, ধার্মিক প্রকৃতির লোক। মাকে খুব স্নেহ করতেন। কলকাতার এক প্রতিবেশিনীরসঙ্গে মা এসেছিলেন বৈদ্যনাথ দর্শনে। তখন বাবা মাত্র বছরখানেক হল মারা গিয়েছেন। ব্রজদাদুর কাছে উঠেছিলেন তারা। ব্রজদাদু কত যত্ন করেছিলেন তাদের! শেখরকে কত গল্প বলতেন!

আর দেওঘরে আসা হয়নি। দু-তিন বছর পরে পরে ব্রজদাদু একবার কলকাতায় যেতেন। প্রত্যেকবার দেখা করতেন তাদের সঙ্গে। মা মারা যাওয়ার পর আর দেখা হয়না। তবে নিরালা অবসরে ওই মানুষটির কথা শেখরের অনেক সময় মনে জেগেছে। বিশেষত মা চলে যাওয়ার পর। নিঃসঙ্গ শেখর একটি স্নেহশীল হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার জন্য কখনও লালায়িত হয়েছে। তখন ব্রজদাদুর কথা মনে পড়েছে তার। প্রতিবছর বিজয়ার পর ব্রজদাদুর একখানা চিঠি আসে শেখরের কাছে আশীর্বাদসহ। সেও জবাব দেয় প্রণাম জানিয়ে। এ বছরও এসেছে চিঠি। এই ঘোর বিপদের সময় প্রাণভয়ে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে ব্রজদাদুর কথাটাই শেখরের মনে এসেছিল। সে জানত, আত্মগোপনের পক্ষে 'এখন নিরাপদ আশ্রয় আর তার কোথাও নেই দুনিয়ায়।

ছয় দিন ধরে সে ঝড়ের মতো ঘুরছে। কোথাও একবেলা, কোথাও বড়জোর ঘণ্টা। দশ-বারো কাটিয়ে আবার নিঃসাড়ে সরে পড়েছে সর্দার কৃপাল সিংয়ের নির্মম মৃত্যু থাবার আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে থাকে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে সে বার বার জায়গা বদল করেছে, পথে হঠাৎ হঠাৎ বাস আর ট্রেন বদল করেছে, আজ সারাদিন তার বাস জার্নি গিয়েছে।

প্রচণ্ড উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তার লৌহ-কঠিন স্নায়ু ও পেশি এখন অবসন্ন। মাথাটা টিপটিপ করছে। অনেকখানি হেঁটে ক্লান্ত পা দুটো আর নড়তে চাইছে না। তার বরাতটাই আজ খারাপ। সাইকেলরিকশা ভাড়া করে আসছিল। মাঝামাঝি এসে রিকশার একটা চাকার টায়ার গেল ফেটে। রিকশাওলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ফিরে গেল। বলেছিল, একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব বাবু?

অতক্ষণ অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয়নি। তাই বারণ করে সে হাঁটা দিয়েছিল। এদিকে আধঘণ্টা কেটে গেল। ব্রজদাদু এখনও ফিরছেন না কেন? সহসা নিস্তব্ধ পথের বুকে জেগে উঠল জুতোর শব্দ—খটখট। কে একজন এগিয়ে আসছে শহরের দিক থেকে। সে কাছাকাছি আসতেই টর্চের তীব্র আলো পড়ল শেখরের মুখে।

শেখর চকিতে উঠে দাঁড়াল। ডান হাতটা ঢুকে গেল তার প্যান্টের পকেটে। ক্ষুদ্রকায় আগ্নেয়াস্ত্রটির শীতল ধাতব বাটটা আঁকড়ে ধরল আঙুল।

আগন্তুক দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ। পরনে হাওয়াই শার্ট ও ফুলপ্যান্ট। মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । তবে মনে হচ্ছে, তারই বয়সি যুবাপুরুষ ও ভদ্রসন্তান। শেখর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে নিল লোকটিকে, মনের গহনে হাতড়ে দেখল ওই মুখ, ওই ভঙ্গি তার পরিচিত কিনা। কৃপালসিংকে বিশ্বাস নেই। তার জাল যে কত বিস্তৃত শেখর তা জানে।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কে ?

না, লোকটিকে চেনা বলে মনে হচ্ছে না। সাদামাটা মুখ, শ্যামলা রং, বড় বড় চোখ দুটোয় কৌতূহল।

সহজভাবে শেখর উত্তর দিল, এই বাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু বাড়ি তালাবন্ধ। বোধহয় বেরিয়েছেন ব্রজদাদু। তাই অপেক্ষা করছিলাম।

এবার শেখরের হাতের ব্যাগটার ওপর আগন্তুকের দৃষ্টি পড়ল—আপনি কি বাইরে থেকে এসেছেন বেড়াতে?

—কিন্তু ব্রজগোপালবাবু তো তিন-চার দিন হল কাশী চলে গিয়েছেন। মাস ছয় থাকবেন শুনেছি। আপনি জানতেন না বুঝি?

না তো। -শেখর রীতিমতো অবাক। ব্রজদাদু হঠাৎ চলে গেলেন কেন? যাক, শেষ আশ্রয়ের ভরসাটুকুও মিলিয়ে গেল।

এবার কী কর্তব্য? কোথায় যাবে সে? বিপুল হতাশা তার দেহ-মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে । জড়িয়ে ধরল। | শেখরকে চুপ করে থাকতে দেখে আগন্তুক যুবক প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাবেন এখন? চেনা-শোনা আছে কেউ এখানে?

–না। দেখি কোনো হোটেল-টোটেলে....

—তাই তো, মুশকিল হল। এখন ফিরতে গাড়িটাড়ি কিছু পাবেন কিনা সন্দেহ। তারপর রাতে হোটেল খোঁজা...

শেখর নীরব।

একটা কাজ করতে পারেন। পথচারী একটু ইতস্তত করে বললেন, চলুন আমাদের বাড়িতে। একটা রাত কাটিয়ে দেবেন।

শেখর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, ব্যাপার কী? কিন্তু আগন্তুকের চোখে মুখে আতিথ্য-প্রদর্শনের নিছক সরল আগ্রহ ছাড়া আর কিছু তো আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। প্রায় চার মাইল হেঁটে বাজার অঞ্চলে ফেরার কল্পনায় শ্রান্ত শরীর বিদ্রোহ জানাল। অগত্যা সে বলল, বেশ চলুন। কোন্ দিকে? মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট নিচ্ছেন।

—বিন্দুমাত্র নয়। আর একটু যেতে হবে। অবশ্য আপনার হোটেলের চেয়ে ঢের কাছে। যেতে যেতে যুবক জিভেস করলেন, কোত্থেকে আসছেন? জামশেদপুর। ইচ্ছে করে মিথ্যে বলল শেখর। যুবক বললেন, আমার নাম মৃগাঙ্ক দত্ত। এখানে তিন বছর আছি। এক ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করছি। বাধ্য হয়ে শেখরকে তার পরিচয় দিতে হল।

—আমি শেখর মিত্র। সেলস্-এ চাকরি করি। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম ক'দিন রেস্ট নেব ব্রজনাপুর বাড়িতে। তা কপাল খারাপ।

নামটা ভুল না বললেও পদবিটা পালটেছে শেখর। সে মিত্র নয়, সরকার। আর জীবিকা? সামান্য সেলসম্যান। সুরভি ইনডাস্ট্রিজ-এর প্রশাধন দ্রব্য বিক্রি করে

ঘুরে ঘুরে। বাইরের লোক সেটাই জানে। কিন্তু তার আসল রূপটি টের পেলে এই নিরীহদর্শন যুবক কি তাকে যেচে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেত না।

আধ মাইলটাক এগিয়ে পিচ রাস্তা থেকে হাত পঞ্চাশ বাঁ দিকে নেমে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা এক বাড়ির গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে।

দু'পাশে ছোট-বড় গাছের ভিড়। মাঝখানে সুরকি-বিছোনো পথ ধরে এগোতে এগোতে শেখর দেখল, সামনে প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ি। বাড়ির ওপর ও নিচের তলায় কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। ওরা আধো অন্ধকার উঠোনে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে সারমেয়কণ্ঠের গভীর গর্জনে কেঁপে উঠল নিশীথের স্তব্ধতা। পরক্ষণেই যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল এক বিশাল অ্যালসেশিয়ান। তার রুপোলি-লোমভরা গায়ে আলো পড়ে যেন পিছলে যাচ্ছে। জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ সবুজ দু'টি চক্ষুতারকা।

মৃগাঙ্কবাবু মৃদু ধমক দিতেই কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল আড়ালে।

বুধন।—ডাকলেন মৃগাঙ্কবাবু।

এবার প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো চত্বরের কোণ থেকে এগিয়ে এল এক বিভীষণ মূর্তি নিঃশব্দ পদে। লোকটা অন্তত সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মুখখানা কুৎসিত। থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট, ঝাকড়া চুল। তার ওপরে একটা চোখ নষ্ট। ওই চোখটার মণি য্যাটম্যাটে সাদা অন্য চোখটা লালচে কুতকুঁতে। একখানা শুধু খাটো ধুতি পরনে, দৃঢ় পেশিবদ্ধ দেহে দানবীয় শক্তির ইঙ্গিত।

মুহুর্তে শেখর সতর্ক হয়ে উঠল এক অশুভ সম্ভাবনায়। রহস্যময় বাড়ি, রহস্যময় এর বাসিন্দারা। ডাক্তারের পরিবার-পরিজন কোথায়? কোনো মহিলা বা ছোট ছেলের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কেন! সবাই কি শুয়ে পড়েছে? রাত তো এমন কিছু বেশি হয়নি। মৃগাঙ্কবাবুকে ও যতটা সরল বলে ভেবেছে, সত্যি কি তা-ই?

যাই ফিরে? কিন্তু শেখর যেন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। একটি উষ্ণ কোমল শয্যায় গা ঢেলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার শরীর উদগ্রীব। যা হয় হবে, দেখা যাক।

কোনো ফাঁদে পা দিলাম না তো? এর চেয়ে বরং ব্রজদাদুর বাড়ির বারান্দায় শুয়ে রাত কাটানো বা হেঁটে বাজার অঞ্চলে গিয়ে হোটেল খোঁজা বুদ্ধিমানের কাজ হত।

মৃগাঙ্কবাবু সেই ভয়ালদর্শন লোকটিকে বললেন, বুধন, ওপরে গেস্ট-রুমে বিছানা করে দাও। ইনি থাকবেন রাত্তিরে।

আস্তে মাথা ঝাকিয়ে বুধন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

চলুন ওপরে। —ডাকলেন মৃগাঙ্কবাবু। সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল তারা। শেখর লক্ষ করল, বাড়িখানা পুরনো আমলের, তবে মজবুত।

দোতলার একটা ছোট্ট ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, বসুন। বিশ্রাম নিন। কী খাবেন? রুটি, না ভাত?

—কিচ্ছু না। ক্ষিদে নেই মোটে। মৃগাঙ্কবাবুর ভ্রু কুঁচকে গেল

—আপনার শরীর খারাপ নাকি?

-না, না, একটু মাথা ধরেছে। রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

বেশ তবে শুয়ে পড়ুন। ঘরখানায় এবার চোখ বুলিয়ে নিল শেখর। সিঙ্গল-বেডের পরিচ্ছন্ন বিছানা, অল্প ক'টি আসবাব, লাগোয়া বাথরুম।

কিছু দরকার আছে?—মৃগাঙ্কবাবু জানতে চাইলেন।

—না ধন্যবাদ।

আচ্ছা, চলি তবে। গুড নাইট। —মৃগাঙ্ক দত্ত বিদায় নিলেন।

দরজার ছিটকিনিটা ভাঙা। কী ব্যাপার? একটা টেবিল টেনে এনে শেখর ভেজা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। বারান্দার দিকের জানলা বন্ধ করল। শুধু বাইরের দিককার জানলাটা রইল আধখোলা। সাবধানের মার নেই। তারপর তড়িঘড়ি জুতো-মোজা, পোশাক-আশাক খুলে রাতের পাজামাটা গলিয়ে নিয়ে, ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। রিভলভারটা ঢুকিয়ে রাখল পাশে টুলের ওপরে রাখা ব্যাগের মধ্যে। চোখ বুজল শেখর।

দুই

অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে কানে অর্থহীন, দুর্বোধ্য। | একটু একটু করে চেতনা ফিরে পায় শেখর, ঘুম ভাঙে। কপালে হাত দিয়ে মনে হল, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। দরজায় জোরে জোরে টোকা দিচ্ছে কেউ-শেখরবাবু, ও শেখরবাবু, চা এনেছে।

মৃগাঙ্কবাবু ডাকাডাকি করছেন। টলতে টলতে উঠে টেবিল সরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে শেখর এসে বিছানায় বসে পড়ল।

উঃ, আচ্ছা ঘুম আপনার। ভোরে ডেকে দিতে বললেন কেন কাল? নইলে বিরক্ত.. —মৃগাঙ্ক দত্তর কথা আটকে গেল।

কী ব্যাপার? কী হয়েছে? তিনি শেখরের হাত চেপে ধরলেন—উঃ, এ যে ধুমজ্বর! শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন।

একটু বাদে অপরিচিত গম্ভীর মৃদু কণ্ঠের কথা শুনে শেখর চোখ মেলল। বিছানার ধারে মৃগাঙ্কবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়। গায়ে কমলা রঙের ড্রেসিং গাউন। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। মোটা ফ্রেমের চশমার পুরু কাচের পিছন থেকে ঝকঝকে দুই চোখের দৃষ্টি শেখরের ওপর নিবদ্ধ। উচ্চতা মাঝারি। গৌরবর্ণ শীর্ণ চেহারা। চওড়া কপাল, উন্নত নাসা ও চাপা ঠোঁটে ব্যক্তিত্ব ও মনীষার সাক্ষ্য।

মৃগাঙ্কবাবু লোকটিকে স্যার বলে সম্বোধন করে কী জানি বললেন। ইনিই তাহলে সেই ডাক্তার ডাক্তার ব্যানার্জি। এই বাড়ির মালিক।

শেখর আবার চোখ বোজে। স্টেথোস্কোপের শীতল স্পর্শ অনুভব করে বুকে-পিঠে। কেমন ঘোর-ঘোর লাগে তার। দু-চারটে অস্ফুট কথাবার্তা কানে আসছে। কিন্তু কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারে না তার দুর্বল মস্তিষ্ক। একবার মৃগাঙ্কবাবু একটু জোরে বললেন শেখরকে, আপনার বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার। ঠিকানাটা বলুন তো। কাকে খবর দেব?

না, না, তার দরকার নেই। -শেখর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

পাঁচদিন পরে শেখরের জ্বর ছাড়ল। অসুখের প্রথম দু-দিন সে জ্বরের ঘোরে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছিল। এই পাঁচটা দিন তার জীবনে যেমন কষ্টের, তেমনি সুখের।

অসুখ-বিসুখে শেখর বহুকাল ভোগেনি। তাই নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হচ্ছিল।

তাছাড়া বিদেশ-বিভুঁইয়ে এমন পঙ্গু হয়ে পড়ার ভাবনা। তার ওপর শারীরিক কষ্ট। যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো ছিড়ে যাচ্ছিল যেন। কিন্তু এমন সেবা-যত্নও সে বহুকাল পায়নি।

মৃগাঙ্কবাবু দিনের বেশিরভাগ সময় দরজার গোড়ায় চেয়ারে বসে বই পড়তেন আর নজর রাখতেন রোগীর ওপর। ওষুধ ও পথ্য খাওয়ানো, জ্বরতপ্ত কপালে জলপট্টি দেওয়া ইত্যাদি রোগীর প্রায় যাবতীয় পরিচর্যা তিনি করতেন। এছাড়া এক বয়স্কা পরিচারিকাও দেখাশোনা করত। তার নাম কালোর মা। ডাঃ ব্যানার্জিও আসতেন মাঝে মাঝে, পরীক্ষা করতেন রোগীকে।

জ্বরের সময় এক দুপুরে একটা কথা মনে পড়ে যেতে শেখর চমকে উঠেছিল। চেয়ে দেখল, তার ব্যাগটা ঘরের কোণে টেবিলের ওপর রয়েছে। দরজা ভেজানো, ঘরে কেউ নেই। এ-ই সুযোগ। কোনোরকমে উঠে গিয়ে সে ব্যাগটা খুলল। চাবি লাগানো নেই। প্রথম রাতে চাবি দেওয়া হয়নি, তেমনই আছে।

রিভাললাভারটা? হ্যা, রয়েছে ওপরে। ব্যাগ ঘেঁটেছিল কি কেউ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে।

খবরের কাগজে জড়িয়ে রিভলভারটা ও রেখে দিল জামা-কাপড়ের একদম তলায়। তারপর চাবি দিয়ে দিল ব্যাগে।

জ্বুর ছেড়েছে, কিন্তু শেখরের শরীর বেজায় দুর্বল। আরও কয়েকদিন সে ঘোরাঘুরি করার শক্তি পাবে না। তার জ্বর ছাড়ার পরদিনই মৃগাঙ্কবাবু কোথায় যেন গিয়েছিলেন দু’দিনের জন্যে। কালোর মা বলেছিল, কাজে বাইরে গেছে।

তিন-চার দিন পরে শেখর অল্প অল্প বাইরে বসা ও হাঁটাহাঁটি শুরু করল। মৃগাঙ্কবাবু বেশ আমুদে প্রাণখোলা মানুষ। শেখর বলেছিল, আপনাদের শুধু শুধু বিব্রত মৃগাঙ্কবাবু থামিয়ে দিলেন—ফের ওই কথা। শরীরটা কিন্তু সারিয়ে যেতে হবে।

মৃগাঙ্ক দত্তর বাড়ি নাকি দুর্গাপুর। উনি নিজেও পাশ-করা ডাক্তার। দেখে মনে হয়, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

মৃগাঙ্কর মতো উচ্চশিক্ষিত মার্জিত লোকদের শেখর পছন্দ করে না। ওর মনের ভিতর এদের সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলে। এরা সফল, সুখী, আরামে লালিত। এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শেখরের মতো দারিদ্র্য ও অপমানের সঙ্গে এদের বুঝতে হয়নি, হবেও না কখনও। সংসারে এইরকম ভগবানের অনুগ্রহপুষ্ট জীবগুলিকে শেখর ঘৃণা করে। এরা শেখরকে বড়জোর স্বার্থসিদ্ধির আশায় খাতির করতে পারে, করুণা করতে পারে, কিন্তু ভালোবেসে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। তাই মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে বেশি ভাব জমাতে তার আগ্রহ নেই। যদিও একটা কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে। শেখরের সঠিক পরিচয় পেলে এখুনি ওঁর ভদ্রতার মুখোশ খুলে যাবে, এটা সে জানে। উনি নিশ্চয়ই শেখরকে তার সমগোত্রীয় কেউ ঠাউরেছেন, শেখরের চেহারা, পোশাক বা চালচলনে ভুল বুঝেছেন।

তবে মৃগাঙ্কবাবু বা ডাক্তার ব্যানার্জি দু'জনেই সত্যি ভদ্র এবং তাদের অহেতুক কৌতূহল কম। শেখরের আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার আর প্রশ্ন তোলেননি, শেখর বলতে অনিচ্ছুক বুঝে। তা, কটা দিন এখানে কাটাতে পারলে মন্দ হয় না।

এখানে থাকবার ব্যাপারে বিচিত্রভাবে প্রস্তাব এল স্বয়ং ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে।

এসে দাড়ালেন—কেমন আছ শেখর ?

সকালে বারান্দায় বসে ছিল শেখর, ডাঃ ব্যানার্জি এসে দাড়ালেন—কেমন আ শরীরে জোর পাচ্ছ তো?

শেখর উঠে দাঁড়াল।

বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে—ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে বসান সামনে- শোনো শেখর, তোমার শরীরে একটা মারাত্মক গোলযোগ আবিষ্কার করেছি। এক্ষুনি ট্রিটমেন্ট না করাও, তবে কিছুদিনের মধ্যেই রোগ সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

শেখর আঁতকে উঠল—মানে এই অসুখ থেকে বুঝি!

-না, না, এই অসুখ তেমন কিছু নয়। খারাপ ধরনের ফ্লু হয়েছিল। সেরে গিয়েছে। আরও কটা দিন রেস্ট নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

শেখরের মনে পড়ে গেল, তার বাঁ দিকের পাঁজরায় মাঝে মাঝে একটা ব্যথা ওঠে। বছর সাত আগে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিল বলের। হয়তো তা-ই থেকেই...সে ঢোক গিলে বলল, কী অসুখ?

—নাম শুনে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না। আমি এখন বলতেও চাই না পেশেন্টকে। তোমার চিকিৎসা আমি নিজেই করতে চাই। আমার ধারণা, আমি তোমায় সারিয়ে তুলতে পারব। আমি যদি না পারি, ভারতবর্ষের কেন পৃথিবীর অন্য কোনো ডাক্তার তোমার এই রোগ সারাতে পারবে কি না সন্দেহ। করবে চিকিৎসা? ট্রিটমেন্টে অন্তত তিন মাস সময় নেবে।

শেখর থতমত খেয়ে গেল। একটা অজানা আতঙ্ক তার বুকে চেপে বসে। ডাঃ ব্যানার্জিকে তো বাজে বকার লোক বলে মনে হয় না। মৃগাঙ্কবাবুর মুখে শুনেছে, ডাঃ ব্যানার্জি একজন নামকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। একসময় ডাক্তার হিসাবে বিপুল পসার ছিল। কিন্তু হঠাৎ প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে এখন কেবল রিসার্চ নিয়ে ডুবে আছেন। এই কাজে মৃগাঙ্ক। দত্ত তার সহকারী। সুতরাং ডাঃ ব্যানার্জির মতামত উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমতা আমতা করে বলল শেখর, সারবে তো?

—সারবে বইকি, নিশ্চয় সারবে। আর যদি নাও সারে, এখন যে অবস্থায় আছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু হবে না। মাস তিনেকের মধ্যেই বুঝতে পারব আমার ট্রিটমেন্টের ফলাফল। যদি ফেল করি, তোমার রোগের নামটা বলে দেব। তখন অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে পার ইচ্ছে হলে।

আমায় কি মাঝে মাঝে এখানে আসতে হবে?—শেখর জিজ্ঞেস করল। —না, কারণ তোমায় এখানেই থাকতে হবে। —এখানে! কিন্তু এখানে তো কেউ চেনা নেই আমার। —বেশ, তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে। এ চিকিৎসা দূরে থেকে হয় না। -খরচ-পত্তর, টাকাকড়ি? —সে তোমায় ভাবতে হবে না।

—আমি দু'দিন ভেবে দেখি ডাক্তারবাবু। চাকরি রয়েছে, তাছাড়া আরও দু-একটা কাজ..

—অলরাইট, দেখ ভেবে। তাড়াহুড়ো নেই। যদি রাজি থাক, চার-পাঁচ দিন পরে ট্রিটমেন্ট শুরু হবে।

ডাঃ ব্যানার্জি বিদায় নিলেন।

শেখরের মনে দুর্ভাবনা দানা বেঁধে ওঠে। এ কোন অজানা ভীষণ ব্যাধি তার দেহে বাসা বেঁধেছে? ভয়ে সে দিশাহারা বোধ করে। একটা সন্দেহ জাগে। তাকে এখানে আটকে রাখার, ফাঁদে ফেলার টোপ নয় তো এটা? কিন্তু তাহলে অসুখের সময় এরা এত যত্ন করবেন কেন? বুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। শেখর ঠিক করল, প্রথমে এই বাড়ি এবং এর অধিবাসীদের খুঁটিয়ে লক্ষ করা দরকার।

ডাক্তার কুঠিতে—ডাক্তার কুঠি নামটা এই বাড়ির চলতি স্থানীয় নাম—একতলাদোতলা মিলিয়ে দশ-বারোটা ঘর। চারধারে বিরাট কম্পাউন্ড। বাগানের মধ্যে একটা আউট হাউস ও পরিচারকদের কয়েকটি ঘর। দোতলায় দক্ষিণমুখী টানা বারান্দা।

দোতলায় থাকেন ডাক্তার ব্যানার্জি এবং মৃগাঙ্কবাবু। ডাক্তারের শয়নকক্ষের গায়ে এক প্রকাণ্ড ঘরে ল্যাবরেটরি। পাশের ঘরে লাইব্রেরি। নিচের তলায় বাস করে বাড়ির কয়েকজন। কয়েকখানা ঘর তালাবন্ধ থাকে।

প্রশস্ত ছাদ। ছাদের সিঁড়ির মাথায় চিলেকোঠায় তানেক খাঁচা। গিনিপিগ, ইদুর, বাঁদর ইত্যাদি নানারকম জীব-জন্তু বন্দি রয়েছে খাচাগুলোয়। ল্যাবরেটরিতে একবার উকি দিয়েছিল শেখর। ঘরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, সারি সারি তাক ও লম্বা লম্বা টেবিল, অজস্র শিশি-বোতল, টেস্টটিউব সাজানো। সাদা অ্যাপ্রন-পরা ডাঃ ব্যানার্জি মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে মগ্ন। কীসের তীব্র কটু গন্ধ এল নাকে, কোনো ওষুধ বা অ্যাসিডের গন্ধ বোধহয়। বাড়ির লোকদের ভালো করে নজর করে শেখর। খবরাখবর নেয় যতদূর সম্ভব।

বাড়িতে ডাঃ ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কবাবু ছাড়া থাকে কালোর মা, কালো, বুধন, ফাগুলাল, দীননাথ ঘোষ এবং অ্যালসেশিয়ান কুকুর-রাজা।

ডাঃ ব্যানার্জি সম্পর্কে শেখর বিশেষ কিছু জানতে পারেনি। শুধু জেনেছে, তিনি সংসারে প্রায় একা, স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ছেলে-পুলে নেই। আগে থাকতেন কলকাতায়। বছর চারেক দেওঘরে এসেছেন। ডাক্তার প্রায় সারা দিন এবং গভীর রাত অবধি ল্যাবরেটরিতে কাটান। মামুলি কথা বা গল্প করেন দৈবাৎ। সর্বদা গম্ভীর। কখনও কখনও বারান্দায় বসে চুপচাপ পাইপ টানেন।

কালোর মা রান্না-বান্না করে। প্রৌঢ়া। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। কিন্তু সমানে বকবক করে চলেছে নিজের মনে।।

কালো দশ-বারো বছরের ছেলে। ভারি দুষ্ট, ছটফটে। সারাটা দিন হুটোপাটি করে বেড়ায়। কালোর মা সর্বক্ষণ ছেলেকে সামলাচ্ছে। কালোর মিষ্টি মুখখানি হাসি-খুশিতে জুল। অ্যালসেশিয়ান কুকুর রাজার সঙ্গে তার বেজায় ভাব এবং খুনসুটি।

বুধন হল সেই কদাকার দর্শন ভৃত্য। অদ্ভুত নিঃশব্দ তার চলাফেরা। মুখে কথা শোন। যায় কদাচিৎ।

ফাগুলাল মালী। সুশ্রী সুগঠিত চেহারা। বছর ত্রিশ বয়স। কাধ-ছোঁয়া ঘন বারবি। ডান গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন মুখখানাকে একটু বিকৃত করেছে। নইলে অনায়াসে এতে যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুর সাজানো চলত। বাগান করা ছাড়াও সে বাঁশ ও তালপাতা দিয়ে মোড়া, টুকরি ইত্যাদি জিনিস বানায়। নিজের মনে থাকে, গুনগুনিয়ে গান গায়। দীননাথবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। বেশ সপ্রতিভ চটপটে ব্যবহার। ঘড়িঘর মানে বাজার অঞ্চলে তার একটা ছাপাখানা আছে। রোজ সকালে বেরোন, রাতে ফেরেন। কালোর মা বলেছে, দীননাথবাবু লোক ভালো। খুব অভাবে পড়েছিলেন। ডাক্তারবাবু ব্যবসা করতে টাকা দিয়েছেন। দু'বছরের মধ্যে ব্যবসা বেশ বাড়িয়ে ফেলেছেন। বউছেলে-মেয়েরা থাকে দেশের বাড়ি বারাসতে।

রাজা দিনের বেলা সাধারণত ছায়ায় পড়ে ঘুমোয় বা ঝিমোয়। খুব কমই সে চেয়ে বাঁধা থাকে। বেশির ভাগ সময় থাকে খোলা। কখনও কখনও মৃগাঙ্কবাবু বা ডাক্তারের কাছে এসে একটু দাঁড়ায়, আদর খায়। রাতে সারা বাড়ি টহল দেয়। কালোকে খুব ভালোবাসে। ওকে এত জ্বালাতন করে ছেলেটা—কান টানে, ঘাড়ে চড়ে, তবু চটে না। বেশি ব্যতিব্যস্ত করলে গুটিগুটি সরে পড়ে।

দোতলার বারান্দায় টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন রয়েছে। শেখর মৃগাঙ্কবাবুকে জিজ্ঞেস করল, একটা ফোন করতে পারি? ট্রাংক কল।

-কোথায়?

-কলকাতায়, আমার অফিসে। দেখি ছুটির কী ব্যবস্থা করা যায়।

-হা হা, নিশ্চয়ই করবেন। সুযোগ খুঁজছিল শেখর। সকাল ন'টা নাগাদ ডাক্তার এবং শেখর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই সে বন্ধুর দোকানের নাম্বার বুক করল।

শিয়ালদার কাছে স্টেশনারি দোকান আছে বন্ধুর। কিন্তু সে গোপনে চোরাই মালের বেচাকেনা করে এবং শেখরের বিশ্বস্ত অনুচর। ঘণ্টাখানেক পর লাইন পাওয়া গেল।

—হ্যালো, বন্ধু আছে?

-আমি বন্ধু বলছি।

—আমি শেখর।

..হ্যাল্লো বস্, তুমি! আমি তো ভাবলাম....

-কী?

-মানে হাপিস হয়ে গেলে বুঝি! কোথায় আছ এখন? উঃ, খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।

—ঠিকানাটা পরে জানাব। আপাতত বল অফিসের খবর কী?

অফিস?

আঁ! বন্ধু ভ্যাবাচ্যাকা খায়। শেখর আবার অফিস বসাল কবে? যে কোম্পানিতে শেখর চাকরি করে, তাদের অফিস-কাছারি নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা, আছে বলে তো জানে না। কিন্তু বন্ধু ধুর্তের শিরোমণি। চট করে বুঝে নিল, শেখর রেখেঢেকে ইঙ্গিতে কথা বলছে। কাছাকাছি হয়তো কেউ আছে। সে জবাব দিল, অফিসের খবর মানে কারবারের গতিক ভালো নয়। সিংয়ের গ্যাঙ তোমায় খুজছে। খুব সাবধান!

—জানি।

কলকাতা থেকে এখন কিছুদিন দূরে থাক বস্।

—হম্। কয়েকটা কাজ করে রেখ। ইদ্রিস শেখকে বলবে, ও যদি আমার হয়ে কাজ করতে রাজি থাকে, দু'গুণ কমিশন পাবে। আর গোমেজকে বলবে, ব্রীজরামকে সিং ভাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছে। বুঝেছ?

-রাইট বস্।

সিড়িতে কার পদশব্দ? শেখর তক্ষুনি গলা চড়িয়ে বলল, শোন, ম্যানেজারকে বলবে, আমি খুব অসুস্থ। ট্রিটমেন্টের জন্যে ছুটি চাই। অন্তত দু-তিন মাস। দরখাস্ত পাঠাচ্ছি। একটু বুঝিয়ে বোলো প্লিজ! তুমি বললেই হবে।

'কালোর মার আবির্ভাব ঘটল। হাতে ট্রেতে দু'কাপ ধুমায়িত চা। সে ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে গেল।

ওদিকে বন্ধু আবার ধাঁধায় পড়েছে। হঠাৎ এক ম্যানেজারের আমদানি হল কোথেকে। তবু সে সামলে নিয়ে বলল, ইয়েস বস।

শেখরের অবশ্য অফিসের ম্যানেজারকে খবর দেওয়ার আপাতত কোনো দরকার নেই। কারণ কলকাতা ছাড়ার সময়ই সে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে ডাকে।

কালোর মা ল্যাবরেটরিতে ঢুকল।

আচ্ছা, আজ রাখছি বন্ধু, পরে খবর দেব।—শেখর রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

চোরাচালানকারী কৃপাল সিংয়ের দাপট সে এবার চূর্ণ করবেই। এই কৃপাল সিংয়ের হয়ে সে ইদানীং নিষিদ্ধ নেশার বস্তু পাচার করত নানা জায়গায়। কিন্তু লোকটা হাড়কিপটে। কাজ হাসিলের পর রেট-মাফিক পারিশ্রমিক দিতে চাইত না। অসন্তুষ্ট শেখর তাই নিজে ' স্বাধীনভাবে এই ব্যবসা করার মতলব আঁটে। ছোটখাটো একটা দল তার ইতিপূর্বে ছিল। খবরটা পৌঁছে যায় সিংয়ের কানে। সে শেখরকে ডেকে পাঠায় তার আস্তানায়'। শাসায়— ফের এমন আস্পর্ধা দেখলে চাবকে তোমার চামড়া তুলে নেব।

সামনাসামনি প্রতিবাদ করতে সাহসে কুলোয়নি, কিন্তু রাগে শেখরের রক্ত টগবগ করে। উঠেছিল। চোখরাঙানিতে মাথা নোওয়াবার পাত্র সে নয়। কয়েকদিন পরে সিংয়ের এক গুপ্ত আড্ডায় পুলিশ হানা দিয়ে উদ্ধার করে বহু টাকার কোকেন। সিংয়ের দলের দু'জন গ্রেফতার হয়। সিং আঁচ করে, শেখরই পুলিশকে খবর জানিয়েছে বেনামী চিঠি দিয়ে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে শেখরকে খুন করার চেষ্টা হয়। বেশি রাতে ঘরে ফিরছিল সে। একটা মোটর ফুটপাথ ঘেঁষে আস্তে এগিয়ে এল তার পিছনে। সদাসতর্ক শেখর।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, গাড়ির জানালায় উকি মারছে চকচকে রিভলভ মহর্তে সে দৌড়তে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে দু-দু'বার গুলি ছোড়ার শব্দ। আছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাক। পরদিনই ভোরে শেখর কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়।

গুন্ডা ইদ্রিস শেখকে লোভ দেখিয়ে দলে ভেড়াতে পারলে অনেকটা জোর পাবে? আর গোমেজের সঙ্গে সিংয়ের যদি একটা খিটিমিটি বাধিয়ে দেওয়া যায়, তো কেল্লা গ্রত গোমেজও চোরাকারবারি। খিদিরপুর ডক এলাকায় তার রাজত্ব। দুর্দান্ত গোঁয়ার। তাই সাকরেদ ব্রীজরামকে সিং দলে টানবার চেষ্টা করছে জানলে গোমেজ ছেড়ে কথা কইরে

যাক, আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। আত্মগোপনের এমন চমৎকার। জায়গা আর পাওয়া যাবে না। সেইসঙ্গে রোগের চিকিৎসাটাও হয়ে যাক মুফতে।

বিকেলে শেখর ডাঃ ব্যানার্জিকে জানাল, অফিসে ছুটি নিলাম। আমি চিকিৎসা করাতে চাই আপনার কাছে।

তিন

শেখরের চিকিৎসা শুরু হল।

দৈনিক একটা করে ইঞ্জেকশন, তাছাড়া দুটো করে খাওয়ার পিল। অনেকখানি তরল গাঢ় হলুদরঙা পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হত তার শিরায়। সাতদিনে ইঞ্জেকশনের কোর্স শেষ হল। কিন্তু পিলটা চলবে সপ্তাহে একটা করে আরও দু মাস।

শেখরের দেহ থেকে রক্ত ইত্যাদির নমুনা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল কয়েকদিন। তবে কী ওষুধ, কী রোগ, শেখর তার কিছুই জানতে পেল না। কয়েকবার সে জিজ্ঞেস করেছিল ডাঃ ব্যানার্জিকে তিনি বলেছিলেন, পরে জানতে পারবে।

চিকিৎসা চলার সময় কেমন ঝিমুনি ভাব আসত। ক্লান্তি বোধ হত। ক্রমে শেখর চাঙ্গা হয়ে উঠল। দিনে দিনে শুধু যে তার শরীর সুস্থ হতে থাকল তা-ই নয়, মনও তার একটা উৎফুল্ল প্রশান্তিতে ভরে উঠল। প্রথম প্রথম সে বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতর ঘোরাঘুরি করত, তারপর সে বাড়ির বাইরে বেরোতে আরম্ভ করল। অবশ্য শহর-বাজারের দিকে সে বড় একটা যেত না-লোকজনের ভিড় ওর পছন্দ নয়। তাছাড়া যদি হঠাৎ চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

এই অঞ্চলের উদার প্রকৃতি, বনময় গিরিশ্রণি বন্ধুর রুক্ষ লালমাটির বুকে শাল-মহুয়াতাল-খেজুরের সারি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগন্তরেখায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপূর্ব বর্ণালি—এইসব দৃশ্য চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে সাধ হয় শেখরের। যদি একটা ক্যামেরা পাওয়া যেত! একসময় খুব ফোটোগ্রাফির শখ ছিল তার।

মৃগাঙ্কবাবুকে বলতে তিনি বললেন, আমার একটা আছে, তবে খারাপ। সারানো হয়নি।

—কই, দেখি। ক্যামেরাটা নিয়ে দেখল শেখর! ভালো জিনিস। জাপানি ইয়াসিকা-৬৩৫। ক্যামেরাটা সে খুলল। দু দিন ধরে মন দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝল, বিশেষ কিছু নষ্ট হয়নি, এক-আধটা ছোট্ট পার্টস শুধু বদলানো দরকার। বাজারে গিয়ে ক্যামেরার দোকানের খোঁজ করে সে ওইসব পার্টস কিনে লাগিয়ে নিল। ব্যস এবার ছবি উঠবে। কয়েক রোল ফিল্মও কিনে আনল শেখর তারপর অনেক ছবি তুলল এবং নিজেই ডার্ক-রুম বানিয়ে ছবি ডেভেলপ করল। হাতে প্রচুর অবসর। কিছু করার জন্যে শেখর ছটফট করে।

একটা বড় দেয়াল-ঘড়ি ঝোলে ওপরের বারান্দায়। বড্ড স্লো যাচ্ছে ঘড়িটা। শেখর সেটা নামিয়ে খুলে তেল দিয়ে, সামান্য টুকিটাকি করতেই ঘড়িটা দিব্যি সঠিক সময় জানাতে লাগল।

দেখে-শুনে মৃগাঙ্কবাবু তাজ্জব। বললেন, বাঃ, আপনার কলকজার মাথা তো খুব সাফ! আর ফোটোগ্রাফির হাতটিও চমৎকার। টাইম-পিস সারাতে পারেন?

—চেষ্টা করতে পারি। মৃগাঙ্কবাবু একটা বন্ধ টাইম-পিস্ ঘড়ি হাজির করলেন। তিন দিনের মধ্যে শেখর ঘড়িটা চালু করে ফেলল। বহু যত্নে নানারকম ছোটখাটো যন্ত্রপাতির কাজ শিখেছে ও নিজে নিজে। কখনও শখে, কখনও প্রয়োজনের

তাগিদে। এ বিষয়ে সত্যি তার প্রতিভা আছে। তার নিজের উদ্ভাসিত একগোছা তারের যন্ত্র থাকে তার ব্যাগে, অতিদুরূহ তালা বা সিন্দুক সহজেই খোলা যায় তাদের সাহায্যে।

শেখরের ছেলেবেলার আর একটি শখ এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—ছবি আঁকা। একবাক্স জল-রং ও আঁকার কাগজ কিনে ফেলল ও। বাগানে আউট হাউসের একটা খালি ঘর হল তার স্টুডিও। নানারকম মেরামতি নিয়ে বা ছবি এঁকে সে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেয় এই ঘরে। | ডাঃ ব্যানার্জির কাজে ছুটি পেলে মাঝে মাঝে মৃগাঙ্কবাবু আসেন আড্ডা দিতে। একদিন তাকে প্রশ্ন করল শেখর, আচ্ছা, ডাক্তার ব্যানার্জি কী নিয়ে রিসার্চ করছেন?

একটু চুপ করে থেকে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, বিষয়টা জটিল। এখন বলতে পারব না, মাপ করবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, ওঁর সাধনা সফল হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তা এক যুগান্তকারী ব্যাপার হবে।

ডাঃ ব্যানার্জি সম্বন্ধে একটা কথা প্রায়ই মনে হয় শেখরের—লোকটি যেন চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছি এই মুখ, কিংবা পরিচিত কারো সঙ্গে এই মুখের ভারি আদল। কিন্তু কার সঙ্গে! কিছুতেই সে মনে আনতে পারে না।

একদিন ডাক্তার কুঠিতে শেখর একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করল। নিচের তলায় একটা ঘর সব সময় তালাবন্ধ থাকে। একদিন শেখর দেখে, সেই ঘরটার দরজা খোলা, ভিতরে কালোর মা এবং মৃগাঙ্কবাবু। শেখর উকি মারল।

ঘরে লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপর বড় বড় কাচের বাক্স অর্থাৎ শো-কেস। শো-কেসের মধ্যে নানারকম মূর্তি। কালোর মা ঝাটা দিয়ে ঘরের ধুলো ও ঝুল সাফ করছে। মৃগাঙ্কবাবু শেখরকে ডাকলেন—ভিতরে আসতে পারেন, তবে বড় নোংরা।

শেখর ভিতরে ঢুকল। মূর্তিগুলো দেখে সে রীতিমতো অবাক। পনেরো-যোলোটা বড় প্রাচীন ধাতু বা কাঠের দেব-দেবীর মূর্তি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের।

শেখর জানতে চাইল—এগুলো কার?

—ডাক্তার ব্যানার্জির সংগ্রহ। একসময় খুব ঝোক ছিল স্যারের পুরনো মূর্তি জেলা করার। অনেক টাকা খরচ করেছেন এর পিছনে। আজকাল গবেষণা নিয়ে

স্যার এমন বাত থাকেন যে, এগুলো আর চেয়েও দেখেন না। আমি বলি, "দিয়ে দিন কোনো মিউজিয়ামে।"

তা-ই নাকি?—শেখর এমন ভাব দেখাল যেন এই বিষয়ে সে নেহাতই অজ্ঞ। আসলে কিন্তু সে এইরকম মূর্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিছুদিন সে এক প্রত্নদ্রব্যের চোরাচালানকারী দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তখন ভালো করে চিনেছিল মূল্যবান প্রাচীন মূর্তির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য।

একটা বিষ্ণুমূর্তির সামনে গিয়ে শেখর থ। ফুটখানেক উঁচু অষ্টধাতুর মূর্তিটা। অন্তত হাজার-বারোশো বছরের পুরনো। এ জিনিস বিদেশিদের কাছে বিক্রি করতে পারলে, কমসে কম বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা মিলবেই।

নির্বিকারভাবে মূর্তিগুলি এক-এক করে দেখে নিয়ে শেখর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শেখর প্রায়ই পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়। কখনও পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়। কখনও পাহাড়ে ওঠে। একদিন মৃগাঙ্কবাবু ডেকে বললেন, দেখুন শেখরবাবু বন-পাহাড়ে বেশি দূর একা একা ঘুরবেন না। পথ হারিয়ে বিপদে পড়বেন। তাছাড়া ভাল্লুক আছে। জঙ্গলে। বুধন কিংবা ফাগুলাল কাউকে সঙ্গে নেবেন।

বুধনকে শেখর আদৌ পছন্দ করে না। তাই এর পর থেকে দূরে গেলে ফাগুলালকে সঙ্গে নেয়। ফাগুলাল একটা বর্শা নেয় হাতে। লোকটি ভারি নম্র প্রকৃতির। এখানকার গাছপালা, পাহাড়ি বনপথ—সব তার নখদর্পণে। তবে ফাগুলালকে বাইরে থেকে শেখর যতটা নিরীহ মনে করেছিল, একটা ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেল, তা ঠিক নয়।

এক বিকেলে তারা পাহাড় থেকে নামছিল আঁকাবাঁকা সরু পথ বেয়ে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে, শেখর সামনে, পিছনে ফাগুলাল। হঠাৎ ফাগুলাল চেঁচিয়ে উঠল—দাঁড়ান বাবু!

শেখর চমকে মাথা তুলে দেখে, ঠিক ওপরে গাছের ডালে জড়িয়ে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক সাপ। সাপটা তাক করছে শেখরকে, চওড়া ফণাটা ফুলে ফুলে উঠছে, দীর্ঘ শরীরটা একটু গুটোনো, পলকহীন দুই চক্ষুর হিংস্র দৃষ্টি শেখরের পানে নিবদ্ধ। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল শেখর।

চকিতে সাঁ করে কী যেন ছুটে গেল কানের পাশ দিয়ে, মুহর্তে সাপটা বর্শার আঘাতে ছিটকে পড়ল মাটিতে। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার ঘায়ে সাপের ফণা দু ফঁাক হয়ে গেছে।

বাঃ, দারুণ টিপ তো!-শেখর অভিনন্দন জানাল ফাগুলালকে—তুমি নিশ্চয়ই ভালো শিকারি। তির-ধনুকে শিকার করেছ? “ফাগুলাল বলল, হ।

-বন্দুক ছুড়তে পার? —ই। —বন্দুক দিয়ে করেছ শিকার? ফাগুলাল একটু বিব্রতভাবে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ ‘হ’।

শুধু শিকারি নয়, ফাগুলাল শিল্পীও বটে। কোনো কোনো রাতে সে বাগানে বসে বাঁশি বাজায়। নিঝুম প্রকৃতিরাজ্যে সেই মিঠে-করুণ সুরের ধ্বনি কী অপরূপ মায়াজাল বোনে।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে একজনের দেখা পেয়ে গেল শেখর। ইন্সপেক্টর খাস্তগির। অবশ্য অধুনা অবসরপ্রাপ্ত।

সেদিন ভোরে দেব-সংঘের দিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল শেখর। গেরুয়া ধুতি ও ফতুয়া গায়ে এক বৃদ্ধ এলেন উল্টো দিক থেকে। বুক অবধি লম্বা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুলসব ধবধবে সাদা। সামনাসামনি হতে শেখর অবাক—ইন্সপেক্টর খাস্তগির এখানে! এ কী মূর্তি তার। বৃদ্ধ কিন্তু শেখরকে লক্ষ করেননি। আনমনে পেরিয়ে গেলেন। | শেখরের হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে খানিকটা বিষাক্ত স্মৃতি উপচে এল। দারোগা খাস্তগির—দুদে নিষ্ঠুর। কত দিন সে ভেবেছে, এই লোকটিকে যদি একবার সে বাগে পায় তাহলে পুরনো অপমানের শোধ তুলবে। . . তখন শেখর কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। এক বন্ধুর সঙ্গে সন্ধে নাগাদ গিয়েছিল চীনেপট্টিতে। বন্ধুটি ছিল বয়সে বড় এবং বখাটে ধরনের।

ঘুপচি গলির ভিতর এক বিরাট পুরনো বাড়িতে ঢুকেছিল তারা। সেখানে একটা ঘরে পাঁচ-ছ জন লোক বাজি রেখে তাস খেলছিল। আসলে সেটা ছিল গোপন জুয়ার আড্ডা। শেখর ওই বন্ধুর সঙ্গে আগেও ওখানে গিয়েছিল কয়েকবার। এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার উত্তেজনা হত। তবে নিজে সে খেলেনি জুয়া। সাহস করেনি, তাছাড়া পয়সার অভাবেও বটে। সেদিন বন্ধুটি খেলতে বসে গেল আর শেখর হাঁ করে দেখছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় পুলিশ হানা দিল আড্ডায়। অন্যান্যদের সঙ্গে শেখরকেও তুলে জিনিয়ে পুরল হাজতে। এই খাস্তগীর দারোগা

তাকে বেদম মারধর করেছিলেন। শেখর কাতর অনুনয় জানিয়েছিল—আমি জুয়া খেলিনি স্যার, আর এখানে আসব না কখনও। দারোগা কান দেননি।

পরদিন কাকা তাকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। ভাগ্যক্রমে কেস হয়নি, কিন্তু বাড়িতে ও পাড়ায় তার কম লাঞ্ছনা জোটেনি। ভীষণ দুর্নাম রটে গিয়েছিল। কেবল মা ছাড়া কেউ বোধহয় বিশ্বাস করেনি তার কথায়? প্রথমে দুঃখ হয়েছিল, তারপর রাগ—দুরন্ত ক্ষোভ। এরপর সে ইচ্ছে করেই লুকিয়ে লুকিয়ে কুসঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। এই খাস্তগির দারোগা যদি সেদিন তার কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতেন, ঘটনাটা জানাজানি না হত, তবে হয়তো তার জীবন ভিন্ন ধারায় বইত।

আশ্চর্য, আজ কিন্তু খাস্তগিরকে দেখে সেই পুরনো রাগ আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল না। শুধু কৌতূহল হল। খানিক তফাতে থেকে তাকে অনুসরণ করল শেখর। মাঠের মাঝে খড়ের চালার মাটির বাড়ি। চারপাশে কিছু জায়গা বেড়ায় ঘেরা। ভিতরে ফুল-ফলের বাগান। বৃদ্ধ খাস্তগির ঢুকলেন বাড়িতে। গেটে কাঠের ফলকে লেখা : নারায়ণ কুটীর।

—নারায়ণ কুটীরে কে থাকে?

প্রশ্ন শুনে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, খাস্তগিরবাবু। আগে পুলিশে ছিলেন। হঠাৎ টেনদুর্ঘটনায় স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে মারা যায়। সেই শোকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসেন। প্রায় সন্ন্যাসী মানুষ। গরিব-দুঃখী লোকের খুব উপকার করেন। একা একাই থাকেন নির্জনে।

শেখর ভাবল কী অদ্ভুত মানুষের নিয়তি! সেই জাদরেল দারোগা এখন সাধু। পাহাড়ের সানুদেশে একটা পাথরে বসে শেখর অনুভব করে, কলকাতার রেষারেষি-উত্তেজনাময় দিনগুলো বুঝি মুছে গিয়েছে। সেই দুর্বার স্রোতে আর না পাড়ি দিলেই বা ক্ষতি কী? এই দেড় মাসের মতো নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ সে বহুকাল পায়নি। ভারি সুখে কাটছে। ইচ্ছে করে না আর ছেড়ে যেতে।

কিন্তু ডাক্তার কুঠির কয়েকটি ব্যাপারে শেখরের মনে দেখা দিল সংশয় ও অশান্তি। " প্রথমতঃ, ডাঃ ব্যানার্জি সম্বন্ধে একটা ভয় দানা বেঁধে উঠছে। লোকটি কি ঠিক সুস্থ বা স্বাভাবিক? উনি কখন খান, কখন শুতে যান কোনো হদিশ করা যায় না। কোনো কোনো দিন শেখর গভীর রাতে ঘুম ভেঙে শুনেছে খট খট খট—

ডাক্তারের জুতোর শব্দ। বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি সমান তালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, অবিশ্রান্তভাবে।

শেখর খেয়াল করেছে, এক-এক সময় ডাক্তার তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কী তীব্র সে চাউনি! বুকের ভিতরে শিরশির করে ওঠে। কী নিয়ে ওঁর রিসার্চ? মৃগাঙ্কবাবু তো দিব্যি প্রাণখোলা গল্পে লোক। তিনি কেন পড়ে আছেন এই ডাক্তারের কাছে? এই পাগলা ডাক্তারের হাতে চিকিৎসা করানো উচিত হল না বোধহয়।

এক দুপুরে একতলার বারান্দায় বসে শেখর ছবি আঁকছিল। কাছে শুয়ে ছিল অ্যালসেশিয়ান রাজা। রাজা চেনে বদ্ধ। কারণ সকালে দু জন মজুর এসে বাগানে কাজ শুরু করতেই রাজা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লোক দুটি ঘাবড়ে গিয়ে কাজ করতে চায় না। তখন রাজাকে বেঁধে রাখা হয়। এখনও রাজার মেজাজ শান্ত হয়নি। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বাগানের দিকে তাকিয়ে গরগর করছে। শেখর তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দোতলা বারান্দার কোণ থেকে এইদিকে চেয়ে আছেন মৃগাঙ্কবাবু। চোখাচোখি হতে তিনি অপ্রস্তুতভাবে চট করে সরে গেলেন।

কী ব্যাপার! মৃগাঙ্কবাবু কি লুকিয়ে লক্ষ রাখছিলেন তাকে? এ সময়ে তো উনি নিজের ঘরে শুয়ে থাকেন, বাইরে আসেন না। শেখরের মনে পড়ল, গতকাল সন্ধ্যায় মৃগাঙ্কবাবু দোতলা থেকে কুঁকে কাউকে খুজছিলেন, কাউকে নজর করার চেষ্টা করছিলেন। শেখর বাগানে ছায়ায় বসে ছিল, তাই মৃগাঙ্কবাবু তাকে দেখতে পাননি। আজ সকালে শেখর যখন এখানে বসে ছবি আঁকছিল, মৃগাঙ্কবাবু যেন ছুতোনাতা করে বারবার দোতলার কোণে এসে তাকাচ্ছিলেন এই দিকে। মৃগাঙ্কবাবুর এই আচরণ শেখরের বেশ অস্বাভাবিক লাগল।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ বাগানে স্টুডিওতে বসে শেখর কয়েকটা সদ্য-প্রিন্ট-করা ফোটো পরীক্ষা করছিল। একসময় বাইরে থেকে কথাবার্তার শব্দ ভেসে এল-ডাঃ ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কবাবু আসছেন এধারে।

স্যার, আমার কিন্তু ভয় করছে-নিচু স্বরে মৃগাঙ্কবাবুর কথা শোনা গেল।

-কেন?

—যদি কিছু বিপদ ঘটে! আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো নয় কি? আপনি কী বলেন? জেনে-শুনে এমন রিস্ক নেওয়া কি উচিত?

না না, আমি ওকে আরও ওয়াচ করতে চাই। তবে সাবধানে থেক। বি কেয়ারফুল। বুধন আর ফাগুলালকেও বলে রেখো নজর...ডাঃ ব্যানার্জির কথা আচমকা থেমে গেল। পরক্ষণেই বললেন, ঘরে কে?

আমি।–সাড়া দিল শেখর। আর ওঁদের কথাবার্তা শোনা গেল না।

একটু পরে মৃগাঙ্কবাবু মুখ বাড়ালেন স্টুডিওর দরজায়—কী করছেন মশাই এত সকালে?

শেখর দেখল, ডাক্তার ফিরে যাচ্ছেন ধীর পায়ে।

অন্যমনস্কভাবে মৃগাঙ্কবাবুর কথার উত্তর দিল শেখর। তার মনের ভিতরে তখন তোলপাড় চলছে: এরা কার বিষয়ে সাবধান হচ্ছেন? আমি কী? হয়তো তা-ই। ওরা কি কিছু জানতে পেরেছে আমার সম্বন্ধে? কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু বা ডাঃ ব্যানার্জির বাইরের ব্যবহারে তো তেমন কোনো লক্ষণ নেই।

তবু শেখরের মনে একটা বিশ্রী সন্দেহ ও অস্বস্তি জাগে।

বাকি অংশ পড়ুন এখানে

ডাক্তার কুঠি   অজেয় রায়

আগের অংশ পড়তে এখানে ক্লিক করুন

চার

তিন-চার দিন পরে ডাক্তার কুঠিতে দু’জন বিচিত্র অতিথির আবির্ভাব ঘটল।

সকাল দশটা নাগাদ একটা ট্যাক্সি এসে ঢুকল বাড়িতে। গাড়ি থেকে নামলেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা ও একটি বছর ত্রিশের যুবক। মহিলা বেশ গাট্টাগোট্টা জাঁদরেল টাইপের। সাদা থান-পরা। যুবকটি রোগা ছোটখাটো, পরনে ধুতি-শার্ট। এই বাড়িতে বাইরের লোকের আগমন কদাচিৎ ঘটে, বিশেষত ভদ্রলোক বা মহিলার, তাই শেখর কৌতূহলের সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল যুবক। চলে গেল গাড়ি। মহিলা ততক্ষণ চারদিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি বাজখাই গলায় বলে উঠলেন, হ্যারে হাবু, এ কোথায় আনলি? এটা তো সেই ডাক্তারের বাড়ি।

যুবকটি মিনমিন করে বলল, হ্যা পিসি, ভাবলাম এলাম যখন দেওঘর, দেখা করে যাই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

তোর মতলবটা কী শুনি?–মহিলার গলা আর এক পর্দা চড়ল—ফের সেইরকম চিকিচ্ছে করাতে চাস বুঝি? খবরদার হাবু, ফিরে চল। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

যুবক এদিক-ওদিক সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে তাকাতে বলল, আহা, চটছ কেন? একট দেখা করে যেতে ক্ষতি কী? কত বড় ডাক্তার! তোমার প্রেশার-টেশার একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই বরং।

ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার!—পিসি গর্জন ছাড়লেন—কেন আমার হয়েছেটা কী? দিবি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমুচ্ছি। এখনও একশো লোকের রান্না করতে পারি একা হাতে। কোনো কালে একটা জ্বর-জ্বালা হয়েছে দেখেছিস? তুই বরং ডাক্তার দেখা, বেটা পেট-রোগা কোথাকার। উঃ, সেবার রোগের নাম করে মিছিমিছি কী যন্ত্রণাই দিলে! কতগুলো ইঞ্জেকশন ফুডল আর ওষুধ গেলাল খামোকা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। যতসব জোচ্চোর, টাকা খসাবার ধান্দা! এসব ডাক্তার আমি খুব চিনি।

উত্তেজনায় ও রাগে মহিলার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। হাবু বলল, ডাক্তারবাবু মোটেই ফি চাননি।

—ডাক্তার চায়নি বলে আমি দেব না কেন? আমি কারো দয়া নিই না। ওর সমস্ত ফি মিটিয়ে দিয়েছি আগের বার, মনে রাখিস। তবে হ্যা, বাজে খরচ করা আমার অভ্যেস নয়। তাছাড়া রোগের নাম পরিষ্কার করে বলছে না কেন?

—আহা, তুমি বুঝছ না পিসি। এ একরকম নতুন রোগ। এখন টের পাচ্ছ না, কিন্তু একদিন মারাত্মক হবে। এ রোগের নাম বললেও তুমি ঠিক বুঝবে না। বাংলা নাম নেই কিনা।

পিসি চোখ পাকিয়ে বললেন, কেন বুঝব না? মুখ বলে? দেখ, বেশি চালাকি করিসনি। রোগ-রোগ করে ভয় দেখিয়ে আমায় সত্যি রোগী বানিয়ে ফেলতে চাস। তারপর চটপট বুড়ি মরলে টাকাগুলো বাগাবি। সেই মতলবে আছিস। ডাক্তারের সঙ্গে ষড় করেছিস বুঝি?

—আঃ, কী যা-তা বলছ!

—ঠিকই বলছি। ফের চিকিচ্ছের নাম করলে তোকে আমি বঞ্চিত করব বলে রাখলুম। উইলে একটা পয়সাও দেব না। ঢের হয়েছে। এখন চ শিগগির! বলেই ভদ্রমহিলা খপ করে হাবুর হাত চেপে ধরে টানতে লাগলেন।

শেখর চমৎকৃত হয়ে দেখছিল। ক্ষীণকায় হাবু পিসির প্রবল আকর্ষণে যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা করতে পারত কিনা সন্দেহ, কিন্তু সেই মুহূর্তে মৃগাঙ্কবাবুর আগমন তাকে বাঁচিয়ে দিল।

মৃগাঙ্কবাবু দ্রুত পায়ে এসে সটান মহিলার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে হেসে বললেন, এই যে পিসিমা, কেমন আছেন? বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

পিসিমার মুখেও হাসি ফুটল। বোঝা গেল, মৃগাঙ্কবাবুকে তিনি পছন্দ করেন। বললেন, হ্যা বাছা, বৈদ্যনাথ দর্শনে এসেছি। এই হাবুটার কাণ্ড দেখ, বলে কিনা আমার প্রেম দেখাবে। কেন; 'আমার হয়েছেটা কী? একদিনও মাথা ঘোরে না, দুর্বল লাগে না। দিন-রাত অসুখ-অসুখ ওর এক বাই। নিজে ভোগে যে!

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, সত্যি, আপনাকে তো চমৎকার লাগছে! পারফেকটুলি ফিট। কিচ্ছ দরকার নেই প্রেশার দেখাবার। চলুন, একটু চাটা খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে তারপর যাবেন।

পিসি সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, ডাক্তার কোথা?

কাজ করছেন ল্যাবরেটরিতে। উনি এখন আসবেন না। —বেশ, চল।। পিসি মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে এগোলেন। পিছনে পিছনে চলল হাবু। শেখরও তাদের অনুসরণ করল।

পিসিকে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু নিজের ঘরে ঢুকলেন। ভাইপো হাবু দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। ভেতর থেকে পিসি ও মৃগাঙ্কবাবুর গল্পের আওয়াজ ভেসে আসছে। হাবু ও ডাঃ ব্যানার্জির ওপর পিসির রাগ তখনও পড়েনি। মাঝে মাঝেই গরম হয়ে ওদের নামে কী সব বলছেন। একটু পরেই ল্যাবরেটরির দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জিকে দেখেই হাবু প্রায় ছুটে তার কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল, ডাক্তারবাবু, পিসিমাকে এনেছি অনেক কষ্টে। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন তো?

তারপর গলা আরও নামিয়ে কী জানি সে বলতে লাগল, শেখর শুনতে পেল না। ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ভিতরে এসো।

ল্যাবরেটরিতে ঢোকার মুখে ডাক্তারের চোখ পড়ল শেখরের দিকে। কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, কী করছ এখানে? নিজের ঘরে যাও।

শেখর অপ্রস্তুত হয়ে ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য, তার কিছুক্ষণ পর থেকেই পিসিমার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। অথচ তিনি এই বাড়িতেই আছেন। দোতলায় একটি ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তারের ধমক খেয়ে সোজাসুজি উকি মারতে সাহস হয়নি শেখরের। তবে ওই ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে জানলা দিয়ে আড়চোখে দেখেছে, ভদ্রমহিলা বিছানায় শুয়ে। ঘুমুচ্ছেন বলেই মনে হয়েছে শেখরের। তারপর পুরো দুটো দিন তিনি বোধহয় শুয়েই কাটালেন। সকাল সন্ধ্যায় যখনই শেখর ঘরের পাশ দিয়ে গিয়েছে, লক্ষ করেছে সেই এক দৃশ্য। স্বাভাবিক ঘুম নয় নিশ্চয়ই। শেখরের সন্দেহ হল, ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। এরপর অবশ্য তিনি উঠলেন, চলাফেরাও করলেন, তবে ঘরের মধ্যেই।

ডাঃ ব্যানার্জি এবং মৃগাঙ্কবাবু প্রায়ই ভদ্রমহিলার ঘরে যেতেন। শেখর বুঝল, কোনো চিকিৎসা চলছে। কীসের চিকিৎসা?

কালোর মাকে হাবুর পিসিমা সম্বন্ধে গোপনে জিজ্ঞেস করল শেখর। কালোর মা বলল, ওই বুড়ির মেলাই টাকা। মলে সব নাকি ওই ভাইপো পাবে। আগে একবার এসে থেকেছিল এখানে। বাপ রে, কী মেজাজ বুড়ির!

–ওঁর রোগটা কী? কালোর মা বলল, কী জানি বাবু, তা বলতে পারব না।

একদিন বাগানে বসে ডাক্তার কুঠির একটা পুরনো সাইকেল অয়েলিং করছিল শেখর।

হঠাৎ খসখস আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হাবু, তাকে একদৃষ্টে দেখছে। হাবুই কথা

শুরু করল—হে হে, আপনি বুঝি থাকেন এখানে?

হু।

—কেউ হন নাকি এদের ?

- না।

—তবে?

শেখর এবার একটু অস্বস্তি বোধ করে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ফেলল, আমি মৃগাঙ্কবাবুর বন্ধু। বেড়াতে এসেছি।

–ও তা-ই নাকি? আমি ভেবেছিলাম....তা, থাকেন কোথায়?

জেরার ঠেলায় শেখর বিব্রত! ঢোক গিলে বলল, কলকাতা। —বেশ বেশ। কী করা হয় মশাইয়ের?

এই চাকরি। -শেখর রীতিমতো বিরক্ত। নিজে প্রশ্ন করবে কি, সে তখন ছাড়া পেতে পারলে বাঁচে। লোকটা তাকে কথা বলার ফুরসতই দিচ্ছে না। হাবু চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে বলল, মশাইকে কোথায় যেন দেখেছি।

শেখর চমকে গেল। কে জানে, অতীত জীবনে হয়তো এর সংস্পর্শে এসেছিল ও। কিন্তু মনে তো পড়ছে না। বলল, কোথায় বলুন তো?

মনে হচ্ছে রাঁচিতে। আমরা ওখানেই থাকি। রাচি শেখর গিয়েছে কয়েকবার। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। সেখানে কেউ কেউ তার গোপন পরিচয় জানে। তার মনে পড়ল, একটা চায়ের দোকানে এই হাবুর সঙ্গে একবার সামান্য আলাপ হয়েছিল বছর চারেক আগে। কিন্তু মুখে সে স্রেফ অস্বীকার করল—রাঁচি তো আমি যাইনি কখনও। আপনি ভুল করছেন। আচ্ছা চলি, আমার একটু কাজ আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে সরে পড়ল শেখর। কে জানে, হাবুর সূত্র ধরে যদি তার অজ্ঞাতবাসের জায়গা ফাস হয়ে যায়। আর সে পারতপক্ষে হাবুর ধারে-কাছে। ঘেঁষছে না।

দিন চারেক পরে এক বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে শেখর আবিষ্কার করল, হাবু ও তার পিসিমা চলে গিয়েছেন। যাওয়ার আগের দিন পিসিমা বারান্দায় এসে বসেছিলেন। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কথা-বার্তা বলছিলেন বটে, তবে নিচু সুরে। তার সেই দাপট, . হাঁক-ডাকের চিহ্নমাত্র ছিল না কণ্ঠস্বরে।

ওঁরা চলে যাওয়ার আগের দিন বিকেলে একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে এসেছিল। লোকটির ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়স হবে। বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। রাজা তার পথ আগলে গর্জন করে উঠতেই ও ডাক্তারবাবু। ও মৃগাঙ্কবাবু। বলে চিৎকারে জুড়ে দিয়েছিল।

মৃগাঙ্কবাবু বেরিয়ে এসে রাজাকে বকুনি দিয়ে সরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার হরিবাবু?

-ডাক্তারবাবু আছেন? দাদা আবার সেইরকম।

—ও। আচ্ছা, আসুন ওপরে। স্যার ল্যাবরেটরিতে আছেন। শেখর তখন তার ঘরে ছিল। চট করে লোকটিকে দেখে নিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গিয়েছে সে। দাঁড়িয়ে থাকেনি বারান্দায়, ডাক্তার দেখলে চটে যাবেন। তার কানে এসেছে হরিবাবুর গলা —কদিন অফিসের কাজে বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে দেখি, দাদা ফের তেমনি শুনলে করেছে। বউদি কান্নাকাটি করছে।

—কিছু বুঝতে পারেননি আগে?

—না, ছিলাম না যে। দাদার শরীর খুৰ শুকিয়ে গিয়েছে। হাপের টানটাও বেড়েছে।

—ওষুধটা খাচ্ছিল ঠিকমতো?

—হ্যাঁ, তবে দু-এক দিন হয়তো ফাক গিয়েছে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই ওষুধটায় কাজ হচ্ছে তো? না পালটাবেন?

দেখি। ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘরে আসুন। এই অবধি শুনতে পেল শেখর। একটু বাদে শেখর দেখেছে হরিবাবুকে ফিরে যেতে। ডাক্তারের একটা লালরঙের ফিয়াট গাড়ি আছে। মৃগাঙ্কবাবুই যা ব্যবহার করেন। গাড়িটা।

আধঘণ্টা পরে ডাঃ ব্যানার্জিকে পাশে বসিয়ে মুগান্তবাবু গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর পরপর পাঁচদিন ডাঃ ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কবাবু সকালবেলা গাড়ি করে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

এই রোগী সম্বন্ধে কালোর মা কিছু বলতে পারল না শেখরকে। শুধু জানাল, স্থানীয় লোক এবং বছরখানেক আগে একবার এসেছিল ওর ভাইয়ের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কাছে। 'ভাই মাঝেমাঝে দেখা করে যায়, তবে রোগী আর আসেনি। কী রোগ সে জানে না।

শেখরের মনে অনেক প্রশ্নের ভিড়: মৃগাঙ্কবাবু বলেছিলেন, 'ডাঃ ব্যানার্জি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু কই, এখনও তো তিনি রোগী দেখেন—অদ্ভুত সব রোগ। এইসব রোগীদের বিষয়ে কৌতুহল দেখালে ডাক্তার অত রেগে যানই বা কেন? এমনকী গাঞ্চবাবুও অন্যদের সামনে এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে চান না। ব্যাপারটা কেমন যেন ধোঁয়াটে।

শেখর লক্ষ করল, হাবুর পিসিমা এবং হরিবাবুর 'আবির্ভাবের পর ডাঃ ব্যানার্জির রাত জাগা আরও বেড়ে গিয়েছে। দিনের বেলা তাকে যতটুকু ল্যাবরেটরির বাইরে দেখা যায়, ভীষণ ছটফটে, অন্যমনস্ক।

অবশ্য ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শেখরের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সে খাসা আছে। তবু সে ডাক্তারের ভাব-গতিক যতটা সম্ভব নজরে রাখতে লাগল।

পাঁচ

ডাক্তার কুঠিতে পর পর দুটো চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটে গেল। প্রথমে অ্যালসেশিয়ান কুকুর রাজা হঠাৎ গেল ক্ষেপে। নির্জন দুপুর। 'আচমকা বাজার ক্রুদ্ধ গর্জন এবং কালোর মার ভয়ার্ত চিৎকারে সারা বাড়ি সচকিত হয়ে উঠল। শেখর দোতলায় লাইব্রেরিতে ছিল, ছুটে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। মৃগাঙ্ক দত্ত এবং ডাঃ ব্যানার্জিও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন।

উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। তার মগডালে বসে থরথর করে কাপছ কালো। আর নিচে রাজা উন্মাদের মতো গজনি করছে আর লাফ মারছে কালোকে লক্ষ্য

করে। উঃ, কী ভীষণ তার মুর্তি! চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। গলায় ঝুলছে ছেড়া চেনের আধখানা।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, নিশ্চয়ই রাজাকে খুচিয়েছে কালো। আজ সকালেই বকুনি দিলাম, বারণ করলাম ক্ষেপাতে। ইস, দেখুন কাণ্ড!

ডাঃ ব্যানার্জি হকি দিলেন—খবরদার, কেউ বেরিও না বাইরে। সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও।

বাগানের মধ্যে বুধনের ঘরের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল বুধন। সে ঠিক ব্যাপারটা আঁচ করতে পারেনি। নিমেষে রাজা গজরাতে গজরাতে বুধনকে লক্ষ্য করে তিৰেগে ধেয়ে গেল। বুধন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে একলাফে ঘরে ঢুকে কপাট দিল আটকে। রাজা ঝাপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার গায়ে। বারকয়েক হুঙ্কার দিয়ে ঠেলাঠেলি করে দরজা খুলতে পেরে সে আবার ফিরে এল পেয়ারাতলায়।

“কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়েছে। ওকে এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। মৃগাঙ্কবাবু, আপনাদের বন্দুকটা কই? দিন আমাকে।" বলতে বলতে ছুটে যাচ্ছিল শেখর, থমকে দাড়াল ডাঃ ব্যানার্জির হুঙ্কারে—কোথায় যাচ্ছেন? রাজা পাগল হয়নি। ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। কাউকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমি দেখছি।

বলে তিনি হনহন করে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেলেন। বেরিয়ে এলেন একটু পরেই, হাতে কয়েকখানা বিস্কুট। | রাজা, রাজা!—ডাকলেন ডাক্তার।

অনেকক্ষণ লম্প-ঝম্প করে রাজা হাপাচ্ছিল। মাথা তুলে দেখল ডাক্তারকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বারান্দার নিচে। ডাক্তার বিস্কুটগুলো ছুড়ে দিলেন রাজার সামনে। এটু শুকে নিয়ে রাজা বসে পড়ে খেতে লাগল বিস্কুট। খানিক বাদেই সে মাটিতে শুয়ে পড়ে, দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। শেখর বুঝল, বিস্কুটে কোনো ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর বুধন ও ফাগুলাল ধরাধরি করে রাজাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিল একটা টেবিলে। ডাক্তার ও মৃগাঙ্কবাবু ছাড়া সবাই বেরিয়ে এল। ল্যাবরেটরি থেকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে শেখর। ডাঃ ব্যানার্জির কটা কথা ভেসে আসে তার কানেইঞ্জেকশনটা রেডি কর মৃগাঙ্ক।

ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চারটে দিন রাজাকে একটা বড় খাচার মধ্যে আটকে রাখা হল। শেখর লক্ষ করল, প্রতিদিন তাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। রাজা এই কয়েকদিন প্রায় সব সময় ঝিমোয়। তার হাবভাব একেবারে নরম হয়ে গিয়েছে। যখন জেগে থাকে, করুণ নয়নে চেয়ে যেন বোঝাতে চায়, আমায় বন্দি করে রেখেছ কেন?

পঞ্চম দিনে রাজাকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হল। সে ছোটাছুটি শুরু করল। বাড়ির লোক কিন্তু চট করে রাজার কাছে ঘেষতে ভরসা পেল না। ব্যতিক্রম কেবল ডাঃ ব্যানার্জি। মর্নিং ওয়াকের সময় আগের মতো রাজাকে সঙ্গে নিয়ে যান তিনি। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই অন্যদেরও রাজার সম্বন্ধে ভয় ভেঙে গেল। কালো আবার তার সঙ্গে খেলা শুরু করল। রাজা ক্ষেপে যাওয়ার ঠিক বারো দিন পরে।

সেদিন শেখর ত্রিকূট পাহাড়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছে। সারাটা দুপুর টোটো করে ফিরল বিকেলে। লক্ষ করল, গোটা বাড়ির আবহাওয়া কেমন থমথম করছে।

মুগাঙ্কবাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, শেখবালু, মাওলালকে দেখেছেন পাহাড়ের দিকে যেতে?

কই, না তো।

'ও।–মৃগাঙ্কবাবু চলে গেলেন চিন্তিতভাবে।

কিছু একটা ঘটেছে। বাড়ির খুটিনাটি খবরের যে সাক্ষাৎ গেজেট সেই কালোর মাকে প্রশ্ন করতে ফিসফিস করে যা বলল কালোর মা, তার সারমর্ম হচ্ছে এইঃ ঘণ্টাখানেক আগে ফাগুলাল কাজ করছিল বাগানে। তখন একজন গ্রামের লোক আসে। সে ফাগুলালের কাছে নাকি পয়সা পেত। বাঁশ বিক্রির দরুন। হঠাৎ আর্তনাদ শুনে সবাই তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে, লোকটাকে বেদম মারছে ফাগুলাল। বুধনকে তো গ্রাহ্যই করল না। শেষে ডাক্তারবাবু কড়া ধমক দিতে সে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালায়। লোকটা তারপর কাদতে কাদতে বলে, সে কোনো দোষ করেনি, একটাও কটু কথা বলেনি। শুধু বলেছিল, আজ তার পাওনাটা চাই। কারণ হাটে যাবে চাল কিনতে। তা-ই শুনে ফাও নাকি রেগেমেগে বলে, হবে না আজ ভাগ !

সে একটু জোর করতেই ফাগুলাল তেড়ে আসে। যাই হোক, ডাক্তার লোকটিকে টাকা-পয়সা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ফাগুলাল আর ফেরেনি।

শেখর রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেল। অমন শান্ত ভদ্র লোকটার এই ব্যবহারের কারণ? ফাগুলালের মন বোধহয় ভালো যাচ্ছিল না। গতকাল থেকে কেমন গুম মেরে ছিল।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ঘটনার জের কোন্ দিকে গড়াচ্ছে ঠাওর করতে পারল না শেখর।

আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা পুলিশ জিপ এসে ঢুকল বাড়িতে। মৃগাঙ্কবাবু এবং ডাঃ ব্যানার্জি তাতে চড়ে বসলেন। জিপে বসে ছিলেন স্থানীয় দারোগা এবং দু'জন কনস্টেবল। উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

ঘন্টা দুই পরে মোটর ইঞ্জিনের গর্জন পাওয়া গেল। হেডলাইটের জোরালো আলোয় চোখ ধাধিয়ে ডাক্তার কুঠির কম্পাউন্ডের ভিতর এসে থামল সেই পুলিশের জিপ। আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শেখর দেখল, জিপ থেকে নামছে ডাঃ ব্যানার্জি, মৃগাঙ্ক দত্ত, দারোগা এবং ফাগুলাল। ফাগুলাল মাথা নিচু করে রয়েছে। চারজন নীরবে এগিয়ে চলল, দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠল, তারপর ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করল। একটু বাদে বেরিয়ে এলেন দারোগা। সোজা গিয়ে উঠলেন জিপে। গাড়ি হু-শ করে বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে।

সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল অতি দ্রুত এবং প্রায় ছায়াবাজির মতো। নিচে নেমে শেখর কালোর মাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিল ফাগুলাল?

মদ খাচ্ছিল শুড়িখানায়। সেপাইগুলো বলাবলি করছিল, আমি শুনেছি। লোকটা অদ্ভুত। আগে এমনি একবার পালিয়েছিল রাগারাগি করে। তারপর দারোগাবাবু ধরে এনে দিল।

দারোগীর সঙ্গে চেনা আছে ডাক্তারবাবুর? আছে না? ওর মেয়ের যে চিকিচ্ছু করেছেন আমাদের ডাক্তারবাবু! কালোর মা সন্ত্রস্তভাবে জানাল, আমি এ-সব বলেছি কাউকে বলবেন না। ডাক্তারবাবু জানলে রাগ করবেন।

অদম্য কৌতূহল শেখরকে অধীর করে তুলল। দোতলার অন্য প্রান্তে জানালার কাচের শার্শী ভেদ করে ল্যাবরেটরির উজ্জ্বল আলোর রেখা বারান্দায় এসে পড়েছে। শেখর পা টিপে টিপে এগোল।

জানালা দিয়ে সাবধানে উকি মারল শেখর।

একটা টেবিলের ওপর ফাগুলালের অসাড় শায়িত দেহ। তবে বক্ষের মন্থর ওঠা-নামায় বোঝা যাচ্ছে, সে গভীর ঘুমে অচেতন। পাশে দাড়িয়ে মৃগাঙ্কবাবু। কাছে চেয়ারে বসে ডাঃ ব্যানার্জি। মৃগাঙ্কবাবু কিছু বলছেন ডাক্তারকে। জানালার ভেজানো পাল্লায় সামান্য ফাক। মৃদু কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শেখর জানলার নিচে বসে কান পাতল।

প্রথমে মিনিটখানেক সে ঘরের ভিতরের কথা-বার্তার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে পারল। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা। তারপরই সে উৎকর্ণ হল মুগাঙ্কবাবুর কথা শুনে।

মৃগাঙ্কবাবু বলছেন, স্যার, এবার কিন্তু আমাদের এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট অনেক ইমপ্রুভ করেছে। মনে আছে স্যার, আগের বার ফাগুলাল কী রকম ভুগিয়েছিল। দু'দিন ওর তো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তারপর ধরবার সময় সে কী ধস্তাধস্তি! আর এবার ডাকামাত্র কেমন সুড় সুড় করে চলে এল। রাজাও এবার ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।

-না না মৃগাঙ্ক, আমি কিন্তু বড় হতাশ হয়েছি। আমি খুব আশা করেছিলাম, দুটো কেসই সাকসেসফুল হবে। অন্তত নাইন্টি-পারসেন্ট সাকসেস। দুটো ফরমুলাতেই দেখাই বেশ খুত রয়ে গিয়েছে। আবার আমায় নতুন করে আনালিসিস করতে হবে। হ্যা, আমার দশটা ফ্রেশ হিউম্যান-ব্রেন চাই। জোগাড় করো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—শেখরবাবুর কেসটা কী মনে হয় স্যর? দেখা যাক। তিন মাস না গেলে তো ওষুধের রিঅ্যাকশন ঠিক বোঝা যাবে না। আ ততা করছি এবারের ফরমুলাটা...একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো মৃগাঙ্ক, তারপর তোমার ছুটি।

—আমি তো কিছু বলিনি স্যার।

বলোনি ঠিকই, কিন্তু আমি বুঝতে পারি। তোমার কষ্ট হচ্ছে। এই নিঃসঙ্গ একঘেমে জীবন। কী করব বলো? গুটিকতক লোকের আত্মত্যাগের ওপর বিজ্ঞানের বড় বড় সাফল্য নির্ভর করে, সে তো তুমি জানই।

ব্যস, ঘরে আর কোনো কথা নেই। একটু অপেক্ষা করে শেখর সরে এল।

নিজের ঘরে এসে শেখির নিশ্চল হয়ে বসে রইল। তার তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বইছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব বুদ্ধি-বিবেচনা।

শেখর বুঝছে, ডাঃ ব্যানার্জি এক গবেষণা-মত্ত নির্মম বিজ্ঞানী। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজনে তার কাছে অন্যের ভালো-মন্দ, আনন্দ-বেদনা সব তুচ্ছ। তিনি নিশ্চয়ই কোনো এক্সপেরিমেন্ট করছেন এই কুকুর রাজা, মালি-ফাগুলালের ওপর, কোনো ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের শরীরে। এবং তার ফলে মাঝে মাঝে অমন ঠান্ডা মেজাজের শিক্ষিত কুকুর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ভদ্র শান্ত ফাগুলাল হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হাঙ্গামা বাধায়। অর্থাৎ এক বিকৃত মানসিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ওইসব ওষুধ——ডাক্তারের নিজের তৈরি গোপন ফরমুলা। হালুর পিসিমা, হরিবাবুর দাদা—এরাও বোধহয় ডাক্তারের খপ্পরে পড়েছেন।

তার নিজের ওপরেও হয়েছে পরীক্ষা। ভুয়া রোগের ভয় দেখিয়ে কারসাজি করে তার দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে অজানা ওষুধ। ওষুধ নয়, বলা উচিত বিষ। এক অনির্দিষ্ট ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় শেখরের দেহ-মন হিম হয়ে এল। বিপদকে সে ডরায় না। বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তার দিন কাটে। কিন্তু এ বিপদের প্রকৃতি সে কিছু হদিশ করতে পারছে না।

এই রহস্যের জাল তাকে ছিন্ন করতেই হবে। তিলে তিলে দুশ্চিন্তার আগুনে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে কোন বিভীষিকাময় ভবিতব্য। জেনে-শুনে তৈরি হয়ে সে এই অজ্ঞাত বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপনের লোভে সে এ কোন্ চক্রান্তের শিকার হল?

উদভ্রান্ত শেখর গভীর রাত অবধি শুয়ে শুয়ে ছটফট করে।

আট

সকাল আটটা নাগাদ নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন মৃগাঙ্ক দত্ত। শেখরকে ঢুকতে দেখে আহ্বান জানালেন—আসুন শেখরবাবু।

—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, মৃগাঙ্কবাবু। —ও, বেশ। বসুন। দেখুন মৃগাঙ্কবাবু, আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। খুব জরুরি প্রশ্ন! তার জবাব চাই। সঠিক জবাব। আজে-বাজে বলে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবেন না। তাতে লাভ হবে না— শেখর কঠোর দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

মৃগাঙ্কবাবু একটু ভুরু কুঁচকোলেন। কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর সহজ সুরে বললেন, বলুন কী প্রশ্ন। উত্তর জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

–আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, মনে আছে, আপনি বলেছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি এক আশ্চর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন ?

গবেষণার বিষয়টা কি জানতে পারি?

-সরি। এ বিষয়ে স্যারের অনুমতি ছাড়া আমি কিছু বলতে পারব না।

—ও। দেখুন, আমার বিশ্বাস, ডাঃ ব্যানার্জি কোনো ওষুধ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন। কুকুর রাজা আর মালি ফাগুলালের ওপর। তা-ই কি?

বোধহয় আমার ওপরেও এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। মৃগাঙ্কবাবু নীরবে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন।

এবং সেই এক্সপেরিমেন্টের ফল হচ্ছে মারাত্মক। এর ফলে নিরীহ ভদ্র কুকুর বা মানুষ কখনও কখনও উন্মত্ত অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুনুন মৃগাঙ্কবাবু, আমি জানতে চাই আমার বেলায় কী ঘটবে? কী রি-অ্যাকশন হতে পারে ওযুধের? একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, আপনি ভুল করছেন শেখরবাবু। আসলে কী যেন বলতে গিয়েও সামলে নিলেন মৃগাঙ্কবাবু।

বোগাস! গর্জে উঠল শেখর—মিথ্যে রোগের নাম করে একবার আমায় ধাপ্পা দিয়েছেন। আমি বোকা বা মূখ নই। বারবার আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। | মুগাথবাবু শান্ত স্বরে বললেন, কেন অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন শেখরবাবু? আপনি সত্যিই রোগগ্রস্ত। স্যার চিকিৎসা করে আপনাকে সুস্থ করে তুলতে চান।

—আমার কী হয়েছে? কী অসুখ? মৃগাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এ বিষয়ে আর আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব । আপনি ডাঃ ব্যানার্জির মুখেই সমস্ত শুনতে পাবেন। আমি ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি। পরে ডাকব আপনাকে।

মৃগাঙ্কবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ল্যাবরেটরির নিরালা কোণে প্রশস্ত ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি। চক্ষু নিমীলিত। দাঁতে কামড়ানো পাইপ। শেখর এসে কাছে দাঁড়াতে চোখ মেললেন। সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে বললেন, বসো।

শেখর বসল। রাশভারী ডাক্তারের সামনে এলে সে একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

ডাঃ ব্যানার্জি গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার প্রশ্ন শুনেছি। উত্তর পাবে। তার আগে শারীর বিদ্যা এবং আমার গবেষণা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। খুব সহজ করে বলছি, বুঝতে অসুবিধা হবে না। | মানুষ বা উন্নত ধরনের প্রাণীদের দেহ নানারকম জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি। মস্তিষ্ক শরীরের অঙ্গ। প্রাণীর সবরকম প্রবৃত্তি ও অনুভূতির কেন্দ্র এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক-চালনার মুলে আছে কিছু রাসায়নিক বস্তুর ক্রিয়া-কলাপ।

দেহের রাসায়নিক উপাদানগুলির আনুপাতিক হেরফেরের জন্যে একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক তারতম্য দেখা যায়। এই কারণে কোনো মানুষ হয় লখা, কেউ বেঁটে, কেউ কালো, কেউ বা ফর্সা, আর কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কেউ বোকা, রাগী, শান্ত-প্রকৃতির বা কল্পনাপ্রবণ হয়। মানুষ ও অন্যান্য উন্নত প্রাণীর মানসিক ক্ষমতা বা দুর্বলতার প্রধান কারণ তার শরীরে বা মস্তিষ্কে কিছু রাসায়নিক বস্তুর তারতম্য।

যেমন ধরো, দেহে কিছু কিছু ভিটামিন, মিনারেল, সল্ট, অ্যাসিড ইত্যাদির কম-বেশির ফলে কোনো কোনো লোক হয় প্রচণ্ড খিটখিটে, রাগী, হিংস্র, লোভী, আবার কেউ হয় প্রতিভাবান শিল্পী, গায়ক, বৈজ্ঞানিক।

দৈহিক বা মানসিক দোষ-গুণের অনেকখানি প্রাণীর সহজাত। উন্নত প্রাণীর প্রত্যেক দেহ-কোষের ভিতরে আছে সূক্ষ্ম সুতোর মতো দেখতে ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজাম তৈরি হয় ডি.এন.এ. নামে একরকম জটিল রাসায়নিক অণুর সাহায্যে। সন্তানের ক্রোমোজোম তৈরি হয় পিতা-মাতার ক্রোমোজোম থেকে। প্রতি

প্রাণীর ক্রোমোজোমের মধ্যে শুকনো থাকে সেই প্রাণীর ভবিষ্যৎ রূপ—তার দৈহিক ও মানসিক গঠন কা হবে। যমজ সন্তানদের ক্রোমোজোমের গঠনে খুব মিল, তাই তাদের চেহারা ও স্বভাবে এত মিল। দেখা যায়। আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণী কিছু স্বাভাবিক ক্ষমতা আর। দুর্বলতা নিয়ে জন্মায়। পরিবেশের প্রভাবে তার এইসব দোষগুণের কোনোটা ফুটে ওঠে, কোনোটা বা চাপা পড়ে যায়।

মনে রেখো, অতিরিক্ত ক্রোধ, লোভ, হতাশা, উত্তেজনা—এগুলো হচ্ছে আসলে মানসিক রোগ এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে পাওয়া। কোনো কোনো মানুষ প্রচণ্ড অপরাধ-প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। তারা সুযোগ খোজে। বারুদের ভুপের সামান্য সুলিঙ্গ যেমন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটায়, ঠিক তেমনি সামান্য ঘটনায় কম বয়স থেকে এরা মনের ভারসাম্য হারায়, এদের বিচার-বুদ্ধি-ধৈর্য লোপ পায়।

যে অবস্থায় পড়ে একজন মানুষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে খুন-জখম করে বসে, অর্থ বা অন্য প্রলোভন এড়াতে পারে না, অথচ একই অবস্থায় যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর এক জনকে দেখা যায় সংযত ও সৎ রয়েছে। কেউ নানাকারণে হতাশায় ভুগে ভেঙে পড়ে, কিন্তু কেউ কেউ আরও ঢের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে। এইরকম বিভিন্ন স্বভাবের প্রধান কারণ মানুষের ক্রোমোজোমের প্রকৃতি, তাদের দেহ-রসায়নের বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, দুর্বল ও বিকল হাত-পা-চোখ ইত্যাদি যেমন চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা যায়, তেমনি মস্তিষ্কের কাজে সরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সমস্ত মানসিক ও স্নায়বিক রোগের চিকিৎসাও এক দিন সম্ভব হবে। আমি গবেষণা করে বুঝতে চেষ্টা করছি; বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রবণতার কারণ কী? শরীরের বা মস্তিষ্কে কোন্ কোন্ উপাদান কী পরিমাণে কমবেশি থাকার জন্যে এইসব প্রবণতার সৃষ্টি হয় ? ট্রিটমেন্ট করে। ওষুধ প্রয়োগে শারীর রসায়নের ত্রুটি সংশোধন করে মানসিক রোগ সারানো যায় কী উপায়ে? কয়েক জাতের প্রাণীকে স্টাডি করলেও আসলে মানুষ নিয়েই আমার রিসার্চ।

ডাঃ ব্যানার্জি থামলেন। বারকয়েক টান দিলেন পাইপে। একটু হেসে বললেন, অনেক। বকলাম। বুঝলে কিছু?

শেখর মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। সে আমতা আমতা করে—হ্যা, মানে এই রাজা, ফাগুলাল, এরা সবাই বুঝি --

—রাইট। এরা আমার পেশেন্ট। রাজা ছিল আমার বন্ধুর কুকুর। খুব চালাক। কিন্তু বাচ্চা বয়স থেকে বদমেজাজি। দিনে দিনে রাগ বেড়েছে। বন্ধু আর রাখতে সাহস পাচ্ছিল। কয়েকজনকে কামড়ে ছিল শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে মেরে ফেলতে বাধ্য হত। আমি এনে চিকিৎসা করছি।

—আর ফাগুলাল?

—ও ছিল ডাকাত। দুর্দান্ত স্বভাব। জেল খেটেছে। এখন কেমন ভদ্র। কী চমৎকার বাগান করে দেখেছ?

—আর কোন পেশেন্ট আছে এ বাড়িতে?

—আছে, যেমন দীননাথবাবু। কেবল হতাশায় ভুগত। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। দু-বার। ওর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

—আচ্ছা, বুধন কি..

-না, না, ও রোগী নয়। বেজায় ভালো মানুষ। দিব্যি স্বাভাবিক। ওই চেহারাটাই যা।

—ওই হাবুর পিসিমা হরিবাবুর দাদা ওরাও কি মেন্টাল পেশেন্ট?

—হ্যা। হাবুর পিসিমা মাঝে মাঝে ভীষণ রেগে যেতেন। তখন ওঁর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। অনেকটা শান্ত করতে পেরেছি। আর হরিবাবুর দানার ঝোঁক ছিল নেশা করার, তা প্রায় ছাড়িয়েছি।

প্রশ্নটা বলি-বলি করে শেখর মুখে আনতে পারছিল না, এবার বলে ফেলল, আচ্ছা, আমি...আমার কী রোগ ? | সহানুভূতি-মেশানো কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, কতকগুলি মেন্টাল ডিফেক্টস ছিল তোমার। অবশ্য সবারই থাকে অল্প-বিস্তর। বাড়াবাড়ি হলেই বিপদ।

—আমার সম্বন্ধে কী জানেন আপনারা? —কিছু কিছু জানি বইকি। নইলে চিকিৎসা করতে চাইব কেন? —যেমন?

—যেমন, তোমার বাবা-মা নেই। আগে কাকার কাছে ছিলে। এখন একা থাক। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলে, কিন্তু বি.এ. পরীক্ষা না দিয়েই পড়া ছেড়ে দাও। স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল, বেপরোয়া এবং লোভী। সেলসম্যানের কাজ করো ঠিকই, কিন্তু কিছু স্মাগলার ও ক্রিমিনালের সঙ্গে মেশামেশি আছে। এবং তোমার পদবি ‘‘মিত্র' নয়, 'সরকার'।

স্তম্ভিত শেখর বলে উঠল, কী করে জানলেন?

খানিকটা আমার বন্ধু এক পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট থেকে। তোমার জ্বরের সময় ঠিকানা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমার ব্যাগ ঘাটতে ঘাটতে রিভলভারটা দেখে আমার সন্দেহ হয়। জ্বরের ঘোরে তোমার মুখে কয়েকটা কথা শুনে ব্যাপার খানিক আন্দাজ করি। তখন তোমার একটা ফোটো তুলে ফোটোসুদ্ধ মৃগাঙ্ককে কলকাতায় পাঠাই কমিশনারের কাজে তোমার সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে। এ ছাড়া তোমার চরিত্রের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাই তোমার দেহ-কোষ বিশ্লেষণ করে।

রুদ্ধনিঃশাসে শুনছে শেখর। ডাঃ ব্যানার্জির মুখ দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কিছুই জানেন তার সম্বন্ধে, তবে রেখে ঢেকে বলছেন।

সস্নেহ কণ্ঠে ডাক্তার আবার বললেন, ভয় নেই, তোমার এই পরিচয় আমি বা মৃগাঙ্ক ছাড়া আর কেউ জানে না এখানে। পুরনো দিনের কথা ভুলে যাও। কারণ তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

শেখর তার মানসিক পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ এবার বুঝতে পারছে। ধরা গলায় বলল সে, আমায় ক্ষমা করবেন, আমি ভুল বুকেছিলাম। কিন্তু ফাগুলালের মতো আবার কি আমার... ।

অমনি ডাঃ ব্যানার্জি উত্তেজিতভাবে উঠে পড়লেন। ঘরের মধ্যে অস্থির পদে পায়চারি। করতে করতে বললেন, হ্যা, ওইখানেই আমি ব্যর্থ হচ্ছি। আমার রিসার্চ অনেকখানি এগিয়েছে। বেশির ভাগ মানসিক রোগ আমি এখন সারিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু মাঝে। মাঝেই রিল্যান্স করছে। কোথায় যে একটু গন্ডগোল...।

ডাঃ ব্যানার্জি থামলেন। তারপর শেখরের দিকে অনুনয়ের সুরে বললেন, প্রার্থনা করো শেখর, যেন আমার সাধনা সফল হয়। দেখো, অপরাধের জন্যে

চোর-ডাকাত-খুনিদের আমরা জেলে পাঠাই, শাস্তি দিই। কিন্তু লোকে এটা ভুলে যায়, তাদের মধ্যে অনেকেই মানসিক রোগী। এইসব অপরাধের জন্যে আসলে দায়ী তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া শারীর রসায়ন, তাদের ক্রোমোজোম। এদের সুস্থ করে তোলার, এদের মানসিক গঠন বদলাবার চেষ্টা হয় না। সমাজ তাদের ঘৃণার চোখেই দেখে। তাই জেলের মেয়াদ শেষ হলে তার বেশির ভাগ আবার ফিরে যায় তাদের পাপের জগতে। কিন্তু উচিত জেলে বা মানসিক হাসপাতালে আটক রাখার সময়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা করা। সংক্রামক রোগী আরোগ্যলাভের পর আর পাঁচজনে তো স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে মেশে। তেমনি মানসিক রোগমুক্ত অপরাধীর সঙ্গে সকলে মেলামেশা করবে। জানো শেখর, সহজাত অপরাধ-প্রবণতার তাড়নায় কত প্রতিভাবান মানুষের জীবন অকালে শেষ হয়ে যায়। তাদের গুণ ও প্রতিভা অসৎ প্রবৃত্তির তলায় চাপা পড়ে নষ্ট হয়। এইসব মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করে ভালো করে তুলতে পারলে সমাজের অপরিমেয় উপকার হবে। সাধারণতঃ অল্প বয়স থেকেই অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছোট-খাটো অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাতে হবে-বড় অপরাধে পা বাড়াবার আগেই। এমনকী কাউকে চোখে না দেখেও তার চরিত্রের খুঁতগুলি স্পষ্ট না জেনেও শুধু তার দেহের কোষ ও নানা উপাদানের অ্যানালিসিস-রিপোর্ট স্টাডি করেই টের পাওয়া যাবে তার মধ্যে কী কী মানসিক রোগের বীজ সুপ্ত আছে। সে-ই বুকে রোগ প্রকাশের আগেই হবে চিকিৎসা। এইভাবে মানুষের প্রতিভার, তার সগুণের বিকাশের পথ যাবে খুলে।

কথা শুনতে শুনতে ল্যাবরেটরির ভিতরটা লক্ষ করছিল শেখর। ল্যাবরেটরির ভিতর সে দু-তিন বার এলেও এই কোণটায় আসেনি আগে। রাইটিং-টেবিলের ওপরে ফ্রেমে-বাঁধানো ছোট একখানা ফোটো দেখে চমকে উঠল সে—এ-ই সেই মুখ! ডাঃ ব্যানার্জির মুখের সঙ্গে কী দারুণ মিল! তাই ডাক্তারকে দেখা পর্যন্ত এত চেনাচেনা ঠেকছিল।

ফোটোখানা দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, এ ছবি কার? ডাক্তার থমকে গেলেন। প্রখর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি চেন একে?

-না, তবে ছবি দেখেছি। বোধহয় খবরের কাগজে। অনেক দিন আগে। আমার ছোট ভাই। ডাক্তার বললেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিল, অসাধারণ মেধা। ভালো চাকরিও করত। কিন্তু ও ছিল ভীষণ লোভী অর্থ, সম্পদ, বিলাসিতার লোভ। মোটে সংযম ছিল না। সর্বদা ধার-দেনায় জড়িয়ে থাকত। বোধহয় আমার ঠাকুর্দার রক্তের ধারা

পেয়েছিল। একটা নোট জাল করার মেশিন তৈরি করেছিল কোনো দুষ্ট লোকের উস্কানিতে। অমন নিখুঁত জাল নোট এদেশে নাকি আর হয়নি। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। এবং জেল হওয়ার আগেই 'আত্মহত্যা করল লজ্জায়।

মনে পড়েছে। খুব হই-চই হয়েছিল ঘটনাটায়। ওর পরিণতিই আমার এই রিসার্চের কারণ। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন ডাঃ ব্যানার্জি। তিনি উত্তরের খোলা জানলার সামনে গিয়ে শেখরের দিকে পিঠ ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি উদাস, অন্তরে বুঝি কোন দূর অতীতের বেদনাময় স্মৃতির রোমন্থন। শেখর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সাত ডাঃ ব্যানার্জির চিকিৎসায় ফাগুলাল আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, ফিরে এসেছে তার আগেকার স্বভাব। সাত-আট দিন সে নিজের ঘরেই ছিল। প্রায় সারাক্ষণ ঘুমুত ওষুধের প্রভাবে। কালোর মা তার দেখাশোনা করত, অবশ্যই সর্বক্ষণ গজগজ করতে করতে।

ফাগুলাল আগের মতোই বাগানে কাজ করে, ফুল গাছের যত্ন নেয়, নিজের মনে টুকরি, মোড়া ইত্যাদি বানায়, রাতে বাঁশি বাজায়। কয়েক দিন সে একটু সঙ্কুচিতভাবে কাটিয়েছিল। তারপর বাড়ির লোকের খোলামেলা ব্যবহার পেয়ে ফের সহজ হয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ফাগু 'ভালো হয়ে গিয়েছে, আর রাগারাগি করবে না।

ব্যস, এ বাক্য কালোর মা, বুধন, মায় কালো অবধি শিরোধার্য করে নিল। কালোর মার ধারণা, ডাক্তারবাবু ফালালকে খুব বলেছেন, শাস্তি দিয়েছেন।

এক পরম প্রশান্তির মধ্যে শেখরের দিন কেটে যাচ্ছে। আনন্দময় অনুভূতিতে তার মন সবসময় ভরে থাকে। এই অনুভব তার আগেও হচ্ছিল, কিন্তু তখন মাঝে মাঝে কলকাতার কথা মনে জেগে উঠত। এখান থেকে ফিরে আবার সেই জীবনযাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ভেবে কেমন একটা অবসাদ ও বিতৃষ্ণতায় অন্তর ভারী হয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে জানে, পুরনো পরিবেশে ফিরে যাওয়ার তার আর দরকার নেই। এখন তার সামনে শুধু ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল নতুন জীবনে পদক্ষেপ।

কখনও সারাটা দিন সে বাগানে তার স্টুডিওতে কাটায়। টুকিটাকি যন্ত্রপাতি মেরামত করে, ছবি আঁকে, বই পড়ে। কোনো কোনো দিন বেড়াতে যায় কাধে

ক্যামেরা বুলিয়ে।

মৃগাঙ্ক দত্তর সঙ্গে শেখরের অন্তরঙ্গতা আরও নিবিড় হয়েছে। প্রথম দিন শেখর এক আড়ষ্ট ছিল – মৃগাঙ্ক তার অতীত ইতিহাসের অনেকখানি জানেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর হাবভাব তার সব সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিল। শেখরের অতীত নিয়ে মুগাঙ্কবাবুর কোনো মাথাব্যথাই নেই, সেসব দিন শেখরের জীবন থেকে বুঝি সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। তার কাছে একমাত্র সত্য আজকের শেখর—এক সুস্থ সুশ্রী বুদ্ধিমান যুবক। মৃগাঙ্কবাবু মাঝে মাঝে শেখরের স্টুডিও বা শোওয়ার ঘরে হানা দেন, হাসি-ঠাট্টায় আসর জমিয়ে তোলেন। শেখরও মেতে ওঠে গল্পে। এই উদার-হৃদয় যুবকটিকে বড় আপন মনে হয় শেখরের।

একদিন মৃগাঙ্কবাবু বললেন, আমাদের আর ওই বাবু-টাবুবা আপনি-আজ্ঞে চলবে না। ওতে কেমন বাদে-বাধো ঠেকে, আচ্ছা তেমন জমে না। এবার থেকে আমি মৃগাঙ্ক, তুমি শেখর। কী, রাজি?

শেখর খুশি হয়ে বলল, ঠিক বলেছ।

সেদিন সন্ধের সময় উন্মুক্ত প্রান্তরে বেদির মতো দেখতে প্রিয় পাথরখানার ওপরে গিয়ে বসল শেখর। কিরকিরে বাতাস বইছে। দিনে ঝা-ঝা রোদুরের পর ভারি আরামদায়ক। অজানা বনফুলের হালকা সুবাস আসছে ভেসে। কাছেই এক নিঃসঙ্গ শালগাছ।

মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে শেখরের। মারা যাওয়ার আগে দু-বছর মা বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। দেওরের সংসারে উদয়াস্ত খাটুনি ও তাচ্ছিল্য, এদিকে তাঁর বড় আদরের একমাত্র সন্তান শেখর কোথায় তাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি দেবে, তা নয়, ক্রমশ সে গোল্লায় যাচ্ছে খারাপ সঙ্গে মিশে। মা সেটা ঠিক টের পেতেন। রাগারাগি, কান্নাকাটি করতেন। ক্ষণকালের জন্যে নরম হত শেখরের মন। কিন্তু অচিরে ভেসে যেত সব সাধু সংকল্প, নিষ্ফল হত মায়ের অনুযোগ, অশ্রু-বিসনি। যে কোনো উত্তেজনাময় জীবন শেখরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। নিষিদ্ধ কাজে উত্তেজনার মাত্র বড় বেশি। তাই জাল-জুয়াচুরি, চোরাকারবারি ইত্যাদি সমাজ-বিরোধী গোপন কার্যকলাপ, অনায়াসে অঢেল টাকা উপার্জনের পন্থা তাকে মোহগ্রস্ত করত, রোমাঞ্চিত করত। বেঁচে থাকলে মা আজ কত খুশিই না হতেন শেখরের পরিবর্তন দেখে! অনুতপ্ত শেখর পরলোকগতা মায়ের কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করল।

জীবনটাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে। ছেলেবেলায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কত রঙিন ছবি ভাসত কল্পনায়। সেগুলিকে কি বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় না? ডাক্তার ব্যানার্জি ও মৃগাঙ্কের মতে, তার মধ্যে নাকি অনেক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। ঠিকমতো চর্চা করতে পারলে সে নাকি যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করতে পারবে। কলকাতার দিনগুলো, পুরনো সাঙ্গোপাঙ্গদের স্মৃতি যেন ইতিমধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

তবে মাঝে মাঝে একটা ভয়, গভীর একটা আশঙ্কা জেগে ওঠে মনে: তার মানসিক ভারসাম্য আবার যদি বিকল হয়! আগেকার দুর্বুদ্ধিগুলো যদি ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই মানসিক পরিবর্তনকে ডাক্তার যে বেশি দিন ধরে রাখতে পারছেন না।

মৃগাঙ্ক বলেছিল যে, সাধারণত প্রথমবার ট্রিটমেন্টের পর মানুষের বেলা তিন মাস এবং কুকুর প্রভৃতি পশুর বেলা ঠিক দু'মাস পরেই পুরনো মানসিক ঝোকগুলো ফিরে আসে। দ্বিতীয় বা পরেরবারের চিকিৎসার ফল অবশ্য অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়, অন্তত দেড়-দু বছর থাকে ওষুধের প্রভাব। শেখরের বেলায় চিকিৎসার পর তিন মাস কুড়ি দিন কেটে গিয়েছে। তাই তাদের আশা, হয়তো তার দেহ-রসায়নের পরিবর্তন স্থায়ী হতে চলেছে, এত দিনে হয়তো সার্থক হতে চলেছে বিজ্ঞানীর দুলহ তপস্যা।

আরও চার-পাঁচ দিন কেটে গেল।

সেদিন সকাল থেকে শেখরের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। মাথা ধরেছিল। কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে শেখরের মনে বেশ গর্ব আছে। তাই এই সামান্য শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু সে কাউকে বলতে লজ্জা পেল। ভাবল, এ কিছু নয়, গত দু রাত অনেকক্ষণ জেগে বই পড়ার ফল। আজ ভালো ঘুম হলে ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন শেখর বিকেলে মাঠ বা পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেল না। গেল শহরের বাজারে—ঘড়িঘর অঞ্চলে। কিছু কেনাকাটা দরকার। মেঘলা দিন, দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জোলো বাতাস বইছে।

বাস টার্মিনাসের সামনে কালীমাতা কেবিনের বেঞ্চিতে বসে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছিল শেখর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাস এসে থামছে, বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার রওনা

হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামায়, ফিরিওলাদের চিৎকারে, কনডাক্টরদের হাঁকডাকে জায়গাটা সরগরম।

হঠাৎ একটা কালোরঙের অ্যামিবাসাডর গাড়ি এসে থামল কিছু দূরে। চারজন লোক নামল গাড়ি থেকে। একজন দ্রুত পায়ে প্রবেশ করল একটা খাবারের দোকানে। বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির কাছে। তাদের একজনের ওপর চোখ পড়তেই শেখরের হৃদপিণ্ডের রক্ত যেন চলকে উঠল।

গঙ্গাপ্রসাদ ওরফে গ্যাড়া গঙ্গু।

গাড়ির কাছে অপেক্ষমাণ তিনজনের মধ্যে এক ব্যক্তি উচ্চতায় বেশ খাটো, কিন্তু পুটি প্রশস্ত এবং অত্যন্ত গাট্টাগোট্টা জোয়ান। মুখখানা তার ফুটবলের মতো গোল, মাথায় চুল কদমছাট, শিকারি বেড়ালের মতো পাকানো গোঁফজোড়া, চোখে কালো গগলস পরিধানে দামি স্যাট। লোকটা সিগারেট খাচ্ছে। এই লোকটি স্মাগলার কুপাল সিংয়ের দক্ষিণ হস্ত —গাড়া গঙ্গু নামে খ্যাত।

কপাল সিং যেদিন শেখরকে তার আচ্ছায় ডেকে এনে অপমান করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল, গঙ্গু পাশে দাঁড়িয়ে কুৎসিত উল্লাসে হাসছিল, রগড় দেখছিল। কৃপাল সিং যখন শেখরকে বের করে দেওয়ার হুকুম দিল, এই গঙ্গই তাকে ঘাড়ধাক্কা মেরে দরজার বাইরে পার করে দিয়েছিল।

দুর্জয় রাগে শেখরের মাথার ভিতরটা দপদপ করতে লাগল। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল গাঙ্গুর পানে। ভুলে গেল চারপাশের দোকান-পাট, মানুষজনের অস্তিত্ব।

একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে জাগল শেখরের-ছুটে গিয়ে দশ আঙুলে সাড়াশির মতো গসুর গলাটা টিপে ধরে। কিন্তু এখন সে নিরস্ত্র।আর গঙ্গু ছুরি বা পিস্তল সঙ্গে না নিয়ে এক পাও হাঁটে না। তাছাড়া সংখ্যায় ওরা-চার, সে এক। সুতরাং ইচ্ছেটাকে সে দমন করতে বাধ্য হল।

একটু পরে ফিরে এল গাড়ির চতুর্থ ব্যক্তি। হাতে এক ডাঙারি খাবার। সবাই উঠল গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে রওনা হল।

শেখর খানিকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল দোকানে। তারপর পয়সা চুকিয়ে বেরোল রাস্তায়। দিশেহারার মতো সে পথে পথে ঘুরতে লাগল। মগজে যেন

আগ্নেয়গিরির প্রলয়কাণ্ড চলছে। কী ভাবছে ওই গঙ্গু, তুপাল সিংয়ের দল? শেখর ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে ভেবে নিশ্চয়ই তারা হাসাহাসি করে। ওরা নিশ্চয়ই ভাবে, শেখর ইদরের মতো গর্তে লুকিয়েছে, আর মাথা তোলার হিম্মত নেই। শেখরের বন্ধু-বান্ধবেরাও তাকে নিশ্চয়ই কাপুরুষ ভাবছে।

হ্যা, প্রতিশোধ চাই—নির্মম প্রতিশোধ! নিজের ওপর ধিক্কার জাগল শেখরের—এখানে কী করছি আমি? অপদার্থ! এত বড় অপমানটা বেমালুম হজম করে গুড বয় হওয়ার সাধনা করছি। ছোঃ!

ভদ্র সৎ জীবন-যাপন চুলোয় যাক! কায়ক্লেশে দুটো পয়সা রোজগার, কোনোমতে দিন গুজরান তার পোষাবে না। শেখর চায় 'অর্থ, ভোগ, প্রতিপত্তি এবং চায় খুব তাড়াতাড়ি, তা সে যে পথেই আসুক না কেন। ন্যায়-অন্যায়ের নীতি-বোধ নিয়ে কি সে ধুয়ে খাবে? সোজা পথে যে সে অর্থ ও খ্যাতি উপার্জন করতে পারবে তার গ্যারান্টি কোথায় ? মৃগাঙ্করা হচ্ছে সুখ-পালিত জীব। কী বুঝবে ওরা শেখরের জ্বালা? আবার সে ঝাপিয়ে পড়বে পুরনো জগতে। কৃপাল সিং গঙ্গুরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে, শেখরকে শায়েস্তা করা অত সোজা নয়। তবে হ্যা, শেখর হুট করে কিছু করবে না, হিসেবনিকেশ করে হুঁশিয়ার হয়ে এগোবে। দল পাকাবে, তারপর নেবে বদলা। ক্রমে একদিন সে হয়ে উঠবে কলকাতার চোরাকারবারি সমাজের মুকুটহীন রাজা। অবশ্য পুলিশের নজর আছে তার ওপরে। কিন্তু তাতে কী?

এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছে শেখর। সহসা তার খেয়াল হল, সে ডাক্তার কুঠিতে ঢুকে পড়েছে।

অন্যমনস্কভাবে রাতের খাবার খেল শেখর। মৃগাঙ্ককে এড়িয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। ঘুম গেল উবে। অবিরাম পায়চারি করে চলল, একটার পর একটা সিগারেট খেল। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করল।

কোনো একটা ছুতো করে ও সরে পড়বে এখান থেকে। বলবে, "কয়েক দিন ঘুরে আসছি" ব্যস, তারপর হাওয়া। ডাক্তার বা মৃগাঙ্ক তাকে জোর করে আটকে রাখতে চাইলে সে বরদাস্ত করবে না। ডাঃ ব্যানার্জির এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হওয়ার জন্যে সে মোটেই দাসখত লিখে দেয়নি।

কলকাতায় এন্টালির ঠিকানাটা পালটাতে হবে। কাল বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করবে টেলিফোনে।

ঢং ঢং ঢং! রাত তিনটে ঘোষণা করল বারান্দার দেওয়াল ঘড়ি। শেখর ভাবল, থাক। এখন, কাল ঠান্ডা মাথায় প্ল্যানগুলো ছকতে হবে।

রিভলভারটা বের করে দেখল ও। চেম্বারে টোটা খতম! বোধহয় ডাক্তার সরিয়ে রেখেছে। যাকগে, গুলি জোগাড় করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন কর্ম নয়।

চেয়ারে বসল শেখর। একসময় তার অজান্তে দু চোখের পাতা বুজে এল তার।

আট

শেখরের ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গিয়েছে। মুখের ওপর একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে।

এ কী, আমি চেয়ারে বসে কেন!শেখর অবাক হল। তারপর তার মনে পড়ে গেল গতকালের ঘটনা—গঙ্গু কৃপাল সিং। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল সে।

মাথাধরা কমেছে একটু। তবু অনিদ্রায় শরীর ভার ভার। আজ তার অনেক কাজ। ভাবতেই তার শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুঃসাহসে ভর করে বিপদের স্রোতে পাড়ি দিতে, বেপরোয়া জীবনের স্বাদ পেতে সে চিরদিনই উল্লাস বোধ করে।

চটপট ব্রেকফাস্ট করে শেখর সাইকেলে বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য-ঘড়িঘর-বাজার।

দোকান-পাট তখন সবে খুলেছে। রেডিওর দোকান কুণ্ডু ব্রাদার্সের মালিক গণপতি কুন্ডুর সঙ্গে শেখরের বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছে এ কদিনে। কুন্ডুর দোকানে টেলিফোন আছে অফিসঘরে শো-কেসের পিছনে। শেখর গিয়ে বলল, নমস্কার কুতুমশাই, একটা ট্রাংককল করতে দেবেন? আমাদের বাড়ি থেকে লাইন পাচ্ছি না, বোধহয় বিগড়েছে বলে সে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল—যা লাগে, নেবেন।

করকরে নোটখানা পকেটস্থ করতে করতে কুণ্ডুমশাই একগাল হাসিলেন—আজ্ঞে, করবেন বইকি কল। তার জন্যে আবার পয়সা কেন? হেঁ হেঁ, তবে বুঝলেন কিনা, ফোনের চাজ যা বেড়েছে! নইলে এই সামান্য উর্গারটুকু কি আর.. ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেখর বধুর লাইন পেল।

হ্যালো, বন্ধু আছে?

—আমি বন্ধু বলছি।

—আমি শেখর।

—হ্যাল্লো বস, তুমি! আমি তো ভাবলাম...

—কী ?

—না, মানে, কোনো পাত্তাই নেই। তা, কবে আসছ?

—শিগগিরই, দু-তিন দিনের মধ্যেই। ওদিককার খবর কী?

—খুব ভালো। ভেরি ভেরি গুড। গোমেজের সঙ্গে সিংয়ের জের ফাইট লেগে গিয়েছে ব্রীজরামকে নিয়ে। আঃ, কী মোক্ষম খবর দিয়েছিলে দাদা! শুনেই গোমেজ ফায়ার। দু দলের তিনটে লোক জখম হয়েছে। গোমেজের দলের একজন এখনও হাসপাতালে। পিঠে

হ্যা, গোমেজ তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সিংকে একচোট দেখে নিতে চায়।

—আর ইদ্রিস শেখ? বলেছিলে তাকে?

—আলবৎ। আমায় ডিউটি দিলে ফঁক পাবে না বস। ইদ্রিস রাজি। কমিশন বেশি পেলে তোমার হয়ে কাজ করবে। তবে গোড়ায় ছিু অ্যাডভান্স চায়।

বেশ, দেব। আর কোনো খবর?

–হ্যা, বাহাদুর এসেছিল পরশু। নেপাল থেকে অনেক টাকার হজমিগুলি সাপ্লাই আসছে দিন পনেরোর মধ্যে, খোঁজ করছিল তুমি নেবে কিনা। সস্তা রেট।

নিতে পারি। বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলব গিয়ে। ওকে অপেক্ষা করতে বোলো।

—যাক, এসে পড়ছ তো শিগগিরই ?

–আঃ, বাচালে। তা আছ কোথায় অদ্দিন ডুব মেরে ?

—পরে বলব। শোনো, একটা বাড়ি খুঁজে রেখো আমার জন্যে। দমদম বা বরানগরে, একটু নিরিবিলি চাই। আচ্ছা, চলি। গুড লাক!

যাক, ওদিককার কাজ অনেকখানি হাসিল। তবে সটকে পড়ার আগে এখানে দুটো জরুরি কাজ বাকি। এক, ডাক্তারের সেই মহামূল্যবান প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিটি হাতাতে হবে। ইদানীং ওই মূর্তিগুলো নিয়ে এরা কেউ মাথা ঘামায় না। ঘরে তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সুতরাং একটা মূর্তি খোয়া গেলে কেউ খেয়ালই করবে না আপাতত। দুই, নারায়ণ কুটারের বাবাজি ওরফে প্রাক্তন দারোগা খাস্তগিরের সঙ্গে একটা পুরনো দেনাপাওনার ফয়সালা করতে হবে—একদা এক অসহায় নিরপরাধ তরশকে নির্দয়ভাবে প্রহার করার বিচার। বক-ধার্মিক খাস্তগিরকে সে খতম করে যাবে। খাস্তগির প্রতিদিন ভোররত্রে তপোবন পাহাড়ে বেড়াতে যায়। শেখর রাত থাকতে গিয়ে ওই পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবে। এবং তারপর এক বৃদ্ধকে খুন করে কোনো গর্তে ফেলে দেওয়া তো নেহাতই ছেলেখেলা। খাস্তগির মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপর সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে দু-চার দিন কাটিয়ে আসে। অতএব তার অন্তর্ধান কয়েকদিন কেউ গায়েই মাখবে না। ইতিমধ্যে শেনো বুনো জন্তু মৃত দেহটার সদগতি করে ফেলবে। আর খুন হয়েছে বোঝা গেলেও তার 'ভয় কী? শেখর যে কস্মিনকালে খাস্তগিরকে চিনত, কেউ জানে না।

আরও একটা লোভ হয়। ডাক্তারের আয়রন-চেস্টে প্রচুর নগদ টাকা মজুত আছে, শেখর দেখেছে। সিন্দুকের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে যাবে নাকি? নাঃ, থাক্ হাজার হোক, বিপদের সময় উপকার করেছে।

শেখর বাড়ি ফিরে লাইব্রেরিতে একটা বই হাতে নিয়ে বসে রইল। মিউজিয়ামঘরের চাবির গোছা মৃগাঙ্কর ঘরে একটা পেরেরাকে টাঙানো থাকে। শেখর তা জানে। মুগাঙ্ক একবার ল্যাবরেটরিতে ঢোকামাত্র সে চট করে মৃগাঙ্কর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চাবি নিয়ে, যে ঘরে বিষ্ণুমূর্তি আছে তার দরজার তালা খুলে, মূর্তিটা বের করে ফের তালা দিল। তারপর মুর্তি নিজের

ঘরে লুঝিয়ে রেখে এল এবং চাবি রেখে এল যথাস্থানে। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

একটা ছুরি জোগাড় করতে হবে—বেশ ধারালো বড় ছুরি। বাগানের স্টুডিওতে একখানা এমনি ছুরি আছে, তাতেই কাজ উদ্ধার হতে পারে। শেখর ধীরে-সুস্থে নিচে নামল।

উঠোনে থাবায় মুখ রেখে টানটান হয়ে শুয়ে আছে রাজা। সামনে মাটিতে দুটো চড়ুই পাখি নেচে বেড়াচ্ছে, রাজা জুলজুল চোখে নজর করছে তাদের। তাড়া লাগাবার মতলব আজিহে বোধহয়। শেখরের পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। ফাগুলাল গোলাপ বাগানে খোঁড়াখুড়ি করছে আপনমনে। শেখর সতর্ক চোখে চারধারে দেখে নিয়ে দল খুলে স্টুডিও ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘরখানি পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। একধারে তক্তপোশ, তাতে শতরঞ্চি পাত তার ওপর নানা ধরনের যন্ত্রপাতিহাতুড়ি, বাটালি, ক্রু-ড্রাইভার, ছুরি ইত্যাদি ছি; রাখা। একটা ট্রানজিস্টার রয়েছে আধখোলা অবস্থায়। দেয়ালে ঝুলছে শেখরের তোলা ডাক্তার-কুঠির একখানা এনলার্জ-করা ফোটো। মেঝেতে চাটাই পীতা। স্ট্যান্ডের গায়ে হেলানো অবস্থায় শেখরের আঁকা একটি প্রায়-সমাপ্ত রঙিন ছবি—ক্ষীণকায়া খরস্রোত পাহাড়ি ঝরনা খাড়া উঁচু থেকে লাফিয়ে নামছে শিলাখণ্ডের বুকে ফোয়ারার মতো জল ছিটিয়ে। দুপাশে ঝোপ-জঙ্গল।

শেখর ঘরের মধ্যে একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। অন্য এক অনুভূতি, বিচিত্র কল্পনাময় এক জগতের স্পর্শ চকিতে অনুভব করল হৃদয়ে। অনেক স্মৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনি তার মনে ভিড় করে এল। আর হয়তো সে কোনো দিন ছবি আকবে না। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ক্যামেরায় বন্দি করে রাখার মতো অবসর আর কি সে পাবে? যে উত্তেজনাময় জীবনের টানে সে ছুটে চলেছে, সেখানে সূক্ষ্ম রুচি বা সৌন্দর্যচর্চার স্থান কোথায় ? আচ্ছা, যে জীবন সে বেছে নিতে চলেছে তা চিরকাল তার ভালো লাগবে তো? ওই স্কুল জীবন-যাত্রা কি কিছুকাল পরে তার কাছে ক্লান্তিকর ঠেকবে? এখানকার কটা দিন বড় আরামে কাটল। এই জগৎটা ছেড়ে যেতে তাই কেমন মায়া হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে।

অসৎ উপায়ে অর্থ-উপার্জন করে হয়তো সে চুটিয়ে বিলাস-ব্যসন উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু লোকের শ্রদ্ধা বা প্রীতি কি অর্জন করতে পারবে কখনো? না বোধহয়। সুখ, শান্তি, সম্মান বিসর্জন দিয়ে শুধু অর্থ-চিন্তা, উত্তেজনা, ভোগ ও

কুসল সত্যিই সে কি চায়? দ্বিধাগ্রস্ত শেখরের মন দুলতে লাগল। কিছু স্থির করতে পারে না সে, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। দু হাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো টলতে লাগল শেখর।

—কী হয়েছে শেখর? শরীর খারাপ নাকি? কাল থেকে দেখছি তুমি কেমন যেন-- মৃগাঙ্কের গলা। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে সে।

উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাল শেখর। তারপর চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, হ্যা, শরীরটা কেমন যেন... জানো মৃগাঙ্ক, আমি বোধহয় আবার সেই আগের মতো,

নিমেষে মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল শেখরের অবস্থা। কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে কোমল স্বরে বলল, কোনো ভয় নেই। এসো আমার সঙ্গে।

দু'জনে দোতলায় উঠল। মৃগাঙ্ক বলল, তুমি বসো এখানে। আমি স্যারকে ডেকে আনছি।। শেখর বারান্দায় চেয়ারে বসল। মৃগাঙ্ক ঢুকল ল্যাবরেটরিতে।

একা হতেই শেখরের চিন্তাশ্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু কাল-আরে, বোকর মতো কাণ্ড করলাম। নার্ভাস হয়ে নিজের পায়ে হড়ল মারলাম। কে চায় নিরীহ পানসে ভালোমানুষের জীবন? শেখরের ভাগ্যলিপি আলাদা। গুলি মারে এই শুরুঠারমার্ক ভদ্রলোকেদের উপদেশে!

ক্ষণিক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সজাগ হয়ে উঠল শেখর। এখনও সময় আছে, ম্যানেজ করে কেটে পড়ার। তাকে আবার চিকিৎসা করার সুযোগ যেন ওরা না পায়। সে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

-শেখর কোথায় যাচ্ছ?

মৃগাঙ্কর ডাক শুনে সিড়ির মুখে শেখরের গতি রুদ্ধ হল। বলল, নিচে যাচ্ছি।

—নিচে কেন?

এমনি কাজ আছে।

সে কী। কেমন লাগছে শরীর? -শুধোল মৃগাঙ্ক।

—ফার্স্টক্লাস!

-মানে! মানে, মজা করছিলাম। অ্যাকটিং। কেমন ভড়কি দিলাম বললা— শেখর জোরে হেসে ওঠে।

মৃগাঙ্ক সামনে এসে দাঁড়াল। শেখরের কাঁধে হাত রেখে তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখে চেয়ে বলল, ঠিক বলছ?

হ্যা...কী আশ্চর্য, এর মধ্যে আবার মিথ্যে বলতে যাব কেন? -শেখর বিব্রতভাবে ঘাড় ফেরাল।

–ভাই শেখর শেষে আমাকেও ফাকি দিতে চাই। আমি সব বুঝেছি। এসো।

ওই স্নেহমাখা কথাকটি শোনামাত্র শেখরের সব প্রতিরোধ শিথিল হয়ে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, দেখতে পেল, ল্যাবরেটরি থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসছেন ডাঃ ব্যানার্জি।

শেখরকে নিয়ে মুগাঙ্ক ও ডাক্তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। শেখরকে শোয়ানো হল একটা টেবিলে। তাকে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন ডাক্তার। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে ঢলে পড়ল শেখর।

তিন-চার দিনের মধ্যে শেখর আবার সুস্থ হয়ে উঠল। ফিরে এল তার মানসিক প্রশান্তি, তার শিল্পবোধ। কলকাতার পুরনো জগতে ফেরার কথা সে এখন ভাবতেই পারে না। গত কয়েক দিনের ঘটনা আগাগোড়া তার কাছে কেমন স্বপ্নের মতো অলীক মনে হয়।

ডাক্তার ব্যানার্জি বা মৃগাঙ্কর কাছে ব্যাপারটার কিন্তু বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের ভাবখানা, যেন নেহাত তুচ্ছ অসুখ করেছিল শেখরের, ওষুধ খেয়ে সেরে গিয়েছে, বাস।

বরং মৃগাঙ্ক রসিকতা করে মাঝে মাঝে—কী হে শেখর, হঠাং তেজ বেড়েছিল যে? সুখে থাকতে ভূতে কিলায়?

'ভালো কথা, একাকে বিষ্ণুমুর্তিটা ফের যথাস্থানে রেখে এসেছে শেখর সুস্থ হওয়ার পর পরই।

ডাঃ ব্যানার্জি বলেছেন যে, শেখর আদৌ আগেকার মানসিক অবস্থায় পুরোপুরি ফিরে যেত না। কারণ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, শেখরের দেহে রাসায়নিক উপাদানগুলির যে ভারসাম্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তা সামানাই বিচলিত হয়েছিল। ব্যাপারটা আরও বুঝিয়ে বলেছেন উনি, তোমার মানসিক রোগের কারণ ছিল তোমার দেহে দু রকম রাসায়নিক পদার্থের খুব বেশি অভাব। সেই অভাব পূরণ করে দিতেই তোমার দুর্বলতা কেটে গিয়েছিল। প্রায় চার মাস পরে আবার ওই রাসায়নিক উপাদানগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য কমে যায়। এর জন্যে অল্প অস্থিরতা বোধ করার অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি তোমার হত না। কয়েক দিন রেস্ট নিলে ঘাটতি আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আকস্মিক উত্তেজনা। ফলে মনের পুরনো প্রবৃত্তিগুলি আবার জেগে উঠেছিল। তবে এই অবস্থা স্থায়ী হত না—শিগগিরই তোমার উত্তেজনা কেটে গিয়ে শুভবুদ্ধি ফিরে আসত। এবং তখন স্বভাবতই জাগত অনুশোচনা। আমার এক্সপেরিমেন্ট এত তাড়াতাড়ি এতটা সফল আর কখনও হয়নি। আগেও একটি কেসে আমি সফল হয়েছি, তবে এত দ্রুত সে সাফল্য আসেনি।

শেখরের মনে উদগ্র কৌতূহল জাগল—কে সেই ভাগ্যবান যার মাধ্যমেই ডাক্তার তাঁর প্রথম সাফল্যের মুখ দেখেন? কিন্তু তার এই বাড়তি কৌতূহল ডাক্তার পছন্দ করবেন কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে সে চুপ করে রইল। তবে এই মুহূর্তে মৃগাঙ্কের প্রতি সে পরম তত বোধ করল। এই মানুষটিই তাকে রক্ষা করেছে সর্বনাশের গ্রাস থেকে। একবার ভুল করে বসলে আর তো তার ফেরার উপায় থাকত না।

অনেক চিন্তা করে শেখর স্থির করেছে, এখানে আর তার থাকা চলবে না। তাকে পালিয়ে যেতে হবে আরও অনেক দূরে—তার বিগত জীবনের দূষিত আওতার অনেক বাইরে।

মৃগাঙ্ক তার অভিসন্ধি জেনে বেজায় আপত্তি জুড়ে দিল। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ডাঃ ব্যানার্জির কাছে। ডাক্তার শুনে প্রশ্ন করলেন, তুমি দূরে যেতে চাও কেন?

শেখর বলল, আমার পুরনো সঙ্গীদের হাত থেকে বাঁচতে। আমি জানি, পুলিশ আমার অপরাধের প্রমাণ পেলে, আমি জেল খাট। সে বরং এক হিসেবে ভালো-অন্যায় করার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। সে শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু

সিংয়ের দলের হাতে আমি মরতে চাই না। এত কাছে থাকলে ওরা আমার খোঁজ পেয়ে যাবে। তাছাড়া চোরাকারবারি কাজে আমার সাঙ্গোপাঙ্গরাও হয়তো আমার এই পরিবর্তনকে সুনজরে দেখবে না। তাদের অনেক কুকীর্তির এমন জলজ্যান্ত সাক্ষী ধার্মিক বনে গিয়ে যদি পুলিশকে সব ফাস করে দেয়। আমি তাদের কাছে এখন বিপজ্জনক। তাই আমি আপাতত এদের নাগালের বাইরে যেতে চাই।

ডাঃ ব্যানার্জি শেখরের মনোভাব খানিকটা বুঝলেন। তাই বাধা দিলেন না। বললেন, কোথায় যেতে চাও?

দক্ষিণ ভারতে। মাদ্রাজে কিংবা মাইসোরে। দেখি কোথায় সুবিধে হয়।

বেশ, মাইসোরে আমার এক বন্ধুর কফির বাগান আছে। ইচ্ছে করলে চাকরি করতে পার সেখানে। চিঠি দিয়ে দেব। তারপর বিদেশে যাওয়ার সাধ থাকলে ব্যবস্থা করা যাবে। হ্যা, কিছু পিল দেব, হপ্তায় একটা করে খাবে তিন মাস। বেশি রাত জাগা চলবে না, অন্তত বছর খানেক। আর সাত-আট মাস পরে একবার আসবে আমার কাছে চেক-আপ করাতে। ভয় নেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার এই নতুন ফিফজিওকেমিক্যাল সিস্টেম আর কখনও ডিস্টার্বড হবে না। হলেও সামান্য হতে পারে। একটা ওষুধ দেব, সঙ্গে রাখবে। কোনো অস্থিরতা টের পেলেই খেয়ে নেবে এক ডোজ।

শেখরের ইচ্ছে, সে বছর দুই এদেশে কাটিয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে। পড়াশোনা করবে। ভালো করে শিখবে ফোটোগ্রাফির কাজ। অনেক দেশ বেড়াবে, ছবি তুলবে। তারপর ফিরবে ভারতবর্ষে।

কিছুক্ষণ পরে মৃগাঙ্ক শেখরকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। একগোছা নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, রাখ।

-কেন?

–তোমার যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার জন্যে লাগবে। আমি জানি, তোমার হাতে বেশি পয়সা নেই। না।

-শেখর মাথা নাড়ল।

—তোমার চলবে কী করে?

শেখর তার বলিষ্ঠ বাহুদুটি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এ দুটো আছে কী করতে? একটা পেট তো, ও ঠিক চলে যাবে। শেখরের মুখ দেখে মৃগাঙ্ক বুঝল জোরাজুরি নিষ্ফল। শেখর টাকা নেবে না।

টাকা শেখরের আছে। প্রচুর টাকা। বর্ধমানেরই এক ব্যাঙ্কে প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকা জমানো আছে। কিন্তু সে স্থির করেছে, ও টাকা সে ছোঁবে না। কারণ ও টাকা পাপের পথে অর্জিত। ওই অর্থ সে ভবিষ্যতে দান করবে কোনো মানসিক রোগের হাসপাতালে বা ডাঃ ব্যানার্জির গবেষণার জন্যে।

তিন দিন পরে এক সকালে শেখর ডাক্তার কুঠি থেকে বিদায় নিল। মৃগাঙ্ক সঙ্গে এল গিধনি স্টেশনে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে।

ট্রেনে জানলার ধারে বসে শেখর। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্ক। শেখর বলল, জানো মৃগাঙ্ক, একটা কথা ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে।

—কী কথা?

—আমিই ডাঃ ব্যানার্জির প্রথম সাকসেসফুল কেস। যখন ডাক্তারের রিসার্চের কথা লোকে জানতে পারবে, আমি তখন বিখ্যাত হয়ে যাব।

মৃগাঙ্ক একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, সরি।

-মানে?

—ডাঃ ব্যানার্জির প্রথম সাকসেসফুল কেস তুমি নও, আমি।

—আঁ! তুমি!!

–হ্যা, আমিও মানসিক রোগী ছিলাম। ছাত্র অবস্থা থেকেই কত কুকর্ম যে করেছি! ভীষণ নিষ্ঠুর ছিলাম। লোককে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়াতেই ছিল আমার আনন্দ।

খুনে-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে মিশতাম। এখন ভাবতে কেমন লাগে। তবে বুদ্ধি ছিল মেডিক্যাল পাশ করতে আটকায়নি। হয়তো পুরোপুরি ক্রিমিনাল হয়ে যেতাম

পরে। স্যার আমায় চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। শেখর খানিকক্ষণ থ হয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কত দিন লেগেছিল সারতে?

—পাকা পাঁচটি বছর। চারবার আমার মেন্টাল ব্যালান্স আপসেট হয়ে যায়, পালিয়ে যাই ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে। স্যার খুঁজে পেতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে এনে আবার আমার ট্রিটমেন্ট করেন। ক্রমে একেবারে সুস্থ হই।

একটু থেমে মিচকে হেসে আবার বলে মৃগাঙ্ক, তাই তো ব্রাদার, সেদিন আমায় ঠকাতে পারনি। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম ব্যাপার। আমি যে ভুক্তভোগী!

সিগন্যালের সবুজ সংকেত, গার্ডের ফ্ল্যাগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের দীর্ঘ দেহটা নড়েচড়ে উঠল, আস্তে আস্তে গড়াতে শুরু করল চাকা। শেখরের হাত চেপে ধরে মৃগাঙ্ক বলে উঠল, নিয়মিত চিঠি দেবে কিন্তু, নইলে ভীষণ রাগ করব। আর সাত-আট মাস কেন? আগেই চলে এসো। বড্ড একা একা লাগবে। আড্ডা মেরে মেরে অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে ভাই।

ক্রমে গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়ায়। মৃগাঙ্ক হাত নাড়ছে তাকে লক্ষ করে। শেখর বোঝে এই মানুষটির স্নেহের বন্ধন। ডাঃ ব্যানার্জির ঋণও সে কোনো দিন ভুলতে পারবে না। তার মানে বিচ্ছেদের বেদনা, তবু এক নবজন্ম লাভের সৌভাগ্যে এক গ্লানিমুক্ত আশা ভরা নতুন জীবনের হাতছানিতে তার হৃদয় অপূর্ব উল্লাসে ভরপুর হয়ে উঠল।

সমাপ্ত

নন্দপুরের অঘটন - অজেয় রায়
Nandapurer Aghatan by Ajeo Ray

Golpa **নন্দপুরের অঘটন - অজেয় রায় Nandapurer Aghatan by Ajeo Ray**

by boidownload

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেসের এক অংশে বঙ্গবার্তার সম্পাদকের ছোট্ট অফিস ঘরে উকি দিল দীপক। সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তখন চেয়ারে গা এলিয়ে আধশোয়া হয়েছিলেন। মাঝবয়সি দৃঢ়কায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। কপালে চিন্তার ভাঁজ। দীপককে দেখে তিনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, “এসো দীপক, তোমার কথাই ভাবছিলুম।

দীপক উল্টো দিকে চেয়ারে বসল।

দীপক রায় বঙ্গবার্তা কাগজের একজন রিপোর্টার। বছর পচিশ বয়স। ভবানী প্রেসের মালিক কুবাবু বঙ্গবার্তা নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটি প্রকাশ করে লাভের মুখ মোটেই দেখেন না। তবু এই কাগজ চালাতে কুঞ্জবাবু এবং তার বিনি মাইনের সাংবাদিকদের উৎসাহে কমতি নেই।

কুঞ্জবিহারী বললেন, কাছারিপট্টির ভোলানাথ সরকারকে চেন? প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি কারন।

দীপক বলল, ‘‘দেখেছি। নাম শুনেছি। তবে আলাপ নেই। ‘‘হুম্। নন্দপুর গ্রাম কোথায় জানো?

‘জানি। বোলপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে। ইলেমবাজার যাওয়ার পথে, বাস রাস্তার কাছে। বাঁ পাশে। একবার গেছলাম ওখানে।

সামনের টেবিলে টোকা মারতে মারতে কুবাবু বললেন, নন্দপুরের একটা ইন্টারেস্টিং খবর শুনলাম। গ্রামটায় ঘুরলে দেখতে পাবে কয়েকটা ছোট বড় পাকাবাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বাড়িগুলোর ভিতরে আর চার পাশে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। কেউ থাকে না। এর কারণ জানো?"

না। দীপক ঘাড় নাড়ে। ‘একটা স্যাড হিস্ট্রি আছে। প্রায় ষাট বছর আগে নন্দপুরে একবার ভয়ঙ্কর মড়ক লাগে। স্মল পক্স। মারাত্মক গুটিবসন্ত। প্রায় উজাড় হয়ে যায় গী। বেশির ভাগ লোক মারা যায়। বাকিরা প্রাণভয়ে পালায়। বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। খাঁ খাঁ গ্রামে ঘরে ঘরে শুধু মৃত বা মরণাপন্ন মানুষ। শিয়াল কুকুরে বাড়ি বাড়ি ঢুকে ছিড়ে খেয়েছিল মৃত এবং মুমূর্মু অসহায় লোকগুলিকে। শকুনের দল নেমে এসেছিল গ্রামে। আতঙ্কে দু-তিন বছর কেউ আর ওই গ্রামে বাস করতে আসেনি। যারা ফিরল পরে তাদের অনেকেই আর তাদের পুরনো ভিটেতে থাকেনি। নতুন বসতবাড়ি বানায়। ভূত-প্রেতের ভয়ে আর কি! বাড়িগুলোয় কত প্রাণ বেঘোরে গিয়েছে। তাদের সংকার হয়নি ঠিকমতো। পরিত্যক্ত পাকা বাড়িগুলো এখনও প্রায় টিকে আছে, তবে মাটির বাড়িগুলো ধসে গিয়েছে।'

‘ভোলা সরকারের দেশ ওই নন্দপুর। ওখানে ওর পূর্বপুরুষের বিশাল বাড়ি আছে। কিন্তু সে বাড়ি এখন পোড়ো। মড়কের পর ওদের বংশের কেউ আর নন্দপুরে বাস করেনি। এখন ভোলা সরকারের নাকি শখ হয়েছে পূর্বপুরুষের ওই

পোড়োবাড়ি সংস্কার করে ভবিষ্যতে সেখানে বাস করবেন। অন্য শরিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এ বিষয়ে। তবে আগে ক'দিন বাড়িটার ভিতর ঘুরে-ফিরে, রাতে থেকে বুঝে নিতে চান বাড়িটায় বাস করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা? অর্থাৎ ভূত-টুতের উপদ্রব আছে কিনা? যদি ভয়ের কিছু না থাকে তবেই পয়সা ঢালবেন বাড়ি সারাতে।শরিকদের অংশগুলোও কিনে নিতে পারেন। অবশ্য দরে পোষালে। বাড়ির অন্য শরিকদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই এই প্রস্তাবে। কারণ ওই পোড়ো বাড়ির ভাগের জন্য যা মেলে তাই লাভ। গতকাল থেকে ভোলা সরকার তীর এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছেন। তোমায় নজর রাখতে হবে ব্যাপার কী দাঁড়ায় ? ভালো স্টোরি হতে পারে বার্তায়। হেডিং দেওয়া যাবে—অতীতের টানে। কিংৰা-পূর্বপুরুষের ভিটের টানে।

প্রেসের কম্পোজিটর বৃদ্ধ দুলালবাবু এক যগকে পাশে এসে শুনছিলেন কথাবার্তা। তিনি রোগে মন্তব্য করলেন, “ভোলা সরকারের ভীমরতি হয়েছে। বুঝবে ঠেল।” * কুঞ্জবিহারী বললেন, 'ফলটা ভালো হলে ভালো। এরপর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে যোগ করলেন, আর অঘটন কিছু ঘটলে আরও ভালো। মানে আমার কাগজের স্বার্থে। জব্বর খনর হাবে। দীপক, নন্দপুরের কাউকে চেনো তুমি?

‘চিনি, জানাল দীপক। “উত্তম। চলে যাও নন্দপুর। পারলে দু এক রাত থেকে যেও ওখানে। ভূত-প্রেতের আবির্ভাব সাধারণত রাতেই হয়। বরাতে থাকলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখতে পারবে। উইশ ইউ গুন্ লাক।

পরদিন সকালে নন্দপুরে গিয়ে নিতাইকাকার কাছে সরকারদের পোড়ো বাড়ির খোঁজ নিল দীপক। বাড়িটা পুপাড়ায়, অল্প দূরে। গতকাল থেকে ভোলানাথ সরকার বাড়িটা সাক করতে লেগেছেন। ভোলাবাবুর এক বন্ধুও এসেছেন সঙ্গে। দীপক পুপাড়ায় চলল।

সরকার বাড়িটা দোতলা। মাঝারি আকারের অট্টালিকা বলা চলে। বোঝা যায় রীতিমতো ধনী ছিল এই পরিবার। একদা বাড়ি ঘিরে ইটের পাঁচিল আজ নিশ্চিহ্ন। কম্পাউন্ডের ভিতরে মস্ত মস্ত গাছ। পুরনো আমলের বাগানের আম কাঠাল ইত্যাদি ফলের গাছের সঙ্গে মিশে আছে অনেক বুনো গাছ। বড় গাছগুলোর তলায় এবং বাড়ির চারধারে ঘন আগাছ। তবে সামনে কিছু ঝোপঝাড় সদ্য কাটা। বাড়িতে ঢোকার প্রকাণ্ড সদর দরজার মুখে ঠাসা ভিড়। গ্রামের যত নিষ্কর্মা পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ভিতরে।

সদর দরজায় পাল্লার চিহ্ন নেই। কেবল কাঠের ফ্রেমের সামান্য অংশ তখনও আটকে আছে দেওয়ালে। দীপক ভিড় কাটিয়ে সামনে গেল। | চারকোনা বিরাট উঠোন। বাঁধানো। তিন দিকের উঠোন ঘিরে উঁচু বোয়াক। রোয়াকের ধার ঘেষে গোল মোটা থামের সারি খাড়া হয়ে আছে দোতলার বারান্দার ভার মাথায় নিয়ে। বোয়াকের লাগোয়া পরপর ঘর। ঘরগুলোর দরজা জানলার যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই আর অন্ত নেই। তাদের অধিকাংশের পাল্লা ফ্রেম উইয়ে খাওয়া জরাজীর্ণ অথবা বেমালুম লোপাট। উঠোন ও রোয়াকে মেঝে খুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে প্রচুর আগাছা। দেওয়াল আর মেঝের ফাটল থেকে ডালপালা মেলেছে অনেক বড় অর্থ।

দু'জন মজুর কাটারি দিয়ে উঠোনে ঝোপ কাটছে। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোলা সরকার। দোতলায় নজরে আসে লোহার রেলিং দেওয়া বারান্দা। মানুষের হঠাৎ উৎপাতে বিব্রত এই পোড়ো বাড়ির বাসিন্দা অজস্র পায়রা ও শালিক পাখি চেঁচামেচি ওড়াউড়ি করছে।

ভোলানাথ সরকারের চেহারা ছোটখাটো কৃশকায় গৌরবর্ণ। পরনে ধুতি ও ফুলহাত শার্ট। পায়ে চটি। বয়স বছর পঞ্চাশ। দীপক শুনেছে যে মানুষটি অতি নিরীহ। ওঁর পক্ষে এমন দুঃসাহসিক কাজে নামা যেন ঠিক মানায় না। দীপক গুটি গুটি গিয়ে ভোলানাথের পাশে হাজির হল। ভোলাবাবু সপ্রশ্নভাবে তাকাতে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয় পারবেন থাকতে?

‘‘দেখি, ইচ্ছে তো আছে।' মৃদুস্বরে জানালেন ভোলাবাবু। . 'হঠাৎ এমন ইচ্ছে হল কেন?' প্রশ্ন করে দীপক।

একটু ইতস্তত করে ভোলানাথ বললেন, মানে দু-দিন স্বপ্নে দেখলাম এই বাড়ি। মনে হল পূর্বপুরুষরা বুঝি চাইছেন আমি তাদের পুরনো ভিটে উদ্ধার করি। বাস করি এই বাড়িতে।

‘বোলপুরের বাসা তুলে দেবেন?

‘না না, এখুনি নয়। আপাতত মাঝে মধ্যে আসব। পরে স্থায়ীভাবেও থাকতে পারি। অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে' ঢোক গিলে চুপ করে যান ভোলাবাবু।

মানে এ বাড়িতে বাস করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, তাই তো?” দীপকের জিজ্ঞাসা। ‘হু, তাই।” আড়ষ্টভাবে মাথা ঝাকান ভোলাবাবু। কাল রাতে ছিলেন এ বাড়িতে?” না। আগে একটু সাফসুফ করি। দেখছেন তো কি হাল। আজ এখানে রাতে থাকার প্ল্যান আছে কি? ‘দেখি, কিছু ঠিক করিনি।' ভোলানাথ আমতা আমতা করেন।

দীপক বোঝে, ভোলাবাবু এখানে রাত কাটাতে ভয় পাচ্ছেন। সে উৎসাহ দেয় ভোলাবাবুকে, বাড়িটা এখনও কিন্তু খুব মজবুত আছে। দেওয়াল কী পুরু! ছাদের অবস্থা কেমন দেখলেন ?”

ভাঙেনি, তবে ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়,' জানালেন ভোলাবাবু।

এই সময় একজন মাঝবয়সি পুরুষ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন একতলায়। লোকটি লম্বা, বলিষ্ঠ। রং কালো। মুখের ভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি ও মালকোচামারা ধুতি। পায়ে রবারের জুতো। হাতে একটা শাবল। তিনি এসেই মজুরদের কর্কশ স্বরে ধমকে উঠলেন—এই, হাত চালা চটপট। নিচের ঘরগুলো আজ সাফ করা চাই।'

মজুর দু'জন একটু বিশ্রাম নিতে বিড়ি ধরিয়েছিল। তাড়া খেয়ে কয়েক টান দিয়ে বিড়ি ছুড়ে ফেলে বাজার মুখে ফের কাজ শুরু করল। আগন্তুক দৃষ্টিতে দীপককে এক দেখে নিয়ে, উঠোনের কোণে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলেন। ‘উনি কে?' জিঙ্গেস করে দীপক।

‘তারাপদ,' জানালেন ভোলাবাবু, আমার বন্ধু। আত্মীয়ও বলা যায় শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। ওই আমায় সাহস নিয়ে এ কাজে নামিয়েছে। নইলে আমার ঠিক ভরসা হচ্ছিল না।

আধঘণ্টাটাক দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরকার বাড়ি পরিষ্কার করা দেখে দীপক নিতাইকার বাড়িতে ফিরল।

বিকেলে সন্ধ্যার খানিক আগে দীপক সরকার বাড়িতে এবার টু মারল। বাড়িটার সামনে গ্রামের লোকের ভিড় তখন আর নেই। বোধহয় অনেকক্ষণ সাফাই করা দেখে একঘেয়ে হয়ে চলে গিয়েছে তারা। সরকার বাড়ি তখন নিঝুম। বাইরে তখনও দিব্যি দিনের আলো। কিন্তু চারপাশে বড় বড় ঝাকড়া গাছ থাকায়

এ বাড়িটাকে ইতিমধ্যেই আঁধার ঘিরে ধরেছে। সদর দরজাপথে আবছা দেখা যাচ্ছে ভিতরের দালানের কিছু অংশ।

ভোলাবাবুরা আছেন না সটকেছেন? ভাবে দীপক। সহসা দোতলায় একটি জানলা দিয়ে দেখা গেল তারাপদবাবুর মুখ, কয়েক পলকের জন্য। খানিক বাদে খুটখাট শব্দ শোনা গেল বাড়ির ভিতর থেকে। তবে বোধহয় ভোলাবাবুরা এখানে থাকছেন আজ রাতে। দীপক ঠিক করল, সেও আজ রাতে থেকে যাবে নিতাইকাকার কাছে। যদি কিছু ঘটে সঙ্গে সঙ্গে জানা মারে।

রাত ন'টা নাগাদ খাবার পর দীপক ফের এল সরকার বাড়ির খোঁজ নিতে। গোটা বাড়ি তখন ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। কাছাকাছি অন্য বাড়ি নেই। গ্রামের লোকের কারও সাড়াশব্দ কানে আসছে না। সরকার বাড়িও নিস্তব্ধ। বাড়ির সদর থেকে হাত তিরিশ তফাতে পায়ে চলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজর করে দীপক। সঙ্গে টর্ক থাকলেও বাড়িটার বেশি কাছে ঘেষতে তার সাহস হল না। যে সরু পথটা সদর দরজা অবধি পৌঁছেচে তার দুধারে ঝোপঝাড়। গরমকাল। সাপখোপ বেরতে পারে। নানা কীটপতঙ্গের বিচিত্র ডাক শোনা যাচ্ছে। অজানা অদেখা কত জীবের গোপন চলাফেরার খসখস আওয়াজ। আবছা টাদের আলোয় বিশাল বাড়িটাকে সত্যি ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। দীপকের গা ছমছম করে। | একটু আলোর আভা না? ই, তাই। সদর দরজা দিয়ে চোখে পড়ল মিটমিটে একটা আলো। জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে যেন কেউ হেঁটে গেল একতলার রোয়াক দিয়ে। অদৃশ্য হয় আলোটুকু। ফের নিছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যায় অট্টালিকা।

আরও খানিকক্ষণ নজরদারির ইচ্ছে ছিল দীপকের। কিন্তু বাধ সাধলো গ্রামের কটা খেকি তকর। দীপককে নির্জনে ভূতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুকুরগুলো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসে। কীরে বাবা, কামড়াবে নাকি? গাঁয়ের লোক চোর ভেবে তাড়া না করে? বেগতিক বুঝে দীপক সরে পড়ল। কাল ভোরে এসে জানতে হবে ভোলাবাবুদের অভিজ্ঞতা। নিতাইকাকাকে বলে রাখবে, সরকার বাড়ির কোনো খবর থাকলে যেন তাকে তৎক্ষণাৎ জানানো হয়।

খুব ভোরে দীপককে ডেকে তুলল নিতাইকাকা। -"ওহে শোনো, ভোলাবাবুর সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন।'

দীপক ধড়মড় করে উঠে বলল, 'কী করে?' | 'তা জানি না। সরকার বাড়ির কাছে পথের ওপর পড়ে আছেন। আমাদের পাড়ার জগবন্ধু প্রথম দেখে। সেই এসে খবর দিয়েছে।”

নিতাইকাকার সঙ্গে দীপক ছুটল সরকার বাড়ির উদ্দেশে।

পথের ধারে মাটিতে পড়ে রয়েছেন তারাপদ। চিৎ অবস্থায় কুঁকড়ানো আড়ষ্ট দেহ। বিকৃত মুখে যন্ত্রণার ছাপ। তখনও খবরটা বিশেষ চাউর হয়নি। মাত্র আট দশজন গ্রামের লোক মৃতদেহের পাশে থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

দীপক প্রাণহীন তারাপদবাবুকে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে সরকার বাড়ির ভিতর ঢুকল।

তারাপদবাবুর সাইকেলটা দেখা গেল একতলায় বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। ভোলানাথবাবু'-চেঁচিয়ে উঠল দীপক।

কোনো সাড়া নেই।

দীপক উঠে গেল দোতলায়। পর পর ঘরগুলোয় উকি দিয়ে চলে। একটা ঘরের মেঝেতে একখানি শতরঞ্চি পাতা। কিন্তু ভোলাবাবুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

দীপক নোংরা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদে উঠল। ফাকা ছাদ। দীপক নেমে এল একতলায়। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে থমকে গেল। এরপর কয়েকটা ঘরে উকি দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল সরকার বাড়ি ছেড়ে।

তারাপদবাবুর মৃতদেহ ঘিরে তখন রীতিমতো ভিড়। চারদিক থেকে লোক আসছে হন্তদন্ত হয়ে। দীপক সেখানে দাঁড়ায় একটুক্ষণ। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে।

কী ভাবে মরল লোকটা?'

“কে 'জানে? আঘাতের চিহ্ন কিছু দেখছি না তো। ‘হাসপাতালে নিয়ে যাবে?

কী লাভ? একদম মরে কাঠ। বরং পুলিশে খবর দিই।'

দীপক আর অপেক্ষা করে না। নিতাইকাকার বাড়ি এসে নিজের বাইসাইকেলখানা বের করে জোর প্যাডেল মারল।

বোলপুর শহরে কাছারিপট্টির বাসিন্দাদের তখনও ভালো ভাবে ঘুম ভাঙেনি। ভোলাবাবুর বাসার দরজায় টোকা দিল দীপক। কপাট খুলে এক মাঝবাসি বিবাহিতা ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন-"কী চাই?"

"ভোলানাথবাবু আছেন?' বলল দীপক।

'একবার ডেকে দিন, দরকার আছে।'

মহিলা ভিতরে গেলেন। ঘুম-জড়ানো চোখে বেরিয়ে দীপককে দেখে ভোলাবাবু অবাক—'আপনি?"

দীপক চাপা সুরে বলল, 'জরুরি কথা আছে, আসুন বাইরে, ওই গাছটার নিচে।'

হতভম্ব ভোলাবাবু দীপককে অনুসরণ করেন। নিরালা গাছতলায় থেমে দীপক বলল, 'সেদিন আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমি দীপক রায়। বঙ্গবার্তা কাগজের রিপোর্টার। নন্দপুরে আপনার সন্ধানেই গিয়েছিলাম। আপনাদের পরিত্যক্ত বাড়ি উদ্ধারের বিষয়ে রিপোর্ট করতে। আচ্ছা কাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কেন?

এখানে নিজের বাড়িতে,' জবাব দেন ভোলাবাবু।

"আর তারাপদবাবু?'

'তারাপদ ওর গায়ে চলে গিছল।'

"ঠিক জানেন?

"হ্যা। দু'জনে একসঙ্গে বোরেই। বাস স্টপেজের কাছে একটা চায়ের দোকানে ও চা খেতে বসল। আমার তাড়া ছিল, তাই আমায় বলল চলে যেতে। আমি বাসে চলে এলাম। ও সাইকেলে যায়।

উনি কোথায় থাকেন? বেশি দূরে নয়। নন্দপুর থেকে মাইল দুই দক্ষিণে। বোলপুরে ফিরে আপনি সোজা বাড়ি এসেছিলেন, না নেমেছিলেন কোথাও ?

'না, সোজা বাড়ি আসিনি। বাজার করেছি কিছু। কী ব্যাপার বলুন তো?"

দীপক গম্ভীরস্বরে কাটা কাটা ভাবে বলল, 'আজ ভোরে তারাপদবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে নন্দপুরে সরকার বাড়ির কাছে।

'আঁ, সেকি! আঁতকে উঠলেন ভোলাবাবু।

'হু। খুব সম্ভব তিনি আপনাকে বিদায় দিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিলেন সরকার বাড়িতে এবং রাতে কোনো রহস্যময় কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ভোলানাথবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "হ্যা হ্যা, তাই হবে, তাই হবে। উঃ, কী ভীষণ কাণ্ড। এই ভয়েই আমি রাজি হইনি ওখানে রাতে থাকতে।'

দীপক বলল, 'পুলিশে হয়তো একটু বাদেই আপনার খোজে আসবে।' 'আঁ, পুলিশ। পুলিশ কেন?" চমকে যান ভোলাবাবু।

কারণ আপনারা দু'জনে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে একজনের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। খুনও হতে পারে। সুতরাং অপরজন অর্থাৎ আপনার ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

'কিন্তু আমি তো রাতে ছিলাম না ওখানে।

'সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ।

ভোলাবাবু গাছের গায়ে হাত ঠেকিয়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলালেন। নইলে হয়তো টলেই পড়তেন মাটিতে। আর্ত চাপা কণ্ঠে বলতে থাকেন, "ওঃ, কেন যে ওর কথায় নেচে এ কন্মে নামলাম। গোয়ার্তুমি করে নিজের প্রাণটা খোল। এখন আমার সর্বনাশ হবে। ওঃ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্লিজ বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ।'

দীপক তীক্ষ্ণ চোখে ভোলাবাবুর মুখপানে চেয়ে বলল, "ওই বাড়িতে, 'আপনারা কি খুজছিলেন? গুপ্ত ধন?'

‘মানে মানে'—ভোলাবাৰু তোতলাতে থাকেন।

সত্যি কথা বলন,' ধমকে ওঠে দীপক, 'আমার কাছে কিছু চেপে গেলে মুশকিলে পড়বেন। মনে রাখবেন এই ঘটনার আমি একজন প্রধান সাক্ষী।

‘তাই। ঠিক ধরেছেন। মানে ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানেন'—থেমে থেমে ঢোক গিলতে গিলতে ভোলাবাবু যা বলে গেলেন তার সারমর্ম এই --

‘মাসখানেক আগে ভোলাবাবু পুরী বেড়াতে যান। সেখানে এক বৃদ্ধ ওড়িয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভোলাবাবু বোলপুর থেকে এসেছেন শুনে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে যে বোলর শহরের কাছে নন্দপুর গ্রাম তিনি জানেন কিনা? ভোলাবাবু বলেন, নন্দপুর তার পূর্বপুরুষের গ্রাম। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে, নন্দপুরে সরকার বাড়ি কি চেনেন?

ভোলাবাবু বলেন যে তিনি সরকার পরিবারেরই বংশধর।

বৃদ্ধ তখন জানায় যে সে পেশায় রাজমিস্ত্রি। ছেলেবেলায় ওড়িশা থেকে নন্দপুরে সরকার বাড়িতে তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল কিছু কাজ করতে। মনে আছে, বাবা একটা ঘর বানিয়েছিল একতলায়। ঘরের মেঝের নিচে ইট গেথে হোট সিন্দুকের আারের একটা চোরকুঠুরি বানায়। কেরের ওপরটা মিলিয়ে দেয় বাকি মেকের সঙ্গে। তবে ভবিষ্যতে খুজে পাওয়ার জন্য ওই চোরা গর্তের ঠিক মাথায় মেঝেতে একটি খুব ছোট পর এঁকে দেওয়া হয়। ওই চিহ্নের নিচে ইট সরালে আছে একটা চৌকো পাথর। পাথরখানা তুললে দেখা যাবে গুপ্ত ফোকর। বোধহয় কিছু দামি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয় ওই ফোকরে। আগে 'ডাকাতের ভয়ে এমনি ভাবে লুকিয়ে রাখা হত ধনদৌলত। কাজটা সেরে তারা ফিরে আসে ওড়িশায়। বাংলাদেশে তারপর সে বার দু'তিন গিয়েছে তবে নন্দপুরে আর যাওয়া। হয়নি। নন্দপুরে সরকার বাড়িতে এখন কেউ থাকে না শুনে বৃদ্ধ খুৰ আপশোস করে।

বৃদ্ধের কথাগুলি মাথায় নিয়ে বোলপুরে ফিরে আসেন ভোলাবাবু। সেই ভয়াবহ মহামারী হয়েছিল তাঁর ঠাকুরদার আমলে। ঠাকুরদারা দুই ভাই মারা যান। তাদের আট ছেলের মধ্যে দু'জন মাত্র জীবিত থাকেন। ভোলাবাবুর বাবা এবং বাবার এক খুড়তুতো ভাই। ভোলাবাবু ভাবেন, সরকার বংশে যে ক'জন রক্ষা পেয়েছিলেন তারা কি জানতেন ওই শুপ্ত ফোকরের খোঁজ? কখনও শুনিনি এ বিষয়ে। খুজে

দেখলে হয় যদি কিছু সোনাদানা মেলে? কিন্তু ওই ভূতুড়ে বাড়িতে একা একা খুজতে তার সাহসে কুলোয়নি। খবরটা নিজের বাড়িতেও বলেননি, পাছে রটে যায়। শেষে বলে ফেললেন তারাপদকে তারাপদ বেপরোয়া স্বভাবের। শুনেই লাফিয়ে উঠল। ঠিক করল খুঁজতে হবে গোপনে। এরপর সরকার বাড়ি সংস্কার করে বাস করার ছুতো করে তারা গুপ্তধন খুজতে লাগে। শর্ত ছিল যদি কিছু মেলে দু'জনের আধাআধি বখরা। মুশকিল হচ্ছিল, একতলায় প্রচুর ঘর। এবং প্রত্যেক ঘরের মেঝেতে ধুলো আবর্জনা বা খসে পড়া পলেস্তরা পুরু হয়ে জমেছে। মেঝে ফেটে চটা উঠে গিয়েছে অনেক জায়গায়। | ভোলাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চুলোয় যাক গুপ্তধন, এখন খুনের দায় থেকে রেহাই পেলে বাচি।

দীপক ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, 'তারাপদবাবু বোধহয় আপনাকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে ছিলেন। তাই আপনার অজান্তে গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলেন। আপনার কিন্তু এখন একবার নন্দপুরে যাওয়া উচিত। তবে এই গুপ্তধনের গল্প আর কাউকে না বলাই ভালো। তাহলে ফ্যাসাদ বাড়বে। আপনাদের আগের গল্পটাই আপাতত চালিয়ে যান।

দীপক ও ভোলাবাবু নন্দপুরে তারাপদবাবুর মৃতদেহের পাশে হাজির হয়ে দেখল যে পুলিশ এসে পড়েছে। বোলপুর থানার দারোগা একমনে শব পরীক্ষা করাছেন। এক বাদে দারোগা উঠে দাড়িয়ে ভোলানাথবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম ভোলানাথ সরকার।

‘আজ্ঞে হ্যা।

ইনি কে?' মৃত তারাপদকে দেখান দারোগা। তারাপদ ঘোষ।

আমার বন্ধু।'

‘আপনি রাতে ছিলেন সরকার বাড়িতে?” দারোগার প্রশ্ন।

“আরে না। আমি বিকেলে বোলপুরে বাসায় ফিরে গিয়েছিলুম। তারপরও নিজের গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ ও কেন যে ফিরে এল বুকছি না? হায়, হায়। আমি বারণ করেছিলুম ওকে এখানে রাত কাটাতে।' কাতর কণ্ঠে বলেন ভোলাবাবু।

“আপনারা সরকার বাড়িতে কী করছিলেন?”

বোঝা গেল দারোগা ইতিমধ্যে ভোলাবাবুদের নন্দপুরে যাতায়াতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছেন। তবু একবার ঝালিয়ে নিতে চান খবরটা।

ভোলাবাবু দীপকের শেখানো মতো জবাব দিলেন।

‘হুম। চলুন বাড়িটা একবার দেখা যাক। দারোগা গটগট করে এগোলেন। ভোলাবাবু সম্বন্ধে তার মনের ভাব ঠিক ধরা গেল না। দারোগার পিছনে শুকনো মুখে চললেন ভোলানাথ। তার পিছনে এক কনস্টেবল। তারপর দীপক। এবং দীপকের পেছনে বিরাট গ্রাম্য জনতা।

সরকার বাড়িতে ঢোকার মুখে দারোগা ফিরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'নো নো, এতজন ঢুকবেন না। কেবল তিন-চারজন সঙ্গে আসুন সাক্ষী হিসাবে। তিনি গ্রামের কয়েকজন

একতলায় ঘুরতে ঘুরতে এক কোনায় গিয়ে থমকে দাড়ায় দলটা। দেখা গেল, হাত চারেক লম্বা, ইয়া মোটা, কালো রঙের প্রকাণ্ড এক মৃত সাপ টান হয়ে পড়ে আছে বারান্দায়। সভয়ে মন্তব্য করল এক গ্রামবাসী, 'বাপরে, এ যে গোখরো। সাক্ষাৎ যম।'

সাপটার মাথা এবং দেহের কয়েক জায়গা থেতলানো। শাহেই পড়ে আছে একটা শাবল। কিছুদূরে উঠোনে পড়ে আছে কাচভাঙা একটা টর্চ। সাপটার সামনের ঘরে খোলা দরজার মুখে মেঝেতে রাখা একটা ভুসো মাখা লণ্ঠন।

দারোগাবার হাতের ব্যাটনটা নাচাতে নাচাতে মন্তব্য করলেন-“হম। এ কেস অফ মেক-বাইট। আমি তাই আন্দাজ করেছিলুম। এ সব বাড়ি তো সাপের আসা।

ভোলাবাবু ফ্যাকাশে মুখে কাঠ হয়ে দেখেন। বাইরে চমকানোর ভান করলেও দীপক মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কারণ দৃশ্যটা সে আগেই দেখে গিয়েছে।

এই দুর্ঘটনার পাঁচ দিন বাদে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দীপক সকালবেলা হাজির হল নন্দপুরে। দীপক নিতাইকাকাকে জানাল, 'ভোলাবাবুর সঙ্গে একবার সরকার বাড়িতে যাব। উনি কয়েকটা জিনিস ফেলে গিয়েছেন ওখানে। একা ঢুকতে ভরসা পাচ্ছেন না তাই আমাকে সঙ্গে আনলেন। তাছাড়া ওই বাড়ির কয়েকখানা ঘরের মেঝে মার্বেল পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। সেগুলো তুলে নেওয়া যায় কিনা দান করবেন। ওখানে বাস করা বোধহয় আর সম্ভব হচ্ছে না।”

'সাবধানে যুরো বাবা, অভিশপ্ত বাড়ি, নিতাইকাকা সতর্ক করেন, আর সন্ধের পর থেকে না ওখানে।"

গ্রামের লোকের চোখ এড়িয়ে দু'জনে ঢুকে পড়ল সরকার বাড়িতে। তারপর সোজা গিয়ে ঢোকে একতলার একটা ঘরে, যে ঘরের সামনে মৃত সাপটা পড়ে ছিল। ঘরের এক কোণে সদ্য খানিক খোঁড়া হয়েছে। কিছু ভাঙা ইটের টুকরো পাশে জড়ো করা।

দীপক ব্যাগ থেকে ছেনি হাতুড়ি বের করে চটপট গর্তটা বড় করতে শুরু করল। মেঝের কয়েকখানা ইট ভেঙে তুলে দেখল নিচে একখণ্ড চ্যাপ্টা আয়তাকার পাথর। সে তুলল পাথরখানা। তার তলায় ইট গেঁথে তৈরি এক ছোট চৌকো কুঠুরি।

ফোকরের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে হাত বাড়িয়ে দীপক তুলে আনল ফুটখানেক লম্বা, বিঘত খানেক উচু ও ততখানি চওড়া চমৎকার নকশাকাটা একটা কাঠের বাক্স। টান দিতেই খুলে গেল বাক্সর ডালা। দেখা গেল ভিতরে রয়েছে চারটে পুরু হলুদরঙা পাত। একটা পাত হাতে নিয়ে দীপক জানাল, এ নির্ঘাৎ সোনা। সোনার বাট। বোধহয় কয়েক লাখ টাকা দাম হবে সব ক'টা মিলিয়ে। যাক ভোলানাথবাবু, আপনার ভাগ্যে তাহলে গুপ্তধন জুটল।"

ভোলাবাবুর মুখে অনেকক্ষণ কথা সরল না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ। চোখ বিস্ফারিত। অতঃপর কাপা কাপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'আঁ, সত্যি!'

দীপক হেসে ফেলল, "সত্যি বইকি। স্বপ্ন নয়। নিজেই দেখুন পরখ করে।' - ভোলাবাবু দীপকের হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনার কিন্তু আধাআধি ভাগ।' না। আমি কিছু চাই না। দীপক ঘাড় নাড়ে।।

না না, তা বললে হবে না, নিতেই হবে। এ সৌভাগ্য যে আপনারই দান। আমার কি সাধ্যি ছিল? ভোলাবাবুর কণ্ঠে আন্তরিক অনুনয়।

"উহু।" দীপক দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে বলল, একটা কারণে বড়ই আপশোস হচ্ছে। কেন জানেন? এমন ইন্টারেস্টিং কাহিনির আসল ঘটনাটাই কাগজে লিখতে পারব না। অভিশপ্ত সরকার বাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা এবং তারাপদবাবুর অপঘাত মৃত্যু নিয়েই স্টোরিটা তৈরি করতে হবে।

‘কেন? ভোলাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

‘মশাই, আপনারই জন্যে”, বলল দীপক, কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হলে সরকার বাড়ির যেখানে যত শরিক আছে সব্বাই গুপ্তধনের ভাগ দাবী করে বসবে। থখন আপনার ভাগে আর মিলবে কতটুকু? তাছাড়া মামলা-মকদ্দমা মহা ঝঞ্জাট লেগে যাবে। সুতরাং এই গুপ্তধন প্রাপ্তির খবর আপনি ঘুণাক্ষরেও যেন ফাস করবেন না।

তা বটে। চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়েন ভোলাবাবু।

দীপক বলল, আমার শুধু একটি অনুরোধ। হতভাগ্য তারাপদবাবুর পরিবারকে আপনার বিবেচনা মতো সাহায্য করবেন। এই গুপ্তধনের হদিশ তো উনিই প্রথম পেয়েছেন। তাতে আমাদের কাজ ঢের সহজ হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই পথচিহ্ন খুঁজে পেয়ে উনি গোপনে এসে খুঁড়ছিলেন এই জায়গায়। তারপর কিভাবে যে সাপের ছোবল খেলেন তা অবশ্য আর জানার উপায় নেই।

প্রতিশোধ - অজেয় রায় Protishod by Ajeo Ray
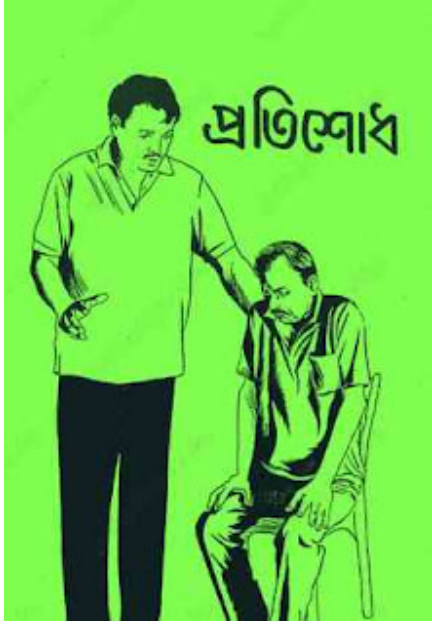
ট্রাকটা যখন সিউড়ি পৌছল তখন সন্ধ্যে নেমে গিয়েছে। শহরের মধ্যে ঢুকে একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা থামিয়ে অন সিং বলল, মন্টু ভাই, আমরা এখানেই আস্তানা গাড়ব। আমার চেনা হোটেল। খানাপিনা ফাস ক্লাস। নাস্তা করে তুমি বেরিয়ে পড়ো তোমার দুশমনের খোঁজে।

দোতলায় একখানা ডবল বেড ঘর নেওয়া হল অর্জুন সিং আর মন্টুর জন্য। ট্রাকের খালাসি রামপ্রসাদ থাকবে নিচে। ঘরে নিজেদের জিনিসপত্র রেখে মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেল তারা। তারপর মন্টু পথে বেরলো পায়ে হেঁটে। অর্জুন ট্রাক নিয়ে গেল কাছেই একটা গ্যারেজে রাখতে।

প্রায় কুড়ি বছর বাদে মন্টু সিউড়ি এল। অনেক বদলেছে শহরটা। ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে চলে মন্টু। অনেক পুরনো বাড়ি ভেঙে বড় বড় হাল ফ্যাশানের বাড়ি তৈরি হয়েছে। অনেক কাচা রাস্তা পাকা হয়েছে। সরু রাস্তা চওড়া হয়েছে। দোকানপাটও বেড়েছে প্রচুর। বেড়েছে রাস্তায় যানবাহন ও পথচারীর ভিড়। অনেক বকা মাঠ গ্রাস করেছে ঘরবাড়ি। মন্টু সাবধানে দু'পাশে নজর রেখে চলে। পুরনো কিছু কিছু বাড়ি, দোকান, গাছ ইত্যাদি খেয়াল করে এগোয়। নানান বাঁক ঘঘরে পথে। একটু একটু করে তারা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি হতে থাকে। তারপর থমকে দাঁড়ায় একটা ঝকঝকে তেতলা বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে

উথালপাতাল। মন্টু কাঠ হয়ে মোহাবিষ্টর মতো ওই বাড়িটা দেখে। নিচের তলায় একটা মস্ত সাইকেলের দোকান। ওপরের দুটো তলায় মনে। হল লোকের বাস।

এইখানেই ছিল। তবে এই বাড়ি নয়। মন্টুর মনে ভেসে ওঠে একটা একতলা পুরনো বাড়ির ছবি। পলস্তরা খসা দেওয়াল। বাড়ির সামনে ফালি জমিতে ফুলগাছের বাগান। মাঝখান দিয়ে সরু ইট বাধানো পথ। লোহার শিকে তৈরি গেট। যেখানে কেটেছে তার ছোটবেলার অনেকগুলি বছর। মন্টু ব্যাকুল হয়ে আশেপাশে তাকায়। ওই তো লাশ গাছটা আজও রয়েছে। বসন্তে ওর ডালে ডালে যেন আগুন জ্বলত কাছাকাছি আরও কয়েকটা বাড়ি দেখছি আজও একই রকম আছে। | প্রবল উচ্ছ্বাস চাপতে মাথা ঝিমঝিম করে মটুর। বহু আগেকার প্রায় মুছে যাওয়া কত ঘটনার স্মৃতি ক্রমে উজ্জ্বল হয়। কত আনন্দের স্মৃতি, কত বেদনার স্মৃতি তোলপাড় ঢেউ তুলে ধেয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্মৃতি, যা এতকাল দূরে থেকেও কখনও ক্ষীণ হয়নি। প্রায় প্রতিদিনই ঘটনাটা তার স্মৃতিপটে চাবুক মেরেছে। সেই প্রবল রাগ আর ঘৃণা ভরা স্মৃতিটা এখানে দাড়িয়ে মুহূর্তে লকলক করে শিখা তোলে। মাথার ভিতর ফের দল করে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন। বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুভার কাকার আকৃতিটা ফুটে ওঠে। মনে।

বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স। মিশকালো রং। মোটা গোঁফ। কড়া কালো চুল। লোমশ ভুরুর নিচে নিষ্ঠুর দুটো চোখ। বিশাল দেহ। সর্বদা চমচ করে পান চিবুচ্ছে আর কষে পিচ গড়াচ্ছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গলায় সোনার চেন। পনে দাই ধবধবে সাদা নিফিনে ধুতি পাঞ্জাবি। ওই মেয়ের মতো চেহারায় তাতে রূপটা আরও খোলতাই হত।

কোথায় সে? দমবন্ধ উত্তেজনায় মন্টু বিশ্বনাথকে দর্শনের আশায় চারধারে চায়। কিন্তু দেখতে পায় না। তারপরেই একটা কথা মনে হতে তার ইশ ফেরে।

এতকাল বাদে বিশ্বনাথকে দেখলে সে কি চট করে চিনতে পারবে? মন্টুকে দেখলেই কি আর এখনকার পুরনো লোকেরা চিনবে এক নজরে? বছর বারোর সেই রোগা পাতলা ভ্যাবলা ছেলেটা আর আজকের ছ'ফুট লম্বা, শক্তপোক্ত জোয়ান আর্ট যুবকটির মধ্যে কতটুকু মিল? তার সেই কিশোর মুখখানা কত ভেঙেচুরে গিয়েছে। টিকলো নাক এখন খাড়া। তার সেই বয়সের ফ্যাকাসে ফর্সা রং আজ রোদে জলে ঘুরে তামাটে। পাট পাট করে একপাশে আঁচড়ানো চুল ভোলা পাল্টে এখন ঘাড় ছোঁয়া, ঢেউ খেলানো। নাঃ, নিজে থেকে পরিচয় না দিলে আগের মন্টুকে যারা দেখেছে তারা এখন চিনতে পারবে না মোটই।

এই বাড়ি থেকে পাঁচখানা বাড়ি তফাতে একটা চায়ের দোকান ছিল। সেখানেই অন্ডি মারত বিশে 'আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। কখনও দোকানের বেঞ্চি জুড়ে। কখনও সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হেন কুকাজ নেই তারা করত না। পাড়ার লোক তাদের যমের মতো ভয় পেত।

মন্ট পায়ে পায়ে সেই দোকানের দিকে যায়।

আরে সেই দোকানটা যে এখনও টিকে আছে! তবে ক্যাশবাক্সর পিছনে বসা সাধুচরণের জায়গায় এখন অন্য লোক। দোকানের ছিরি কিছুটা পাল্টেছে। বলা যায়, উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি খদ্দের বসে আছে ভিতরে। কিন্তু খুঁটিয়ে নজর করেও বিশ্বনাথ বা তার চ্যালাদের সঙ্গে মেলে, এমন কাউকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারে না মন্টু। সে ওই দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খেল বেশ সময় নিয়ে। নাঃ, গুভা প্রকৃতির লোকের কোনো গুলতানি তার চোখে পড়ে না। নেহাতই নিরুপদ্রব পড়া।

বিশে গুড়া কি তার আমার জায়গা বলেছে? চায়ের দোকানে বিশ্বনাথের হদিশ জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না মন্টুর। কী জানি, যদি অন্য কিছু সন্দেহ করে। ফলে তাদের সব প্ল্যান যদি ভেস্তে যায়!

মন্টু ফিরে চলে হোটেলে। কত কথা ভাবতে ভাবতে ওই বাড়িতে এখনকার তেতলা নয়—সেই একতলা পুরনো বাড়িটায় জন্মেছিল মন্টু। ওইখানেই কেটেছে তার জীবনের বারোটি বছর। মন্টুর বয়স যখন সাত তখন তার মা চরম বিপাকে পড়েন। আত্মীয়স্বজন কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। কেউ আশ্রয় দিতে আহ্বান জানায়নি। হয়তো মায়ের বাবা বেঁচে থাকলে সেটুকু জুটত। মন্টুর মায়ের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। অনাহুতভাবে কারও আশ্রয়ে যেতে চাননি। ভালো সেলাই জানতেন তিনি। সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে আর স্বামীর সামান্য জমানো পুজি সম্বল করে কায়ক্লেশে সংসার চালাতে থাকেন। ছেলেকে পড়াতে থাকেন স্কুলে। কিন্তু তাও সইল না বরাতে। দুর্যোগ ঘনাল। মন্টুদের বাড়ির মালিক বাড়িটা হঠাৎ বেচে দিয়ে সিউড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। বাড়িটা কিনেছিল বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুন্ডা। বাড়িটার মালিক হয়েই সে মন্টুর মাকে নোটিশ দিল—এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এখানে সে দোকান করবে।

মন্টুর মা বাড়ি খুজতে থাকেন। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে তেমন কোনো বাড়ি মেলেনি সুবিধা মতো। ঠিক এক মাস বাদে বিশে দুই সারেন নিয়ে হাজির হল

তাগাদায়।

মন্টর মা মিনতি জানিয়েছিলেন, আর ক'টা মাস সময় দিন। কম ভাড়ায় এখানে বাড়ি পাইনি সহ্যাছি। এই পাড়ায় একজন কথা দিয়েছেন, তার বাড়িতে একটা ঘর খালি হবে ছ'মাস বাদে। সেটা আমায় দেবেন অল্প ভাড়ায়। আমার সামর্থ্য তো জানেন। কম ভাড়ায় পেলেও, বেশি দূরে যেতে সাহস হয় না। দূরে গেলে ছেলের ইস্কুলে যাওয়া আসা মুশকিল। তাছাড়া আমি প্রায়ই সেলাইয়ের অর্ডার নিতে, কাপড়-সুতো কিনতে বাইরে ঘুরি। ছেলেকে চেনাশোনা প্রতিবেশীদের ভরসায় একা রাখি। আর ক'টা মাস অপেক্ষা করুন।

নির্দয় বিশে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে এক চোট গালিগালাজ দিয়ে জানিয়েছিল, "ওঃ, আরও কটা মাস ? আবদার! আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। নইলে কেস খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।" | মন্টুর মা তেজি মানুষ ছিলেন। এমন অভদ্র ব্যবহারে রুখে উঠে বলেছিলেন, 'আমি নিয়মিত ভাড়া দিচ্ছি। এমন জবরদস্তি করে আমাদের বাড়িছাড়া করতে পারেন না। দেশে আইন আছে।'

বটে, আইন দেখানো হচ্ছে? দে ঘর ফাকা করে। দেখি কে কী করতে পারে?

খেপে গিয়ে বিশে হুকুম করতেই তার দুই সাকরেদ টপাটপ ঘরের বাক্স বিছানা চেয়ার বইপত্তর তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলতে শুরু করে।

মন্টুর মা কয়েক মুহুর্ত হতভম্ব থেকে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন বাধা দিতে। কিন্তু তার আগেই বিশের হাতের এক ঝটকা মন্টুর মাকে আঘাত করে পাশে খাটের ওপর ফেলে দেয়। মন্টু আর থাকতে পারেনি। সে ঝাপিয়ে পড়েছিল বিশের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিশের হাতের এক প্রচণ্ড থাপ্পড় খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেয়। ক্ষণকালের জন্য রানও হারিয়েছিল রোগা-দুবলা ছেলেটা।

বিশ্বনাথ নির্মম হেসে কর্কশ স্বরে মন্তব্য করেছিল, "উচ্চিংড়েটার তো আস্পর্ধা কম নয়! যাকগে, আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আইন-আদালত করলে কিন্তু ওই ছেলের লাশ পাওয়া যাবে মাঠে, এই বলে রাখছি।"

হুমকি দিয়ে ঘরের ছত্রাকার জিনিসে বারকয়েক লাথি মেরে ছিটকে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে গিয়েছিল বিশে। পাড়ার লোক দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিল। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি।

অপমানটা বড্ড বেজেছিল মন্টুর মায়ের বুকে। তবু তিনি ভয়ে পিছু হটার পাত্রী ছিলেন। হয়তো কোর্টে যেতেন সত্যি সত্যি। কিন্তু একমাত্র সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কায় সিউড়ি ছাড়লেন দিন কয়েক বাদে।

এই কদিনও রেহাই পায়নি মন্টুরা। সে বা তার মা বিশ্বনাথের আড্ডাখানা চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে গেলেই শুনতে হয়েছে তাদের উদ্দেশে কটুক্তি। সব তারা বুজে সরে গিয়েছে, না শোনার ভান করে।

সিউড়ি ছেড়ে মা ছেলে হাজির হয়েছিল মন্টুর খড়মামার কাছে হুগলিতে।

হুগলিতে পাঁচটা বছর বড় অনাদরে কেটেছিল মন্টর।

মন্টর বড়মামা ছাপোষা মানুষ। বাসা ছোট। মন্টুদের আগমনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। বিশেষত বড়মামি। সোজাসুজি চলে যেতে না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে ক্রমাগত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই উটকো আপস বিদায় হলেই বাঁচি। মন্টুকে কেবলই উপদেশ দিতেন চটপট কোনো রোজগারের চেষ্টা করে। মন্টুর মা অবশ্য সেখানেও সেলাই করে যথাসম্ভব নিজেদের খরচ জোগাতেন। মাধ্যমিক পশে করেই তাই মন্টু মামারবাড়ি হাড়ে রোজগারের ধান্দায়, মায়ের অমতেই।

প্রথমে একজন ট্রাক ড্রাইভারের হেলার হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বছর দুই নানা জায়গায় ঘোরে, নানান কাজ করে, যখন যা জুটেছে। তারপর কানপুরে থিতু হয়। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটা মোটর গ্যারেজে মোটর গাড়ির কলকজার কাজ শিখতে থাকে।

বহু কষ্ট সহ্য করে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সে একজন পাকা মোটর মেকানিক হিসাবে নাম কেনে। রোজগারও অনেক বাড়ে। এতদিন যখন যেটুকু পেরেছে মাকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছে। তবে মামারবাড়ি গেছে কদাচিৎ। এবার সে মাকে নিজের কাছে কানপুরে এনে রাখে।

মন্টুর মা কিন্তু আর বেশিদিন বাঁচেননি। দুঃখে কষ্টে তার শরীর ভেঙে গিয়েছিল। শেষ জীবনে মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছিল ভেবে, মন্টুর হৃদয়

ভারি তৃপ্তি পায়। তবে একটা ব্যাপারে মন্টু নিশ্চিত—সিউড়ি থেকে ওভাবে অপমানিত হয়ে চলে আসার দুঃখময়। স্মৃতি কোনোদিন ম্লান হয়নি মায়ের মনে।

মা মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না বটে, কিন্তু কখনও তাদের সিউড়ির জীবনের শেষ কটা দিনের প্রসঙ্গ তুলতেন না। যেন ওই দিন ক'টা ভুলে যেতে চাইতেন জোর করে। মন্টু সেকথা তুললেও কঠিন মুখে চুপ করে থাকতেন। যোগ দিতেন না কথায়।

একবার মন্টু উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেছিল, "জানো মা, ইচ্ছে করে একবার সিউড়ি যাই। গিয়ে শয়তান বিশের মাথাটা ডান্ডা মেরে ভেঙে দিয়ে আসি।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলেন মা- "না খোকা, অমন মতলব করিসনি। ওখানে গিয়ে ওসব করলে তুই খুন হয়ে যাবি। অনেক কষ্টে দড়িয়েছিস। 'তুচ্ছ কারণে একটা বাজে লোকের ওপর শোধ তুলতে গিয়ে কেন নিজের জীবন নষ্ট করবি? সে আমি সইতে পারব না।' মা তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, একদিন ওরা পাপের শাস্তি ঠিক পাবে। আমি বিশ্বাস করি।

একা সিউড়ি গিয়ে বিশ্বনাথের ওপর ভালো মেটানোর হঠকারিতা করেনি মন্ট। কিন্তু সেই অপমানের কারণে দুরন্ত প্রতিশোধের ইচ্ছেটা তুষের আগুনের মতো তার নিরুপায় বুকে নিয়ত ধিকিধিকি জ্বলেছে। এতদিনে বুঝি বা সেই আশঙক্ষা মিটবে অর্জুন সিংয়ের দৌলতে।

হরিয়ানাবাসী অর্জুন সিং। বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। বিশাল জোয়ান। দুর্ধর্ষ প্রকৃতি। এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির পার্টনার সে। সারা ভারত চষে বেড়ায় ব্যবসার কাজে। দরকারে। নিজেও ট্রাক চালায়। দিব্যি বাংলা জানে। মন্টুর সঙ্গে পরিচয় কানপুরে। সরল পরিশ্রমী। যুবক মন্টুকে ভালো লেগেছিল অর্জুনের। কানপুরে এলেই সে মন্টুর সঙ্গে আড্ডা দেয়।

মন্টু একদিন কথায় কথায় অর্জুন সিংকে বলে ফেলেছিল, সিউড়িতে বিশে গুণ্ডার হাতে তাদের লাঞ্ছনার কাহিনি।

অর্জুন ফুসে উঠেছিল, এখনও তার বদলা নাওনি কেন?" মন্টু সখেদে জানায়, কী করব? সিউড়িতে একা গিয়ে শোধ তুলতে গেলে লাইফ রিস্ক। মায়ের বারণ। ইচ্ছে কি আর হয় না?"

সিংজি টেবিলে দড়াম করে এক ঘুসি বসিয়ে গর্জন ছেড়েছিল, "দোস্ত, আমায় আগে বলোনি কেন? আরে, কত আচ্ছা আচ্ছা গুন্ডা বদমাশের সঙ্গে আমার খাতির আছে। ওই বিশের মতো পাতি গুন্ডাকে সিউড়ি থেকে বেমালুম হাপিস করে এনে তোমার পায়ের নিচে ফেলার বন্দোবস্ত করে দেব। তখন বেটাকে যো খুশ কোরো। কোনো ডর নেই। এমন জায়গায় এনে ফেলব কেউ পাত্তা পাবে না। থানা পুলিশ হলে আমি সামলাব। সে হিম্মত আছে। অর্জুন গোঁফ চোষতে চোষতে গম্ভীর বদনে প্রশ্ন করে, তা দুশমনটাকে হাতে পেলে কী করবে? আমি বলি, একদম খতম করে দাও। 'না না, খুন নয়। আপত্তি জানিয়েছিল মন্টু।

ইচ্ছে হয় একা একা খালি হাতে একবার ওর টর্কর নিই। তারপর যে-হাতে ও আমায় চড় মেরেছিল, যে হাতে ও আমার অসহায় মাকে ধাক্কা মেরেছিল, সেই হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিই।' বলতে বলতে মন্টু নিজের দুই পেশিবহুল হাত দু'খানায় চোখ বোলায়। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে।

অর্জুন সিং মন্টুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, 'বহুত আচ্ছা। এবার যখন সিউড়ি লাইনে যাব, তোমায় সাথ নেব। সেই বেতামিজ বিশেটাকে চিনিয়ে দিও। পরে ওকে তুলে এনে তোমার সঙ্গে লড়িয়ে দেব।

সেই উদ্দেশ্যেই সিউড়ি এসেছে অর্জুন সিং আর মন্টু।

হোটেলের কাছাকাছি এসে মন্টুর হঠাৎ মনে হল, ভরতের সঙ্গে একবার দেখা করি। ও কি এখনও বাসায় আছে?

ভরত সাইকেলরিকশা চালাত। মুলুক থেকে সদ্য আসা সহায়হীন যুবক ভরতকে মন্টুর বাবা কিছু সাহায্য করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ভোলেনি ভরত। মন্টুদের খুব ভালোবাসত। মন্টুর মাকে রিকশায় ঘুরিয়ে অনেক সময় ভাড়া নিতে চাইত না। আর নিলেও নামমাত্র। যখন মন্টুর সিউড়ি তখন ভরতের বয়স বছর তিরিশ। স্টেশনের কাছে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাস করত সে। গোপনে বিশ্বনাথের খবর জানতে ভরতই সব চাইতে নিরাপদ।

মন্টু হোটেলে ফিরল রাত ন'টা নাগাদ। অর্জুন সিং অপেক্ষায় ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'খবর মিলল?' "মিলেছে।' জবাব দেয় মন্টু। সংক্ষেপে ভরতের পরিচয় দিয়ে মন্টু বলে, ভরতের কাছে জেনেছি, বিশে গুন্ডার এখন হাল বেশ খারাপ। ওর গ্যাং ভেঙে গিয়েছে। টাকাপয়সাও উড়ে গিয়েছে। এখন থাকে শহরের

সীমানায় একটা ছোট্ট বাড়িতে। আমাদের আগের বাড়ি, সে বাড়ি অবশ্য এখন আর নেই, ভেঙে তিনতলা নতুন বাড়ি হয়েছে দেখলাম। সেটাও নাকি বিশের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মালিক অন লোক। ও এখন শহরের ভেতর মোটে আসে না। হয়তো পুরনো শত্রুদের ভয়ে। চার-পাঁচ বছর ওকে চোখে দেখেনি ভরত। শুনেছে এসব। আমি ভরতকে ভার দিয়ে এসেছি বিশ্বথের গতিবিধির খোঁজ করতে। ও কাল আমায় জানাবেন।

সারাদিন হোটেল ঘরে কাটিয়ে, পরদিন বিকেলে মন্টু গেল ভরতের আছে। রাতে ফিরে অর্জুনকে রিপোর্ট করল—বিশ্বনাথ নকি বাড়ির বাইরে বেরোয় কদাচিৎ। তার কাছে লোকজন আসে খুব কম। একদম একা, নেহাতই নিরীহ জীবন কাটাচ্ছে। ওর দুই ছেলে বাইরে চলে গিয়েছে। তারা কখনও আসে না। বড় মরে গিয়েছে। কে বুড়ো ওর কাজ করে। ওই বুড়ো প্রত্যেকদিন সন্ধের সময় বাড়ির বাইরে যায়। আজাফাজ্ঞা মেরে ঘন্টা দুই কাটিয়ে ফেরে। রাতে ওই বাড়িতেই থাকে।

অর্জুন তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলল, “আরে এ আমি তো একদম ফালতু। তুমি সি লোকটাকে আমায় দেখিয়ে দাও। বাইরে না বেরোলে ওর কোঠিটা চিনিয়ে দাও। ব্যস, কাম ফতে। 'আমার লোক ঠিক ওকে গায়েব করবে।"

মন্টু একটুক্ষণ গুম মেরে থেকে লল, 'দেখো সিংজি, বাইরে নয়, আমি এখানেই বিশ্বনাথের সঙ্গে মোলাকাত করব ঠিক করেছি। ওর বাড়িতেই। ও আমাদের বাড়ি এসে আমায় আর মাকে অপমান করেছিল। আমিও ওর বাড়িতে গিয়ে সেই অপমানের শোধ নেব।”

সিংজি চমকে বলল, “আরে ভাই, এ কেয়া বাত?"

‘হ্যা, তাই করব। ওর দলবল যখন নেই, এ বিশ্বনাথের সঙ্গে মোগবিলাটা এখানেই হয়ে যাক। বাড়িটা আমি দেখে এসেছি। বেশ নির্জন। পাশে ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছ। রাতে পাড়াটা একেবারে অন্ধকার নিঝুম হয়ে যায়। ওর বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট আছে, কিন্তু সামনে কাঁচা রাস্তায় এখন স্ট্রিট লাইট যায়নি। ওর কাজের লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর, অন্ধকার হলেই ওর বাড়িতে ঢুর। ভারতের রিকশায় যাব। বিশ্বনাথের বানির কাছাকাছি নেমে, হেঁটে গিয়ে ওর দরজায় নক করৰ। দরজা না খুললে জানলার শিক বাঁকিয়ে ঢুকব। শিকগুলো পলকা, দেখে এসেছি। বিশ্বনাথের উপর হাতের সুখ করে, ফের ভরতের রিকশায় চেপে চলে

আসব। আমি বেরোলেই, তুমি ট্রাক নিয়ে হোটেল ছাড়বে। আমার লাগেজ নিও। স্টেশনের কাছে লালজির ধাবায় অপেক্ষা করবে। আমি কাজ সেরে ফিরলেই, গাড়ি স্টার্ট দেবে। তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যে কোনো জায়গায় সুবিধে মতো আমায় নামিয়ে দিও। কটা মাস এদিক সেদিক লুকিয়ে থেকে কানপুরে ফিরব। গুরত ছাড়া এখানে কেউ আমায় চিনতে পারেনি। আমার কানপুরের ঠিকানাও কেউ জানে না। পরে জানাজানি হলেও, আমায় কেউ ধরতে পারবে না। আর ভরাত কাউকে বলবে না। তেমন বুঝলে না-হয় কানপুরে ফিরব না কয়েক বছর। হ্যা, একটু ছবেশ ধরতে হবে। মাথায় টুপি, চোখে গগলস, ফলস দাড়ি-মোচ—এতেই হবে। যাতে পরে পুলিশ পিছনে লাগলেও, বিশ্বনাথ আমায় না শনাক্ত করতে পারে। গানটা কী রকম?”

অর্জুন সিং এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, ‘প্ল্যান ঠিক আছে। লোকন হনতি তুমার সাথ যাব।'

“কেন?” মন্টু অবাক।

সিংজি গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মন্টু ভাই, এইসব শুভ বদমাশ বহত খতরনাক। তুমি তো খালি হাতে বদলা নিতে চাও। লেকিন ওই বদমাশটার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে। পিস্তল, চাকু। ও যাতে সেটা না চালায়, আমি খেয়াল রাখব। ট্রাক রেডি থাকবে। কাম যাতে করে এসেই আমরা স্টার্ট দেব।' মন্টু খুঁত খুত করে, কিন্তু পরে তুমি যদি ঝামেলায় পড়ো? অর্জুন সিং ধমক দিল, “থ্যস বাস, সে আমি ম্যানেজ করব।'

পরদিন রাত নামতেই, মন্ট ও অর্জুন সিং শহরের সীমানায় এক জায়গায় ভারতের রিকশা থেকে নামল। জায়গাটায় সবে বসতি গড়ে উঠছে! অঘ্রানের অল্প পাতলা কুয়াশা জমেছে। আশপাশ শুনশান। শুধু খানিক দূরে একটা মুদির দোকানে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে।

একটা ছোট অন্ধকার মাঠ পেরল দু'জনে। মাঠের গা ঘেষে কাচা রাস্তা। রাস্তার ধারে তফাতে কিছু বাড়ি। তবে লোক নেই পথে। একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে মন্টু দেখাল—এই বাড়ি।'

নিঃশব্দে দু'জনে বাড়িটার দরজায় কান পাতে। কোনো শব্দ নেই ভিতরে। তবে মৃদু আলোর রেখা কপাটের ফাক দিয়ে নজরে আসে। অর্জুন সিং একটা বড়

রুমাল বেঁধে নিল তার মুখে। চোখের নিচ অবধি ঢেকে। তার চোখেও মন্টুর মতো কালো গগলস। সে পাগড়ি পড়ে না। কিন্তু আজ বেঁধেছে। মন্টু দরজায় টোকা দেয় খটুখ।

‘কে? ভিতর থেকে প্রশ্ন হয়। ‘আস্তে দশরথ।' জবাব দেয় মন্টু।

বিশ্বনাথের বাড়িতে যে বৃদ্ধ কাজ করে তার নাম দশরথ। বাড়ির মধ্যে থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসে। দরজাটা খুলতে বেশ দেরি হচ্ছে। কিছু সন্দেহ রুল নাকি? হঠাৎ ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়। পাল্লা ফাক হতে হতে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন হয়, তুই এত তাড়াতাড়ি?

মুহুর্তে কপাট ঠেলে ঘরে প্রবেশ করে মন্টু। ভিতরের লোকটির বুকে ছুরি ঠেকিয়ে, সে চাপা হিংস্র ষ্ঠে গজায়, “খবরদার। চেঁচালেই মরবে।'

মন্টুর পিছন পিছন ঘরে ঢুকে কপাটে ছিটকিনি তুলে দেয় অর্জুন সিং। ‘আঁ আঁ..' আর্তস্বর বের হয় বিশ্বনাথের গলায়। ‘চোপ্। ফের ধমকায় মন্টু।

ভয়ে স্তব্ধ হয় বিশ্বনাথ। সিংজি খপ করে বিশ্বনাথের হাত দুটো পিছন থেকে বঙ্গমুষ্টিতে চেপে ধরে, তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় ঘরের মাঝখানে। তার সারা গায়ে হাত চালিয়ে পরখ করে নেয় যে ওর কাছে কোনো অস্ত্র আহে কিনা। এরপর মাথা নেড়ে মন্টুকে বোঝায় নেই স সিংজি এবার বিশ্বনাথকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছু হটে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার নজর রাখে বিশ্বনাথের ওপর। মন্টু ও বিশ্বনাথ এখন মুখোমুখি। কুদ্ধ চোখে বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুতার দিকে চেয়ে থাকে মন্টু।

হির বিপ ভরা কথা শোনা যায়, 'এ ভরি, বুত য়ে জোড়া কন রে পিটা।

প্রতিশোধ। ১৯১ নেহি তো মার্ডার হোয়ে যাবে।”

মুট তখন এক চরম বিস্ময়ের মাঝে! আরে, সামনে এই লোকটা কে? এত বছর যে কাকের মতি মন্টুর হয়ে প্রীতি লা সৃষ্টি করেছে, যার ওপর প্রতিশোধের কামনায় অস্থির হয়েছে, এ তো সেই লোক নয়!

হ্যা, সেই লোকই বটে, কিন্তু কুড়ি বছর আগের সেই বিশে গুণ্ডা নয়। বরং বলা উচিত—এ বিশে গুন্ডার প্রেত ! একে এখন মন্টুর দেখা বিশ্বনাথ বলে চেনাই

কঠিন। কুড়ি বছর বড় কম সময় নয়। তবু এতখানি পরিবর্তন ভাবা যায় না!

কিঞ্চিৎ স্থূল সেই বিরাট লম্বা চওড়া বন্ধুটা যেন শীর্ণকুৎসিত পোড়া কাঠ হয়ে গিয়েছে। ভাঙ পড়া চোপসালো গাল। কণ্ঠা বের করা সরু গলা। মাথায় আধপাকা পাতলা চুল। গোঁফ উধাও। মুখে অন্তত দু'দিন না-কামাননা সাড়ি। শরীর ধনুকের মতো বেকে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। একদা উদ্ধত চোখ দুটো কোটরে বসা, ঘোলাটে। আতঙ্কে বিস্ফারিত। থরথর করে কাপছে দেহ। বুঝি এখুনি পড়ে যাবে হাঁটু ভেঙে। বিশ্বনাথের পরনে ঢলঢলে আধময়লা পাবি ও লুঙ্গি। পায়ে বারের চটি।

মন্টু থ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিশ্বনাথ কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়, আমার কিছু নেই। আমায় মেরো না। নিয়ে যাও যা আছে। দয়া করো। | এই কটা কথা বলেই সে মুখ হাঁ করে ভীষণ হাঁপাতে থাকে। আরও কুঁজো হয়ে যায়। দু'হাতে চেপে ধরে নিজের বুক। বোঝা গেল যে—শুধু ভয়ে নয়, প্রচণ্ড। হাঁপানির টানে তার বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। নিচু হতে হতে বুকি সে পড়েই যেত মেঝেতে। মন্টু ঝপ করে ওর কাধ আঁকড়ে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় একটা চেয়ারে। মরণ ফাঁদে পড়া জীবের মতো উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বিশ্বনাথ সশব্দে লম্বা লম্বা মাস টানে আর ফেলে। | মন্টু ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। নিতান্ত অভাবের ছাপ গোটা ঘরে। একটা নেড়া তক্তপোশ, কাঠের দুটো চেয়ার ও একটা টেবিল। দেয়াল-তাকে উাই করা একগাদা পুরনো খাতা। দেয়ালে পেরেকে ফুলছে একটা রঙ-চটা ছাতা—এমনই সব জিনিস। সবই ধুলোমলিন।

খানিক ধাতস্থ হয়ে মন্টু আবার বিশ্বনাথের দিকে চোখ ফেরায়। অর্জুন সিং ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের চেয়ারের পিছনে সরে গিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে লক্ষ করছে মন্টুর হাবভাব।

কঠিন চোয়াল মন্টুর তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে, বিশ্বনাথ অসহায় ভঙ্গিতে ছটফট করে ওঠে। ওর গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ বেরোয়। ছুরিটা খাপে পুরে প্যান্টের পকেটে রেখে, চাপা কড়া গলায় মন্টু প্রশ্ন করে প্রাক্তন বিশে গুন্ডাকে, 'আমায় চিনতে পারছ?”

'না না।' বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়ে।

'অনেক বছর আগে। কুড়ি বছর। বাড়ি দখলের নামে একটা ছোট ছেলে আর তার, মাকে তাদের বাড়ি গিয়ে অপমান করেছিলে, মনে আছে?”

না না। হয়তো সত্যিই বিশের মনে নেই, অথবা সে মিথ্যে ভান করছে। 'অসহায় ছেলেটাকে মেরেছিলে। তার মাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে। ঘরের জিনিসপত্র ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলে। মনে আছে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়ে, না না, আমি না।

মন্টু এবার তার কোটের পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে বিশ্বনাথের চোখের সামনে ধরে বলল, “দেখো, একে চিনতে পারো?

ফোটোটা মন্টুর মায়ের। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ছবি। সযত্নে ফ্রেমে বাঁধানো এই ফোটোর বড় এক কপি মন্টুর কানপুরের বাসায় আছে।

বিশ্বনাথ বোধহয় আজকাল চোখে ভালো দেখে না। বেশ কিছুক্ষণ সে ছবিটা দেখে খুব কাছে ঝুঁকে। তারপর চিনতে পারে। কারণ মহাভয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। হাঁপানির টানও বেড়ে যায়। ফ্যাসফেসে গলায় বলে ওঠে, 'কে, কে তুমি?'

'আমি সেই ছোট ছেলেটা। আমার মায়ের এই ফোটো। মায়ের ওপর সেই অত্যাচারের আজ শোধ নিতে এসেছি। ব্যঙ্গ মেশানো হিসহিসে গর্জন ছাড়ে মন্টু, এবার? সে ঘুসি বাগিয়ে ডান হাত তোলে বিশ্বনাথকে আঘাত করার জন্য।

মন্টুর ভয়ঙ্কর আক্রোশের আঁচে বিশ্বনাথ আরও কুঁকড়ে যায়। মরিয়া চেষ্টায় সে দু'হাত মেলে আত্মরক্ষার তাগিদে।

মন্টু কিন্তু অদ্ভুত আচরণ করে। তার উদ্যত হাত সহসা থমকে যায় শূন্যে। সে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেয় হাত। তারপর দু'পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বিশ্বনাথের দিকে। তার ঠোঁট বেঁকে যায়, যেন চরম বিতৃষ্ণায়। এমন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে অর্জুন সিংয়ের উদ্দেশে উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, আরে দূর, একে কী মারব? এ লোকটা তো আধমরা। এর গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। থাক এটা। তিলে তিলে মরুক। মা ঠিকই বলেছিলেন চলো। সে পায়ের বুট দিয়ে বিশ্বনাথের গায়ে একটা ঠোক্কর মেরে ঝটিতে পিছু ফেরে। 'ঠারো।' সিংজির নির্দেশ শুনে আবার ঘুরে দাঁড়ায় মন্টু।

হুঁশিয়ার অর্জুন সিং পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাপড় আর খানিকটা দড়ি বের করে। বিশ্বনাথের মুখে কাপড় গুজে দিয়ে তার মুখ বাঁধে। দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধে তাকে। তারপর ভীষণ গলায় হুমকি দেয়, লেকিন এ নিয়ে ঝামেলা পাকালে, ফির এসে একদম খতম করে দেব। সমঝা?’

মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে যাওয়ায় বিশ্বনাথের তখন শোচনীয় অবস্থা। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কোনো রকমে নাক দিয়ে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে, ফেলছে। তাকে নজর করতে করতে সিংজি মিচকে হেসে বলল, না, বুড়া মরবে না। যবতক দশরথ না আসে, বাবা বিশসোনাথ থোড়া আরাম করুক।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, মন্টু ও সিংজি বেরিয়ে যায়।

৯। অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ ১১। মন কথা কয়না

বাতিঘরের বিভীষিকা - অজেয় রায়
Batigharer Bibhishika by Ajeo Ray
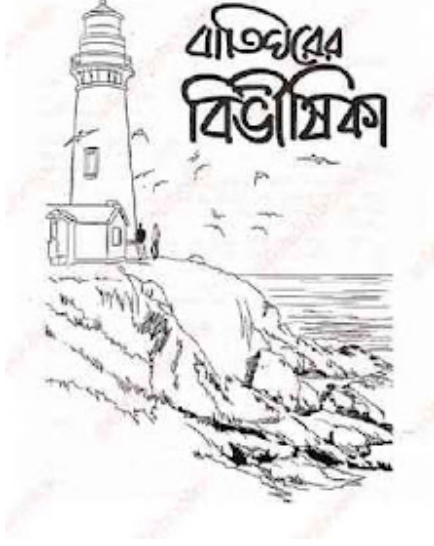
জায়গাটা দেখে দু'জনেরই খুব পছন্দ হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণে অর্ধবৃত্তাকারে অকুল পাথার জলরাশি। বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলি অশ্রান্তভাবে এসে আছড়ে পড়েছে বেলাভূমিতে। সাগরের দিকে মুখোমুখি হলে পিছনে কিছুদূরে নাতিউচ্চ পর্বতশ্রেণি, উত্তর-দক্ষিণে সাগরের তটরেখা বরাবর প্রাচীরের মতো চলে গিয়েছে। নির্জন সমুদ্র সৈকত। বেলাভূমির সাদা ও ঈষৎ কালচে বালুরাশি পেরিয়ে কোথাও রক্তবর্ণ উচুনিচু খোয়াই আর শিলাময় কঠিন জমি। মাঝে মাঝে ঝাউ আর কেয়া বন। সেখানে মানুষের বসতি বলতে মাত্র একটি ছোট্ট জেলে পল্লি।

জায়গাটি ভারতের দক্ষিণ উপকূলে ভিজেগাপত্তম থেকে কিছুটা উত্তর পূর্বে। প্রায় চারশো বছর আগে এখানে অন্ধ রাজাদের এক বন্দর ছিল। সমুদ্র উপকূলে, পাহাড়ের গায়ে সেই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে অনেক ছোট বড় অট্টালিকা, মন্দির ও প্রকারের চিহ্ন।

আগাছা ও জঙ্গল গজিয়েছে ইট পাথরের ঢিবি আর ভাঙাচোরা খণ্ড খণ্ড দেয়ালের গায়ে। সব চেয়ে কাছের লোকালয়টি অন্তত মাইল দুই দূরে। তাকে বড় জোর আধা শহর বলা যায়, নাম বিমলী। একটা কাঁচা রাস্তা বিমূলী থেকে এঁকে

বেঁকে এসে পৌঁছেচে ভাঙা বন্দরের কাছে। শহরের লোক এই সমুদ্রতীরে পা দেয় কদাচিৎ। তবে এখানকার জেলেরা প্রায়ই শহরে মাছ বিক্রি করতে যায়, হাট বাজার করতে যায়। অজয় আর সুনীল বিমলীতে বেড়াতে এসেছে তিন দিন হল।

প্রত্যেকদিন দুই বন্ধু হাজির হয় ভাঙা বন্দরের তীরে। ঘুরে ঘুরে দেখে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি। পাহাড়ে ওঠে, সমুদ্রে স্নান করে, ঝিনুক কুড়োয়। সাধারণত আসে সকালে, দুপুরে ফেরে। একদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে এসে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে।

শহরের কেউ কেউ বারণ করেছে তাদের—"মশাই যাবেন না ওদিকে, ভাঙা বাড়িগুলো সাপখোপের আড্ডা। ফিরতে রাত হলে পথ হারাবেন। তাছাড়া, জায়গাটা ভালো নয়। কেন, কাছেই তো ভালো বিচ আছে।

জায়গাটা কেন ভালো নয়, মানে ভূত প্রেতের ভয়ের কথা পরিষ্কার করে না বললেও তারা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে। শুনে দুই বন্ধুর জায়গাটার ওপর টান বেড়েছে বই কমেনি।

তাদের কাছে জায়গাটির আর এক আকর্ষণ হল এক প্রাচীন লাইট হাউস। পুরনো বন্দর এলাকার সামনে তীর থেকে মাইল দেড় দূরে সমুদ্রের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাইটহাউসটা। গোল গম্বুজের মতো গড়ন। প্রতিদিন অজয়া খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখত এটাকে। জলের মধ্যে ছোট্ট এক নেড়া পাথুরে দ্বীপ। তার ওপর তৈরি হয়েছে লাইট হাউস। এখন অবশ্য ওই আলোক-স্তম্ভের মাথায় আলোর ইশারা নাবিকদের সংকেত জানায় না, সাবধান করে দেয় না। বন্দরটি পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই আলোকস্তম্ভের কাজও ফুরিয়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় পাথুরে দেহ সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম আঘাত সহ্য করে আজও খাড়া রয়েছে। কেবল ওই পাথুরে দ্বীপ নয়, ওর কাছে নাকি একটা ডুৰৰ পাহাড় আছে, তাই তৈরি হয়েছিল লাইটহাউসটা। 'বাঃ চমৎকার কড়িটা।" অজয় সমুদ্রতীরে বালির ওপর থেকে একটা কড়ি কুড়িয়ে নিল। 'দেখি?' সুনীল সেটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকে।

প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা। হালকা চকচকে হলুদ গায়ে কালো আর খয়েরি ফুটফুট। মুগ্ধ হয়ে দেখে।

কড়িটা একবার দেখতে পারি?' গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে কথাগুলো কানে যেতে দু'জনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল। পিছনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ভেঙ্কটেশ্বর রাও।

অজয়রা ভদ্রলোককে দেখেছে। কিছুটা পরিচয়ও জেনেছে। প্রৌঢ়, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় মজবুত শরীর, ধারালো মুখের গড়ন, তীক্ষ্ণ চোখ। মাথায় কঁচা পা চুল। চিবুকে অল্প দাড়ি।

অজয়রা এসে পর্যন্ত প্রত্যেকদিন এই ভদ্রলোককে দেখেছে সমুদ্রের ধারে একা একা ঘুরছেন। কখনও সামুদ্রিক জীবের খোলা তুলে পরীক্ষা করছেন। কখনও বা পাথরের ওপর বসে চুপচাপ তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে আর চরট টানছেন। তার পরনে থাকে শার্ট ও ফুল প্যান্ট এবং রোদুরের সময় মাথায় কাপ।

বিমলীর বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র এই একটি লোক প্রায় নিয়মিত প্রাচীন বন্দরের কাছে সমুদ্রতটে আসেন। শহরের অন্য লোকেরা যে সমুদ্র সৈকতে যায় সেখানে তিনি যান না।' ভদ্রলোকের চালচলন রহস্যময়।

বিমলীর প্রান্তসীমায় একটি ছোট বাড়িতে মিস্টার রাওয়ের বাস। একা থাকেন। একটি পরিচারক তার কাজকর্ম করে দেয়। পাঁচ বছর হল এসেছেন এখানে। চাকরি কিংবা ব্যবসা কিছুই করেন না। ঘরে থাকেন বা একা বেড়িয়ে সময় কাটান। ও প্রথম বিমলীতে এসেছিলেন দিন পনেরোর জন্য। জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় মাস ছয় পরে এসে বাড়ি কিনে পাকাপাকিভাবে রয়েছেন।

শহরের লোক রাওয়ের ব্যক্তিগত জীবনের খবর সামান্যই জানে। আগে নাকি উনি জাহাজে কাজ করতেন। লোকটি অহংকারী ধরনের। এই শহরের লোকদের সঙ্গে মেশেন না মোটে। তবে ভদ্রলোক বোধ হয় বেশ শিক্ষিত। কারণ বিমলীর যে দু-চার জনের ওঁর ড্রইংরুমে উকি দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তারা দেখেছে, ঘর ভর্তি নানা বিষয়ের বই। শহরের লোক ওকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সমুদ্রতীরে জেলেদের সঙ্গে মিস্টার রাওয়ের দিব্যি খাতির আছে। গরিব জেলেদের তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন বলে শোনা যায়।

মাঝে মাঝে রাও বিমলী ছেড়ে ডুব মারেন কয়েক দিনের জন্য। রাওয়ের পুরনো পরিচিত কোনো অতিথি এখানে এসেছে কদাচিৎ। শহরের কারও সঙ্গে

তাদের আলাপ করিয়ে দিতে রাও আগ্রহ বোধ করেননি। নানা গুজব আহে রাও সম্বন্ধে। সেগুলি মানুষটির বিষয়ে সন্দেহই জাগায়।

‘‘কি, দেখাবেন?' দু'জনকে হা করে চেয়ে থাকতে দেখে রাও অধৈর্য হয়ে বললেন।

‘হা, এই যে,' থতমত খেয়ে অজয় কড়িটা মিস্টার রাওয়ের হাতে তুলে দিল। রাও কড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখে মাথা নাড়লেন, তারপর অজয়ের হাতে সেটি ফিরিয়ে দিলেন।

‘কি, কড়িটা ভালো?' অজয় জিজ্ঞেস করল।

‘ভালো তবে রেয়ার নয়। আমি ভেবেছিলাম অন্য এক রকম।'

‘এ কড়ির নাম জানেন?

‘‘জানি। সাইপ্রেইয়া টাইগ্রিস লিনে। সোজা কথায় ব্যাঘ্র-কড়ি। বাঘছালের মতো গায়ের রং কিনা।'

অজয়রা বুঝল, ভদ্রলোক সামুদ্রিক জীব-জন্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জানেন। নইলে টপ এর বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম বলে দেন কী করে? এই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটিকে তার কৌতূহলী চোখে দূর থেকে দেখেছে। কাছে পেয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল।

কথাবার্তা ইংরিজিতেই হচ্ছিল।

অজয় বলল, 'আপনি প্রত্যেক দিন এখানে বেড়াতে আসেন দেখেছি।’’ ‘হু।’’

'আপনি বিমলীতে থাকেন?', রাও এবার শুধু সামান্য মাথা ঝাকিয়ে হাঁ জানালেন।

‘‘আপনারা কোত্থেকে? বাঙালি মনে হচ্ছে?' এবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাও।

‘হ্যা, বাঙালি। আমি কলকাতায় থাকি ও হায়দরাবাদে। আমি অজয় দাস ও সুনীল রায়।'

এখানে কেন ?

এমনি বেড়াতে এসেছি।'

'এখানে তো কোনো টুরিস্ট আসে না। পাণ্ডব বর্জিত জায়গা।'

'সুনীলের এক অন্ধ্রদেশি সহকর্মীর একটা বাড়ি আছে এখানে। তার কথাতেই এসেছি। ওর বাড়িতেই উঠেছি। বাড়িটা প্রায় খালি। কেবল এক বৃদ্ধা থাকে। খাসা আছি,' জানাল অজয়।

'এই সি-বিচে কেন? শহরের কাছে তো আরও ভালো বিচ রয়েছে। অজয়দের উপস্থিতি যেন ভদ্রলোকের পছন্দ নয়!

"কেন, আপনি যে আসেন?"

অজয়ের কথায় একটু থমকে গেলেন রাও। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন - "আমার কথা আলাদা। আমি আসি সামুদ্রিক জীব-জন্তুর খোজে। সে দিক দিয়ে বিচটা চমৎকার। কত রকম প্রাণী ভেসে আসে। তাছাড়া লোকের ভিড় আমার সহ্য হয়।

আমাদের কিন্তু দারুণ লাগছে বিচটা। কত ঐতিহাসিক চিহ্ন এখানে। 'আপনাদের ইতিহাসে আগ্রহ আছে?' 'আছে। আমি ইতিহাস পড়াই কলেজে, ও অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার।' জানাল অজয়। 'বন্দুক এনেছেন কেন?" সুনীলের কাধে ভোলানো শটু-গানটার দিকে দেখালেন রাও। "ভেবেছিলাম শিকার টিকার যদি মেলে। এই পাখি টাখি।' সুনীল উত্তর দিল। এখানকার শান্তি নষ্ট করবেন?" রাও যেন বিরক্ত।

না, না, তাই গুলি ছুড়তে ইচ্ছে করেনি। ছুড়িওনি একটাও। এমনি সঙ্গে রেখেছি', বলল সুনীল। রাও বললেন, 'ওই ধ্বংসপগুলোয় ঢুকতে গেলে অবশ্য বন্দুকটা কাজে লাগবে। বিষাক্ত সাপ আছে ওখানে আর হিংস্র শেয়াল। শ্মশানের মড়া খেয়ে খেয়ে শেয়ালগুলো মাংসাশী হয়ে উঠেছে। সাবধানে যাবেন।

"আপনার সামুদ্রিক জীবের কালেকশন্ আছে?" অজয় জিয়েস করল। "হু।"

“আমরা যদি একদিন দেখতে যাই?" মিস্টার রায়ের কপালে ক'টি ভাজ পড়ল। উত্তর দিলেন না। বোঝা গেল তাদের বাড়িতে আহ্বান করতে রাওয়ের অনিচ্ছা। বেশি মাখামাখি করতে চান না।

অজয় তবু হাল ছাড়ে না, 'ভাব আমাবার চেষ্টা করে। “আচ্ছা এই লাইট হাউসটায় যাওয়া যায়?' অজয়া আঙুল দেখায়।

ভেঙ্কট রাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন লাইট-হাউসটা। শহতের পরিষ্কার সকাল। তেজি রোদে ঝকঝক করছে আলোক-স্তম্ভের কালচে পাথুরে দেহ। পটভূমিকায় দিগন্ত ছোঁয়া ঘন নীল জল। 'ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। ‘কেন? ওখানে কেন ? জানতে চাইলেন রাও।

এমনি, দেখতে যেতে চাই। লাইট হাউসের মাথা থেকে সমুদ্র দেখতে নিশ্চয়ই দারুণ লাগবে। ওর সিড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায় ? জানেন?

‘হু, যায়।'

“ওই রক্টায় পৌছানো যায় না?'

“যায়, তবে রিস্কি।

রাওয়ের সাবধানবাণী অজয় গ্রাহ্য করল না। মহা উৎসাহে বলল-“জেলেদের বললে রাজি হবে না নিয়ে যেতে ?” বলা শক্ত। তবে আমার পরামর্শ যদি চান বলব, শখের অ্যাডভেঞ্চার করতে এতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। এখানকার ডুবো পাথরে করাতের মতো ধার, নৌকো বেকায়দা আছড়ে পড়লে ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে।' ‘আমরা সাতার জানি।” অজয় জোরালো কণ্ঠে জানায়।

ও সুইমিংপুলের বিদ্যে কোনো কাজে দেবে না। ভেঙ্কট রাওয়ের ঠোটে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে।

‘আমরা ভয় পাই না' গরম হয়ে বলল অজয়।।

‘অল রাইট। উইশ ইউ গুড লাক।' মিস্টার রাও হঠাৎ ফিরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। বোধ হল মনে মনে বেশ চটেছেন।

অজয় ও সুনীল দুজনেই শক্ত সমর্থ যুবক, ডানপিটে বেপরোয়া। রাওয়ের বিপ তাদের জেদ চেপে গেল। যেতেই হবে ওই লাইট-হাউসে। বিপদজনক হলেও পরোয়া নেই। জেলে পল্লিতে গিয়ে তারা লাইট-হাউসে পৌছনোর কী ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েকজন জেলে স্রেফ না করে দিল। বিদেশি লোক জলে ডুবে মরলে তাদের হাতে হাতকড়া পড়বে। জেলেদের কথা ঠিক বোঝা যায় না। হাত মুখ নেড়ে ইশারায় যদুর সম্ভব বোঝাবুঝি চলে। শেষে এক বৃদ্ধ মাতব্বর জেলেকে ধরল 'অজয়রা। সুনীল অবশ্য কিছু তেলেগু শিখেছিল। সেই কথাবার্তা চালাচ্ছিল। সুবিধে হল বুড়ো জেলে খানিক হিন্দি ও ইংরেজি জানে। সে অনেক দিন কাজ করেছে ভিজেপত্তম বন্দরে। তাই শিখেছে। বুড়োকে অনেক খোশামোদ করতে সে কয়েকজন জেলেকে রাজি করাল, অবশ্য মোটা বকশিশ কবুল করে।

জেলেরা বলল যে আসচে কাল সমুদ্র যদি শান্ত থাকে তো তাদের লাইট-হাউস দেখিয়ে আনবে।

সকালে যখন তারা মাছ ধরতে বেরবে তখন তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে যাবে। নামিয়ে দেবে লাইট-হাউসের তলায়। তারপর তারা পাড়ি দেবে খোলা সমুদ্রে। আবার সাত-আট ঘণ্টা পরে মাছ ধরে তীরে ফেরার সময় তুলে আনবে।

জেলেদের কাছে একটা খবর জেনে খুব অবাক হল অজয়রা। ভেঙ্কট রাও নাকি যান ওই লাইটহাউসে। এমনকী কখনও কখনও রাতেও থাকেন। কথাটা বেমালম চেপে গেলেন কেন ভদ্রলোক? আশ্চর্য!

‘বেশ আমরাও রাত কাটাব ওখানে প্রস্তাব দিল সুনীলরা তারপর ভেঙ্কট রাওতে শুনিয়ে দেব শখের অ্যাডভেঞ্চারের দৌড় কত।

বুড়ো জেলে শুনেই আঁতকে উঠল। উরি ব্বাপ। কাল আবার পূর্ণিমা। ‘কেন পূর্ণিমায় আপত্তির কী?

বুড়ো চোখ বড় বড় করে বলল, এই সব পূর্ণিমা রাতে লাইট-হাউসটা দানোয় পায়। বাতাসে চিৎকার ভেসে আসে ওদিক থেকে। অনেক জাহাজ নৌকো ডুবেছে ওখানে, অনেক লোক মরেছে তাদের প্রেতাত্মারা পূর্ণিমা রাতে জড়ো হয়ে কাঁদে, আর্তনাদ করে। “কিন্তু মিস্টার রাও যে যায়?

বুড়ো হাত নেড়ে মুখ ভঙ্গি করল। বোভালো, পাগল লোকটা যা করে অন্য পাঁচজন সুস্থ মানুষের কি তা সাজে? ঠিক মরবে একদিন। , পূর্ণিমা রাতে ভূতুড়ে আওয়াজ অজয়দের মনে বেশ দাগ কাটল। খটকা লাগল, কী করতে রাও যায় ওখানে? লোকটা কি সত্যি ক্ষেপাটে না আর কিছু? যাহোক লাইট-হাউসে রাত কাটানোর প্ল্যানটা আপাতত বাদ দিল আমার থাকা যাবে কিনা বুঝে নিয়ে পরে বরং একরার রাত কাটিয়ে আসব ওখানে।

পরদিন ভোরে জেলে পল্লিতে হাজির হল অজয় ও সুনীল। দুটো নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। তার একটায় উঠল অজয়রা।

শান্ত সমুদ্র। অনুকুল বাতাস। তরতর করে এগিয়ে চলল নৌকো। আকাশ সামান্য মেঘলা। তাতে দিব্যি আরামই লাগছিল। একটা নৌকো এগুল উত্তর-পুবে আর অজয়দের নৌকো একটু ডাইনে বাঁক নিয়ে সোজা লাইট-হাউস লক্ষ্য করে চলল।

লাইট-হাউসের কাছে পৌঁছে খুব সাবধানে নৌকো চালাচ্ছিল মাঝিরা। ওরা জানে কোথায় কী বিপদ। লাইট-হাউসের দক্ষিণে অল্প দূরে একটা ডুবো পাহাড়ের চুড়ো দেখা গেল। তখনও প্রায় ফুট দুই জলের ওপর জেগে রয়েছে। পুরো জোয়ারের সময় ডুবে যায়।

যে শিলাস্তুপের ওপর লাইট-হাউসটা তৈরি হয়েছে মাঝিরা তার গায়ে নৌকো ভেড়াল। একটা খাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল নৌকো। খাজের গায়ে পাথর সিঁড়ির মতো ধাপ করে কাটা। তাই নামতে অসুবিধা হল না। অজয়দের নামিয়ে দিয়ে নৌকো আবার রওনা হল তার সঙ্গী তরীটি লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় নৌকোটিকে তখন দূর সাগরের বুকে বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

ধীরে ধীরে দ্বীপের ওপরে উঠল অজয় ও সুনীল। তীর থেকে এটা যত ছোট দেখায় আসলে তার চেয়ে ঢের বড়। জলের ওপর বেশ খানিকটা মাথা তুলে রয়েছে। পাথর কেটে সমান করা হয়েছে ওপরের খানিকটা জায়গা। ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ উঁচু করে দেখল তারা। অন্তত ষাট-সত্তর ফুট খাড়াই হবে স্তম্ভ। তলা থেকে ওপর দিকে একটু সরু হয়ে গিয়েছে। স্তম্ভের নিচের অংশে পাথুরে দেওয়ালে একটা বড় ফাটল দেখা গেল। কালের। নির্মম আঘাত সহ্য করে আর এটা কতদিন টিকে থাকবে কে জানে?

দ্বীপের পাথর কালচে ও মেটে রঙের। তাতে শ্যাওলার সবুজ ছোপ ছোপ শিলা খণ্ডের ফাকে জমা মাটিতে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে। হঠাৎ মানুষের আগমনে কয়েকটা বড় বড় সামুদ্রিক পাখি ডানা মেলে আকাশে উড়ল। চক্রাকারে পাক খেতে লাগল মাথার উপর। তীক্ষ ভীত স্বরে ডেকে ডেকে জানাতে লাগল তাদের বিরক্তি। অজস্র সামুদ্রিক জীবের খোলা ও হাড় ছড়ানো রয়েছে দ্বীপে। দ্বীপের কিনারে লেগে ঢেউগুলি ছিটকে ছড়িয়ে। পড়ছে। শিলাপের গা বেয়ে অনেকখানি উঠে আসছে জল। আবার পিছিয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে।

পিছল পাথরের গায়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে দু জনে লাইট হাউসের নিচে পৌছল। ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে দরজায় এখন কপাট নেই, হাঁ করে আছে। পাক খেয়ে সরু সিড়ি উঠে গিয়েছে। ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

ভিতরটা স্যাতস্যাতে আঁশটে গন্ধ কেমন। তবে সিড়িগুলো প্রায় অক্ষত আছে।

দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট চৌকো ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ সূর্যের আলো ঢুকছিল ভিতরে, তাই উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল না বিশেষ। তবে তারা টর্চও জ্বালছিল দরকার মতো। একটা কামরায় এসে হাজির হল তারা। এই ঘরে বোধ হয় থাকত লাইট-হাউসের রক্ষক। গোল ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার, যেন কেউ ঝাট দিয়েছে। এক কোণে কিছু জঞ্জাল জড়ো করা। ঘরের তিন দিকে তিনটে ছোট জানলা, এক সময় জানলায় পাল্লা ছিল নিশ্চয় কিন্তু এখন স্রেফ ফুটো। মিস্টার রাও এ ঘরে আসেন—এই যে প্রমাণ। অজয় মেঝেতে একটা চুরুটের টুকরো দেখাল।

এ ঘরের কোণ দিয়ে আবার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। ওপরে উঠল অজয়রা। মনে হয় এই বুঝি আলোক স্তম্ভের ছাদ। আসলে এটাই ছিল ঘরে দেওয়াল বলতে কিছু নেই। গোল মেঝের ধারে ধারে সমান দুরত্বে কতগুলো পাথরের থাম খাড়া হয়ে আছে—মোট আটটা থাম। থামের মাথায় আর ছাদ নেই এখন। এক সময় বাতি ঘরের চারপাশ ছিল কাচে ঘেরা। থামের গায়ে কাচ আটকানোর ফ্রেম বসাবার গর্ত দেখা গেল। তবে কাচ বা ফ্রেমের চিহ্ন নেই আজ। এই ঘরেই জ্বালা হত অগ্নিকুণ্ড কিংবা মোম বা তেলের উজ্জ্বল বাতি। সেই বাতি বন্দরে আসা যাওয়ার সময়। তরীকে হুঁশিয়ার করে দিত।

চারধার খোলা থাকার দরুন ঘরটার ভিতর দিয়ে যেন ঝড় বইছে। শক্ত করে থাম আঁকড়ে তবে দাঁড়াতে হয়। এই টংয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা সত্যি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। শুধু পশ্চিমে তটরেখা, বাকি তিন পাশে অসীম বারিধি।

দিকচক্রবাল ঢালু হয়ে উঠে গিয়েছে। আর সেই ঢাল বেয়ে যেন নেমে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। যত কাছে আসে ঢেউগুলি স্পষ্ট হয়, উঁচু হয়, আর যেন তাদের গতি বাড়ে। জল ও বাতাসের কী অবিরাম গজনি! ফেনিল তরঙ্গগুলি নাচতে নাচতে ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ছে পায়ের নিয়ে শিলাস্তুপে। ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডটির ওপর বিপুল জলরাশির কি আক্রোশ! বাতাসের তোড়ে এক চেঁচিয়ে না বললে কথা শোনা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখল দু'জনে সাগরের এই চঞ্চল রূপ। মিস্টার রাওকে ধন্যবাদ। তার ঠাট্টার খোঁচা খেয়েই জেদ করে চলে এল নইলে আসা হত কিনা সন্দেহ।

সমুদ্রের বাতাসের গুণে এবং পরিশ্রমে বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। অজয়রা নেমে এল নিচের ঘরে। হ্যাভারস্যাক খুলল। স্যান্ডউইচ ও কফি খেল। তারপর মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়ল।

ঘন্টাখানেক জিরিয়ে অজয়রা আবার চড়ল বাতিঘরে। আরে একী, আকাশের একী পরিবর্তন!

আকাশে কালো করে মেঘ জমেছে। দিনের আলো ফ্যাকাসে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় বৃষ্টি আসবে না কি?

ঝড় বৃষ্টি এল ঠিকই, তবে এমন কিছু নয়। অন্তত তীরে থাকলে তাই বলত অজয়রা। কিন্তু লাইট-হাউসের প্রহরীর ঘরে আশ্রয় নিয়ে তাদের মনে হল যেন প্রলয় শুরু হয়েছে। বাইরে জল ও বাতাসের কী শোঁ শোঁ গর্জন। থেকে থেকে বাজের কী হুংকার, আর চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের চমক। ছাদের সিঁড়ির ফাক দিয়ে এবং জানলার ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকে তাদের বেশ ভিজিয়ে দিল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃষ্টি ধরে গেল। কিন্তু বাতাসের বেগ কমল না। একবার বাতিঘরে উঠতেই মনে হল বাতাস বুঝি ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবে। ভয়ে নেমে এল তারা। সমুদ্রও উদ্দাম। এমন স্রোতে এই বিপদজনক এলাকায় কি আসবে তাদের নৌকো? অবশ্য এখনও সময় আছে।

বেলা চারটে বাজল। অজয়দের নৌকো কিন্তু এল না। যদিও ততক্ষণে সমুদ্র ফের শান্ত হয়ে এসেছে। ঝড় বৃষ্টির দাপটে ওই ডিঙি নৌকোকে যে কতদূরে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে কে জানে?

‘আজ বোধহয় এখানেই কাটাতে হবে,' বলল অজয়। ভাগ্যিস বেশি করে খাবার এনেছি সঙ্গে। কাল নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ভাড়া পায়নি যখন আসবে ঠিকই।

প্রহরীকক্ষের জানলা দিয়ে সুনীল তীরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল-দেখ, একটা নৌকো আসছে এদিকে। আরে মিস্টার রাও যে!'

নৌকোখানা তখন প্রায় লাইটহাউসের পায়ের কাছে পৌছেছে। তিনজন মাঝি নৌকো ৰাইছে। একজন ধরেছে হাল। রাও বসে আছেন পাটাতনে।

‘ভালোই হল, দেখা যাক রাও এখানে কী করেন। সম্ভবত উনি আজ রাত কাটাবেন এখানে। বলল অজয়। রাওয়ের নৌকো দ্বীপে ভিড়ল।

একটু পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। রাও যখন দরজায় এসে দাঁড়ালেন দু-বন্ধু তখন নির্বিকার ভাবে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে রাও কথা বললেন—‘‘আপনারা এসেছেন আমি শুনেছি।

একটু পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল সিড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। রাও যখন দরজায় এসে দাঁড়ালেন দু-বন্ধু তখন নির্বিকার ভাবে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে রাও কথা বললেন—‘‘আপনারা এসেছেন আমি শুনেছি।

আমার নৌকো এখুনি ফিরবে তাতে ফিরে যান। আপনাদের নৌকোর আজ আর আসার চান্স নেই। আশা করি যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে? রাওয়ের ঠোটে ব্যঙ্গের আভাস।

‘না। মাথা নাড়ল অজয়। 'মানে?'

‘মানে, আমরা আজ রাতটাও কাটাব এখানে। অ্যাডভেঞ্চারটা পুরোপুরি করতে চাই।' ‘‘আপনারা যাবেন না?' ‘‘আজ্ঞে না স্যর। দৃঢ়কণ্ঠে জানাল অজয়। সুনীলও মাথা নেড়ে সায় দিল।

রাগে রাওয়ের চোখ দুটো যেন ঝলসে উঠল। গভীর একটা দম নিয়ে কোনোরকমে সামলালেন নিজেকে। কঠিন চাপা কণ্ঠে বললেন—'অলরাইট। এরপর তিনি বাতিঘরে উঠে গেলেন গটগট করে।

উকি মেরে দেখল অজয়রা, রাও হাত নেড়ে ইশারা করলেন তার নৌকোর মাঝিদের। একটু পরে দেখা গেল নৌকো ফিরে চলেছে তীরের দিকে।

রাও বাতিঘর থেকে নামলেন না। নিচের ঘরে অজয় ও সুনীলের মহা অস্বস্তি। মতলব কী লোকটার? স্মাগলার নয়তো? ওরা শুনেছে বঙ্গোপসাগরে কুলে চোরাচালানকারীদের লঞ্চ আসে। নির্জন তটে দলের লোকের কাছে নামিয়ে দেয় বহুমূল্য চোরাইমাল। রাও কি সেই দলের লোক? লাইট-হাউস থেকে সংকেত জানায় তাদের? সম্ভাবনাটা মনে এলেও মানতে ইচ্ছে হয় না। হাজার হোক লোকটা শিক্ষিত। খামখেয়ালি হলেও ভদ্রলোক বলে মনে হয়। যাহোক সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমে পর্বতমালার আড়ালে সূর্য অস্ত যেতে লাগল। সাগরের বুকে কি অপূর্ব রক্তিমছটা। 'ওপরে আসতে পারেন। হঠাৎ রাওয়ের ডাক শুনে অজয়রা অবাক হল।

যা হোক ভূতের মতো আধো অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে ওপরে যাই। লোকটির কাছাকাছি থাকলে বরং বিপদটা আন্দাজ করতে সুবিধে হবে। দু'জনে গুটিগুটি ওপরে গেল। বাতিঘরের মেঝেতে বসে আছেন রাও। সুনীলকে দেখেই প্রশ্ন করলেন 'বন্দুক এনেছেন নাকি?'

না। মাথা নাড়ল সুনীল।

'ভালোই করেছেন। আনাড়ি লোক ঘাবড়ে গিয়ে গুলি চালালে উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি।

সুনীলের অবশ্য তখন খুব আপশোস হচ্ছে, কেন বন্দুকটা আজ আনলাম না?

ইয়ংমেন, সাহসের খুব বড়াই করছিলে। বেশ, দেখা যাক তোমাদের নার্ভ কেমন শক্ত। আশা করি তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সাধ আজ মিটবে।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রাও।

‘কেন কী হবে?’ অজয়ের উদ্বেগ আর চাপা থাকে না। দেখতেই পাবে। অবশ্য যদি তোমাদের লাক থাকে।

রাও আর কথাবার্তা না বলে সমুদ্রের দিকে চোখ ফেরালেন। অগত্যা অজয় ও সুনীল বসে পড়ে সমুদ্র দেখতে।

পূর্ণিমার রাত। মস্ত গোল চাঁদ উঠছে সাগরের কোল থেকে। ঈষৎ লালচে চাঁদ ক্রমে রুপালী রং নিল। ওপরে ফুটফুটে আকাশ। নিচে বিপুল জলরাশি জোয়ারের ফাঁপছে, ছুটছে। যেন তরল রুপোর স্রোত বইছে। অপরূপ অপার্থিব সেই দুর্ভাবনার ভার না থাকলে তারা এই সৌন্দর্যকে আরও অনেক উপভোগ করত।

ছমছম করছে মন। কী হবে? তবে কি কোনো ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে চাল কথাই কি তবে ঠিক? রাও ঠায় তাকিয়ে আছেন বাইরে। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। মানে অস্থিরভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন সমুদ্রের একধার থেকে আর এক ধার। কিন্তু তীরের দিকে একবারও চাইছেন না। রাত প্রায় বারোটা। জল ও বাতাসের তর্জন সমানে চলেছে। হঠাৎ রাও একটু ঝুকে পড়লেন। নিবিষ্ট চোখে দেখছেন কিছু। অজয়রাও দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছু সাম করতে পারে না।

রাও চকিতে ফিরলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—সে আসছে। থামের আড়ালে যতটা পারেন লুকিয়ে বসুন। ওই দিকে লক্ষ করুন। তিনি পূর্ব-দক্ষিণে সাগরের বুকে আঙুল দেখালেন। কী আসছে?’ জিজ্ঞেস করল অজয়। রাও জবাব দিলেন না।

অজয়রা রাওয়ের নির্দেশ মতো যথাসম্ভব গা ঢাকা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তাদের বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে। জানা বিপদ থেকে অজানা বিপদের সম্ভাবনাই বেশি ভয়ের ও রহস্যময়।

খানিকক্ষণ কিছুই তাদের নজরে এল না। তারপর আবছা দেখতে পেল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোক এবং জলে ফসফরাসের ঝিকিমিকিতে দেখল—সাগরের বুক চিরে কিছু একটা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। খুব লম্বা। গাঢ় রঙ। গোল পিঠ। তীব্র বেগে জল কেটে এগোচ্ছে।

কী ওটা? কোনো জীবন্ত প্রাণী না টর্পেডো জাতীয় কোনো সামুদ্রিক যান? এখনও ওটা মনে হয় মাইল খানিক দূরে।

হু হু করে এগোতে এগোতে লাইট-হাউস থেকে শ'খানেক হাত দূরে এসে সেটা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর জল থেকে উঁচু হতে লাগল এক বিপুল লম্বা দেহ। বার কয়েক বেঁকেচুরে মোচড় খেয়ে খাড়া হয়ে রইল। জল ছেড়ে অন্তত কুড়ি পঁচিশ হাত উঠেছে সে। রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল অজয় ও সুনীল।

ওটা যে জীবন্ত প্রাণী সন্দেহ নেই। কারণ ওর মস্ত চেপ্টা মাথা দেখতে পাচ্ছে তারা। প্রকাণ্ড পিপের মতো গোল মোটা তার দেহ। অদ্ভুত অলৌকিক ওই জীবটা যেন সোজা। তাকিয়ে আছে এই লাইট-হাউসের দিকে।

‘কী ওটা?' সুনীল কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল রাওকে।

কী মনে হচ্ছে? রাও উলটে প্রশ্ন করলেন।

‘বোধ হয় কোনো সামুদ্রিক মহাসর্প' বলল অজয়।

‘না’—ধমকে উঠলেন রাও। ওর মাথাটা দেখেছেন? ওর দেহের নিচ অংশটা লক্ষ করুন।

প্রাণীটি আরও খানিক ঠেলে উঠল জল থেকে। সত্যি ও মাথা সাপের হতে পারে না বরং কুমিরের বলা চলে। আর ওর সাপের মতো দেহের তলার দিকটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গিয়েছে যেন একটা প্রকাণ্ড উল্টানো নৌকো ভাসছে জলে। মাঝে মাঝে সে দুলছে, হাঁ করছে। তীক্ষ্ণ ছুরির মতো দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠছে। মাথার নিচে শরীরের লম্বা অংশটা আসলে ওর বিষম লম্বা গলা।

‘তবে কী ওটা? স্তম্ভিত অজয় জানতে চাইলে।

‘আধুনিক কালের কোনো প্রাণী নয়। মনে হয় ডাইনোসর যুগের কোনো সামুদ্রিক সরীসৃপ, জবাব দিলেন রাও।

‘ডাইনোসর!’অজয় অবাক হয়ে বলে। সে তো কোটি কোটি বছর আগেকার ব্যাপার। সে সময়ের প্রাণীরা তো এখন লুপ্ত।

‘হু ঠিক,বললেন রাও, তাদের এখনও থাকার কথা নয়। তবু দু-এক রকম আদিম প্রাণী আশ্চর্যভাবে আজও আটকে আছে। যেমন, সীলাকাস্থ মাছ বা স্কটল্যান্ডের ল-নেসমনস্টার।

সহসা প্রাণীটা ডেকে উঠল। ট্রেনের হুইলের মতো তীক্ষ্ণ জোরালো সেই ডাক। একবার দু-বার তিনবার সে চিৎকার করে উঠল। সাগর আর হাওয়ার অট্টরোল ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠ। “নিঃসঙ্গ প্রাণীটা ডাকছে ওর সাথীকে। রাওয়ের কথা শোনা গেল।

সত্যি ওই প্রচণ্ড চিৎকারে যেন ক্রোধ নেই বরং এ যেন কাতর আর্ত আহ্বান। কয়েকবার চিৎকার দিয়ে প্রাণীটা আবার চুপ করে লাইট-হাউসের দিকে ফিরে স্থির হয়ে রইল।

‘আপনি ওটাকে আগে দেখেছেন? প্রশ্ন করল অজয়। দেখেছি,' বললেন রাও, ‘সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে এখানে আসে পূর্ণিমা রাতে। গত তিন বছর ধরে দেখছি।'

‘শুধু একটাই আসে?” “হ্যাঁ। হয়তো এই শেষ বংশধর। ওর জাতের আর কেউ আজ বেঁচে নেই।

এর কথা আপনি জানলেন কী করে? সুনীল জিজ্ঞেস করল।

রাও বললেন, ‘আপনাদের মতোই পূর্ণিমা রাতে জেলেদের মুখে প্রেতাত্মার কান্নার গল্প শুনে কৌতুহলী হয়ে এখানে আসি রাত কাটাতে, তখন দেখতে পাই।

‘আরে ওটা এত কাছে আসছে কেন। কী ব্যাপার! এত কাছে তো আসে না কখনও!' রাও বিচলিত স্বরে বলে উঠলেন।

অতিকায় রাজহাঁসের মতো গলা তুলে প্রাণীটা সরসর করে এগিয়ে আসতে লাগল কাছে। একেবারে লাইট হাউসের সামনে এসে থামল। তার শরীরটা স্পষ্ট দেখা গেল। গাঢ় সবুজ চকচকে দেহে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। বিশাল চওড়া লেজটাকে সে ঝাপটাতে লাগল। তোলপাড় উঠল জলে। একবার সে ডেকে উঠল ভীষণ জোরে। কানে তালা ধরে গেল যেন। আবার সে নড়ে উঠল—এগোতে লাগল। তারপর মাথা নামাল। অজয়দের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

রাও বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে চমকে উঠে বললেন—একি। এ যে দ্বীপে উঠে আসছে!’ বলতে বলতেই এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল।

এক অতি গুরু দেহ ভার। থরথর কেঁপে

লাইট-হাউসের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল এক অতি গুরু দেহ ভার। থরথর কেঁপে উঠল স্তম্ভটা। সঙ্গে সঙ্গে বাতিঘরের ঘাড়ের ওপর ঝুকে এল এক প্রকান্ড মাথা। নার্ভাস হয়ে টর্চের আলো ফেলল তার ওপর। এবং ফেলেই নিবিয়ে দিল সভয়ে। চকিত আলোক রশ্মির ঝলকে তিনজনে প্রত্যক্ষ করল এক ভয়ানক দৃশ্য — এক দানব মুণ্ড। অগ্নিগোলকের মতো তার দুই হিংস্র চক্ষু। ক্ষুধিত দাঁতের সারি। একবার দেখা দিয়েই সে সরে গেল, নামিয়ে নিল মাথা।

'আসুন। কুইক। রাও লাফিয়ে উঠে উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে গিয়ে নামতে লাগলেন নিচের ঘরে। অজয় আর সুনীলও অনুসরণ করল তাঁকে।

এরপর কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতা অজয়দের জীবনে যেন এক দুঃস্বপ্ন। সেই বিরাট সরীসৃপ-দেহ বারবার আছড়ে পড়তে লাগল লাইট-হাউসের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার কি ক্রুদ্ধ ফেস-ফোসানি। অজয়দের ভয় হতে লাগল, এই সুদৃঢ় পাষাণ স্তম্ভও বুঝি ওর ধাক্কা। সইতে পারবে না। মাঝে মাঝে জানলার ফুটো দিয়ে নজরে আসছিল ওর বিরাট দেহের অংশ—কখনও তার ঘাড়, কখনও বা মাথার কিছুটা। ভাগ্যি ভালো জন্তুটা তাদের দেখতে পায়নি কারণ তার লক্ষ্য ছিল ওপরের বাতিঘর। | ছাদে অর্থাৎ বাতিঘরের মেঝেয় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল কী সব জিনিস। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন রাও-ও আজ ক্ষেপে গিয়েছে। লাইট-হাউসটাকে ও ভাবত ওর জাতের কেউ। বারবার এসে ডেকেছে তাহ। কিন্তু জড়স্তম্ভ সাড়া দেয়নি, ওর সাথী হয়নি। তাই আজ ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, মারমুর্তি ধরেছে। এই অবাধ্য জীবটাকে শাস্তি দিতে চায়। জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবছে হয়তো।

মিনিট কুড়ি পরে এই তাণ্ডব হঠাৎ থেমে গেল। জন্তুটার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন শুধু উত্তাল সাগরের মাতামাতি কানে আসে। লাইট হাউসের প্রহরীকক্ষে তিনটি মানুষে তখন প্রাণভয়ে ইষ্টনাম জপছে।

আরও বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনজন উঠে এল বাতিঘরে। দেখল, প্রাগৈতিহাসিক জীবটা অদৃশ্য হয়েছে, বাতিঘর তছনছ। মাত্র দুটি থাম আস্ত আছে। বাকিগুলো কোনোটা আধভাঙা, কোনোটা গোটাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বড় বড় পাথরের খণ্ড ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। 'ভরা জ্যোৎস্নায় উদ্দাম দিকহারা সাগরের বুকে চেয়ে বিষন্ন সুরে বললেন রাও, 'বোধহয় ও আর এখানে আসবে না। হয়তো ও বুঝেছে এ চেষ্টা নিষ্ফল। এ বস্তু তার সঙ্গী হতে পারবে না।

কথাটা সত্যি হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে পরপর তিনবছর রাওকে চিঠি লিখে জেনেছিল অজয়—শরতের পূর্ণিমা রাতে রাওয়ের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপটি আর কখনও আসেনি লাইটহাউসের কাছে। বুঝি ওই নিঃসঙ্গ প্রাণী আজও সাত সমুদ্র চষে কেবলই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কোনো সাথীকে!

মঙের চুনি - অজেয় রায় Monger Chuni by Ajeo Ray

লীর দোকানে ঢুকে মঙ এক কোণে দাঁড়াল। আর একজন খদ্দের ছিল। তাকে জিনিস দিয়ে বিদায় করে মঙের দিকে ফিরল।—কী চাই?

চাল।' ছোকরাটি চাল দেওয়ার বদলে মঙকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সোজা মালিক লীর কাছে হাজির হল। লী টেবিলে খাতার ওপর হিসাব করছিল। কর্মচারীটি তাকে কী জানি বলতে মুখ তুলে মঙকে দেখল। তারপর হেঁড়ে গলায় হেঁকে উঠল—কী ব্যাপার মঙ? আবার কী চাই! পয়সা আছে?

মঙ কাচুমাচু ভাবে বলল, না পয়সা আনিনি। লিখে রাখ। পরে সব শোধ করে দেব।

'—উঁহু, আর ধার হবে না। এক সপ্তাহ ধারে ধারে চলছে। তোমার মতো খদ্দেরের সঙ্গে বেশিদিন কারবার করলে বাপু আমার ব্যবসা লাটে উঠবে। ব্যবসা করতে এসেছি আমি। দানছত্র তো খুলিনি। নেহাত পুরনো খদ্দের বলে অ্যাদ্দিন চুপ করে ছিলাম।

মঙ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। আস্তে আস্তে বলল—তোমার ধার আমি কবে শোধ করিনি, লী?

‘হু—তা করেছ। তবে এবার আর আশা দেখছি না। লী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গোদা গোদা হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে বেলুনের মতো ফুলো মুখটা সামনে বাড়িয়ে খুব মিহি সুরে বললে, 'বুঝলে বুড়ো, একটা ভালো পরামর্শ দিচ্ছি শোনো। কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করছ? তোমার বরাতে আর পাথর টাথর নেই। তাই বলি এবার দেশে ফিরে যাও। কাজকম্ম করো। বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে নিজে মরছ। অন্যদেরও জ্বালাচ্ছ। গত দু'বছর ধরে তো দেখছি। হ্যা, যাওয়ার আগে আমার ধার-টারগুলো শোধ করে যেও কিন্তু।

মঙ কোনো উত্তর না দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। লীয়ের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। ক্ষোভে দুঃখে সে দিশেহারা বোধ করছিল। বয়স ও দারিদ্র্যে জীর্ণ তার শরীর ধনুকের মতো নুইয়ে পড়েছিল তার শীর্ণ বেড়ানো মুখে অজস্র ঋজ। এলোমেলো ভাবে পা ফেলে মঙ ভাবতে ভাবতে পথ চলল।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সে প্রথম এই অঞ্চলে এসেছিল। এই-রত্নের দেশে। সত্যি, এমন দুরবস্থা তার কখনও হয়নি। খারাপ সময় আগেও অনেকবার এসেছে। কয়েকমাস যাবৎ কিছু পায়নি। কিন্তু তারপর আবার সৌভাগ্যের মুখ দেখেছে। কয়েকটি দামি পাথর পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার যেন ভাগ্যদেবী আর মুখ তুলে চাইছেনই না। গত দু'বছরে যে ক'টা পাথর পেয়েছে তা অতি খেলো। বিক্রি করে কয়েকমাসের রসদ কেনার পয়সাও জোটেনি। মাঝে মাঝে পাথর খোজা বন্ধ করতে হয়েছে। এই গ্রামের কাছাকাছি। কোথাও গিয়ে গায়ে গতরে খেটে তিল তিল করে পয়সা জমিয়ে, আবার ফিরে এসে কাজে নেমেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছে। ভাগ্য ফেরেনি। ফের অভাব দেখা দিয়েছে। ধার জমেছে।

শুধু লী কেন? কিছুদিন হল অনেকেই তাকে দেখলে ঠাট্টা করছে। গায়ে পড়ে উপদেশ দিচ্ছে। যাও হে বুড়ো, এবার ফিরে যাও। কোনোদিন রাস্তায় পড়ে বেঘোরে মরবে। খালি পেটে পাথর ভাঙা কি এই বয়সে পোষায়।

গ্রামের প্রায় সীমানায় কোম্পানির আমলে তৈরি ভাঙাচোরা দোতালা পাকা বাড়িটায় ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। কোম্পানির বাড়িটা ছাড়িয়ে কিছু দূরে মঙের ছোট্ট কুটির। একটি মাত্র ঘর। বাঁশের দেওয়ালের ওপর খড় ছাওয়া। মঙের মতো তার বাসস্থানটিরও চরম দুরবস্থা। এবার বর্ষা বুঝি কাটে না!

কুটিরের সামনে বেদির মতো পাথরটায় বসে পড়ল মঙ। ক্লান্ত পা দুটোকে ছড়াল। পরনের প্যান্টটায় সর্বাঙ্গে তালি মারা। শার্টটা ঘাড়ের কাছে ফেঁসে গিয়েছে। দুটোই চিরকুটে ময়লা। এক টুকরো সাবান পেলে কেচে পরিষ্কার করে নেওয়া যেত। কিন্তু সাবান কেনার পয়সা কই? পেটের ভাত জোটে না তো সাবান!

হ্যা, লোকরা ঠিকই বলে, তাকে নেশায় ধরেছে। রত্নের নেশা। চল্লিশ বছর আগে যখন বর্মা-রুবি মাইনস-এ কাজ করতে আসে তখন কি মঙ জানত উত্তর বর্মার মগোক প্রদেশে এই বনজঙ্গল পাহাড় রাজ্যে ঘুরে ঘুরে তার বাকি জীবনটা কেটে যাবে। তার দেশ এখান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে। সেখানে তার নিজের বাড়ি আছে। বাড়ি যেত বছরে অন্তত একবার। এখন পাঁচ বছর যায়নি। খালি হাতে ফিরতে তার লজ্জা করে।

পাথরের রহস্য জানতে তার কম দিন লাগেনি, একটু একটু করে জেনেছে। ক্রমে নেশা ধরেছে। বর্মারুবি মাইনএ কাজ করার সময় সে প্রথম পাথর চিনতে শুরু করে। জানে এই দেশের মাটির তলায় আছে মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার। নানান জাতের মূল্যবান কোরাম পাথর। চুনি, নীলা, চন্দ্রকান্তমণি। মাটি খুঁড়ে পাথর ভেঙে বের কর। আর চিনতে শেখ পাথরের জাত। কোনটা দামি কোনটা খেলো। কোম্পানিতে সে ছিল মজুর। মাটি পাথর কাটার কাজ। রত্নপাথর ঘাটাঘাটির তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো সেও কাজের ফাঁকে কিছু কিছু করে পাথরের জাত বিচারের বিদ্যে রপ্ত করেছিল। বছর দশেক পরে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল।অনেক কর্মচারী কিন্তু গেল না। লাইসেন্স নিয়ে নিজেরাই প্রসপেকটিং শুরু করে দিল। মঙও থেকে গেল। তখন থেকে তার ভাগ্যের ওঠানামার ইতিহাসের শুরু।

মঙ মাথা নেড়ে বিড় বিড় করতে লাগল। পেয়েছি, অনেকবার পেয়েছি। রাখতে পারিনি টাকা।

মঙ চিরকাল বেহিসেবি। উড়নচণ্ডী যখনই দামি পাথর বেচে মোটা টাকা হাতে পেয়েছে। দু-হাতে উড়িয়েছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দেদার ফুর্তি করেছে। ব্যস, দু'দিনে ফতুর, আবার যে কে সেই পাথর ফাটান। প্রাণান্ত পরিশ্রম করা উদাস চোখে গ্রামের ঘরবাড়ির দিকে চেয়ে মঙ ভাবতে লাগল এক সময় কী জমজমাটই না ছিল এই গ্রাম। পুরনো দিনের সেই ছবি মঙের মনে ভাসে। বড় বড় বাড়ি। সুন্দর দোকানপাটে কত লোকজনের আনাগোনা। ইরাবতী নদীর কুলে ঘাটে সর্বদা নৌকোর ভিড়। লঞ্চও বাঁধা থাকত দু'একটা। বর্মারুবি মাইনস-এর দিন শেষ হয়ে,

পরও অনেককাল বাড়বাড়ন্ত ছিল এই গ্রাম। তারপর ক্রমে অবস্থা খারাপ হতে ete কেবল এই গ্রাম নয়। এ অঞ্চলের আরও অনেক গ্রাম যারা রত্নপাথরের খনিগুলির দৌলত ফেঁপে উঠেছিল সবারই ভাগ্যরবি যেন অস্ত গেল।

মাটির তলায় লুকনো মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার যেন ফুরিয়ে গেল। দামি পাথর আর তেমন পাওয়া যায় না। খাটুনি পোষায় না। বেশির ভাগ অনুসন্ধানকারী চলে গেল। শুধু মঙের মতো কয়েকজন মাটি কামড়ে পড়ে রইল। রক্তে যাদের নেশা লেগেছে। রত্নপাথর খোঁজার সর্বনাশা নেশা।

পুরনো লোক, মঙের বন্ধু বান্ধবেরা আজ কেউ নেই। তবে এখনও প্রতিবছর কিছু কিছু নতুন লোক আসে এ অঞ্চলে। কয়েক বছর খোঁজে। কেউ কিছু কিছু পায়। কেউ কিছুই পায় না। তারপর তারা চলে যায়। বেশিদিন থাকে না কেউ। | মঙ ভাবে, আর না। এবার ফিরে যাই। দেশে তার দু'মুঠো ভাতের অভাব হবে না। কিন্তু হতাশ মনে পরাজিত হয়ে ফিরতে তার আঁতে লাগে। যদি তেমন কিছু পাই তো ফিরব, নইলে নয়।

মঙ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। পাথর তাতছে। ঘরে ঢুকে সে কৌটো, হাঁড়িকুড়িগুলি নেড়েচেড়ে দেখল চারমুঠো চাল অবশিষ্ট আছে আর এক ফালি কুমড়ো। অর্থাৎ মাত্র একবেলার আহার। থাক, এখন রান্না করব না, রাতে খাব। আসছে দিনের ভাবনা মঙের মাথায় আসে না। যা হয় হবে। শুধু লী কেন, অন্য কোনো লোক তাকে আর ধার দেবে না। অনেকের কাছেই তার প্রচুর ধার জমেছে। শেষে ভরসা ছিল লী, তাও গেল। বাধ্য হয়ে আবার হয়তো তাকে মজুরি খাটতে হবে। কিন্তু বুড়ো বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি আর শরীরে সয় না।

খাবার চিন্তায় লীর ঠাট্টা মনে পড়ল। তার কাছে কটা টাকাই বা ধার? অথচ মঙের কৃপায় তার কম লাভ হয়নি এতদিনে। বোকা মঙকে অনেকে ঠকিয়েছে। তার অংশীদারুরা। দোকানদাররা। যখন সে পাথর ভালো চিনত না, দাম জানত না, অংশীদাররা প্রায়ই ভালো ভাললা পাথরগুলো ঠকিয়ে নিয়েছে। ওই লী কতবার দামি পাথর নামমাত্র দামে কিনেছে। তার কাছ থেকে। আবার টাকা হাতে পেয়ে ওই লীর দোকানেই সে ফুর্তি করেছে। জিনিস কিনেছে। মাসের শেষে মোটা বিল দিয়েছে লী। একবার চোখ বুলিয়েও দেখেনি হিসেবটা। তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দিয়েছে সব পাওনাগণ্ডা। বন্ধুরা বলেছে ও বেটা জোচ্চোর। ঠকায়। মঙ কিন্তু

কখনও লীকে কিছু বলেনি। আর আজ কি অপমানটা করল। এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই লোকটার।

মঙ উঠে দাঁড়াল। খনি খোঁড়ার দরকারি যন্ত্রপাতি ভরা থলিটা কাঁধে নিয়ে সে কুটিরের বাইরে বেরুল।

গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মাইল খানেক দুরে পাহাড় জঙ্গলের শুরু। বনের কাছে এক গভীর গর্ত। খনির খাদান এখন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। বড় বড় গাছ গজিয়েছে চারপাশে। প্রচুর রুবি ও নীলা পাওয়া গিয়েছিল এই খাদে। মঙ বনের ভিতর ঢুকল। বনের মধ্যেও এমনি অনেক পরিত্যক্ত খনি ছড়িয়ে আছে। এক জায়গায় সে দেখল কয়েকজন লোক একটা খাদে কাজ করছে। এরা বছর খানেক হল খাদানটা খুঁড়ছে। কিছু কিছু পাথরও পেয়েছে। তবে রুবি কম, বেশির ভাগই নীলা।

এরকম দলবেঁধে কাজ করলে অনেক সুবিধে। কিন্তু মঙের দুর্ভাগ্য কেউ তাকে এখন অংশীদার নিতে চায় না। পয়সা নেই, বুড়ো। কাজেই মঙকে একা একাই কাজ করতে হয়।

তবে একা কাজ করার চেয়ে ইদানীং তাকে সবচেয়ে মুশকিলে ফেলেছে তার চোখ। তার দৃষ্টিশক্তি বেশ কমে গিয়েছে। পাথর বাছতে অসুবিধা হয়। হয়তো বাজে পাথরের সঙ্গে দু'একটা দামি পাথরও ফেলে দেয়। কিন্তু শহরের ডাক্তারকে চোখ দেখানো বা চশমা নেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তাই খুব ধীরে সাবধানে পাথর পরীক্ষা করে।

কাছে কোনো বড় পাহাড় নেই। নিচু পাহাড় বা টিলা। পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকায় নানারকম গাছ গাছড়া। লম্বা লম্বা সেগুন গাছ। ঘন বাঁশের ঝাড় আর কাঁটা ঝোপই বেশি। শক্ত মাটির তলায় চুনা পাথরের স্তর। কোথাও বা কালচে কঠিন গ্রানিটের ঢিপি।

মঙ একটা পুরনো খাদের পাশে থামল। কিছুদিন ধরে সে এই খাদানটার মধ্যে খুঁজছে। খাদানটা ভালো করে খোড়া হয়নি। যারা এখানে আগে কাজ করেছিল কোনো কারণে অনুসন্ধান শেষ না করেই চলে গিয়েছিল ঝোপ ও লতায় অনেকটা ঢেকে গিয়েছে গর্ত।

খাদের দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে মঙ সাবধানে নিচে নামল প্রায় তিরিশ ফুট গভীর খাদ। এক জায়গায় অনেকগুলো বড় বড় পাথরের চাঙড় ছড়ানো। এগুলো ভাঙতে হবে। ওপর থেকে এক ফালি রোদ এসে পড়ছে। তবে আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। মঙ তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল।'

খস খস করে একটা আওয়াজ হতেই মঙ সতর্ক হল। কীসের শব্দ? শেয়াল, বুনো কুকুর না সাপ? ক্ষীণ দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে ওপরে চারপাশে দেখল। একটা ছোট পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিল। দরকার হলে ছুড়বে।

নাঃ, শব্দটা থেমে গিয়েছে। পাথরটা ফেলে দিতে গিয়ে সে চমকে উঠল। পাথরের গায়ে সন্তর্পণে আঙুল বোলাল। একটা ছোট্ট নুড়ি। পাথরের গায়ে আটকে রয়েছে। তার চোখ দুটি মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার অভিজ্ঞ আঙুলের স্পর্শ কখনও ভুল করে না। সাধারণ নুড়ি নয়, কেমন মসৃণ। নিশ্চয় দামি পাথর। তাড়াতাড়ি সে হাতুড়ি ঠুকে পাথর ভেঙে নুড়িটা বের করল।

সুপুরির মতো ছোট্ট গোল নুড়ি। হুঁ, রক্তটা যেন লালচে। একটু ঘষে পরিষ্কার করে সে ভালো করে দেখল। বাঃ, গাঢ় লাল রঙ যেন ফুটে বেরচ্ছে। রোদের আলোয় সে নুড়িটা পরীক্ষা করল। উত্তেজনায় ধক ধক করে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। হ্যা, ভেবেছে ঠিক। টুকটুকে লাল স্বচ্ছ পাথর। পায়রার রক্তের মতো গাঢ় লাল রঙা চুনি। যাকে বলে পিজিয়ন ব্লাড রেড রুবি। পৃথিবীর সেরা মণি। হীরের চেয়েও দামি। অতি দুর্লভ বস্তু। মনে হচ্ছে পাথরটির ঘনত্বও নিখুত। এখন অবশ্য তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। কিন্তু মঙ জানে কেটে পালিশ করলে এই পাথরের টুকরোটি অঙ্গারের মতো জ্বলবে। আলো পড়লে ঝিলিক দেবে।

এই রক্তরঙা চুনি কেবল উত্তর বর্মার মগোক অঞ্চলে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাও আজকাল অতি দুষ্প্রাপ্য। শৌখিন ধনীর জগতে একটি পিজিয়ন ব্লাড রেড রুবির জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অস্বাভাবিক দর ওঠে। ডান হাতের তে চনিটি দেখতে দেখতে মঙের সারা শরীর কাপতে থাকল। দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ে লাগল। যেন বিশ্বাস হয় না ব্যাপারটা। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, খুটিয়ে পড়ে। করল চুনিটা। না, কোনো ভুল নেই।

কত ওজন হবে? মঙ আন্দাজ করল প্রায় কুড়ি ক্যারেট। সময় নষ্ট না করে সে চটি পকেটে পুরে যন্ত্রপাতি থলিতে ভরে গ্রামের পথে রওনা দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল।

মঙ সোজা বা-থিনের দোকানে এসে ঢুকল। লীর মতো বা-থিনও হরেকরকম ব্যবসা করত। মশলাপাতি, মণিহারি জিনিস সাজানো রয়েছে দোকানে। সঙ্গে লাগোয়া একটি ঘরে পান ভোজনের ব্যবস্থাও আছে। তাছাড়া লীর মতো বা-থিনও মণি রত্ন কেনাবেচা করে এসে বাথিনের সামনে টেবিলের ওপর চুনিটি রেখে মঙ বলল-“ওজন কর।

পাথরটি দেখে বাথিন চমকে উঠল। খপ করে তুলে নিয়ে আইগ্লাস বের করে চোখে লাগিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু ইতস্তত করে সে যেন অভ্যাসবশেই বলতে যায়। উঁহু, তেমন ভালো জাতের বলে মনে হচ্ছে না তো। কমদামি মাল।

কিন্তু মঙের ভাবলেশহীন মুখ দেখে সে নিজেকে সামলে নিল। মঙের মতো ঝানু পাথর খুঁজিয়েকে এসব ভাওতায় ভোলোনো যায় না বাথিন জানত। বরং সে হাত বাড়িয়ে মঙের হাত চেপে ধরে বলল, –‘অভিনন্দন মঙ। খুব ভালো জিনিস পেয়েছ। খাটি মাল।

মও আবার নিস্পৃহ স্বরে বলে, ‘ওজন করো।'

‘হা, হা করছি। বাথিন চটপট দাঁড়িপাল্লা বের করে। ‘, যা ভেবেছিল ঠিক। একুশ ক্যারেট।

‘দাম কত?’ মঙ একই সুরে বলল।

বাথিন কাগজ কলম বের করে নানারকম অঙ্ক কষতে লাগল। কিন্তু মঙ ততক্ষণে মনে মনে একটা হিসাব কষে ফেলেছে। ‘পনেরো হাজার টাকা। বাথিন বলল।

মঙ হাত বাড়াল। পাথর দাও।'

‘সে কি। বাথিন আঁৎকে ওঠে। –‘ভাবছ বুঝি ঠকাচ্ছি। বেশ আরও দু’হাজার দিচ্ছি।

না। পাথর দাও। এখন বিক্রি করব না। ‘বেশ বেশ তাড়াহুড়োর কী আছে। পাথর দিচ্ছি। তা দু’দণ্ড বসো তো। ওরে কে আছিস। দুটো মাংসের চপ নিয়ে আয়, আর চর্বির বড়া। গরম গরম আনবি।

মঙ নির্বিকার ভাবে চা ও চপ খেল। তারপর চুনি পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বাথিন। পিছন পিছন এল।-দেখ মঙ আমি তোমার কদ্দিনকার খদ্দের। কখনও ঠকিয়েছি তোমায়? জানি তুমি অন্য দোকানে যাবে দর যাচাই করতে। বেশ, অন্যরা যা বলে আমিও ঠিক তত দিতে রাজি! মনে রেখো কথাটা।

লী হঠাৎ মাথা তুলে টেবিলের সামনে মঙকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্র কোচকাল। প্রায় মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—"তারপর কী? বললাম তো ধারটার হবে না। কিন্তু মঙের হাবভাব দেখে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মঙ গম্ভীরভাবে চুনি বের করে টেবিলে রাখল।—'ওজন করো! কত দাম হবে।

পাক্কা জহুরি লী পাথরটি এক নজরে দেখেই চিনতে পারল। একটু পরীক্ষা করেই কোনো সন্দেহ রইল না তার। উত্তেজনায় তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল —'আঁ, আজই পেলে বুঝি এটা।'—হু। মঙের সংক্ষিপ্ত জবাব।

অনুশোচনায় লীর নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছে হয়।ওঃ, এই লোকটাকে সে আজ সকালে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে আর এখন? যদি মঙ প্রতিশোধ নেয়? যদি তাকে এই চুনি বিক্রি করতে না চায়? ইস, বহুদিন এমন ভালো লাভের সুযোগ আসেনি তার ভাগ্যে। এই রক্তরঙা চুনি বিদেশি ধনীর কাছে বিক্রি করে মোটা দাও করা যাবে। | লী তৎপর হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছোকরা কর্মচারীটির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, এই ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ভদ্রলোককে বসার টুল দে। আর দেখ কী কী খাবার পাওয়া যায়। যা যা টাটকা পাবি আনবি।

তারপর বলল, 'হেঁ হেঁ, বুঝলে মঙ। তোমার সৌভাগ্য উপলক্ষে একটু খাওয়া-দাওয়া করলে কি চলে?'লী দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

মঙ প্লেটভর্তি খাবারের সদগতি করতে করতে বলল, কই, ওজন করলে না? দামটা হিসেব করো।

'হা করছি। তাড়া কীসের। আগে খাও।

সতেরো হাজার টাকা। দামটা বলে ফেলে লী আড় চোখে মঙকে লক্ষ করে। উঁহু, মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি দামটা। তাড়াতাড়ি বলল – "আচ্ছা, আঠারো হাজার দেব। কি, চলবে?

মঙ মুখ মুছতে মুছতে হাত বাড়ায়—আমার পাথর দাও।

লী শশব্যস্ত হয়ে বলে, “কি পোবাল না। বেশ আর এক হাজার দিচ্ছি—উনিশ। এর বেশি কেউ দেবে না। তুমি যাচাই করতে পার। আরে! তোমায় কি আমি ঠকাব? আমাদের কি কেবল লাভ-লোকসানের সম্পর্ক। আঁ? তুমিই বলো?

মঙ মাথা নাড়ল।‘পাথর দাও, এখন বেচব না। লী হতাশ ভাবে বলল, ‘বেশ, আর এক হাজার দিচ্ছি। এবার খুশি? মঙ কথা না বাড়িয়ে চুনি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লী হাত কচলাতে কচলাতে রাস্তার মোড় অবধি সঙ্গে চলল। মনে করিয়ে দেয় তাদের কতদিনের বন্ধুত্ব। কতদিনের কারবার। হা, সকালের ব্যাপারটায় ভাই রাগ করো না। মাথার ঠিক ছিল না আমার। একটা মোটা লোকসানের খবর পেলাম আজ সকালেই। সর্বনাশ হয়ে গেছে ব্যবসার। নইলে কি ওই সামান্য কটা টাকার জন্যে তোমায় তাগাদা দি? অ্যাদ্দিন তো দেখছ আমায়। তুমিই বলো।

মঙ উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

আমের পথে যার সঙ্গে মঙের দেখা হয় সেই সেধে সেধে কথা বলে। যারা এতদিন, " হে বুড়ো' ইত্যাদি ভাষায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলেছে, তারাই আভের মশাই' বলে সম্ভোধন করতে লাগল। মুখে তাদের সমীহ। প্রথমটা মঙ অবাক হয়ে গেলেও একটুক্ষণ পরে রহস্যটা ধরতে পারল। —অর্থাৎ খবরটা রটে গিয়েছে।

তার কুটিরের ভিতর ঢুকে স্থির হয়ে বসল। হুম, এখন কী করা যায়? নাঃ ক্ষিদে নেই।

লী ও বাথীনের কল্যাণে পেট ভর্তি। ঘুম পাচ্ছে। সারাদিনের খাটুনি ও উত্তেজনা শরীর অবসাদে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু এই নির্জন ভাঙা ঘরে ঘুমনো কি ঠিক হবে। দুষ্ট লোকের অভাব নেই। সে বৃদ্ধ, দুর্বল। কেউ যদি জোর করে চুনিটা কেড়ে নেয় ঘুমের মধ্যে চুরি করে? এ চুনি সে এখানে বিক্রি করবে না। মান্দালয় শহরে নিয়ে যায়। সেখানকার 'রিদের সঙ্গে দরদস্তর করলে তার দৃঢ় বিশ্বাস আরও কয়েক হাজার টাকা বেশি পাওয়া যাবে।

ভেবেচিন্তে মঙ কুটির ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটা দিল।

মঙ কোথায় আত্মগোপন করেছিল, কোথায় সে ঘুমিয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক পরে সে যখনই গ্রামে আবির্ভূত হল তাকে দেখে সবাই হতভম্ব।

উকে খুসকো চেহারা। চোখ লাল। পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে এবং হাতে এক মস্ত ধারালো কাটারি।

কী ব্যাপার! ব্যাপারটা অচিরেই জানা গেল। মঙ জঙ্গলের ভিতর ঘুমিয়েছিল। সেই সময় কেউ নাকি তার চুনি চুরি করেছে।

মঙ উন্মাদের মতো পথে পথে ছুটে বেড়াতে লাগল। যাকে দেখে ভয়ঙ্কর ভাবে কাটারি তুলে তেড়ে যায়।

-বলো, কে চুরি করেছে আমার পাথর? নিশ্চয় জানো। বুঝেছি ষড়যন্ত্র। বেশ আমিও দেখে নেব কেমন সে আমার হকের ধন হজম করে। ঠিক খুজে বের করব সেই শয়তানকে। আমি তাকে খুন করব।'

গ্রামের লোক মঙের সেই বিভীষণ মূর্তি দেখে যে যার ঘরে ঢুকে দোর দিল। চুনির শোকে বুড়োর মাথার ঠিক নেই। কী জানি কী করে বসে।

মঙকে ছুটে আসতে দেখে লী ঝটপট দোকানের ঝাপ ফেলে ভিতরে বসে বসে ঠকঠক করে কাপতে লাগল। মঙ বাইরে থেকে তারস্বরে চেঁচাল ‘বুঝেছি, এ তোর কীর্তি লী! ভালোয় ভালোয় পাথর বের করে দে, নইলে এর শোধ আমি তুলব।'

লী কোনো সাড়াশব্দ দিল না। সেখান থেকে মঙ ছুটল বাথিনের উদ্দেশে। বাথিন অবশ্য আগে থেকেই খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে সরে পড়েছিল!

মঙ অনেকক্ষণ এইভাবে চেঁচামেচি ও আস্ফালন করে তার কুটিরে ফিরে গেল। তার চুনির কিন্তু কোনো হদিশ মিলল না।

গ্রামে তো বেজায় হুলস্থুল। কে চুরি করল মঙের চুনি?

একদল বলল, এ নির্ঘাৎ বেঁটে চ্যাং-এর কীর্তি। লোকটা দাগি চোর এবং অনেকে তাকে মঙের পিছন পিছন যেতে দেখেছে। আরএক দলের রায়, এটি ফুজির হাত সাফাহ। বিকেল বেলা ও বনে ঢুকেছিল কী করতে!

ফুজি ও চ্যাং দু'জনেই গুজব কানে যাওয়া মাত্র দৃঢ়ভাবে সব অভিযোগ অস্বীকার করল। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণও কিছু নেই। হাতে নাতে কেউ ধরেনি। মঙও বলতে পারছে কে নিয়েছে।

নী ও বাথিনের মতো ব্যবসায়ীরা দারুণ ঘাবড়ে গেল। ছি ছি কী কাণ্ড! এরকম চুরি-চামারি হলে ব্যবসা চলে কী ভাবে! যে চুরি করেছে, সে তো পাথরটা নিয়ে সটকাবে এবং অন্য কোথাও বেচবে। এতে এই পাথর কেনাবেচা করে তারা যে লাভটুকু করত সেটি মাঠে মারা গেল।

লী বেঁটে চ্যাং-এর এক সাকরেদকে পাকড়ে মিষ্টি মিষ্টি করে শোনাল।–দেখ ভাই, কেউ যদি একখানা ভালো চুনি বিক্রি করতে চায় তো আমার কাছে পাঠিও! উচিত দাম দেব! হ্যা, পাথর সে কোত্থেকে পেয়েছে! কেমন করে, এসব নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র মাথাই ঘামায় না! আর কথা দিচ্ছি যেই বিক্রি করুক না কেন, তার নাম আমি গোপন রাখব।

ইতিমধ্যে বাথিনও একই বার্তা প্রচার করেছিল!!

মঙ সে রাত কেমন করে কাটাল কেউ খোঁজ করেনি। খোজ করার সাহসও ছিল না কারও। যাহোক পরদিন সকালে তাকে দেখা গেল নদীর ঘাটে বসে আছে।

সেদিন মান্দালয়গামী স্টিমার আসার দিন। ইরাবতী নদীপথে যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে স্টিমার আসা যাওয়া করে। তবে রোজ নয় কয়েকদিন অন্তর অন্তর। স্টিমার গ্রামের ঘাটে থামে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি শহরে যাওয়ার বা আসার এই একমাত্র উপায়। নইলে নৌকোয় বা ডাঙাপথে অনেক বেশি সময় লাগে।

স্টিমার এল। মঙ ছাড়াও ঘাটে আর কয়েকজন যাত্রী ছিল। সবাই উঠল। গ্রামের লোক কৌতূহলী হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল—"মঙ, কোথায় চললে?

অনেকক্ষণ পর মঙ চিৎকার করে উত্তর দিল-"থানায়।

এখান থেকে ঘন্টাখানেক স্টিমারে গেলে থানা। ওই থানার দারোগার ওপর এ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার।

ডেকের এক কোণে মঙ কাঠের মতো খাড়া বসে রইল। তার তীব্র উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি জলের দিকে নিবদ্ধ। যাত্রী ও মাল্লারা ফিসফিসিয়ে তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগল কেউ অবশ্য তার কাছে ঘেঁষল না। এমনকী তার কাছে স্টিমারের টিকিট অবধি চাইতে গেল না কেউ।

থানার ঘাটে স্টিমার ভিড়তেই মঙ লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল। সারেংকে আদেশ দিল—"খবরদার, কাউকে নামতে দেবে না। আমি পুলিশ ডাকছি। তল্লাশি হবে।

থানার দারোগা মঙের নালিশ শুনে বলল, তাইতো, খুবই দুঃখের ব্যাপার। তোমার এত বড় লোকসান হল। নাঃ, গ্রামের বদমাশগুলো বড় জ্বালাচ্ছে। একবার আচ্ছা করে কড়কে না দিলে চলছে না। তবে এখন লঞ্চে তল্লাশি করে কিসসু ফল হবে না যে চুরি করেছে সে কি আর এই স্টিমারে চলেছে। মনে হয়, সে আপাতত গ্রামেই আছে। পরে সুযোগ বুঝে পালাবে। আমি বরং গ্রামে সেপাই পাঠাচ্ছি। কিন্তু চুনি ফিরে পাওয়ার আশা। কম। কে নিয়েছে যখন দেখতে পাওনি।

মঙ নাছোড়বান্দা।, নিশ্চয় ওই গ্রাম থেকে যারা আসছে তাদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে আমার চুনি। তাদেরই কারও কাছে আছে। তাড়াতাড়ি শহরে চলেছে বিক্রি করতে।

অগত্যা বাধ্য হয়ে দারোগা উঠল। নইলে যে বুড়ো নড়বে না। মঙের সঙ্গে আরো আটজন লোক ওই গ্রামের ঘাট থেকে স্টিমারে উঠেছিল। তাদের জামা কাপড় জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও হারানো চুনির পাত্তা পাওয়া গেল না। বিরক দারোগা সেপাইদের নিয়ে ফিরে গেল। * সবার আগে দারোগা মঙকে জিজ্ঞেস করল, এখন কী করবে? জানি না। মঙ উত্তর দিল। এই স্টিমারেই যাবে?-হ্যা।

থানার এক সিপাই ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল ওই স্টিমারে। দারোগা তাকে ডেকে-লোকটার ওপর একটু নজর রেখো। শেষে আত্মহত্যা না করে বসে। তাহলে আরও ভোগাবে আমায়।

মঙ ডেকের কোণে গিয়ে বসেছে। তার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। ডান হাতের তালু মুখের ওপর চাপা। সমস্ত ভঙ্গিতে চরম হতাশা ও রিক্ততার ভাব। মঙের অবস্থা দেখে অন্যদের দুঃখ হচ্ছিল। তবে তার গ্রামের সঙ্গী ক'জন বেজায়

চটেছে। তারা দূর থেকে মুণ্ডপাত করছিল বুড়োর। মঙের অবশ্য কোনো খেয়াল নেই। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

মান্দালয়ে স্টিমার থামতে মঙ নামল। সিপাইটি দারোগার কথামতো কিছুক্ষণ মঙকে চোখে চোখে রেখেছিল। কিন্তু জাহাজ ঘাটায় ভিড়ের মধ্যে ছ করে মঙ কোথায় যে হারিয়ে গেল সিপাইটির তাড়া ছিল। একটা ক্ষ্যাপা বুড়োর পিছনে বাজে সময় নষ্ট না করে সে ছুটল শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার নৌকো ধরতে। " আরও দু'দিন পরে।

দুপুরবেলা এক নির্জন মাঠের ধারে মঙ বাস থেকে নামল। একজন লোক সেই বাসে উঠবে বলে দাঁড়িয়েছিল। মঙকে দেখে চেঁচিয়ে বলল—"আরে মঙ যে, অনেক কাল পর। থাকবে তো কিছুদিন?

'হ্যা ভাই, এবার দেশেই থাকব ঠিক করেছি। আর ফিরব না। মঙ হাসিমুখে উত্তর দিল। 'বেশ বেশ। পরে দেখা হবে, গল্প হবে। বলতে বলতে লোকটি চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। মঙ একা দাঁড়িয়ে রইল।

দূরে মাঠের ওপারে গাছপালা ঘেরা তার নিজের গ্রামটির দিকে তাকিয়ে মঙ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে বের করল একটি থলি। থলিটা টিপেটুপে দেখল। আঃ, নোটে ঠাসা। কড়কড়ে পঁচিশ হাজার টাকা। মান্দালয়ে চুনি বিক্রি করে পেয়েছে।

'একটু হিসাব করে চললে এখন বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে আরামে কাটাব।" মঙ নিজের মনে বলল। "মঙ বোকা, চিরকাল কেবল ঠকেই এসেছে। তাই না? এখন কেমন? চোর ডাকাতকে ফাঁকি দিলাম এবং অতগুলো পাওনাদারকে বেবাক কলা দেখালাম। কাউকে একটি পয়সা ধার শোধ করতে হল না।

দারোগাকে মঙ নিছক মিথ্যে কথা বলেনি। স্টিমারে ওই গ্রামের যাত্রীদেরই কারও কাছে ছিল তার চুনি। তবে লোকটি যে স্বয়ং মঙ তা কে ভাববে!

মন কথা কয়না - অজেয় রায় Mon Kotha Koy Na by Ajeo Ray

এক শশাঙ্কনাথ বোস একটু আনমনাভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পিচ ঢাকা চওড়া বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, শরতের অপরাহে উজ্জ্বল রোদের আভায় চকচক করছে। শশাঙ্কনাথের হাত স্টিয়ারিং-এর ওপর, সম্মুখে প্রসারিত চক্ষু কুঞ্চিত। বাস, লরি, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদি "দ্রুতগতি যানগুলিকে অভ্যাসবশে পাশ কাটিয়ে চলছে তার ছাইরঙা অ্যামবাসাডর। শশাঙ্কনাথের মনে চিন্তার আলোড়ন! “মজা! অদ্ভুত মজা! ম্যাজিক!” প্রিয়রঞ্জনের কথাগুলো ঘুরছে তার মাথায়। কী ব্যাপার? খুব হইচই মজা করার ধাত নয় প্রিয়রঞ্জনের। ছেলেবেলা থেকে তিনি বইমুখো চাপা স্বভাবের। অবশ্য মাঝেমধ্যে বেয়াড়া রসিকতা। করার অভ্যাস ছিল তার। শশাঙ্ক অনেকবার বোকা বনেছেন, অপ্রস্তুত হয়েছেন তার পাল্লায়। পড়ে। এত দিন বাদে তাকে দেখে কী আবার মতলব জাগল প্রিয়র মাথায়? সন্দিগ্ধ শশাঙ্কনাথ ভেবে ভেবে এই হেঁয়ালির কুলকিনারা পান না। একটু যেন ভয়-ভয় করে তাঁর। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক কৌতূহল, কী এক রহস্যের হাতছানি বুঝি।

শশাঙ্কনাথ বোস এক আধা-বিলিতি বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে মোটা মাইনের অফিসার। গোলগাল চেহারাটি, আচ্ছাপ্রিয়, আমুদে মানুষ। বন্ধুদের খোঁজখবর নেন, সাধ্যমতো উপকারও করেন। পুরনো বন্ধুদের দেখা পেলে ছাড়তে চান না। তাই গত শুক্রবার বাল্যবন্ধু প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে যেমন অবাক তেমনি খুশি হয়েছিলেন তিনি।

পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে দেখা হয়েছিল দু'জনের। লাল বাতির নিষেধে সার সার গাড়ি তখন থেমে পড়েছে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। শশাঙ্ক বা পাশের গাড়ির চালকের দিকে চেয়ে চমকে ওঠেন: প্রিয়রঞ্জন না? হ্যা, ঠিক! কী আশ্চর্য! বাঁ পাশের গাড়িটা লালরঙা ফিয়াট। তাতে আরোহী শুধু নিঃসঙ্গ চালক।

প্রিয়। —হুঙ্কার ছেড়ে ডাক দিয়েছিলেন শশাঙ্কনাথ। চালক মুখ ফিরিয়েছেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেছেন, আরে, শশাঙ্ক না?

—এগজ্যাক্টলি! এদ্দিন পরে!

শশাঙ্কের কথা শেষ হয় না, পথের লাল সংকেত হলুদ হয়, স্তব্ধ গাড়ির সারি যেন প্রাণ ফিরে পায়, ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ ওঠে। অতি ধীরে এগোতে থাকে গাড়িগুলি।

ওইখানে গাড়ি দাঁড় করা।-ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন শশাঙ্ক। পার্কস্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে একটু এসে চৌরঙ্গির ফুটপাথ ঘেঁষে দু'জনে গাড়ি পার্ক করেছিলেন। দরজা খুলে পথে লাফিয়ে পড়েছিলেন শশাঙ্কনাথ, পদভারে ফুটপাথ কম্পিত করে ধেয়ে গিয়েছিলেন সামনের ফিয়াট গাড়িখানার দিকে। প্রিয়রঞ্জন তখন সবে গাড়ির দরজা খুলেছেন। একরকম টনে-হিঁচড়ে তাকে নামিয়ে এনেছিলেন শশাঙ্ক। বিপুল কনিনাদে অফিস যাত্রীদের সচকিত করে অভ্যর্থনা জানিয়েহিলেনপ্রিয়, ইউ নটি বয়! কবে ফিরেছিস? কোথায় আছিস? কী করছিস? উঃ, চার বছর পরে দেখা!

শশাঙ্কের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুধু মৃদু মৃদু হেসেছিলেন প্রিয়রগুন। প্রিয়রঞ্জনকে ভালো করে লক্ষ করেন শশাঙ্কনাথ। সেই একই চেহারা, কোনো পরিবর্তন হয়নি। কে বলবে, বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে। ফর্সা, লম্বা, এক যেন রোগ হয়েছে। উন্নত নাসিকা, দৃঢ়বদ্ধ অধরওষ্ঠ, চশমার পুরু কাচের আড়ালে ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চোখ। পরনে ট্রাউজার ও ফুলহাতা শার্ট। কবে ফিরলি দেশে? —প্রশ্ন করেছিলেন শশাঙ্কনাথ।

প্রায় বছর খানেক। আঁ, বছর খানেক। অ্যাদ্দিন কোনো পাত্তা পাইনি যে? আমায় খবর দিসনি কেন? —শশাঙ্কের স্বরে অভিমান। প্রিয়রঞ্জন কাচুমাচুভাবে বলেছিলেন, সময় পাইনি ভাই, বড় ব্যস্ত ছিলাম।

কবে ফিরছিস কানাডায়? —আপাতত ফিরছি না।

-কী করছিস এখানে?

-একটা কাজ নিয়েছি রেমন্ড ইলেকট্রনিকস-এ আর...বলতে বলতে প্রিয়রঞ্জন থেমে যান।

—আর কী? রিসার্চ বুঝি? ওঃ, তোর তো খুব নাম হয়েছে কানাডায়। কী সব সাংঘাতিক রিসার্চ, যুগান্তকারী। হাবুল বলছিল। হাবুলকে মনে আছে? সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত আমাদের সঙ্গে? এখন আমেরিকায় থাকে। ও দেশে এসেছিল দু'বছর আগে, বলেছিল। তোর কথা। তা তুই হঠাৎ চলে এলি যে?

-এমনি! অনেক দিন তো থাকলাম ওদেশে! -তোর চেহারা ফেরেনি কেন? অ্যাদ্দিন থাকলি অমন ভালো জায়গায়। কেন এখানটা খারাপ কী? তুই তো আরও মুটিয়েছিস।-জবাব দিয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন।

—চল আড্ডা মারা যাক। ওঃ, কত কথা জমে আছে। চল্ আমার বাড়ি।

—আজ থাক্। একটু কাজ আছে আমার।

=ধ্যেৎ! সারা জীবন শুধু কাজ আর কাজ। মাঝে মাঝে একটু ফুর্তি করতে হয়, বুঝলি? নইলে জীবনটায় মরচে পড়ে যায়। চল্ চল্।

নাঃ, আজ থাক্। বুঝেছি, আমার মতো মুখর সঙ্গে আড্ডা দিলে সময় নষ্ট। তুই এখন কত বড় বৈজ্ঞানিক! গরম হয়ে বলেছিলেন শশাঙ্কনাথ।

প্রিয়রঞ্জন বলেছেন, আহা, রাগ করছিস কেন? এই নে আমার ঠিকানা। আসছে শনিবার বিকেলে চলে আয় আমার বাড়ি, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সিথির কাছে। একটা মজা দেখাব, অদ্ভুত মজা!

কৌতুক ঝিলিক দিয়েছে প্রিয়রঞ্জনের তীক্ষ্ণ চোখে। শশাঙ্কনাথ অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী মজা? দেখবি খন। ম্যাজিক। অবশ্য দেখাতে যে পারবই, গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

—প্রিয়রঞ্জন রহস্যময়ভাবে হেসেছিলেন। তোর বাড়িতে আর কে থাকে?—জানতে চেয়েছিলেন শশাঙ্কনাথ।

—আমি আর আমার একজন কাজের লোক, বাস্। নিকট আত্মীয়ের তো বালাই নেই মা মারা যাওয়ার পর!

আচ্ছা যাব।-সম্মতি জানিয়েছিলেন শশাঙ্ক।

আজ সেই উদ্দেশ্যেই চলেছেন। হঠাৎ থামালেন গাড়ি। ওই যে, লালরঙের খুব পুরনো। মস্ত বাড়ি। লোহার সবুজ গেট, মাথায় বোগেনভিলার ঝড়। গেটের মাঝে শেপাথরের ফলকে লেখা: মিত্রভবন। সব মিলছে প্রিয়রঞ্জনের বর্ণনার সঙ্গে।

পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে নামলেন শশাঙ্কনাথ। দেখলেন চারধার। নিত্রভবনের চারপাশ ঘিরে অনেক ছোট ছোট বাড়ি। কিছু দূরে একটা কলোনি। কয়েকটা ছোট ছোট দোকান। পথের পাশে নোংরা ডাস্টবিন। বোঝা যায়, মিত্রভবন ছিল বহুকাল আগে এক সুরম্য প্রমোদ-বন। আজ অবশ্য তার চেহারা জীর্ণ বার্ধক্য-ক্ষীণ।

এমন বাজে বাড়ি নিল কেন প্রিয়? কলকাতায় ভালো পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য তো তার আছে।ভাবলেন শশাঙ্কনাথ। তারপর ধীরে ধীরে মিত্রভবন লক্ষ করে এগোতে থাকেন।

শশাঙ্কনাথ মিত্রভবনে পৌঁছেবার আগে দুটি যুবক বেরিয়ে এল ওই বাড়ির গেট খুলে। একজন পথের ধারে দাঁড় করানো একটা ছোট কালো গাড়িতে চেপে বসল। তারপর অন্যজনের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। দ্বিতীয় যুবক ফিরে যাচ্ছে, শশাঙ্কনাথ ডাকলেন—এখানে প্রিয়রঞ্জন রায় থাকেন?

যুবক গুরে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণ, লম্বা, শক্ত-গড়ন। চৌকে দৃঢ় চোয়াল। পরনে সাধারণ সুতির শার্ট ও টেরিকটের ফুলপ্যান্ট। একমুহূর্ত শশাঙ্কনাথকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে নিয়ে বলল, হ্যা।

আছে প্রিয়?—শশাঙ্ক জানতে চাইলেন। আপনি?—যুবকের কণ্ঠে বিস্ময়, মুখের ভাব কঠিন।

বন্ধু। ওল্ড মেট। আমাকে আসতে বলেছিল আজ। আমার নাম শশাঙ্কনাথ বোস। নাম বললেই চিনবে।

ও আসুন।-যুবক নীরবে এগোতে থাকে বাড়ির দিকে। সদর দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকে বাঁ পাশে একটা মাঝারি ঘর দেখিয়ে যুবক বলল, বসুন, আমি স্যারকে খবর দিচ্ছি।

শশাঙ্ক ঘরে ঢুকলেন। এটি নিশ্চয় ড্রয়িংরুম। ঘরের ফ্যানটা ঘুরছে। হয়তো খানিক আগে লোক ছিল এই ঘরে। বোধহয় ওই যুবকটি বসেছিল এখানে। শশাঙ্কনাথ একটা

পর চেয়ার টেনে ঠিক ফ্যানের নিচে বসলেন। তারপর সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। অতি সাদামাটা করে সাজানো। দুটি সাধারণ কাঠের চেয়ার, একজোড়া পুরু-গলি আঁটা চোর, মাঝখানে একটি গোল টেবিল। দু'টি ছোট-ছাট টি-পয়—এ-ই আসবাব। ঘরের জানালাগুলো পর্দাটানা। নিয়নবাতি জ্বলছে। শৌখিন বস্তু বলতে তার নজরে পড়ল দুটি জিনিস: এককোণে টেবিলের ওপর রাখা বড় একটা অ্যাকোয়ারিয়াম এবং গৰিমোড় চেয়ারদুটির পিছনে চমৎকার এক টেবিলল্যাম্প। কারুকার্য-করা লম্বা স্ট্যান্ডের মাথায় ধাতু-নির্মিত এক প্রকাণ্ড আধখোলা পদ্ম-কুঁড়ি, তার মাথায় বা, তার ওপর ঘন সবুজ কাপড়ের ঘেরাটোপ। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতর ছোট্ট বাতি জ্বলছে, নানা বিচিত্র বর্ণ মাছ আলোয় উজ্জ্বল জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে।

পিছনে পায়ের শব্দ। শশাঙ্কনাথ মুখ ফিরিয়ে দেখেন, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন প্রিয়রঞ্জন।

হাল্লো প্রিয়!—লাফিয়ে উঠলেন শশাঙ্কনাথ।

বোস শশাঙ্ক। বাড়ি খুঁজতে অসুবিধে হয়নি তো?—বললেন প্রিয়রঞ্জন।

না। কিন্তু এমন ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরে বাড়ি নিলি কেন? এই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, নির্ঘাত ভূত-টুত আছে।

–কেন, বাড়িটা খারাপ কী? অনেকটা জায়গা। কলকাতার হট্টগোল নেই। দিব্যি নিরিবিলি। তারপর? খবর বল্ তোর। বাড়ির সবাই কেমন? মাসিমা, তোর স্ত্রী সব

ভালো। তো? মেয়ের এবার কোন ক্লাস হল? যাব তোর বাড়ি। সেই পুরনো বাসাতেই আছিস তো? লেক রোডে?

শশাঙ্কনাথ ভাসা-ভাসা উত্তর দিলেন এসব প্রশ্নের। তাঁর মন ছটফট করছে: সেই কথাটা পাড়ছে না কেন প্রিয়? শেষে থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, সেদিন বললি, কী মজা দেখাবি। কই, দেখা। মজা!

—প্রিয়রঞ্জন থতমত খেলেন।

-হ্যা। বললি যে, ম্যাজিক! অদ্ভুত মজা!

-দূর, সে এমনি বলেছিলাম। শশাঙ্কনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারেন, প্রিয়রঞ্জন পাশ কাটাতে চাইছেন, তাঁর মুখ ভার দেখে প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, আরে, রাগ করছিস কেন?

-না ভাই, আমি মুখ মানুষ, তুমি পণ্ডিত। তোমার কাছে আমার রাগ-অভিমানের কী দাম।

প্রিয়রঞ্জন মাথা নিচু করে ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, বেশ দেখাৰ মজা! কিন্তু শশাঙ্ক, একটা কনডিশান আছে।

কী?

—যা দেখাব, কারও কাছে তা ফাঁস করা চলবে না। বাড়িতেও না। ইন নো সে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

অবাক হয়ে শশাঙ্ক বললেন, বেশ করেছি প্রতিজ্ঞা। একটু আনমনাভাবে প্রিয়রঞ্জন বললেন, অবশ্য দেখাতে পারব কিনা জানি না। সব সময় ঠিক হয় না। দেখা যাক, হোর লাক আর আমার হাতযশ। বলেই হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠেন প্রিয়রঞ্জন। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখ কাও, শুধু বকাচ্ছিস। অতিথি সৎকারে খেয়াল নেই। বংশী, ও বংশী, শুনে যাও তো একবার।.আরে, এই বিচ্ছিরি কেঠো চেয়ারটায় বসেছিস কেন? ওই গদিওয়ালা চেয়ারটায় আরাম করে বোস্।

প্রিয়রঞ্জন একরকম জোর করে শশাঙ্ককে তুলে এক গদি-দেওয়া চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। একজন মাঝবয়সি লোক উকি মারল দরজায়।

কী খাবি? চা, না, কফি?—জানতে চাইলে প্রিয়রঞ্জন।

—কফিই হোক।

বংশী, কফি আন এক কাপ। আমি এখন না, এইমাত্র খেয়েছি। বেশি চা-কফি খেলে ঘুম হয় না।

বংশী চলে গেল।

প্রিয়রঞ্জন নানা গল্প শুরু করলেন। বেশির ভাগ বিদেশে বেড়ানোর কথা। কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নিলেন!!

একটু বাদে কফি এল, সঙ্গে উত্তম মাংসের প্যাটিস। শশাঙ্কনাথ খাইয়ে মানুষ। চটপট প্যাটিসলির সস্থ্যবহার করলেন। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, কই, এবার দেখা। প্রিয়রঞ্জন আশ্বাস দিলেন—হবে, হবে। ব্যস্ত কীসের!

একবার উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালার পর্দা ভালো করে টেনে দিলেন। ল্যাম্পের শেডটা একটু সোজা করলেন। ফের বসলেন। গল্প শুরু প্রলেন। হঠাৎ তিনি উঠে পড়লেন আবার। বললেন, শশাঙ্ক, প্লিজ একটু বোস্। এই পাঁচ মিনিট। একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে ফেলে এসেছি। ভুলে গিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরিতে ইন্সট্রুমেন্টগুলো গুছিয়ে রেখে আসছি। ভেরি সরি। বলে দ্রুতপায়ে প্রিয়রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন শশাঙ্কনাথ। কোথায় পাঁচ দশ মিনিট কেটে গিয়েছে, প্রিয়রঞ্জনের দেখা নেই। চিরকাল খেয়ালী, ইদানীং যেন আরও বেড়ে স্বভাবটা।

এ কী রকম ভদ্রতা? আসতে বলল বিকেলে। হাতের কাজ সেরে রাখেনি কেন? নিজেই বলল, ‘‘মজা দেখাৰ",তারপর আর উচ্চবাচ্য নেই। নেহাত শশাঙ্কনাথ চাপ দিলেন, তাই রাজি হয়েছে।

ভাবছেন শশাঙ্কনাথ।

প্রিয় এই অজ্ঞাতবাসের কারণটা মনে হয়, চেনা-জানা জগৎ থেকে কিয়ে থাকতে চায়। ওর ফিরে আসার খবর তাই বন্ধুরা জানে না কেউ।

একটা সন্দেহ জাগল শশাঙ্কনাথের মনে। শুধু কি এটা নিরিবিলিতে বাস, না, অন্য কি? প্রিয় আমেরিকা কানাডা ফেরত। আজকাল হরদম শোনা যায়, সি.আই. এর নাম মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা। সেই রকম কোনো দলের খপ্পরে পড়েছে নাকি ও? গোপনে দেশের খবর পাচার করছে বিদেশি শক্তিকে? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে ওর নিশ্চয়ই এদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক দপ্তরে যাতায়াত আছে। এদেশে নতুন বৈজ্ঞানিক, আমিও তাই ভাবছিলাম। বললেন প্রিয়রঞ্জন। আবিষ্কার ও অগ্রগতির বহু খবর ও রাখে। তাই কি ওর এই পরিবর্তন? নির্জনে রিসার্চ-টিসার্চ তবে কি বাজে কথা?

নাঃ, প্রিয়র এমন অধঃপতন বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্রী সন্দেহটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন শশাঙ্কনাথ। একটা পত্রিকাও নেই ঘরে যে পড়বেন। ধ্যেৎ, সন্ধ্যাটা আজ মাটি হল। ক্লাবে গিয়ে তাস পিটলে বরং কাজ হত।

বেজার মুখে শশাঙ্কনাথ এমনি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন। একবার উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ান। আবার বসেন।

—অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, সরি! কখন্ প্রিয়রঞ্জন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন শশাঙ্কনাথ টের পাননি। সময় কাটাতে তিনি তখন অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলির খেলা দেখতে তন্ময়। প্রিয়র গলা শুনে চমকে ফিরলেন তিনি। ঘড়িতে আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, বেশি না, আধঘণ্টা। এবার সেই জিনিসটা দেখাবি কি দয়া করে দেখাব?

নিশ্চয়ই দেখাব। প্রিয়রঞ্জন বসলেন।

শশাঙ্কনাথের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, অপরাধ করেছি স্বীকার করছি, তা বলে আমায় একেবারে সি, আই-এর এজেন্ট ভাবা কিন্তু তোর উচিত হয়নি।

প্রিয়রঞ্জনের কথা শুনে শশাঙ্কনাথ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে স্তম্ভিত চোখে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

প্রিয়রঞ্জন আবার বললেন, ভাবছিলি, পাগলের পাল্লায় পড়ে সন্ধেটা নষ্ট হল, এর চেয়ে তাস পিটলেই ভালো হত। তা-ই না? মিস্টার কাপুর কেমন খেলেন ব্রিজ। আগেরবার তোত তোকে কমপিটিশনে ডুবিয়েছিলেন। তবে তাকে এবারেও নিলি কেন পার্টনার?

শশাঙ্কনাথের চোখ বিস্ফারিত, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কিছু বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, বাড়ি ফিরবি, না, আজ রাতে থেকে যাবি এখানে? মজা দেখার উত্তেজনায় বউয়ের অর্ডার ভুলে গেছিস। বাড়ি যিলে কিন্তু আস্ত রাখবে না। কাল সকালে বরং নিউমার্কেট থেকে চীনে রান্নার মশলাটা কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকি। আমার বাঁধে খাসা, মুরগি আর পরোটা বানাবে! কী করবি বল। শশাঙ্কনাথ তোতলাতে তোতলাতে উচ্চারণ করলেন,

প্রিয়, তুই এসব জানলি কী করে? প্রিয়, তুই কি ম্যাজিক মানে হট রিডিং শিখেছিস, প্রিয়রঞ্জন সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, হু, কিছু কিছু।

প্রিয়, তুই কি সাধনা-টাধনা, মানে সাধু-টাধুর কাছে—শশাঙ্কনাথ আমতা-আমতা করেন।

নো সাধু সন্ন্যাসী বিজনেস!—প্রিয়রঞ্জন উত্তর দিলেন, আমি বৈজ্ঞানিক। আমার সাধনা অন্য পথে।

—প্রিয়, আমরা বন্ধু ছিলুম ছোটবেলার। প্লিজ, আমায় একটু বুঝিয়ে বলু, আমি কিছুই ধরতে পারছি না! | ছিলুম মানে? —প্রিয়রঞ্জন ভুরু কোঁচকান — এখন নেই?

হা হা, আছি বইকি। -সন্ত্রস্ত শশাঙ্কনাথ এই অলৌকিক ক্ষমতাধারী ব্যক্তিকে নিজের বন্ধু বলে দাবি করতে যেন ভরসা পান না। বলছি সব। আগে এক কাপ কফি হোক। আমিও খাব। —বললেন প্রিয়রঞ্জন। শুকনো গলায় টোক গিলে শশাঙ্কনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন।

কফিতে চুমুক দিয়ে একটুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন প্রিয়রঞ্জন। বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নিলেন নিজের বক্তব্য। তারপর বললেন, মানুষের শরীর-যন্ত্র এবং নিউরোসাইবারনেটিকস-এর রহস্য সম্বন্ধে তোর কোনো ধারণা আছে?

শশাঙ্কনাথ আমতা-আমতা করে বললেন, ইন্টারমিডিয়েটে অবিশি বাওলজি ছিল, কিন্তু সব ভুলে গেছি, চর্চা নেই।

-। আচ্ছা, দু-একটা সোজা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার গবেষণার মূল সূত্র। বেশি আলোচনা করে লাভ নেই, কারণ তোর মাথায় ঢুকবে না। তাছাড়া ওটা আমার সিকরেট, আপাতত ফাস করতে চাই না।

তা-ই ভালো। দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শোনার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়ে শশাঙ্কনাথ হাঁফ ছাড়লেন।

হ্যা, শোন,—প্রিয়রঞ্জন শুরু করলেন; বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ করেছেন, মানবদেহে প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন ও মানসিক আবেগের সঙ্গে তার দেহকোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, সৃষ্টি হয় একরকম বৈদ্যুতিক তরঙ্গের। জীবকোষ এমনভাবে তৈরি যে, প্রত্যেক কোষের আবরণ-ঝিল্লির অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের মধ্যে আয়ন-অসাম্য বর্তমান। এই অসাম্যের ফলেই বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি হয়। জীবনে প্রতিনিয়ত এমনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রাণীদেহে অসংখ্য স্নায়ুকোষের ভিতর দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে : চিন্তা কী

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকেন প্রিয়রঞ্জন! তারপর আবার শুরু করেন: নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস, চিন্তা করার সময় আমাদের মনে নানারকম আধুনিক খবর বা পুরনো স্মৃতি জেগে ওঠে। কোনোটা তখুনি-তৈরি কোনো সমস্যার চিন্তা, কোনোটা বা পূর্বেকার ঘটনার স্মৃতি বা দৃশ্য। তখন আমরা নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি বা দৃশ্য দেখি। এভাবে আমাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করি। মস্তিষ্ক হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে আছে প্রায় কুড়ি সেটি নিউরন বা স্নায়ুকোষ। এই স্নায়ুকোষগুলি অ্যাক্সন বা স্নায়ুতন্তু দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।মানুষের মস্তি প্রতিমুহর্তে কাজ করে চলেছে। তার ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই প্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রেনে এই বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ-এর সৃষ্টি হয়। এই ওয়েত বা তরঙ্গকে সেরিব্রাল ওয়েভ বলা যেতে পারে। রেডিও বা টেলিভিশনে যে হার্টজিয়ান বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, এই তরঙ্গ প্রায় তারই মতো। মস্তিষ্কে উৎপন্ন এই তরঙ্গ প্রচণ্ড গতিতে এবং বিভিন্ন কল্পনাঙ্কে চতুর্দিকে শুনে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় তা আবার মস্তিষ্কের ভিতরেই স্থির তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কী রে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

নীরবে ঘাড় নাড়লেন শশাঙ্কনাথ। প্রিয়রঞ্জন বলে চলেন : আমাদের মস্তিষ্কের আর একটি কেন্দ্রের কাজ হল এই স্থির তরঙ্গকে গ্রহণ করা। বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের সংবাদ-বাহক এই তরঙ্গগুচ্ছকে গ্রহণ করতে এই গ্রাহক কেন্দ্রকে মস্তি-পেশির সাহায্য নিতে হয়। মস্তিষ্কের প্রেরক কেন্দ্র এবং গ্রাহক কেন্দ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনকেই আমরা চিন্তা বলি। প্রত্যেকটি চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একশ্রেণির স্টেশনারি ওয়েভ বা সীমাবদ্ধ কনাঙ্কের স্থির বিদ্যুত্তরঙ্গগুচ্ছ।

আই সি। শশাঙ্কনাথের কণ্ঠে খুশিভরা উত্তেজনা। সেটা লক্ষ করে প্রিয়রঞ্জনও খুশি। বললেন, আরও একটু জ্ঞান দেব ভাই, ধৈর্য ধরে শোন। এবার স্মৃতি প্রসঙ্গে আসা যাক। স্মৃতি দু'রকম—ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী। সেরিব্রাল কর্টেকস-এর ঠিক নিচে হিপোক্যাম্পাস অঞ্চলে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির অবস্থান, আর দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি স্থির তরঙ্গরূপে জমা থাকে সেরিব্রাল কর্টেকস-এ। কোনো জিনিস নিয়ে বারবার চিন্তা করলে সেই ঘটনা বা চিন্তাতরঙ্গ সেরিব্রাল কর্টেকস-এর একরকম স্নায়ুকোষে জমা হয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, সেই চিন্তা বা সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুচ্ছ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে উঠে যায়। কোনো অতীত ঘটনাকে স্মরণ করার কায়দা হল আমাদের মস্তিষ্কের প্রেরক কেন্দ্রের দ্বারা পূর্ব-প্রচারিত স্থির তরঙ্গগুচ্ছকে গ্রাহক কেন্দ্রে গ্রহণের জন্যে মস্তিষ্কের পেশি-সঞ্চালন। একটি মস্তিষ্কের প্রেরক যন্ত্র যে সীমাবদ্ধ কম্পনাঙ্কের তরঙ্গগুচ্ছ উৎপন্ন করে, সাধারণত সেই মস্তিষ্কের গ্রাহক কেন্দ্রই সেগুলি গ্রহণ করতে পারে। আমাদের চিন্তারাশির উৎস মস্তিষ্কের ভিতরে লুকিয়ে থাকলেও ওর প্রভাব বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুচ্ছের আকারে মস্তিষ্কের বাইরে মহাশূন্যেও ছড়ায়।

যদি দুটি লোরে মস্তিষ্কের গঠন এমন হয় যে, একটির প্রেরক কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়া চিন্তাতরঙ্গ অপরটির গ্রাহক কেন্দ্র ধরতে পারে, তাহলে একজনের চিন্তা-ভাবনা অন্যজন জানতে পারবে।

প্রিয়রঞ্জন হড়হড় করে যেন ঘোরের মধ্যে বলে যাচ্ছেন। শশাঙ্কনাথ অবাক হয়ে ভাবছেন, প্রিয় এখন কী চমৎকার বাংলা বলে! এত শক্ত-শক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলি বাংলায় বোঝাচ্ছে। এত বছর বিদেশে থেকেও বাংলা ভোলেনি। দেশে থাকতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্যে আন্দোলন করত ও। জেদটা বজায় রেখেছে।

—কী রে, অসুবিধা হচ্ছে না তো বুঝতে ? চমকে উঠে শশাঙ্কনাথ থতমত খেয়ে বললেন, না... মানে...

—কেন? এ তো খুব সোজা ব্যাপার! আচ্ছা, একটা সোজা উদাহরণ দিচ্ছি। রেডিও অপারেশনের সূত্রটা জানিস? শশাঙ্কনাথ উজ্জ্বল মুখে ঘাড় নাড়লেন—হ্যা, মোটামুটি!

—প্রায় সেইরকম ব্যাপার এটা। রেডিওর ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে নানারকম রেডিও ওয়েভকে প্রচার করা হয়। আর আমাদের রেডিও-যন্ত্রে থাকে রিসিভিং সেন্টার অর্থাৎ গ্রাহক কেন্দ্র। কোনো বিশেষ বেতার তরঙ্গকে ধরতে গেলে আমরা রেডিওর রিসিভিং নবকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় টিউন করে নিতেই শুনতে পাই সেই তরঙ্গে প্রচারিত ধ্বনি। আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কে একটি প্রেরক কেন্দ্র এবং একটি গ্রাহক কেন্দ্র থাকে। কিছু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি টেলিপ্যাথি বা মানসিক যোগসাধন করতে পারেন। এতে থট রিডিংও বলা যায়! বোধহয় তারা যোগ-অভ্যাসের দ্বারা মস্তিষ্কের পেশি সঞ্চালন করে এই ক্ষমতা আয়ত্তে আনেন। তখন অন্যের পাঠানো চিন্তাতরঙ্গ তাঁর নিজের মস্তিষ্কের গ্রাহকযন্ত্রে ধরতে পারেন। আবার হিপনোটিজম বা সম্মোহন যারা করতে পারেন, তাঁরা বিশেষ সাধনাবলে নিজের মস্তিষ্কের পেশি সঞ্চালন করে অতি তীব্র চিন্তাতরঙ্গ পাঠিয়ে আর একজনের মস্তিষ্ককে অবশ করে দিতে পারেন। এও একরকম মানসিক যোগসাধন।

এবার ব্যাপারটা অনেকটা সহজ লাগছে।-শশাঙ্কনাথ বললেন।

বেশ।—প্রিয়রঞ্জন বলতে থাকেন : শুনেছিস বোধ হয়, যমজ ভাই-বোনেরা অনেক সময় দূরে থেকেও একে অন্যের মনের কথা জানতে পারে। এর কারণ হল, জন্মসূত্রে দু'জনের মস্তিষ্কের গঠনে যান্ত্রিক মিল। তাই একজনের মস্তিষ্কের প্রেরক যন্ত্র থেকে পাঠানো চিন্তাতরঙ্গ অন্যজনে ধরতে পারে। | বুঝেছি।—বললেন শশাঙ্কনাথ, তুই টেলিপ্যাথি শিখেছিস। কার কাছে শিখলি? কোনো ম্যাজিশিয়ান?

-না। আমি মানুষের চিন্তাতরঙ্গকে ধরবার একটা উপায় আবিষ্কার করেছি। এর মধ্যে কোন অলৌকিক কাণ্ড নেই, এটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশল, অর্থাৎ টেকনোলজি। যন্ত্র! কোথায়?—শশাঙ্কনাথ ঘরের এদিক-সেদিক তাকান। এঘরে নেই, পাশের ঘরে।—জানালেন প্রিয়রঞ্জন। এই ঘরে আছে শুধু একটা অ্যানটেনা। এই অ্যানটেনার সঙ্গে যন্ত্রের বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ আছে। আনটেনা চিন্তাতরঙ্গগুচ্ছকে গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেয়া হয়ে।

এ ঘরে কোথায় অ্যানটেনা?

শশাঙ্কনাথের কৌতূহলী দৃষ্টি খুজতে থাকে চারধার।

লুকোনো আছে তোমার চেয়ারের পিছনে ল্যাম্পসেডের ভিতরে। আর ওই যে অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখছিস, ওর মধ্যে একটা বাস্ব জ্বলছে। নজর করলে দেখতিস, যখন তই প্রথমবার কফি খাচ্ছিলি, তখন আর একটা ছোট্ট বা জ্বলে উঠেছিল ওর মধ্যে। অ্যাকোয়ারিয়ামের পিছনে একটা সুইচ আছে। আমি ঘুরতে ঘুরতে সুইচটা অন করে দিয়েছিলাম। তারপর আকোয়ারিয়ামের দ্বিতীয় বাটা ভুলে ওঠা মাত্রকলাম, অ্যানটেনা মারফত তোর চিন্তাতরঙ্গ আমার যন্ত্র ধরতে পেরেছে। অসংখ্য মানুষের চিন্তাতরঙ্গের প্রকৃতিও বহুরকম। সবরকম সেরিব্রাল ওয়েভকে ধরার মতো বিদ্যে এখনও আমার হয়নি। যদি কারও চিন্তাতরঙ্গ আমার যন্ত্রে ধরা পড়ে, তার অটোম্যাটিক সিগনাল দেয় ওই অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে লুকোনো বা। এখন সুইচ অফ করে দিয়েছি ভিতর থেকে, তাই বাল্বটা জ্বলছে না।

—আমার চিন্তা তুই জানলি কী করে এখানে বসে?

এখানে বসে নয়, ভিতরে গিয়ে আমার যন্ত্রের কাছ থেকে জেনেছি। তাই তো তোকে বসিয়ে রাখলাম এতক্ষণ। তোকে চিন্তা করার সুযোগ দিলাম। আর সেই চিন্তা চুরি করে জেনে নিলাম আমি।

—একবার তোর যন্ত্রটা দেখাবি ভাই? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

—আপত্তির কী আছে? চল ও ঘরে।

পরের অংশ পড়ুন এখান থেকে।

১০।প্রতিশোধ১২। খাতা চুরি রহস্য

মন কথা কয়না   অজেয় রায়

চার

প্রিয়রঞ্জন ও শশাঙ্কনাথ ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে পাশেই আর একটা বড় ঘরে প্রবেশ করলেন। এ-ই আমার চিন্তা-গ্রাহক যন্ত্র।-দেখালেন প্রিয়রঞ্জন।

শশাঙ্কনাথ একবার ম্যাসেঞ্জার জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমে ঢুকেছিলেন। ঘরের মাঝখানে যন্ত্রটা যেন তারই ছোট সংস্করণ। ক্যাবিনেটের মতো দেখতে, প্রায় মানুষ সমান উচু, হাত দুই চওড়া, সাত-আট ফুট লম্বা ধাতু ও প্লাস্টিকের আবরণে তৈরি যন্ত্রটা। তাতে প্রচুর খোপ-খোপ। খোপগুলি কোনোটি কাচে ঢাকা, কোনোটি বা ভোলা। প্রত্যেকটি খোপের ভিতর সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি। বিচিত্র তাদের গড়ন, ডায়াল, মিটার, ছোট ছোট বাথ, মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য বৈদ্যুতিক তার এক অংশের সঙ্গে অন্য যন্ত্রাংশের সংযোগ ঘটাচ্ছে। এ

ছাড়া ঘরের কোণে দুটি বড় বড় লোহার বাম, তাতে লাগানো মোটা মোটা পাচালো নল ও তার। ঘরের ছাদে ও দেওয়ালের গায়েও অদ্ভুত

তর কিছু যন্ত্র। তাদের গা থেকে বৈদ্যুতিক তার এসে যুক্ত হয়েছে প্রধান যন্ত্রের সঙ্গে। গোটা ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ঘরের তিনটে জানালা পুরু কাচের শাশি-বন্ধ। উফল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে ঘরে।

শশাঙ্কনাথ চিন্তাগ্রাহক যন্ত্রের চারপাশে বারকয়েক পাক খেলেন। দেওয়াল ও ছাদে ঘর ঘুরিয়ে দেখলেন এবং বিয়ের মতো মাথা দুলিয়ে আওয়াজ ছাড়লেন— হুম!” অতঃপর তিনি যন্ত্রের একটা অংশের দিকে ভীষণ ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন কোনো খুত আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো একটা স্টিলের আলমারি খুলে টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেটের মতো ছোট্ট একটা বাক্স বের করলেন প্রিয়রঞ্জন। সেটা দেখিয়ে বললেন, শশা দেখ, এর মধ্যে বন্দি হয়ে আছে তোর মিনিট পনেরো চিন্তা। শশাঙ্ক অবাক হয়ে বললেন, কী করে? কী এটা?

—এক বিশেষ ধরনের টেপ এটা। যেমন গান বা কথার ধ্বনি টেপে রেকর্ড করা হয়, এও প্রায় সেই ব্যবস্থা। কী, পরখ করে দেখবি নাকি নিজে? মনে আছে কী ভাবছিলি তখন?

ঠিক-ঠিক মনে নেই। দেখি একবার। শশাঙ্কনাথের মনে দারুণ কৌতূহল। বোস এই চেয়ারটায়।

—নির্দেশ দিলেন প্রিয়রঞ্জন। শশাঙ্কনাথ বসলেন। প্রিয়রঞ্জন একটা ধাতু-নির্মিত হেলমেটের মতো জিনিস আলমারি থেকে বের করে পরিয়ে দিলেন তার মাথায়। হেলমেটটায় কয়েকটি সরু সরু শিং। এই শিংগুলি বৈদ্যুতিক 'তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল টেবিলে রাখা এক বাক্সের সঙ্গে।

লাগবে না তো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন শশাঙ্কনাথ।

না না, কোনো ভয় নেই! —আশ্বাস দিলেন প্রিয়রঞ্জন

—শুধু একটু শির শির করবে মাথার ভিতর। মনে হবে, কেউ যেন ফিসফিস করছে নিঃশব্দে।

ক্যাসেটটা ওই বাক্সের এক খোপে সাবধানে বসিয়ে দিলেন প্রিয়রঞ্জন। আরও কিছু যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করলেন। তারপর একটা সুইচ টিপলেন। বললেন শশাঙ্ক, চোখ বুজে লে। তাতে মনঃসংযোগ করতে সুবিধা হবে।

মৌমাছির গুঞ্জনের মতো অতি মৃদু ধ্বনি জাগল ঘরে।

চোখ টিপে কাঠ হয়ে আছেন শশাঙ্কনাথ। কিন্তু তার মনে যে বিষম উত্তেজনা হচ্ছে, তা বোঝা যায় দু'মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন চেয়ারের হাতল, মুখ হাঁ, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। খট!

পাঁচ মিনিট পরে সুইচ অফ করে দিলেন প্রিয়রঞ্জনের গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গেল। বিস্ফারিত। চোখ খুলে শশাঙ্কনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন—ওয়ানডারফুল! ম্যাজিক! ভেলকি। প্রিয়, তুই একটা জিনিয়াস! উঃ, সব মনে পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখন যা-যা ভেবেছিলাম। এমনকী সেই গোল দেওয়ার সিনটা অবধি দেখলাম অবিকল। হঠাৎ ফুটবল খেলার কথা তখন মনে এল কেন?

=প্রিয়রঞ্জন বেশ অবাক হয়ে বললেন, আর দেখ, প্লেয়ারগুলো যেন, মনে হচ্ছিল আমার খুব চেনা-চেনা। মানে তোকে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে আমি যখন টেপ চালিয়ে তোর চিন্তাকে আমার মগজে চালান করে দেখছিলাম, তখনকার কথা বলছি।

হবেই তো চেনা!—শশাঙ্কনাথ উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেন, ওটা হচ্ছে ইন্টার-ক্লাস ফাইনালে আমাদের ক্লাস টেন-এর সঙ্গে নাইনের খেলার দৃশ্য। সব তোর চেনা ছেলে। আমি ওদের হাফকে কাটিয়ে ঘু দিলাম, আর লেফট ইন বঙ্কা, সেই যে, আমাদের সেশনে পড়ত রে, চমৎকার প্লেস করে গোল দিয়ে দিল সেই সিনটা! জিজ্ঞেস করছিলি, হঠাৎ ফুটবল খেলার কথা আমার মনে এল কেন? আরে, খানিক চেয়ারে বলে তোর জন্য অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি, পাশের মাঠে কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে। অমনি আমার সেই পাস আর বঞ্চার গোল দেওয়ার সিনটা আমার মনে একেবারে স্পষ্ট ভেসে উঠল। ও, তুই, বুঝি এইভাবে আমার ওই সময়ের চিন্তা চুরি

করে জেনে নিয়েছিস।

হ্যাঁ, এ হচ্ছে চিন্তা চুরির একটা উপায়।—বললেন প্রিয়রঞ্জন। প্রথমে চিন্তাতরঙ্গকে অ্যানটেনার সাহায্যে রিসিভ করে তাকে বিশেষ ধরনের ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করা হয়। এরপর ফের সেই টেপ থেকে তাকে ইলেকট্রিকাল ইম্পালস-এ ও থট ওয়েতে রূপান্তরিত করা যায়। টেপে সংগ্রহ করা কারও চিন্তাতরঙ্গ অন্যজনের মগজে চালান করা হয় এইভাবে ইলেকট্রোড-এর সাহায্যে। আর একজনের চিন্তা অন্যজনের মগজে যাতে গ্রহণ করতে পারে, সেইমতো চিন্তারদের ফ্রিকোয়েনসি বা কম্পনাঙ্ককে অদল-বদল করে দেওয়া হয়। এ-ই হচ্ছে সবচেয়ে সোজা এবং দ্রুত চিন্তা চুরির উপায়।

এছাড়াও আমি এমন উপায় আবিষ্কার করতে পারব মনে করছি, একটু থেমে আবার বলেন প্রিয়রঞ্জন, যাতে কারও নিঃশব্দ ভাবনা অন্যে শুনতে পাবে বা তার মনে-মনে-দেখা ছবি অন্য লোকে সিনেমার মতো পর্দায় দেখতে পারবে। অবশ্য এই দুটি উপায় খরচসাপেক্ষ, আর এ নিয়ে আমার গবেষণা এখনও খুব বেশি দূর এগোয়নি। তবে

ভবিষ্যতে, আশা করছি, পারব।

আঁ, বলিস কী!—শশাঙ্কনাথের চক্ষু ছানাবড়া।

—আসলে মূল সূত্রটা সব জায়গাতেই এক। এনার্জি বা শক্তির রূপান্তরের ওপরই সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তার সময় আমরা হয় মনে মনে নিঃশব্দে কথা বলি কিংবা কোনো ছবি দেখি। এই দু'টি কাজের সময় মস্তিষ্ক-পেশির সঞ্চালনের ফলে তৈরি হয় চিন্তাতরঙ্গ। একবার যখন এই তরঙ্গকে ধরতে পেরেছি, তখন নিঃশব্দ ভাবনাকে সাউন্ড এনার্জিতে বা মনে-মনে-দেখা দৃশ্যকে ভিডিও টেপে ধরে লাইট এনার্জিতে রূপান্তর করা অসম্ভব হবে না। তবে সময় লাগবে।

আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাব, আমার নিঃশব্দ চিন্তাকে যদি সশব্দ করতে পারিস?—জিজ্ঞেস করলেন শশাঙ্কনাথ।

তা বোধহয় পারব না! -হেসে বললেন প্রিয়রন, সশব্দ চিন্তার ধ্বনি হবে মেশিনের ধাতব শব্দ, কোনো মানুষের গলার আওয়াজ নয়।

উঃ, এ যে ভীষণ ব্যাপার। শশাঙ্কনাথ উত্তেজনার চোটে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন।

হাঁ, বিষয়টা খুবই জটিল।—উত্তর দিলেন প্রিয়রঞ্জন

—পৃথিবীতে মাত্র গুটি কয়েক বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে গবেষণা করছেন। এর পিছনে আমি বহু বছর পরিশ্রম করেছি। আরও কত দিন করতে হবে জানি না।

আচ্ছা, এই যন্ত্র আমাদের কী কাজে লাগবে ভেবেছিস?—প্রশ্নটা করে শশাঙ্কনাথ একই অগ্রত হলেন।

নিশ্চয়ই।—বললেন প্রিয়রঞ্জন, আমার এই আবিষ্কার মানব সমাজে বিপ্লব ঘটাবে। আমার যন্ত্র বহু ক্রিমিনালের দুষিত চিন্তাকে আগেভাগে জেনে ফেলবে, অনেক পাষণ্ড রাজনীতিবিদের মনের গোপন অভিলাষ ধরে ফেলবে। শান্তিপ্রিয় সং মানুষকে সতর্ক করে দেবে। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধ্বংস, হত্যা, ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

বলতে বলতে প্রিয়রঞ্জন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তা বটে তা বটে। সায় দিলেন শশাঙ্কনাথ। আচ্ছা, এর জন্যে তো অনেক জিনিসপত্র, মানে যন্ত্রপাতি দরকার?- ঘরের মাঝে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন শশাঙ্কনাথ।

—নিশ্চয়ই। অনেক সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লাগে। সবই প্রায় আমার উদ্ভাবন, তৈরি করিয়ে নিতে হচ্ছে।

—এসব জিনিস পেতে এখানে অসুবিধে হয় না?

হয়। নানা জায়গা থেকে অর্ডার দিয়ে পার্টসগুলো তৈরি করাই। সব সময় ঠিক পছন্দসই হয় না, বার বার ভুল করে। এক জায়গা থেকে বেশি জিনিস করাই না, কী জানি, যদি কারও মনে সন্দেহ হয়, আমার রিসার্চ জানতে গুপ্তচর লাগে।

—তা তুই কানাড়া ছাড়লি কেন? ওসব দেশে, শুনেছি, এমন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি অনেক ভালো তৈরি করে। রিসার্চের সুবিধে বেশি।

প্রিয়রঞ্জন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ছাড়লাম বাধ্য হয়ে। কারণ ওখানে পিছনে লোক লেগেছিল। ওখানে আরও একজন বৈজ্ঞানিক ঠিক এই বিষয়

নিয়েই গবেষণা করছে। সে বোধহয় আমার রিসার্চের সাফল্যের কথা কিছু টের পেয়েছিল। দু-দু'বার আমার রিসার্চ পেপারস ও মেশিনের ডিজাইন চুরি করার চেষ্টা হয়। তখন বাধ্য হয়ে আমি ওদেশ ছাড়ি।

—কিন্তু এদেশে কি তোর রিসার্চের গুপ্তরহস্য চুরি যাওয়ার ভয় নেই?

—নেই বলা উচিত নয়। সে ভয় সবসময়ই আছে। তবু এখানে আমি অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ এই কাজ করছেন এমন বৈজ্ঞানিক এদেশে কেউ নেই। কাজেই আমার গবেষণা সম্বন্ধে এখানে কারও বিশেষ কৌতুহল হবে না।

—কিন্তু তোর বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বী যদি তোকে এখানে ফলো করে আসে? প্রিয়রঞ্জনের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যদি নয়, সত্যিই সে আমায় ফলো করেছে।

থ। তার নাম ডক্টর আয়ার। জন্মসূত্রে ভারতীয়, তবে এখন পাকাপাকিভাবে বিদেশে থাকে। ভীষণ ধূর্ত লোক। ওর ইচ্ছে ছিল, আমার সঙ্গে একসঙ্গে এ বিষয়ে রিসার্চ করবে।

আমি রাজি হইনি। খুব চটেছিল তাই। পিলু আয়ার গত হপ্তায় কলকাতায় এসেছে। খোঁজ নিয়ে ঠিক বের করেছে আমার খবর। অফিসে এসেছিল দেখা করতে। বলল, "তিন মাসের জন্যে ভারতে এসেছি টাটা ইন্সটিটিউটে একটা কাজ নিয়ে। আর কলকাতায় সে এসেছে নাকি এর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এটা-সেটা কথার পর আয়ার জানতে চাইল আমি সেই পুরনো রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছি কিনা। সাফ না বলে দিলাম। ওর মুখ দেখে মনে হল, ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

–ডেনজারাস! প্রিয়, তুই এখান থেকে সরে পড়ে অন্য কোথাও গা-চাল দে।

-এখন আর তা সম্ভব নয়। যন্ত্র ফিট করে ফেলেছি। তাছাড়া একটা চাকরিও চাই পেট চালাতে। তবে সাবধানে থাকতে হবে। অবশ্য এখানে আমার খুব সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।

তুই কি এইসব কাজ একা-একা করিস?—জিজ্ঞাসা করলেন শশাঙ্কনাথ।

-না, দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে।

-ওই যে দেখলাম একটা হেলেকে, কালো মতো লম্বা করে, ও?

-হ্যা, ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, নাম সমীর কর। ফিজিক্সে এমএসসি। আর একজন আছে বিশু, মানে, বিশ্বম্ভর রক্ষিত। স্কুল ফাইনাল পাশ। তবে রেডিও, ওয়্যারলেস ইত্যাদি যন্ত্র সম্বন্ধে চমৎকার মাথা! ওরা অন্য কাজও করে, অবসর সময়ে আমায় সাহায্য করে। সমীর একটা কলেজের লেকচারার, আর বিশু রেডিও মেরামত করে রোজগার করে। দুজনকেই এখানে থাকবার ঘর দিয়েছি, কারণ সন্ধেবেলা আর রাতে আমি মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে কাজ করি। ফলে সেসব রাতে ওদের এখানে থাকতে হয়।

ওরা বিশ্বাসী তো?

-মনে তো হয়।

ওরা এই যন্ত্র চালাতে পারে?

—পারে। আমার নিজের প্রয়োজনেই শিখিয়েছি।

—যদি ওরা বিট্রে করে, ফাস করে দেয় তোর রিসার্চের কথা? যন্ত্র আবিষ্কারের কথা?

—এই রিসার্চের আসল রহস্য ওরা বাস করতে পারবে না, বড় জোর বিষয়টা ফাস করে দিতে পারে। এই যন্ত্রের বা রিসার্চের মূল সূত্রগুলি আমি ওদের জানতে দিইনি।

তবু ...খুতখুত করে শশাঙ্কনাথ। প্রিয়রঞ্জন বললেন, তুই তো রেডিও চালাতে-বন্ধ করতে পারিস, কিন্তু রেডিও কী ভাবে বাজছে তার রহস্য জানিস?

—ঘাড় নাড়লেন শশাঙ্কনাথ।

–ওদের অবস্থাও তা-ই। তাছাড়া ওরা প্রতিজ্ঞা করেছে, এই রিসার্চের খবর কাউকে জানাবে না। আর আমি কথা দিয়েছি, আমায় সন্তুষ্ট করতে পারলে প্রতিদান-স্বপ ভবিষ্যতে ওদের ভালো চাকরি জোগাড় করে দেব, প্রচুর পুরস্কারও দেব। সুতরাং আমার রিসার্চের বিষয় মাস করে ওদের লোকসান বই লাভ নেই।

—কিন্তু ডঃ আয়ার?

হুঁ। প্রিয়রঞ্জন কেমন অন্যমনস্ক হলেন। বুজা গেল, আয়ার সম্বন্ধে একটা দুশ্চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে।

হাতের ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শশাঙ্কনাথ-এবার চলি। উঃ, দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হল! কিন্তু ভাই, আর আমি এখানে আসছি নে। কেন? প্রিয়রঞ্জন অবাক।

-মানে, এলেও তোর এই ড্রইংরুমে বসছি নে। কখন যন্ত্র চালিয়ে আমার মনের সব গোপন চিন্তা-চুরি করে জেনে নিবিঃ ডেনজারাস।

-বেশ, ওঘরে বসিসনি, অন্য ঘরে বসাব তোকে। কিন্তু আসিস মাঝে মাঝে। শনিবার সন্ধেটা সাধারণত কাজ করি না, বিশ্রাম নিই। বড় খাটুনি। একঘেয়ে কাটে। একটু আড়া মাৱলে ফ্রেশ লাগবে।

প্যাসেজ দিয়ে বাইরে হাঁটতে হাঁটতে শশাঙ্কনাথ বললেন, প্রিয়, আর কেউ যদি তোর খবর জানতে চায়, তোদর ঠিকানা চায়, কী করব? বলব, না, চেপে যাব? বন্ধু-বান্ধব কখনও কখনও তোর খোঁজ করে আমার গছে।

একটু ভাবলেন প্রিয়রঞ্জন। তারপর বললেন, “একেবারে জানি নে বলা ঠিক হবে না। মিথ্যে বলছিস জানাতে পারলে সন্দেহ হবে। নিজে থেকে কাউকে আমার কথা জানানোর দরকার নেই। তবে কেউ যদি টের পায়, আমি এখানে আছি, জিজ্ঞেস করে আমার কথা, বলিস আমি ফিরে এসেছি, রেমন্ড কোম্পানিতে চাকরি করছি। ঠিকানা জানতে চাইলে দিতে পারিস। তবে বলবি, বেজায় ব্যস্ত থাকি চাকরি নিয়ে, বাড়িতে প্রায় থাকিই না। তবে আমার এই রিসার্চের খবর যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না টের পায়।

হা হা, সে আর বলতে। প্রিয়রঞ্জন বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারের সিটে জাকিয়ে বসেছেন। শশাঙ্কনাথ! প্রিয়রঞ্জন বললেন, চীনে রান্নার মশলার কথা ভুলিসনি যেন। কিনে নিয়ে যাস।

চমকে শশাঙ্কনাথ বললেন, রাইট! ঠিক বলেছিস। ফের ভুলে গেছলাম।

প্রিয়রঞ্জন হেসে বললেন, দেখ তবে প্রমাণ হয়ে গেল আমার চিন্তা-চুরি যড় কেমন কাজের। নইলে তোর বউয়ের ফরমাশ জানতে পারতাম না, মনে করিয়েও দিতাম না। আর তুই বাড়িতে গিয়ে বকুনি মেসি।

সত্যি ভাই, আজব কল বানিয়েছিস বটে। প্রশংসায় গদগদ শশাঙ্কনাথ মোটরে স্টার্ট দিলেন।

পাঁচ

মিত্রভবনের একতলায় একটি মাঝারি ঘর। ঘরের মধ্যে একটি সিঙ্গল খাটে পাতা বিছানা, বেডকভার দিয়ে ঢাকা। ঘরের কোণে পড়ার টেবিল ও সামনে একটা চেয়ার। টেবিলে বই, একটা বিদেশি ক্যালকুলেটিং মেশিন, বড় সাইজের একটা খাতা খোলা অবস্থায় রয়েছে। এই ঘরের বাসিন্দা প্রিয়রঞ্জনের সহকারী সমীর কর!

সমীর ঘরেই রয়েছে। সে অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে ঘরের ফাঁক জায়গাটুকুতে আর নিজের মনে বিড় বিড় করে বকছে। তার চোখে মুখে চাপা উত্তেজনার টকটক! বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল।

চমকে স্থির হল সমীর। প্রশ্ন করল, কে?

আমি। স্যার! তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে দরজার কপাট ফাক করল সমীর। আজ এত ভোরে উঠেছেন প্রিয়রঞ্জন, কী ব্যাপার?

প্রিয়রঞ্জন ঘরে ঢুকলেন। পরনে পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক, হাতে ব্রিফকেস। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তিনি কৌতুহলী সুরে বললেন, ব্যাপার কথা বলছিলে কার সঙ্গে? আঙো, কেউ না। সমীর লজ্জা পেল।

বুঝেছি, নিজের মনে বকছিলে দেখে নেব', 'আর বেশিদিন নয়''

এসব কথার মানে? সমীর ঢোক গেলে। ঘামতে থাকে। একটু সামলে নিয়ে বলে, আরে, এ আমার এক বদভ্যাস। স্টুডেন্ট লাইফে অনেক থিয়েটার করেছি। কাজ করতে করতে একঘেয়ে লাগলে নিজের মনে নাটকের ডায়ালগ আওড়াই।।

প্রিয়রঞ্জন স্ত্রী চোখে সমীরকে লক্ষ করলেন। বললেন, তোমায় বড় শুকনো দেখাচ্ছে। ঘুম হয়েছিল রাতে?

—আজ্ঞে, একটু রাত হয়ে গিয়েছিল শুতে। বই পড়তে পড়তে...

—আমার ক্যালকুলেশন কদুর ?

—প্রায় হয়ে গিয়েছে, কাল পেয়ে যাবেন।

—গুড! কিন্তু বেশি স্ট্রেইন কোরো না। ভালো কথা, কাল রাতে তুমি মেশিনঘরে গিয়েছিলে কেন? কী করছিলে?

এবার সমীর রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়ে। ঢোক গিয়ে উত্তর দিল, হঠাৎ একটা এক্সপেরিমেন্ট মাথায় এল। খুব দ্রুত চিন্তা রেকর্ড করে সেটা ধীরে ধীরে ট্রান্সমিট করা যায় কিনা পরীক্ষা করছিলাম।

—হু। কাল একজনকে এনেছিলে এ বাড়ি। থট রিডিং করতে নাকি?

—হ্যা স্যার, ইচ্ছে ছিল তা-ই।

—পারলে? আজ্ঞে না-হতাশভাবে উত্তর দিল সমীর।

—বিশু ফিরেছে বাড়ি থেকে?

-জানি না ঠিক। কাল ওর ঘর বন্ধ দেখলাম। ও ফিরলে বলবে, শীঘ্রই ওকে একবার বাঙ্গালোর পাঠাব, যেন তৈরি থাকে। ভারত

ইলেকট্রনিয়ে কয়েকটা কাপলিং আর ভ্যাকুয়াম টিউবের অর্ডার দিয়েছি। ওকে ডিজাইন মিলিয়ে টেস্ট করে আনতে হবে। আর ওকে বলবে চটপট কিছু স্যাম্পল কেস নিতে। এই আশপাশের লোক ডেকে এনে তাদের সেরিব্রাল ওয়েভ রেকর্ড করার চেষ্টা করুক। ওর বেশ চেনা-শোনা আছে এ পাড়ায়। তোমার তো নেই!

আরে না।

হু। দূর থেকে লোক ডেকে আনা বাজে সময় নষ্ট। এ ব্যাপারে তোমার-আমার চেয়ে বিই বেশি কাজের। আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে বড় বড় গ্যাপ থেকে

যাচ্ছে। প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট না হলে মানুষের চিন্তাতরঙ্গের রেঞ্জটা ঠিক বোঝা যাবে না। টেপগুলো যত্ন করে রেখে দেবে। আমি সময় পেলেই শুনব।

বেশ, বলে দেব বিকে। প্রিয়রঞ্জনের কথাবার্তা ভিন্ন পথ ধরতে সমীর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—আর শোন,আমি দমদম এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। আমার এক পরিচিত সায়ানটিস্টের। আসার কথা, দেখা করব। হয়তো ওকে সঙ্গে নিয়েও আসতে পারি। লাঞ্চ রেডি লেখো।

দরজার দিকে ফিরে ফের ঘুরে দাঁড়ালেন প্রিয়রঞ্জন—সমীর, একটা কথা। যদি কোনো নতুন এক্সপেরিমেন্টের আইডিয়া তোমার মাথায় আসে, আগে আমাকে বলবে। প্রয়োজন মনে হলে আমি নিয়ে পরীক্ষা করব। অবশ্য তুমিও থাকবে সঙ্গে। কিন্তু আমার অজান্তে মেশিনে কোনো নতুন পরীক্ষা কোরো না, মেশিনের ক্ষতি হতে পারে। এই যন্ত্রের অনেক বিঃ তোমরা জানো না।

কথাগুলো যেন একটু কড়া সুরেই বললেন প্রিয়রঞ্জন। সমীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। প্রিয়রঞ্জন ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রিয়রঞ্জনের জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেলে সমীর অবজ্ঞাভরে বলে উঠল, হু, জানি। যন্ত্রের অনেক কিছুই জানি না। আপনি ভুল করেছেন ডক্টর প্রিয়রঞ্জন। আমি অনেক কিছুই জানি। কারণ জানাটা আমার প্রয়োজন। আরও—আরও যন্ত্রকে কমপ্লিট করতে হবে। আপনার খ্যাতিকে দ্রুত করার জন্যে নয় স্যার, দরকারটা আমার নিজস্ব। অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, আর নয়।

ঠিক এই সময় গ্যারাজের দিকে যেতে যেতে প্রিয়রঞ্জন ভাবছেন, সমীরের কেমন পরিবর্তন দেখছি। কেমন নার্ভাস টেনশনে ভুগছে মনে হয়। আমার কাজ অবশ্য চমৎকার করছে। ভীষণ খাটে। তবু কোথায় যেন গন্ডগোল।

বিশাল জাম্বো জেট প্লেন প্রচণ্ড শব্দে দমদম বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করল। খানিক বাদে যাত্রীর ভিড় লাউঞ্জে ঢুকতে লাগল।

ওয়েলকাম প্রফেসর রজার্স—এক যাত্রীর সামনে এসে অভিবাদন জানালেন। প্রিয়রঞ্জন।

প্রসের রজার্স ছোটখাটো মানুষ। শান্ত, সুন্দর হাসি-হাসি মুখ। পুরু কাচের চশমার পিছনে প্রশান্ত নীল চোখ। মাথাভরা ধবধবে কেশরাশি হাওয়ায় এলোমেলো। চিবুকে একগুচ্ছ শ্বেত শ্মশ্রু। হাতে একটি সুটকেস নিয়ে নিজের মনে এগোচ্ছিলেন তিনি, ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রিয়ার প্রনকে দেখে সোচ্ছাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো রয়, তুমি এসেছ! আমি দারুণ খুশি হয়েছি। সত্যি বলতে কি, তোমায় আমি এক্সপেক্ট করছিলাম।

কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছে। প্রফেসর রজার্সের ইংরেজিতে অবশ্য একটা অদ্ভুত টান। আসলে হাঙ্গেরির লোক তো, এখন সুইজারল্যান্ডবাসী।

এক্সপেক্ট করছিলেন বুঝি? কিন্তু কই, আমার খোঁজ করলেন না তো! যেমন সোজা এগোচ্ছিলেন!

ওঃ হো! রজার্স বালকের মতো হাসলেন—যখন কাস্টমস চেকিংয়ের জন্যে বাসে আছি, তখন একটা প্রবলেম এল যে মাথায়! সেইটে ভাবতে ভাবতে..

হাসলেন প্রিয়রঞ্জন। সে হাসিতে যুগপৎ কৌতুক ও শ্রদ্ধা। বামভোলা ঋষিতুলা মানুষ এই রজার্স। সর্বদা নিজের চিন্তায় ডুবে আছেন।

তারপর তুমি কেমন আছ, রয়? কী করছ? হঠাৎ চলে এলে কেন কানাডা থেকে? —রজাস প্রশ্ন করলেন।

এই সময় একটি যুবক এসে সামনে দাঁড়াল। ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, আপনি প্রফেসর রজার্স?

হা।—উত্তর দিলেন রজার্স।

আমি সায়ান্স ইন্সটিটিউট থেকে আসছি, আপনাকে নিতে এসেছি। গাড়ি এনেছি। একটু দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন। পথে গাড়ি থারাপ হয়েছিল।

স্যার, চলুন না আমার বাড়িতে, লাঞ্চ করবেন। প্রিয়রঞ্জন অনুরোধ জানালেন।

—না, এখন ইন্সটিটিউটে যাই। বিকেল তিনটেয় আমার বক্তৃতা। তুমি এসো ইন্সটিটিউট। লেকচারের পর আড্ডা দেওয়া যাবে। কাল সকালেই যেতে হবে কলম্ব। খুব ভোরের ফ্লাইটে।

প্রিয়রন ভাবলেন, বক্তৃতার পর রজার্সকে একা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, তখন কি আর ওঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে? তিনি বললেন, স্যার, আপনাকে একবার আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

—বাড়ি? সময় হবে কি? খুব জরুরি দরকার নাকি? —হ্যা স্যার।

—বেশ, কারণটা শুনি, তারপর বিচার করব। | প্রিয়রঞ্জন সায়ান্স ইন্সটিটিউট থেকে আসা যুবকের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে বললেন, স্যার, আমরা যদি একটু প্রাইভেটলি কথা বলি..

বেশ, বেশ।—রজার্স অপেক্ষমাণ যুবককে বললেন, ইয়ংম্যান, তুমি একটু অপেক্ষা করো গাড়িতে। আমি আসছি।

রজার্স ও প্রিয়রঞ্জন লাউঞ্জের এককোণে নিরিবিলিতে গিয়ে বসলেন। * বলো কেন বাড়ি নিয়ে যেতে চাও—জিজ্ঞেস করলেন রজার্স।

-স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখতে চাই। কী জিনিস?

—আমার আবিষ্কার, একটা যন্ত্র।

যন্ত্র? কীসের?

সেই আমি যা নিয়ে রিসার্চ করছিলাম।

-ওঃ, সেই থট-ক্যাচিং মেশিন।

–হ্যা, স্যার। আমি যন্ত্রটা বানিয়ে ফেলেছি। অনেকটা সফল হয়েছি। আপনাকে দেখতে চাই। সফল হয়েছ মানে?—রজার্স খাড়া হয়ে বসলেন।

-মানে, কিছু-কিছু চিন্তাতরঙ্গ আমি রেকর্ড করতে পেরেছি। তবে কয়েক জায়গায় ঠেকে যাচ্ছি। সে সম্বন্ধে আপনার উপদেশ চাই, কারণ রেডিও ফিজিক্সে আপনার চেয়ে বড় এক্সপার্ট আর কেউ নেই।

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন রজার্স। চিবুকের দাড়িতে আঙুল বোলাতে বোলাতে বিষ গলায় বললেন, রয়, তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে, আমার সহকর্মী ছিলে। তোমার

প্রতিভা, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার খুবই উঁচু আশা! আমার উপদেশ তুমি শুনবে?

—নিশ্চয়ই শুনব। বলুন স্যার।

এ লাইনে রিসার্চ সম্বন্ধে আমি আগেও তোমায় নিরুৎসাহ করেছি, আবার আজ বলছি, আমার উপদেশ, আমার আদেশ, আমার অনুরোধ: এই গবেষণা তুমি বন্ধ করো। এ যন্ত্র তুমি বানিও না।

—স্যার, আপনি এর কেবল মন্দ দিকটাই দেখছেন। ঠিকমতো ব্যবহার করলে এই আবিষ্কার মানুষের সমাজে বিপ্লব আনবে। ঠিকমতো ব্যবহার।শান্তকণ্ঠে বললেন রজার্স, রয় তোমার এই শর্তটা বড় কঠিন। —আপনি আগেই হতাশ হচ্ছেন।

কারণ সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। বার বার প্রমাণিত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ঠিকমতো ব্যবহার করা হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রাণপাত করে আবিষ্কার করে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করে অন্য লোক। আর সেই লোকগুলো যে ভালো হবে, এমন গ্যারান্টি কই? নিউক্লিয়ার পাওয়ারের আবিষ্কারকরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, এই গবেষণার ফল হবে। এমন মারাত্মক, তৈরি হবে নিউক্লিয়ার বম্ব? আইনস্টাইন- রাদারফোর্ডরা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন তাঁদের গবেষণার পরিণতি দেখে। একবার আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তা বৈজ্ঞানিকের মুঠোর বাইরে চলে যায়। তার ইচ্ছে, তার উদ্দেশ্য কি আর মানে কেউ? তাই বলছি, এখনও সাবধান হও।

প্রিয়রঞ্জন নতমুখে চুপ করে রইলেন।

রজার্স উত্তেজিতভাবে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, এই গবেষণার জন্যে তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে।

-কেন?

-বুঝছ না? গুপ্তচর বৃত্তির এমন হাতিয়ার দখল করার লোভে সমস্ত পৃথিবী হন্যে হয়ে উঠবে, দেশি-বিদেশি কত লোক, কত রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা ছলে-বলে তোমার কাছ থেকে এই কৌশল ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। তাই বলছিলাম, তুমি

অন্য গবেষণায় মন দাও। তাতে যদি আমার সাহায্য লাগে, আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দেব।

আমি যে অনেকদূর এগিয়েছি!

-করুণ সুরে বললেন প্রিয়রঞ্জন। প্রিয়রনের অবস্থা দেখে ভরা রজার্সের কষ্ট হল। তিনি প্রিয়রঞ্জনের পিঠে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন, রয়, আমার থাই যে সত্যি হবে, তা হয়তো নয়।তুমি আরও ভাব, নিজে বিচার করো, তারপর কর্তব্য স্থির করে। অনেক মানুষের পক্ষে বিষ, আবার তা-ই দিয়েই ওষুধও তৈরি হয়। বিষ বলে তার উৎপাদন বন্ধ হয়নি। সুতরাং ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। এখন বিচার্য: কার শক্তি বড় হয়ে উঠবে? সেটা তুমিই ঠিক করো। তুমি বুদ্ধিমান, ঠিক সিদ্ধান্তেই পৌছবে। আজ উঠি। লেগারে এসো। মাইক্রোওয়েভ সম্বন্ধে একটা নতুন জিনিস আলোচনা করব।

অত্যন্ত হতাশা মনে রজার্সকে বিদায় জানালেন প্রিয়রঞ্জন। বুঝলেন, তার এই আবিষ্কারে প্রফেসর রজার্সের প্রবল আপত্তি বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ছয়

মিত্রভবনের মেশিনঘর।

উজ্জ্বল বাতির আলোয় কুঁকে পড়ে একটি ছোট্ট যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করছেন ডক্টর প্রিয়রঞ্জন।

খট-খট! দরজায় টোকা পড়ল।

—আজ্ঞে, আমি বিশু।

এসো, ভেতরে এসো। ভেজানো কপাট ঠেলে ঢুকল এক যুবক। রোগা, ফরসা, পাকানো চেহারা, হাড়-বেরকরা মুখ। সক ছাঁটা শৌখিন গোফ। পরনে শার্ট-প্যান্ট। যুবকের হাবভাব চটপটে। চোখদুটি ক্ষুদ্র এবং চল।। | বোসা। জাস্ট এ মিনিট।-ড্রাইভার দিয়ে একটি স্ক্রু টাইট করতে করতে বললেন। প্রিয়রঞ্জন। বিশু বসল না, বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। কাজ শেষ করে প্রিয়রঞ্জন মুখ তুললেন —তোমায় ডেকেছিলাম।

—হ্যা স্যার।

- কটা টেপ করলে?

—চারটে।

—ট্রাই করেছিলে কটা?

—দুজনকে।

ছ'টার মধ্যে দুটো ব্যর্থ। নট ব্যাড। টেপগুলো বের করো, আমি শুনতে চাই। দেওয়ালের পেরেকে কোলানো একটি চাবি নিয়ে বিশু আলমারি খুলে চারটে ক্যাসেট বের করল। টেপগুলো রাখল প্রিয়রঞ্জনের সামনে।

একটি টেপ তুলে নিয়ে প্রিয়রঞ্জন বালের গায়ে আটকানো লেবেল পড়লেনঃ যুধিষ্ঠির দাস। ভদ্রলোক কে?—তিনি জানতে চাইলেন,

রাস্তার ওপারে লালবাড়ির একতলায় ভাড়া থাকে। পোর্ট কমিশনার্স অপিসের র্ক। আপনি দেখেছেন একে। মাস তিন আগে আপনার কাছে এসেছিল ভাইপোর চাকরির জন্যে দরবার করতে।

—হু, মনে পড়েছে। বেটেখাটো চেহারা। মস্ত সংসার। অভাবী, গোবেচারা লোক।

‘হু—বিশুর ঠোটে চকিতে হাসি ঝিলিক দিল। প্রিয়রঞ্জনের হাতে হেলমেট এগিয়ে দেয় সে। একটা যন্ত্র ফিট খাল টেপটা। হেলমেটের ইলেট্রোডের সঙ্গে যুক্ত তারের শ্লাগ সেই যন্ত্রে লাগাল। প্রিয়রঞ্জন যন্ত্রের গায়ে একটা সুইচ টিপে যুধিষ্ঠির দাসের চিন্তাতরঙ্গ নিজের মস্তিষ্কে গ্রহণ করতে শুরু করলেন। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে গেলেন।

পাঁচ মিনিট পরে চোখ মেললেন তিনি। সুইচ অফ করে দিলেন। বললেন, আরে, এ যে সাংঘাতিক লোক! স্মাগলিং করে। দু-দুটো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে। কত লক্ষ টাকা যেন হিসাব কষছিল। জাহাজ থেকে লুকিয়ে কোকেন পাচার করার মতলব ভাজছিল বসে বসে। কী নাম বললে, যুধিষ্ঠির? বাঃ, সার্থকনামা

ব্যক্তি। এ লোকের সঙ্গে বেশি মিশো না হে, বিপদে পড়বে। নাও আর একটা লাগাও।

যুধিষ্ঠির দাসের টেপ খুলে দ্বিতীয় ক্যাসেট হাতে তুলে নিল বিশু। এর পরিচয় কী?—জানতে চাইলেন প্রিয়রঞ্জন।

—লাল সিং। ড্রাইভার, লরি চালায়। চায়ের দোকানের পাশে গ্যারাজে থাকে। খুব লম্বা-চওড়া শিখ। আপনার মোটর খারাপ হতে ডেকে এনেছিলাম। সেই লোক।

-বাস, লোকটা তো সাক্ষাৎ ডাকাত! দেখা যাক ও কী ভাবে? টেপ রেকর্ডার অন করা হল, প্রিয়রঞ্জন চোখ বুজলেন। মিনিটখানেক পরে চোখ খুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কমলি কে? লাল সিংয়ের মেয়ে।বলল বিশু। ফের চোখ বন্ধ করলেন প্রিয়রঞ্জন। মিনিট পাঁচ-ছয় বাদে তিনি চোখ খুলে টেপ বন্ধ করে দিলেন। গভীর বিস্ময়ে বললেন, আরে, লোকটা অদ্ভুত। বদ্রীনাথে এক সাধুর আশ্রমে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। সংসার ত্যাগ করার ইচ্ছে। আবার কমলির কথাও ভাবে।

—হ্যা স্যার, লোকট খুব সাধু-সন্ন্যাসীর ভক্ত। মাঝে মাঝে ডুব মারে, কোনো তীর্থে গিয়ে কাটিয়ে আসে। বলে, “কেবল কমলির জন্যেই সংসার ছাড়তে পারছি না। কমলির বিয়ে হলেই পাহাড়ে চলে যাব।”

—লাল সিংয়ের বউ আছে?

-না, অনেক দিন মারা গিয়েছে। প্রিয়রঞ্জনের প্রশ্নে বিশু আমতা-আমতা করতে থাকে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, হাত দেখাতে বুঝি? ও ভাগ্য-গণনার কথা চিন্তা করছিল বসে বসে।

–আরে হ্যা। আর কত দিন ওকে সংসারে থাকতে হবে জানতে চাইছিল।

–তোমার এ বিদ্যের চর্চা আছে নাকি?

—সামান্য।

প্রিয়রঞ্জন গম্ভীর হয়ে রইলেন। বোঝা গেল, বিশুর গজে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। বিশু মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, এসব হচ্ছে টোপ। এমনি-এমনি কে আর

ড্রইংরুমে আপনার যন্ত্রের সামনে বসবে? তাই নানা টোপ ফেলে নিয়ে আসি। কেউ আসে বিনি পয়সায় চায়ের লোভে, কেউ হাত দেখাতে চায়। বুঝেছি।-মনের মেঘ টে গেল প্রিয়রঞ্জনের - এবার তিন নম্বর লাগাও।নাম কী? —ভবদুলাল ভট্টাচার্য। এই পাড়ারই লোক। আপনি দেখেননি। প্রিয়রঞ্জন মিনিট পাঁচেক তিন নম্বর টেপের চিন্তাতরঙ্গ নিজের মগজে গ্রহণ করে টেপ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'ভদ্রলোক রেস খেলেন। রেসের মাঠের কথা চিন্তা করছিলেন। গিরিবালা কে?

—ভবনুলালবাবুর স্ত্রী।

—অর্থাৎ ভদ্রলোক স্ত্রীর ভয়ে কাটা, পাছে জানতে পারে। কী করে স্ত্রীকে বাকি দেবেন প্ল্যান ভাজছিলেন। থাক আর নয়। সত্যি, মানুষ কী বিচিত্র জীব। বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না। তাই অন্যের গোপন চিন্তা চুরি করে শুনতে এত রোমাঞ্চকর লাগে। আচ্ছা, এই টেপগুলো কতক্ষণের?

—পাঁচশ-ত্রিশ মিনিটের হবে।

—আরও কম সময় নেবে। চিন্তাতরঙ্গ ধরা পড়লেই আমার শক্ত হবে। কী ব্যাভ শুধু জানা দরকার।

হ্যা, টেপগুলো মুছে ফেলে ফের নতুন সে ট্রাই কোরো।

পরদিন সকালে শশাঙ্কনাথের ফোন পেলেন প্রিয়রঞ্জন : ভাই প্রিয়, আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। জরুরি দরকার।

—কিন্তু আজ যে শনিবার নয়, আমার কাজ আছে। —জানি, জানি।

—ব্যাপারটা কী?

আমাদের অমরের, মানে, অমরেন্দ্র ঘোষের হঠাৎ মেন্টাল ব্রেক ডাউন হয়েছে। তোমার হেল্প চাই।

—আমার সাহায্য কেন? আমি কি ডাক্তার?

-জানি, কিন্তু তোমার সাহায্যই দরকার।

—হঠাৎ মেন্টাল ব্রেকডাউনের কারণ?

—সব আলোচনা করব। আসহ বিকেলে।

কাজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় প্রিয়রঞ্জন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। শশাঙ্ক যখন জেদ ধরেছে, ওকে ঠেকানো যাবে না, আসবেই। কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলও জাগে র্তার মনে। অমরের হলটা কী? তাঁর কাছে কি সাহায্য চায়? অমর তাঁদের কলেজের বন্ধু। এখন বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। অতি শান্ত, ধীর প্রকৃতির।

শশাঙ্কনাথ অমর সম্বন্ধে যা জানালেন, তা সংক্ষেপে এই : অমর আজ দু সপ্তাহ ধরে কলেজে যান না, বাড়িতে থাকেন। অথচ তার ক্লাস আছে। সবশ মনমরা হয়ে থাকেন। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন না। রাতে ঘুম নেই। ঘরে পায়চারি করেন। তার এই আচরণে কোনো কারণও বলেন না জিজ্ঞেস করলে। কারণ একটা অনুমান করা গিয়ে, অমরের কলেজে এক কাণ্ড ঘটেছে। ইতিহাস অনার্স টেস্ট পরীক্ষার পর জানা যায় যে, সেকেন্ড পেপারের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ওই প্রশ্ন করেছিলেন অমর। কলেজে এই নিয়ে অমর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তিক্ত সমালোচনাও হয়েছে, যদিও তা বেশিদূর গড়ায়নি। শশাঙ্কনাথের ধারণা, এই ঘটনাই অমরের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ।

জানিস তো অমর কেমন সেন্টিমেন্টাল।—শশাঙ্ক জানিয়েছেন—আত্মসম্মানজ্ঞান কী টনটনে। আমার ভয় হচ্ছে, ও একটা কিছু না করে বসে।

কী করবে?—শুধোলেন প্রিয়রঞ্জন।

—যদি সুইসাইড করে বা চাকরি ছেড়ে দেয়।

—ভেরি ব্যান্ড। কিন্তু আমি কী করতে পারি?

ধ, তোর মেশিনের সাহায্যে ওর মনের কথা জেনে নেওয়া যায় না? তাহলে একটু হদিশ পাওয়া যায়। তখন সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

—কিন্তু ওর চিন্তা যদি রেকর্ড করা না যায় ? যদি ধরা না পড়ে?

চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

—বেশ। তাহলে অমরকে আমার ড্রইংরুমে এনে বসাতে হবে।

—অমর তো এমনিতে বাড়ির বার হচ্ছেই না। তুই চল্ আমার সঙ্গে ওর বাড়ি। ছুতোনাতা করে ওকে এখানে একবার নিয়ে আসি। তুই রিকোয়েস্ট করলে ও না করতে পারবে না।

বেশ, দেখা যাক।—রাজি হলেন প্রিয়রঞ্জন।

পরদিন রবিবার সকালে শশাঙ্ক ও প্রিয়রঞ্জন মানিকতলায় অমরেন্দর বাড়ি হাজির হলেন।

অমরেন্দ্র এলেন। বিষম ভাব, অবশ্য ভদ্রতায় ত্রুটি নেই তার। তবে বেশি কথা বলতে যেন অনিচ্ছা।

প্রিয়রঞ্জনের সেসবে গ্রাহ্য নেই, অমরের হাবভাব খেয়ালই করলেন না তিনি। দু'কথার পরই জিজ্ঞাসা করলেন, কী নিয়ে কাজ করছিস? অমরেন্দ্র দ্বিধাভরে বললেন, এই ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্য নিয়ে একটু খোঁজ-খবর করছি।

—নতুন ইন্টারেস্টিং কিছু পেলি?

—পেয়েছি। কী রকম? প্রিয়রঞ্জন উৎসুক।

অমরেন্দ্র বলতে থাকেন। একটু-একটু করে তিনি সহজ হয়ে ওঠেন। প্রিয়রঞ্জন প্রশ্ন করেন মাঝে মাঝে। নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে পেরে আর আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে অমরেন্দ্রের চোখ-মুখ উল হয়ে ওঠে। শশাঙ্কনাথ উসখুস করছেন। এসব আলোচনায় বেচারা থই পান না। লুকিয়ে চোখ

টিপছেন প্রিয়কে: এই সুযোগ, 'অনরকে নেমন্তন্ন করে ফে। কিন্তু প্রিয়রঞ্জনের তাতে আক্ষেপ নেই। শশাঙ্কনাথ বার দুই অপর থেকে ঘুরে এলেন, অমরের স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে দেখা করে এলেন। চা-জলখাবার এল।

বাংলার বারো ভূঁইয়া ও প্রতাপাদিত্য নিয়ে মশগুল হয়ে আলোচনা ছেন দু'জনে। হঠাৎ বললেন, অমর, শুনলাম, তোমার নাকি মন খারাপ? কোয়েশ্চেন আউট হয়ে গিয়েছে, 'তাই।

অমর থতমত খেয়ে গেলেন। প্রিয় বললেন, আরে দূর, তাতে মনখারাপের কী আছে?

—এ তো আজকাল আকছার হচ্ছে। তুমি তো আর নিজে বলোনি কাউকে!

—না, কক্ষনো না।

—তবে নিশ্চয়ই কেউ চুরি করে জেনেছে। অতএব তোমার এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে?

অমর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমার মন খারাপের কারণটা অন্য।

—প্রশ্ন, কেউ চুরি করে জেনেছে। কিন্তু কে সে? সেই উত্তরটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

-মানে?

প্রশ্নটা করে আমি একটা খাতা চাপা দিয়ে টেবিলের ওপরে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। কাজটা উচিত হয়নি। বলতে পারি, কেয়ারলেস হয়েছি। ফাইলের ভিতরে রাখা উচিত ছিল। তবে এরকম আগেও রেখেছি, কোনো অঘটন ঘটেনি। ঘণ্টা দুই পরে আমি ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল দু'জন। আমার ছোট ভাই সনৎ এবং আমার এক ছাত্র তপন। আমার বোন, মাও ঢুকে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে চটপট প্রশ্নটা কপি করে ফেলা সম্ভব নয়। যদি বাড়ি থেকে আমার প্রশ্ন ফাস হয়ে থাকে, তবে সে কাজ সনৎ বা তপনের।

—তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?

এইখানেই মুশকিল। দু'জনকেই আমি স্নেহ করি, বিশ্বাস করি। তারাও আমার শ্রদ্ধা করে। এত বড় সন্দেহটা তাই মুখ ফুটে বলতে পারছি না। ধর, যদি ওরা নির্দোষ হয়, কী ভাববে? ওদের সম্বন্ধে এমন জঘন্য সন্দেহ আমার মনে এসেছে, এ কথা ভেবে আমার ওপর ওরা সব শ্রদ্ধা হারাবে। ওদের মনে কতবড় আঘাত দেওয়া হবে, ভেবে দেখ।

—হয়তো কোয়েশ্চেন প্রেস থেকে আউট হয়েছে, প্রেসের লোক টাকা খেয়ে বের করে দিয়েছে।

হতে পারে। তবে আর কোনো প্রশ্ন আউট হল না, শুধু আমারটা। আর ওই প্রেস খুব বিশ্বাসী। অনেক বছর ওখানে আমার প্রশ্ন ছাপাচ্ছি, কখনও কোনো গোলমাল হয়নি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রশ্ন আমার বাড়ি থেকেই বেরিয়েছে। উঃ, এ যে কী সমস্যা। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত। তাই শান্তি পাচ্ছি না।

প্রিয়রঞ্জন ও শশাঙ্কনাথ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কোনো কথা জোগাল না তাদের মুখে।

অমরে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, এসব কথা এখন থাক। প্রিয়, তুমি অনেকদিন পর এসেছ, মিছিমিছি বিব্রত করলাম তোমায়। আমার সমস্যার সমাধান আমি ঠিকই একদিন করব। যাক, সেদিন ফিরলে কখন? কবে?— জিজ্ঞেস করলেন প্রিয়রঞ্জন।

—যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তুমি বাড়ি ছিলে না!

–তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে কোথায়?

–কেন, তোমার বাড়িতে। সিথির কাছে।

– সে কী! কদিন আগে?

-হপ্তাতিনেক হবে। কেন, কেউ বলেনি তোমায় ?

—আমি তো ভাবছিলাম, তাই তুমি এসেছ আজ। তুমি আমার ঠিকানা পেলে কী করে?

শশাঙ্ক বলেছিল। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার খবর। ও বলল, তুমি ফিরেছ। বাড়ির ঠিকানা দিল।

শশাঙ্কনাথ ঘাড় নেড়ে অমরেন্দ্র কথার সমর্থন জানালেন। অমরেন্দ্র বললেন, স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটে গিয়েছিলাম একটা কাজে। ভাবলাম, কাছেই থাক তুমি, দেখা করে যাই। তুমি সেদিন বিকেলে ছিলে না। খানিক অপেক্ষা করে চলে

এলাম। ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব। তারপরই কলেজে এই কাণ্ড! সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার বাড়ি কে ছিল তখন?—প্রিয়রঞ্জন জানতে চাইলেন।

একটি ছেলে। কালো, লম্বা। আমায় বসাল ড্রইংরুমে। -তারপর?

—আধঘন্টাটাক অপেক্ষা করে উঠে পড়লাম।

—সেদিন 'আমার ড্রইংরুমে বসে তুমি কি ওই প্রশ্নগুলো ভাবছিলে?

–হ্যা, ঠিক বলেছ। কী করে বুঝলে? অনার্সের টেস্ট আরম্ভ হবে দু'দিন পরে। বসে বসে ভাবছিলাম আমি কী কী কোয়েশ্চেন সেট করেছি।

এর পরেই প্রিয়রঞ্জনের ভাব গম্ভীর হয়ে গেল। একটুক্ষণ পরেই বললেন, আজ উঠি।

বাড়ি ফিরেই প্রিয়রঞ্জন সমীরের খোজ করলেন। সমীর মেশিনঘরে ছিল। মেশিনম্বরে ঢুকে দু-একটা আজে-বাজে কথার পর প্রিয়রঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, সমীর, দিন পঁচিশেক আগে এক শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করতে একজন এসেছিলেন। পাতলা, ফরসা, মাঝারি হাইট। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। আমার দেখা না পেয়ে চলে যান। তুমি তাকে বসিয়েছিলে?

-হ্যা, স্যার। প্রফেসর অমরেন্দ্র ঘোষ।

তুমি চেনো অমরকে?

আজ্ঞে চিনি। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে এক সভায় দেখেছি ওঁকে বক্তৃতা করতে।

—অমরকে ড্রইংরুমে বসিয়েছিলে?

—হা।

—তুমি তার চিন্তা রেকর্ড করেছিলে?

না, স্যার।

অমরের কথা আমায় বলেনি কেন?

ভুলে গিয়েছিলাম স্যার। প্রিয়রঞ্জনের সুকুটি স্পষ্ট হয়। সমীরকে বেশ নার্ভাস দেখাল। বলল, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। ওঁকে বসিয়ে রেখে নিজের ঘরে একটা বই পড়ছিলুম। খুব জমে গিয়েছিলাম বইটায়। খানিক বাদে এসে দেখি, উনি কখন চলে গিয়েছেন। উনি নিজের পরিচয় দেননি, আপনার সঙ্গে যে কোনো জরুরি কথা আছে তাও বলেননি, তাই ওঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি।

বাড়িতে তখন আর কে কে ছিল?

—বিশু আর বংশী।

—বিশু অমর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

—হু। জিজ্ঞেস করল, “ভদ্রলোক কে?”

আমি পরিচয় বলেছিলাম।

–বিশু কি ওর সেরিব্রাল ওয়েভ রেকর্ড করেছিল?

—জানি না স্যার। আমি নিজের ঘরে ছিলাম। হুম্।

—প্রিয়রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন।

প্রিয়রঞ্জনের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ঘূর্ণি। অমরের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার জন্যে দায়ী কে? অমরের ভাই, ছাত্র, না, তার যথ? সেদিন অমরের চিন্তা কি কেউ চুরি করে রেকর্ড করেছিল? শুধু লুকিয়ে রেকর্ড করা নয়, সেই গোপন চিন্তাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহারও করা হয়েছে। এ কার কীর্তি-সমীর, না, বিশুর? সমীর কি সত্যি কথা বলছে। বিশু এখন নেই এখানে, ব্যাঙ্গালোর গিয়েছে। এর সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত। তার অ্যাসিস্টান্টদের মধ্যেই কেউ কি এমন বিশ্বাসঘাতক, দুষ্টপ্রকৃতির? অমরেন্দ্রর মতোই প্রিয়রঞ্জনও তীক্ষ্ণ দ্বিধা ও সন্দেহের খোচায় জর্জরিত হতে থাকেন!

পাঁচদিন ধরে সমীর মিত্রভবনে অনুপস্থিত। কোনো খবর অবধি নেই।

প্রিয়রঞ্জন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এমন তো হয় না কখনও। সমীরের কি অসুখ করেছে? কিংবা অমরের প্রশ্ন ফাস হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই এর কারণ? তবে কি সমীরই দোষী? প্রিয়রঞ্জন সন্দেহ করছেন বুঝে এখন সে গা-ঢাকা দিয়েছে? সমীরের বাড়ি গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

কলকাতায় বাগবাজার অঞ্চলে সরু গলির মধ্যে এক মস্ত পুরনো বাড়ির একতলায় সমীরের বাস। তিনখানি ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে। বাড়িতে অন্য প্রাণী বলতে তার মা এবং ছোট বোন। সমীরের সাংসারিক পরিচয় এইটুকুই জানেন প্রিয়রঞ্জন।

সমীরের বাসা খুজে বের করতে প্রিয়রঞ্জনকে রীতিমতো বেগ পেতে হল। বাইরের দরজায় কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে উকি মারল একটি মেয়ে। প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

মেয়েটির মুখের আদল সমীরের মতো। নিশ্চয়ই ওর বোন। প্রিয়রঞ্জন বললেন, সমীর আছে? আমি প্রিয়রঞ্জন রায়।

চকিতে তরুণীর মুখে সম্ভ্রম ফুটে ওঠে। দরজা খুলে এক পা এগিয়ে এসে বলল, ও, আপনি। 'আসুন ভিতরে। আমি রেবা। সমীর আমার দাদা।

—আছে সমীর? আছে।

—ঘাড় নাড়ল রেবা।

-কী ব্যাপার? ও যাচ্ছে না কেন? অসুখ করেছে?

মানে, 'আসুন ভিতরে। সব বলছি।

রেবার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। সে দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রিয়রঞ্জনকে ঢোকার পথ করে দিল। সামনের ছোট ঘরখানিতে বসালেন প্রিয়রঞ্জন। খুবই সাদাসিধেভাবে সাজানো। কয়েকটি কাঠের টেবিল, চেয়ার। দেওয়াল ঘেঁষে ছোট এক তাপোশ, তার ওপর শতরঞ্চি বিছোননা। এককোণে একটা লেখার টেবিল, তাতে কিছু খাতা-বই। দেওয়ালের তাকে ঠাসা বই, কতকগুলি গল্পের, বাকি বিজ্ঞান বিষয়ের। দেওয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা ছবিটি। অনাড়ম্বর দিন-যাপনের

ছাপ, সুরুচির পরিচয় মেলে। রেবা সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। কই, সমীরাকে ডাক।—অধৈর্যভাবে বললেন প্রিয়রঞ্জন। দাদা হঠাৎ...দাদার কী যেন হয়েছে?

—ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল রেবা। কী হয়েছে? —প্রিয়রঞ্জন বিস্মিত।

—দাদা কদিন ধরে গুম হয়ে থাকছিল। কলেজে যেত না, আপনার ওখানেও যেত না। আমি, মা বারবার জিজ্ঞেস করেছি, "শরীর খারাপ?" উত্তর দিত না। বেশি জিজ্ঞেস করলে রেগে উঠত। তবে ওর জ্বর-জ্বালা হয়নি, এটা ঠিক। গত পরশু দাদার এক বন্ধু আসেন দেখা করতে। মানিকদা, দাদার অনেকদিনের বন্ধু। খুব ভালো লোক। সাদাকে খুব ভালোবাসেন। দাদা এই ঘরে বসেছিল। আমি আর মা ভিতরে ছিলাম। একটু পরেই শুনি দাদার গলাঃ "বেরিয়ে যাও। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও!" ছুটে গিয়ে দেখি, দাদা থরথর করে কাপছে রাগে, চোখ-মুখ লাল, মানিকণা হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে। মানিকদা কী যেন বলার। চেষ্টা করলেন, দাদা অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "কোনো কথা নয়। জোচ্চোর। ভণ্ড। বেরোও। আমি সব জানতে পেরেছি। গেট আউট।" মানিকদা মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। দাদা তারপর পাথরের মতো বসে রইল ঘণ্টাখানেক। মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কী করেছে মানিক?" দাদা বলল, "কিছু না।" জানেন তো এমনিতে দাদার মেজাজ কত ঠান্ডা। কেন চটল, কিছুই বুঝলাম না। এরপর থেকে দাদা বাড়িতে। নিজের ঘরে পোর বন্ধ করে থাকে প্রায় সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। এমন করলে দাদা ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

বলতে বলতে রেবার চোখে জল এসে গেল। প্রিয়রঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, মনে হচ্ছে, অমরের প্রশ্ন-চুরির কারণে সমার ডুব মারেনি। কারণ অন্যর সঙ্গে রাগারাগি। তিনি বললেন, সমীরকে ডানে, বলো, আমি এসেছি।

রেবা ভিতরে চলে গেল।

স্যার আপনি?—মিনিট দুই বাদে সমীর ঘরে ঢুকল। চোখ বসা, শ্রান্ত চেহারা অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত 'ভার।

বোসো সমীয়। সহজ সুরে বললেন প্রিয়রন। সমীর জড়সড় হয়ে বলল। কোনো ভনিতা না করে প্রিয়রঞ্জন বললেন, বন্ধুকে দেখে মাথা গরম করেছিলে কেন? রেবা বলল।

সমীর অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, স্যার, আমি যে কী ভীষণ আঘাত পেয়েছি কেউ জানে না! এই মানিক আমার কত দিনের বঙ্গ, ওকে বিশ্বাস করতাম, ভালোবাসতাম। আর ও-ই কিনা আমার সেই অপমানের জন্য দায়ী? উঃ, কী মিটমিটে শয়তান! আমি ভাবতে পারিনি।

একটু খুলে বল ব্যাপারটা।—প্রিয়রঞ্জন অনুরোধ করলেন।

সমীর ধীরে ধীরে বলতে লাগল: জানেন স্যার, এম. এস-সি পড়ার সময় একটা মেসে থাকতাম। ওই মেসেই থাকত মানিক। ওর সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি। আমার ফিজিক্স। তবু খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল দু'জনের। অবশ্য দু'জনে এক ঘরে থাকতাম না। মানিকের অবস্থা 'ভালো ছিল না, আমার চেয়েও খারাপ। ও থাকত নিচের তলায় একটা কমভাড়ার ছোট্ট, ঘরে, আমি থাকতাম দোতলায়। আমার ঘরে চারটে সিট ছিল, তবে ঘরটায় আলো-বাতাস খেলত বেশ। ঘর আমিই একমাত্র পড়ুয়া, অন্য তিনজন চাকুরে। তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ বনত না। বোধহয় নিজেরা অল্প শিক্ষিত হওয়ার ফলে আমাকে ওরা একটু বাঁকা চোখে দেখত। সময়-অসময়ে অল্প-বিস্তর ঠাট্টা-বিক্ষপ করত। আমি গায়ে মাখতাম না। ঘরটা ভালো, কাছেই বাথরুম, স্নানের ঘর। এইসব সুবিধের দরুন সিটটা পালটাবার চেষ্টা। করিনি। মানিক প্রায়ই এসে বসত আমার খাটে। গল্প-গুজব করতাম। পরীক্ষার মাসতিনেক আগে আমার ঘরে এক কাণ্ড হল। আমার পাশের সিটের ভদ্রলোকের পাঞ্জাবি ঝুলছিল তার আলনায়, জামার পকেটে অনেক টাকা ছিল। পকেটের টাকা বালো তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। বিকেলে খোজ পড়ল টাকার। দেখা গেল, নেই। খোঁজাখুঁজির পর কী আবিষ্কার হল জানেন? আমার বিছানার তোশকের তলা থেকে বেরোল সেই টাকার গোছা। লজ্জায় মরে গেলাম। বারবার দোষ অস্বীকার করলাম। মেসের বেশির ভাগ লোক অবশ্য আমাকে নির্দোষ মনে করল। তবু কিছু লোকের মনে সন্দেহ নাইল—বিশেষ করে, আমার ঘরের অন্য তিন মেম্বারের। সেটা তাদের হাব-ভাব দেখে টের পেতাম। তারা বাক্সে ডবল তালা লাগাল। প্রতিদিন ঘরে ঢুকে আলনার কাপড়-চোপড় গামছা অবধি গুনে গুনে দেখে। কথাবার্তা বলে না আমার সঙ্গে। কেবল আড়চোখে লক্ষ করে আমায়। এমনকী মানিকও আমার ঘরে আসা বন্ধ করে দিল। তখন ভেবেছিলাম, 'ভয় পেয়েছে, আমার দুর্নামের ভাগী হতে চায় না। অবশ্য ও বারবার আমায় বলেছিল, ও কখনো বিশ্বাস করে না, এ আমার কাজ, এ কাজ নিশ্চয়ই অন্য কারও। এ কীর্তি কার, এ প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ কাজ আমার তিন রুমমেটের কারও। তার হাত

ষড়যন্ত্র করে আমায় অপদস্থ করেছে। কিছুদিন ধরেই ওরা আমায় ওই ঘর থেকে তাড়াতে চাইছিল। আমার জায়গায় ওদের এক বন্ধুকে ঢোকাবে। তাহলে রাতে বাজি রেখে তাস খেলা জমবে। মিথ্যে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। লজ্জায়, গে, gণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। শেষে ওই মেস ছেড়ে দিলাম। সস্তা মেস পাওয়া কঠিন। একটা জঘন্য মেসে কোনোরকমে একটু জায়গা পেলাম। পড়াশোনা মাথায় উঠল। ফলে ফাইনাল পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট অনেক খারাপ হয়ে গেল।

একটু থেমে সমীর আবার বলে চলে: জানেন স্যার কদিন আগে কী আবিষ্কার করেছি—আমার সেই চরম লাঞ্ছনার জন্যে দায়ী আমার প্রিয় বন্ধু মানিক। ও-ই আমার বিছানার নিচে 'টাকাটা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল। এর পর মানুষের ওপর, বন্ধুত্বের ওপর আমার সব বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু কেন ও আমায় এমন অপদস্থ করেছিল, তার কারণটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

-আদ্দিন পরে এমন আবিষ্কারটি করলে কী করে? প্রিয়রঞ্জনের প্রশ্নে থতমত খেল সমীর। বলল, ইয়ে ... মানে... আপনার যন্ত্রের সাহায্যে। ঘুম। মাথা নাড়লেন প্রিয়রঞ্জন—এত দিন রাগ পুষে রেখেছিলে? আশ্চর্য!

—না, ঠিক পুষে রাখিনি, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার চিন্তাগ্রাহক যত্ন নিয়ে কাজ করতে করতে ভাবলাম, জানতে চেষ্টা করি, কে আমায় সেদিন অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

মানিককে সন্দেহ করলে কেন?

—একেবারেই করিনি। আমার সন্দেহ ছিল সেই তিন রুমমেটের ওপর। ছল ছুতোয় তাদের একজনকে এনেছিলাম যন্ত্রের সামনে। কিন্তু তার চিন্তাতরঙ্গ ধরতে পারল না মেশিন। রোথ চেপে গিয়েছিল, প্রকৃত অপরাধীকে আবিষ্কার করব। তারপর তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেব। শোধ তুলব। মানিকের চিন্তা রেকর্ড করেছিলাম স্রেফ মজা করার জন্যে। কিন্তু তার বদলে এ কর্মী জানলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমার অপমানের জন্যে দায়ী লোককে খুজে বের করার চেষ্টা না করলেই ভালো ছিল। তাহলে আমার মনের শাস্তি এ ভাবে নষ্ট হত না। ভুলেই তো গিয়েছিলাম। ওঃ! দু' হাতে কপাল চেপে মুখ নামিয়ে বসে রইল সমীর। প্রিয়রঞ্জনও ভাষাহীন, মূক।

সমীর! ডাক শুনে সমীর চমকে বাইরে তাকাল। আধ-ভেজানো দরজায় এক যুবক উদ্ভ্রান্তের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, ছোটখাটো চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি। মানিক! —বলে সমীর তার সামনে গিয়ে দাড়াল।

মানিক আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, সমীর, আমার কথা একবার শোন। তারপর আমায় যা ইচ্ছে শাস্তি দিস। আমি এজ ইচ্ছে রে করিনি ভাই।

প্রিয়রঞ্জন গলাখাকারি দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিলেন। প্রিয়রঞ্জনকে লক্ষ করে মানিক ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল।

সমীর বলল, উনি ডক্টর প্রিয়রঞ্জন রায়। ওঁর সামনে বলতে পারিস। উনি সব জানেন। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে মানিক বলতে লাগল: সেদিনকার ঘটনা তোর মনে আছে সমীর? আমায় বিছানায় বসতে বলে তুই স্নান করতে গেলি। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার নজর পড়ল কৃপাসিন্ধুকুর সিটের পাশে দেওয়ালে কোলানো একটা পাঞ্জাবির বুকপকেটে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবির ভিতরে পকেটা ফুলে উঠেছে, আবছা দেখা যাচ্ছে নোটের গোছা। আমার তখন কী অবস্থা যাচ্ছে না করতে পারবি। তিন মাস হল, বাড়ি থেকে একটি পয়সাও আসেনি। বাবার অসু, বিনা মাইনেয় ছুটি নিয়েছেন, কেবল কুড়ি টাকার টিউশনিট মাত্র সম্বল। চারিদিকে ধার। মেসের ম্যানেজার বারবার তাগাদা দিচ্ছে: 'টাকা দাও। নইলে মেস ছাড়তে হবে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। ঘরে কেউ নেই। টপ করে তুলে নিলুম নোটগুলো। তখুনি ঘরে ছেড়ে পালিয়ে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় বাইরে শুনলাম কৃপাসিন্ধুবাবুর গলা। ভাবলাম, উনি ঠিক টাকার খোঁজ করতে এসেছেন। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে টাকাটা গুজে দিলাম তোর বিছানার তলায়। শুধু নিজেকে বাঁচাবার চিন্তাই তখন মনে এসেছিল। এর ফলে তোর যে বিপদ ঘটতে পারে মাথায় আসেনি।

একটু দম নিল মানিক। তারপর বলতে লাগল: কৃপাসিন্ধুবাবু ঢুকলেন। একটি খাতা বের করে দেখলেন। কিন্তু টাকার খোঁজ করলেন না। বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তুই এসে পড়েছিস! ভাবছিলাম, তোকে কোনো ছুতায় সরিয়ে দিয়ে টাকাটা ঠিক জায়গায় রেখে দেব। টাকা চুরির সাহস তখন আমার উবে গিয়েছে। কিন্তু হায়, সুযোগ পেলাম না। আবার তোদের ঘরের মেম্বাররা যখন থাকে না, তখন ওই ঘর থাকে তালা বন্ধ। লুকিয়ে ডোলর সুযোগ নেই। কলেজে গেলাম তোর সঙ্গেই। সারা দুপুর কী অশান্তিতে যে কাটল! কিন্তু উপায় খুঁজে পেলাম না। বিকেলে মেসে ফিরে দেখি, হুলস্থুল কাণ্ড চলছে। তারপর...

কান্নায় মানিকের গলা বুজে এল। খানিক চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আমি কাওয়ার্ড, কাপুরুষ, স্বার্থপর! কেন স্বীকার করতে পারলাম না নিজের দোষ? এত বড় অপমানের বোঝ তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম। পরেও বারবার ভেবেছি, সব স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। পারিনি ভয় হয়েছে, চিরকালের মতো তোর বন্ধুত্ব যদি হারাই! হয়তো তুই সে ঘটনা ভুলে গিয়েছিস! পুরনো বিষাক্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার দরকার কী? এও ভয় হয়েছে, তুই হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবি না, ভুল বুঝবি। উঃ, কী অনুশোচনায় যে ভুগেছি! যাক, এখন সব স্বীকার করলাম, ক্ষমা চাইছি। যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলিস, করব।

উন্মুখ হয়ে সমীরের দিকে চেয়ে রইল মানিক।

সমীর মৃদু কোমল স্বরে বলল, তোর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। এবার আমার ক্ষমা চাওয়ার পালা। সেদিন আমার উচিত ছিল আগে তোর কথা শোনা। তোর এত ভালোবাসা কী করে একমুহূর্তে ভুলতে পারলাম ভাবতে পারছি না। আমি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমায় মাপ করো ভাই!

মানিকের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। বলল, একদিন বারবার ভেবেছি, আত্মহত্যা করব। তোর ক্ষমা না পেলে হয়তো তা-ই করতাম। উঃ, আমার এতদিনের যন্ত্রণা থেকে আজ মুক্তি পেলাম।

এবার চলি আমি।

প্রিয়রঞ্জনের কণ্ঠ। দুই বন্ধু সম্বিৎ ফিরে পেল। সমীর, লজ্জিতভাবে বলল, আপনার অনেক কাজের ক্ষতি হল স্যার, আমি কাল থেকে যাব!

কালই দরকার নেই। দুদিন রেট নাও। তোমায় খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে, বললেন প্রিয়রঞ্জন।

বাড়ি ফেরার পথে প্রিয়রঞ্জন সারা সময় গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

আট

সমীরের সঙ্গে প্রিয়রঞ্জন যেদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন সেইদিনই বিকেলে শশাঙ্কনাথ মিত্রভবনে এসে উপস্থিত। মহা উত্তেজিতভাবে বললেন, কথা আছে,

দারুণ খবর!

এসো। –শশাঙ্ককে প্রিয়রঞ্জন নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে বসালেন —কী ব্যাপার? তোমার বিশু একটা স্কাউনড্রেল!—বললেন শশাঙ্কনাথ।

কয়েকদিন ধরে আমি মিত্রভবনের কাছাকাছি পাড়াগুলোয় বিশু সম্বন্ধে খোঁজ-খবর। করলাম। কাছেই আমার এক ভগ্নীপতি থাকে। বঙ্কিমবিহারী। তাই কাজটা একটু সহজ হল। বঙ্কিমের সঙ্গেও বিশুর আলাপ আছে। অবশ্য তোর মেশিন সম্বন্ধে কোনো আভাস দিইনি। ঘুরে ঘুরে কী জানলাম জানি, বিশু এখানে গাদা লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে এবং বিশু এখানে একজন জ্যোতিষী হিসাবে ফেমাস। যেখানে-সেখানে ও হাত দেখে না, মক্কেলদের তোর ড্রইংরুমে গিয়ে গিয়ে বসিয়ে হস্ত, ললাট ইত্যাদির বিচার করে। তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদেরও অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে এমন সব গোপন কথা বলে দেয় যে, লোকে কুপোকাৎ! লোকে ভবিষ্যতের কথাও জানতে চেয়েছে। সে বিষয়েও অনেক ইঙ্গিত দিয়েছে শ্রীমান বিশু। এরপর ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায়। অনেকে তার কাছে ব্যবস্থা চেয়েছে। বিশু তাদের কাছে বিক্রি করেছে নানা রত্ন-পাথর বাজার-দরের চেয়ে ঢের বেশি দামে, অর্থাৎ প্রচুর লাভ করে নিয়েছে। কাউকে কাউকে আংটি-মাদুলিও গছিয়েছে অবশ্যই পয়সা নিয়ে। বিশুর খ্যাতি হু হু করে বাড়ছে। শুধু এপাড়া নয়, ইদানীং বাইরে থেকেও লোক আসছে তার কাছে হাত দেখাতে। আমি খোজ নিয়ে জেনেছি, এখানে আসার আগে জ্যোতিষী হিসাবে ওর কোনো নাম-ডাক ছিল না। আমার ধারণা, তোর এই অ্যাসিস্ট্যান্টটি তোর চিন্তা-চুরি-যন্ত্রের ঘাড় ভেঙে বেশ দু'পয়সা। কামিয়ে নিচ্ছে। সত্যি হাত-টাত দেখতে জানে, না, কচু! নইলে শুধু তোর ড্রইংরুমে এনে। হাত দেখবে কেন? ওখানে অ্যানটেনার সাহায্যে লোকের চিন্তা চুরি করে রেকর্ড করে। তাদের অতীত-বর্তমানের দু-চারটে গোপন কথা বলে তাক লাগায় সে। কাউকে কাউকে। নাকি বলেছে, এখন দেখব না, কয়েক মাস পরে বলব!" ওঃ, কী ঘড়েল ছোকরা!

প্রিয়রঞ্জন বললেন, আমি বিশুকে কিছু পাড়ার লোক এনে তাদের থট ওয়েভ রেকর্ড করতে বলেছিলাম। হাত দেখার কথা ও স্বীকার করেছিল। বলেছিল, এ বিদ্যে ও সামান্য জানে। এই লোভ দেখিয়ে ড্রইংরুমে লোক ডেকে আনে। কিন্তু পাথর-টাথর দেওয়া, এ আমি ভাবতেও পারিনি। আট-দশটা সেরিব্রাল ওয়েভ-এর রেকর্ডও আমায় ও শুনিয়েছে।

জানতাম না এত লোক এনেছে। সকালে আমি বা সমীর কে খাকিন, বুকেছি তখন ও আরও আছে শ্রীমানের কীর্তি, আরও আছে-শশাঙ্কনাথ বললেন, আমার সন্দেহ অমরেন্দ্রর হিস্ট্রির কোয়েশ্চেন বিশুই আউট করেছে। আমি জেনেছি, অমরের কলেজে বিশুর এক মামাতো ভাই পড়ে। সে টেস্ট দিয়েছে এবং হিস্ট্রি ছিল। আর ওই ছোকরা যে হোস্টেলে থাকে, সেখান থেকেই প্রথম অমরের প্রশ্ন আউট হয়। খুব সম্ভব বিশু অভ্যাসবশত অমরের চিন্তা রেকর্ড করে। পরে গেয়েশেনগুলো পেয়ে ভাইকে বলে দেরা।

প্রিয়রঞ্জনের মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক বলেন, আরও শুনবি? বিশু ছোকরা শুধু হাত দেখার নাম করেই পয়সা কামাচ্ছে না, ব্ল্যাকমেল করছে।

কী রকম?

—আমার ভগ্নীপতি বঙ্কিম এখানে সজ্জন লোক বলে পরিচিত। ছোটখাটো ছাপাখানার ব্যবসা আছে। অমায়িক, পরোপকারী। এখানকার স্কুলের ভাইসপ্রেসিডেন্ট। বাইরের কথা বলছি না, আমি নিজেও জানি, ওর মনটা সত্যিই উদার। বঙ্কিম এবার এখানে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যে দাঁড়াবে ঠিক করেছে। কিন্তু ও এক সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। কেউ ওকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছে।

এর সঙ্গে বিশুর সম্পর্ক কী?—অধৈর্যভাবে বললেন প্রিয়রঞ্জন।

-বলছি, বলছি। বঙ্কিম অল্প বয়সে ছিল বেপরোয়া ধরনের। তখন লখনউতে ছিল কিছুদিন। একদল খারাপ লোকের সঙ্গে মেশামেশি লত। তখন এক জুয়ার আড্ডা থেকে। ওকে পুলিশে ধরে। এক মাস জেল খাটতে হয়েছিল ওকে। ভীষণ জয় পেয়েছিল। মায়ের পা ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনও কুসঙ্গে মিশবে না। প্রতিজ্ঞা ও রেখেছে। অনেক চেষ্টায় আজকের এই প্রতিষ্ঠা আর সুনামটুকু অর্জন করেছে। কিন্তু মাসকয়েক আগে ওর কাছে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির চিঠি আসে। তাতে ভয় দেখানো হয়, প্রতি সপ্তাহে দুশো টাকা করে না দিলে তার পুরনো পাপের খবর সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। চিঠি পাওয়া ইস্তক ভয়ে কাটা হয়ে আছে বঙ্কিম। বাড়িতে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী কাউকে জানায়নি লজ্জায়। এ কথা জানাজানি হলে সমাজে তার মুখ দেখানো ভার হবে, বাড়ির লোরে কাছেও মাথা হেট হয়ে যাবে। চেয়ারম্যান দাঁড়ানোও হবে না। হপ্তায় হপ্তায় সে তাই টা দিয়ে চলেছে। শ্যামবাজারে এক পানের দোকানে টাকাটা জমা দিয়ে আসতে হয়।

আমাকে সে খুব ভালোবাসে। আর থাকতে না পেরে আমায় বলে ফেলেছে সব। এবং —

শশাঙ্কনাথের কথার স্রোত ছামিয়ে দিয়ে প্রিয়রঞ্জন প্রশ্ন করলেন, বঙ্কিমবাবু বিশুর কাছে গিয়েছিলেন?

—হ্যা, গিয়েছিল।

—কেন?

হাত দেখাতে, ইলেকশনের ভবিষ্যৎ জানতে।

— ড্রইংরুমে বসে তিনি লখনউর সেই ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছিলেন?

করেছিল।

-বঙ্কিমবাবু কি সন্দেহ করেন, বিশু তাকে ব্ল্যাকমেল করছে?

—মোটেই না। বিশু সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উচু। বঙ্কিম ভাবছে, তার লখনউর পুরনো শত্রু কেউ পিছনে লেগেছে। কিন্তু আমার অনুমান, এ কাজ বিশুর।

হুম!—প্রিয়রঞ্জন চেয়ারে ঠেস দিয়ে নিথর হয়ে বসে রইলেন। —প্রিয়, শোন্ তোর এই বি ছোকরা মহা ধড়িবাজ। ওকে তাড়ানো উচিত।

—ঘাড় নাড়লেন প্রিয়রঞ্জন। সমর্থন, না, প্রতিবাদ, ঠিক বোঝা গেল না। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?—বললেন,শশাঙ্কনাথ, বিশু বাঙ্গলোর থেকে ফিরছে কবে?

-আজ-কালের মধ্যেই।

—তোর যন্ত্র দিয়ে বিশুর চিন্তা গোপনে জেনে নিলে কেমন হয়? তাহলে ও কী কী বদ মতলব অটিছে একটু হদিশ পাওয়া যায়। আমিও তাই ভাবছিলাম— বললেন প্রিয়রঞ্জন।

দুদিন পরের ঘটনা। সকাল প্রায় দশটা। প্রিয়রঞ্জন মিত্রভবনে ড্রইংরুমে বসে। সামনে টেবিলের ওপর বিছোনো একটা নকশা-আঁ কাগজ। দরজার বাইরে

পায়ের শব্দ হল। বিত উকি মারল দরজায়।

এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।ডাকলেন। প্রিয়রঞ্জন। বিশু ঢুকল ঘরে।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, এই ডিজাইনটা দেখ। কাল টমসন অ্যান্ড থমসন কোম্পানিকে এই ডিজাইন মিলিয়ে পার্টস তৈরির অর্ডার দিয়ে আসবে। আমি ওপরে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেক পরে 'আসব। কোথাও গোলমাল লাগলে তখন বুঝে নিও।

এই ঘরে বসেছেন যে? -বিশু একটু অবাক হল। রোদুরে বেশ পিঠ দিয়ে বসেছিলাম। মেশিনঘরটা যা চাপা! খেন আর কে আসবে এখানে? তুমি এখানেই বোসো। দরজাটা বরং বন্ধ করে দিও।—বিশুকে নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লেন প্রিয়রঞ্জন।

যদি বিকেলে করি?—বিশু ইতস্তত করে। বোধহয়, এখন আটকে যাওয়ার ইচ্ছে ওর।

-না না, বিকেলে আমি থাকব না। সায়ন্স কলেজে লেঙ্কার শুনতে যাব। ফিরতে রাত হবে। এখনই বুঝে নাও।

বেজার মুখে বিশু প্রিয়রঞ্জনের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ল।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে থমকে গিয়ে বললেন প্রিয়রঞ্জন, আজ বিকেলে আমাকে একজন টেলিফোন করতে পারে। প্রফেসর অমরেন্দ্র ঘোষ। বলেছিল, টেলিফোন করে 'আমি বাড়ি আছি কিনা জেনে নিয়ে আসবে। যদি ফোন করে, বলে দিও কাল আসতে। বংশীকেও বলে দিচ্ছি।

সমীরদা থাকবে না বিকেলে? জিজ্ঞেস করল বিশু। —না। সমীরও লেকচার শুনতে যাবে। প্রিয়রঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। বিশু বু প্রিন্টটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ সে মুখ তুলে তাকাল অ্যাকোয়ারিয়ামটারদিকে। হালকা স্বচ্ছ জলপূর্ণ আধারে রকমারি আকৃতির নানারঙের পাথরের অসিল প্রবালের ফাকে ফাকে সাঁতরে বেড়াচ্ছে কত রকম মাছ। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। নাঃ, শুধু সৌন্দর্য উপভোগ উদ্দেশ্য নয়া বিশুর। সন্দিগ্ধ নয়নে সে খুটিয়ে দেখল মৎসাধার। আকোয়ারিয়ামের দ্বিতীয় আলোটা জ্বলছে না। নিশ্চিন্ত হল বিশু। মিনিট পাঁচেক নকশাটা লক্ষ করার পর চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সে। ঘন্টা দুই পর।

পার্ক স্ট্রিটের এক নামী রেস্তোরাঁয় নিভৃত কেবিনে মুখোমুখি বসেছেন প্রিয়রঞ্জন এবং শশাঙ্কনাথ। আধঘন্টা আগে প্রিয়রঞ্জনের জরুরি আহবানে অফিস থেকে সোজা এখানে এসেছেন শশাঙ্কনাথ, প্রিয়রঞ্জন অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই বোঝা গেল, গুরুতর কিছু ঘটেছে।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, আজ সকালে বিশু গট-ওয়েত রেকর্ড করেছি মিনিট দশেক। ও টের পায়নি? বললেন শশাঙ্কনাথ।

—না। অ্যাকোয়ারিয়ামের ইনডিকেটর বাঘটার কানেকশান অফ করে রেখেছিলুম। তাই ও বুঝতে পারেনি, মেশিন চালিয়েছি। অবশ্য বেশিক্ষণ রেকর্ড করতে ভরসা পাইনি, যদি সন্দেহ করে উঠে মেশিনঘরে গিয়ে দেখে!

—কী পেলি? অমরের প্রশ্ন ও-ই ফাস করেছে। আমি নামটুকু মাত্র ওর কাছে উল্লেখ করেছিলাম। বিশু তারপর অমরের হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন নিয়ে ভেবেছে। কিন্তু এতে আমি অবাক হইনি খুব একটা, এ আমি আশাই করেছিলাম। আমি আশ্চর্য হয়েছি, ও ডক্টর আয়ারের নাম জানল কী করে? আয়ারের সঙ্গে কি বিশুর যোগাযোগ হয়েছে?

—বিশু যে তোর চেনা আয়ারের কথা চিন্তা ছিল, তার প্রমাণ।

সঠিক প্রমাণ নেই, আমার বিশ্বাস। দুইয়ে দুইয়ে চার, এ-ই আর কী! অর্থাৎ গভীর ষড়যন্ত্র! শশাঙ্ক চিন্তিতভাবে মস্তক আন্দোলিত করলেন। প্রিয়রঞ্জন বললেন, বিশু একটা প্ল্যান করেছে আজ সন্ধ্যায়। টুকরো টুকরো এলোমেলোভাবে ভাবছিল। সেই প্রসঙ্গে আয়ারের নামও ভেবেছে।

—আজ বিকেলে কেন?

—ঠিক বুঝছি না। তবে আজ সন্ধ্যায় আমি বাড়ি থাম্ব না, ও জানে। কিন্তু ঠিক কী করতে চায় বুঝতে পারছি না।

বাড়িতে আর কে থাকবে? -শুধু বংশী। অম! এক হিসাবে এ ভালোই হল। -বললেন শশাঙ্কনাথ, বিশুর যদি কোনো বদ মতলব থাকে, আজই হাতে-নাতে ধরব। তুই লেকচার শোনা বাদ দে। আজ আমরা লুকিয়ে শ্রীশানের কার্যকলাপ ওয়াচ করব।

-কোথা থেকে?

-না না, ওয়াচ করার দায়িত্ব তোর নয়, সে ব্যবস্থা আমার। আমরা দুজন অপেক্ষা রব আমার ভগ্নীপতি বঙ্কিমের বাড়িতে। তারপর যথাসময়ে অকুস্থলে হাজির হব। নয়তো আমাদের কাউকে মিত্রভবনের কাছে ঘোরা-ফেরা করতে দেখলে বিশু সাবধান হয়ে যাবে।

—কে ওয়াচ করবে?

সে আমি ব্যবস্থা করব, তোকে ভাবতে হবে না। তুই বিকেলে বাড়ি ফিরেই লেকচার শোনার নাম করে বেরিয়ে পড়বি। শ্যামবাজার কফি হাউসের সামনে আমি অপেক্ষা করব। তারপর দুজনে চলে যাব বঙ্কিমের বাড়ি। দেখা যাক কী হয়। আমার কিন্তু দারুণ থ্রিল লাগছে রে!—উৎসাহিত শশাঙ্কনাথ প্রিয়রঞ্জনের পিঠ চাপড়ে দিলেন—হ্যা, একটা কথা, বংশীকে ছুটি দিয়ে দিস, ধরু, সিনেমা দেখার। বাড়ি যেন একদম ফাঁকা থাকে। মানে, শুধু বিশু থাকবে। তারপর জমবে নাটক।

নয়

ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

টেলিফোন আর্তনাদ করামাত্র শশাঙ্কনাথ লাফ দিয়ে উঠে রিসিভার কানে লাগালেন। একটুক্ষণ শুনলেন কারও কথা। চাপা স্বরে বললেন, বেশ যাচ্ছি আমরা। রিসিভার নানালেন তিনি।

বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে টেলিফোনের সামনে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন শশাঙ্কনাথ এবং প্রিয়রঞ্জন। প্রিয়রঞ্জনের উৎসুক চোখে প্রশ্ন ফুটে ওঠে। শশাঙ্কনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, বংস, উত্তিষ্ঠিত! জাগ্রত ! ডাক এসেছে।

মিত্রভবনের কাছে প্রিয়রঞ্জনের গাড়ি এসে থামল। নামলেন দু'জনে। জানুয়ারির শেষ। শীতের সন্ধ্যায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে কুয়াশায়। কত গাঢ় হয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। পথচারীর সংখ্যা কম। তীব্র হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে ট্রাংক রোড ধরে। ছুটে যাচ্ছে প্রাইভেট মোটর, লরি, বাস।

একটি মানুষ কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে নিঃশব্দে গাড়ির গা ঘেষে দাড়াল। শশাঙ্কনাথ ডাকলেন—এই যে ডাম্বেল!

ডাম্বেল নামধারী যুবক দৃঢ়শরীর, দীর্ঘকায়। পরনে কালো রঙের ফুল প্যান্ট ও ছাইরঙা গরম সোয়েটার।

ইনি হচ্ছেন ডাম্বেল, মানে ডাক-নাম আর কী! -পরিচয় করিয়ে দিলেন শশাঙ্কআমার বোনপো এবং এখানকার থানার সাব ইন্সপেক্টর। ভালো নাম সুব্রত না। আজকের 'অপারেশনের জন্যে এর সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছি। এতক্ষণ ও-ই তোমার বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল। প্রিয়রঞ্জন ও সুব্রত নাগ ওরফে ডাম্বেল পরস্পরকে নমস্কার জানালেন। শশাঙ্কনাথ বললেন, ডাম্বেল, তুমি বলহ, বিশ মিনিট চল্লিশ হল মিত্রভবনে ঢুকেছে?

—সঙ্গে আর একটা লোক ছিল?

—হু।

—আর বেরোয়নি?

এবার কী কর্তব্য?

—আমাদের বাড়িটায় ঢোকা উচিত। ওরা কী করছে দেখা যাক।

—উত্তম। জোরে জোরে বারকয়েক নিঃশ্বাস টেনে, হাতের মুঠো বারকয়েক খোলা-বন্ধ করে, বুক চিতিয়ে এগোলেন শশাঙ্কনাথ। পিছনে চললেন সুব্রত এবং প্রিয়রঞ্জন। তিনঙ্গনে এসে থামালেন মিত্রভবনের গেটের পাশে পাঁচিলের আড়ালে।

অন্ধকার মিত্রভবন। গেটের সামনের আলোটা জ্বলছে না। বাড়ির মেনো জানলায় আলোর চিহ্ন নেই। বেশির ভাগ জানালার বাট বন্ধ।

ওই ঘরে আলো জ্বলছে। -আঙুল তুলে দেখালেন প্রিয়রঞ্জন—এটা আমার শোওয়ার ঘর, তালা দেওয়া থাকে। আশ্চর্য!

অন্যরা দেখলেন, দোতলার একটা ঘরে ঘুলঘুলি-পথে ক্ষীণ আলোর রেখা চুইয়ে আসছে।

সুব্রত তৎপর হলেন—চলুন ভিতরে। আমায় পথ দেখান। একদম শব্দ করবেন না। সদর দরজা ঠেলতে বোঝা গেল, ভিতর থেকে তা বন্ধ। আর কোনো পথ আছে ভিতরে ঢোকার? – জিজ্ঞেস করলেন সুব্রত। আছে, খিড়কি-দরজা। জানালেন প্রিয়রঞ্জন। খিড়কি-দরজায় মস্ত তালা ঝুলছে। প্রিয়রঞ্জন বললেন, বংশী তালা দিয়ে বেরিয়েছে। সিনেমা দেখে এই পথে ঢুকবে।

সুব্রত পকেট থেকে কয়েকটা সরু লোহার কাটা বের করলেন। তালার গর্তে ঢুকিয়ে বারকয়েক এপাশ-ওপাশ চাপ দিতেই হঠাৎ খট করে তালাটা খুলে গেল।

শশাঙ্কনাথের চক্ষু ছানাবড়া। ফিসফিসিয়ে বললেন, হ্যাহে ডাম্বেল, তুমি পুলিশ, না, চোর?

চোর ধরতে গেলে চোরের ট্রেনিংও কিছু কিছু জানা দরকার। মুচকি হেসে চাপা স্বরে বললেন ডাম্বেল।

দরজা কিন্তু খুলল না। ভিতর থেকে খিল বন্ধ।

এ নিশ্চয়ই বিশুর কীর্তি।—প্রিয়রঞ্জন বললেন, বংশী যাতে না তার অজান্তে বাড়ি ঢুকে পড়ে, তার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সুব্রত ওরফে ডাম্বেল এবারও দমলেন না। সরু একটা লোহার পাত বের করে দুই কৰাটের কে দিয়ে গলিয়ে খিলটা তুলে এমন কায়দায় নামলেন যে, কোনো শব্দ হল না।

ভিতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকার উঠোন। রান্নাঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলতে খুলে গেল। ঘুটঘুট করছে ভিতরে।

সুব্রত টর্চ বের করলেন। তিনজনে নিঃশব্দে চললেন রান্নাঘর পেরিয়ে ভিতরের প্যাসেজে। তারপর সিড়ি ধরে দোতলায়।

প্রিয়রঞ্জনের শয়নকক্ষের দরজা ভেজানো। সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে কপাটের হ্যাক পয়ে। সুব্রত আঙুলের ঠেলায় কপাট আর এক ফাঁক করে ইশারায়

ডাকলেন প্রিয়রঞ্জনকে।

প্রিয়রঞ্জন দেখলেন, ঘরের মধ্যে দু'টি লোক। একজন বিশু, দ্বিতীয় জন অচেনা। অচেনা লোকটি গাঁট্টাগোট্টা, ফুলপ্যান্ট ও হাতকাটা স্পোর্টস গেঞ্জি-পরা। দেওয়ালের ধারে রাখা একটা স্টিল ক্যাবিনেটের সামনে দাড়িয়ে ল জানি যেন করছে সে। পাশে লোহার আলমারিটা হাট করে খোলা। পড়ার টেবিলের ওপর একরাশ কাগজপত্র। বিশু একখানা বড় নকশা-আঁকা কাগজ উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতির তলায় মেলে একমনে পরীক্ষা রছে। প্রিয়রঞ্জনের মুখ লাল হয়ে উঠল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। সুত্রত আস্তে তার হাতে চাপড় দিয়ে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলেন।

সহসা চাপা হর্ষধ্বনি শোনা গেল ঘরে। অচেনা লোকটি একটানে ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার খুলে ফেলেছে।

বাঃ!-বলে বিশু হাতের কাগজখানা টেবিলে রেখে তার কাছে এগিয়ে এল। বলল, এর মধ্যেই বাকি র-প্রিন্ট আর ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলো আছে। এই ঘরেই সৰ রাখেন ডক্টর রায়, আমি জানি। বাহাদুর বটে তুমি, এত চটপট খুলে ফেললে!

বিশুর প্রশংসা-বাক্যে দ্বিতীয় লোকটির বুলডগের মতো মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। ফুটল।

ইন্সপেক্টর সুব্রত নাগ চকিতে কপাট খুলে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, ব্যাপার কী? ছছানেলাল, তোমার সাহস তো কম নয়! ফের অমির এলাকায় বিশু ও তার সঙ্গী যেন ভূত দেখল। কয়েক মুহূর্ত তারা থ হয়ে রইল। কিন্তু ছছানেলাল অতি তৎপর। ত্বরিত গতিতে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোর সুইচটা অফ করে দিল সে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজার গোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন সুব্রত। তারপরই প্যাসেজের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ফের জ্বলে উঠল বান্ধ। ঘরের নয়, প্যাসেজটার। জ্বেলে দিয়েছেন প্রিয়রঞ্জন।

মেঝের ওপর দেখা গেল দুই যুযুধান মূর্তিছোনেলাল এবং সুব্রত। ছোনেলালকে বজ্র-আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরেছেন সুব্রত, হোনেলাল প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। বিশুর দেখা নেই। সে কি পালিয়েছে?

সহসা ছোনেলালের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুসি কাল সুব্রত, হোনেলালের চিবুক কেটে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। এলিয়ে পড়ল সে। সুব্রত কঠিন গলায় বললেন, বাড়াবাড়ি কোরো না ছেনে, পালাতে গেলে গুলি করব। আমার কাছে রিভলবার আছে।

ছোনেলাল নিথর হয়ে গেল। আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না সে।

সহসা ঘরের মধ্য থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এল একজন বিশু। এতক্ষণ ঘরেই ছিল সে। দুদ্দাড় করে সে ছুটল প্যাসেজ দিয়ে সিড়িতে নামার দরজা লক্ষ্য করে।| শশাঙ্কনাথ প্যাসেজের কোণে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে কঁাধ ম্যাসাজ করছিলেন। পলায়মান ছোনেলালের সঙ্গে অন্ধকারে তার দেহের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ছোনেলাল পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। ইত্যবসরে সুব্রত ঝাপিয়ে পড়েছিল ছোনের ঘাড়ে। কিন্তু সংঘর্ষে বেচারা শশাঙ্কনাথের অবস্থা কাহিল। বিশু একলাফে সুব্রত ও ছছানেলালকে টপকে পেরিয়ে শশাঙ্কনাথের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, নিজের ব্যথা ভুলে তক্ষুণি পা চালালেন শশাঙ্কনাথ। সেই দশ পদাঘাতে দেওয়ালে যা খেয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল বিশু। যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। মনে হল, কোমরে আঘাত পেয়েছে। শশাঙ্কনাথও ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গিয়েও ফের চট করে উঠে ভূলুষ্ঠিত বিশুর বুকের ওপর চেপে বসলেন। ওই বিপুল দেহভারে চাপা পড়ে আর নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না বিশুর।

কাধের বেদনা ভুলে শশাঙ্কনাথ একগাল হেসে বললেন, দেখলি ডাম্বেল, এখনও কী বডি ফিট। বাবা, স্কুল-কলেজের টিমে স্টপার খেলতাম যে!

পকেট থেকে সরু শক্ত দড়ি বের করে ছেনেলাগের হাত পিছমোড়া করে বাঁধলেন সুব্রত, তার পাও বাঁধলেন। দেখাদেখি শশাঙ্কনাথ তার রুমাল বের করে বিশুর দুপায়ে পেচিয়ে গিট লাগালেন।

আপনারা দাঁড়ান, আমি আসছি।-বলে সুব্রত গটগট করে একতলায় নেমে গেলেন। একটু বাদেই হুইসলের তীক্ষ্ণ ধ্বনি শোনা গেল। পরক্ষণেই দু'জোড়া বুটের আওয়াজ উঠে এল ওপরে। সুব্রতর সঙ্গে এসেছে এক পুলিশ কনস্টেবল।

এবার এদের থানায় নিয়ে যাই? —সুব্রত জিজ্ঞেস করেন। সুব্রতবাবু।

ইঙ্গিতে ডাকলেন তিনি সুব্রতকে। তিনজনে প্রিয়রঞ্জনের ঘরে প্রবেশ করে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। বন্দিদের পাহারায় রইল সেপাই।

টেবিলের ওপর জড়ো করা মেশিনের ডিজাইন আঁকা কাগজ এবং কিছু টাইপ কাগজের তাড়া দ্রুত পরীক্ষা করলেন প্রিয়রঞ্জন। আলমারির ভিতরে এবং ক্যাবিনেটের ড্রয়ারগুলোর ভিতরটা দেখলেন উলটে-পালটে। তারপর নিশ্চিতভাবে বললেন, যাক, সব ঠিক আছে। এদের নিয়ে এখন কী করতে চান সুব্রতবাবু?

—হাজতে পুরব। তারপর কেস হবে। আপনার বাড়িতে চুরির চার্জ। আমি কেস করতে চাই না।—বললেন প্রিয়রঞ্জন।

কেন? – মামা-ভাগ্নে দুজনেই অবাক।

কারণ, বিশু কাঠগড়ায় দাঁড়ালে উকিলের জেরায় আমার রিসার্চ সম্বন্ধে অনেক কথা জানাজানি হয়ে যাবে। তাতে আমার ক্ষতি হবে।

ইন্সপেক্টর সুব্রত বুদ্ধিমান লোক। প্রিয়রঞ্জনের রিসার্চ কী নিয়ে, কী তার গুঢ় রহস্য, এসব না জেনেও ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললেন তিনি। বললেন, বেশ, আপনার যা মর্জি। ওদের বিরুদ্ধে আপনার বাড়িতে চুরির সে আনৰ না। তবে ছোনেলালকে ছাড়ছি না। দু-দুটো সিন্দুক ভাঙার কেসে পুলিশ ওকে অনেক দিন ধরে খুঁজছে।

বিশুটা শয়তান, ওর শাস্তি হওয়া উচিত। কিঞ্চিৎ উমাসহ জানালেন শশাঙ্কনাথ।

বলেন তো ওকে অন্য কেসে জড়িয়ে দিই। থানায় নিয়ে দু'চার ঘণ্টা উত্তম-মধ্যম দিই। কিছুটা শাস্তি হোক!

—মামার সমর্থনে যোগ দিলেন সুব্রত নাগ ওরফে ডাম্বেল। থাক্। কিছু শাস্তি ও পাবে। তাছাড়া একটা চান্স দিই ওকে। জেলে গেলে ও পাশ। ক্রিমিনাল বনে যাবে। আর ভদ্রভাবে বাঁচার উপায় থাকবে না ওর।

—বললেন প্রিয়রঞ্জন।

তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পাড়ে, ইসঙ্গে থানামে লে যাও। ছোনেলালকে দেখিয়ে হুকুম দিলেন সুব্রত। সিপাহিজি হোনের পায়ের বাধন খুলে জামা ধরে হ্যাচকা টানে তুলল তাকে। অতঃপর তার ঘাড়ে এক রক্ষা কষিয়ে ঠেলা মেরে বলল, চল বুবাক!

ছোনে মহাধূর্ত। সে আন্দাজ করে নিল, তার ভাগ্যেই থানা-পুলিশ ঝুলছে, বিশু বোধহয় বেকসুর খালাস পাবে। কয়েক পা গিয়ে থমকে ফিরে কর্কশ গলায় সে বলল, এ বিশুবাবু, হামার পাওনা হাজার রুপেয় হামার শারেদের হাতে ঠিক জমা করে দিবেন।

আঁ!—বিশুর গলা দিয়ে অর্ধযুট আর্তনাদ বেরোল। হামার ডিউটি হামি করেসি, লেকিন টাকা না দিলে বহুৎ মুশকিল হোবে, হাঁ।ছোনে। চোখ পাকাল।

চল চল বেল্লিক কাহাকী! সেপাইয়ের সম্ভাষণ মধুর ধাক্কা খেতে খেতে ছোনে সিড়ির পথে অদৃশ্য হল। ফ্যাকাসে মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে রইল বিশু।

সুব্রত বিশুর পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে আদেশ করলেন,—উঠে দাঁড়াও! বিশু কাঁপতে কাঁপতে উঠল। এ কাজ কেন করলে?—কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন প্রিয়রঞ্জন। বিশু চুপ। –কে তোমায় পাঠিয়েছে? কে চুরি করতে বলেছে? সত্যি করে বলো? বিশু নীরব। তার মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। —ডক্টর আয়ার, তাই না? ভীত চোখে একবার চকিতে মুখ তুলে তাকিয়ে বিশু আবার মাথা নামাল।

বুঝেছি, বললেন প্রিয়রঞ্জন, শোন বিশু, এবার তোমায় মাপ করছি, পুলিশে দেব। কিন্তু ভবিষ্যতে এ বাড়িতে তুমি আর কখনও পা দেবে না। যাও, বেরিয়ে যাও!

ভয়ে, লজ্জায়, যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ বিশু একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না, কারও দিকে তাকাতে পারল না, ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল।

শোনো, ডাকলেন প্রিয়রঞ্জন—এখন তোমার ঘরে ঢুকবে না। সোজা চলে যাও। আমি তোমার ঘর সার্চ করব। দেখব কী শ জিনিস তুমি চুরি করে রেখেছ। হ্যা, মনে রেখো, আমার যন্ত্রের সাহায্যে অনেকের গোপন কথা জেনে নিয়ে তুমি

তাদের ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছ, এ খবর আমি জানি তাদের নাম-ঠিকানাও আমি জানি। ভবিষ্যতে এ চেষ্টা ফের করেছ কি তোমায় ঠিক পুলিশে দেব।

বিশু ক্ষণকাল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বেরিয়ে গেল।

আমি ওকে বিদায় করে আসছি।-বলে সুব্রত বিশুকে অনুসরণ করলেন। কিছু পরে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। সুব্রত ফিরে এলেন।

যাক, ঝঞ্ঝাট মিটল! প্রিয়, এবার কিন্তু সাবধানে থাকিস। আয়ার অতি ঘুঘু লোক। —বললেন শশাঙ্কনাথ।

প্রিয়রঞ্জন চেয়ারে বসে পড়েছেন। উত্তেজনার শ্রান্তিতে হয়তো অবসন্ন বোধ করছেন তিনি। শশাঙ্কের কথায় মৃদুস্বরে বললেন, ই, ঠিক আমার আগেই সাবধান হওয়া উচিত বলে তিনি উঠে পড়ে ডাকলেন—ঘরে আয় শশাঙ্ক। সুব্রতবাবু, আপনিও আসুন। আপনাদের সাক্ষী রেখে আমি একটা কাজ করতে চাই।

ক্যাবিনেট ও আলমারি থেকে বেছে বেছে এক টেবিলে রাখলেন প্রিয়রঞ্জন। কাগজগুলো দেখিয়ে বললেন, এর মধ্যে আছে আমার নকশা ও টাইপ করা কাগজ আবিষ্কারের চাবিকাঠি, আমার চিন্তা-গ্রাহক যন্ত্রের প্রিন্ট আর কনি।

প্রিয়রঞ্জনের চোখ-মুখ কী এক চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে, লাল হয়ে উঠেছে। একটা মোমবাতি জ্বালালেন তিনি। তারপর যা করলেন, দেখে শশাঙ্কনাথ ও সুব্রত থ হয়ে গেল।

কাগজের মোটা এক বান্ডিল পাকিয়ে প্রিয়রঞ্জন মোমবাতির শিখায় ধরলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কাগজগুলো।

এ কী! প্রিয়, তুই কি পাগল হলি? শশাঙ্কনাথ প্রিয়রঞ্জনের হাত চেপে ধরলেন।

পাগল হইনি। মৃদুটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন প্রিয়রঞ্জন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, খুব ভেবেচিন্তেই আমি এ কাজ করছি। আমার আবিষ্কার আমি নিজের হাতেই ধ্বংস করে ফেলব। কিন্তু কেন? তোর এতদিনের সাধনা, পরিশ্রম! – শশাঙ্কনাথ থই পান না।

—ঠিক, আমার বহুদিনের সাধনা এসব। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ আবিষ্কার মানব-সমাজে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করবে। মানুষের সৎ প্রবৃত্তির চেয়ে তার অসৎ প্রবৃত্তিই বেশি প্রবল। মানুষের লোভের সীমা নেই। মানুষের সব গোপন চিন্তাকে চুরি করে জানলে আমাদের সমাজ-সংসার হয়তো তছনছ হয়ে যাবে। আমার গুরু ডক্টর রজার্স আমায় এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তখন আমি শুনিনি, বিশ্বাস করিনি, এতটা ভেবে দেখিনি। আমার মত পালটে গিয়েছে। রজার্স ঠিকই বলেছিলেন।

হঠাৎ তোর মত পালটাল কেন? —শশাঙ্কনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

—হঠাৎ নয়, একটু একটু করে পালটেছে। অমরেন্দ্র, সমীর, বিশু, এদের কেসগুলো ভেবে দেখ। আমার মেশিন তাদের উপকার করেছে, না, সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে? ঠিকমতো মানুষের কল্যাণে এ মেশিন ব্যবহার করা বোধ হয় সম্ভব হবে না। কিছুদিন ধরেই আমার মনে এই সন্দেহ জাগছিল, থাক, আপাতত সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলি, রাতে মেশিনের পার্টসগুলো আলাদা করে ফেলব। ব্যস, ইতি। সুব্রতবাবু, অনেক ধন্যবাদ। এই চুরি ঠেকিয়ে মানুষের মত উপকার করলেন। আমার পেপারস আয়ারের হাতে পড়লে সর্বনাশ হত।

সেই অমূল্য গবেষণাপত্রগুলির ধুমায়মান বহ্নি-উৎসব দেখতে দেখতে শশাঙ্কনাথ বিড়বিড় করেন, কী আশ্চর্য আবিষ্কার! ইস্।

প্রিয়রঞ্জন, যেন নিজের হাতে নিজের চিতায় অগ্নিসংযোগ করে চলেছেন। বিষয় দৃষ্টি তার লেলিহান শিখার প্রতি নিবদ্ধ। অন্তরের অন্তঃস্থলে তীব্র ব্যথার আলোড়ন, কিন্তু বাইরে ধীর, সংযত।

ইন্সপেক্টর সুব্রত নাগ নীরব দর্শক। এক বিচিত্র নাটকের অভিনয় দেখছেন তিনি। তার

স্মৃতির মণিকোঠায় এই ঘটনা, এই দৃশ্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।

একটু হেসে বললেন প্রিয়রঞ্জন, শশাঙ্ক, দুঃখ করিস না। আমার এই রিসার্চের অভিজ্ঞতা নষ্ট হবে না। আমি আর এক নতুন লাইনে গবেষণা করব, ঠিক করেছি। তাতে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাব। অবশ্য আর ভুল করছি না। যদি নতুন আবিষ্কার সফল হয়, তাকে শুধু মানুষের ভালর জন্যেই ব্যবহার করা যাবে।

প্যাসেজে পায়ের শব্দ। দরজায় উকি দিল বংশী। সিনেমা দেখে ফিরেছে। ঘরে জ্বলন্ত কাগজের স্তুপ দেখে সে ‘ফ্রিজ’ হয়ে গেল।

বংশী, এই পোড়া কাগজগুলো সাফ করে ফেল। আর তিন কাপ কফি বানাও, —বললেন প্রিয়রঞ্জন। কফি কি এ ঘরে দেব?—বংশী জানতে চাইল।

নাঃ! ঘরটা বেজায় নোংরা হয়েছে। নিচে ড্রইংরুমে দাও। কী রে শশাঙ্ক, ড্রইংরুমে বসতে বোধকরি তোর আর আপত্তি নেই?

সমাপ্ত

জোনাকিদের বাড়ি এক পেখম স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আকাশের বন্ধু ইন্দ্রনীল সান্যাল

জোনাকিদের বাড়ি চব্বিশ পুশকিন স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

মরণের মুখে - অজেয় রায় Moroner Mukhe by Ajeo Ray

এক

সকাল দশটা নাগাদ।

ভবানী প্রেসের সামনে সাইকেল থেকে নামল দীপক। একবার টু মেরে যাই সম্পাদকের ঘর।

ভবানী প্রেসের এক কোণে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তার ছোট্ট অফিসঘর। দীপক দরজা ঠেলে মুখ বাড়াতেই সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি যথারীতি গমগমে গলায় আহ্বান জানালেন -"এসো দীপক।।

দীপক ঢুকল। কুঞ্জবাবুর সামনে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে। ছোটখাটো চেহারা। ফরসা রং। মানুষটিকে দেখেছে দীপক, তবে পরিচয় নেই। কুঞ্জবিহারী বললেন দীপককে, 'কি কোনো ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে? কয়েক হপ্তা মোটে ভালো স্টোরি যাচ্ছে।

সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি হোড়।

দীপক চেয়ারে বসতে বসতে মিনমিন করে—'নাঃ তেমন কিছু নেই। শুধু ওই হনুমানের বিয়ে দেখা। 'কী রকম?' নড়েচড়ে বসেন কুঞ্জবিহারী।

গত শুক্রবার মানে তিন দিন আগে নানুরের কাছে একটা বিয়ে ছিল। কী সব স্ত্রী-আচার হচ্ছিল সকালে। হঠাৎ কোথেকে একটা গোদা হনুমান একদম ঘাড়ের কাছে। পাঁচিলে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে ব্যাপার। ভয় পেয়ে সব মেয়েরা মায় কনেসুদ্ধু । মারে ছুট। ছেলেরা লাঠিসোটা দেখিয়ে হনুটাকে তাড়ায়। কিন্তু সে বেটা নাছোড়বান্দা। ওইসব অনুষ্ঠান যেখানেই হয় ঠিক গিয়ে উকি দেয়। শেষে লোকে হাল ছেড়ে দেয়। থাকুকগে। ওকে আর ডিসটার্ব করে না। হনুমানটাও কোনো গোলমাল করে না। খুঁটিয়ে দেখে সব। বিকেলে ওকে কিছু কলা-মুলো দেওয়া হয় খেতে। হাজার হোক নেমন্তন্নবাড়ি। তাই দিয়ে তৃপ্তিসহ ভোজ সেরে হনুটা বিদায় নেয়। লোকে বলছে ও নাকি আশীর্বাদ করে গিয়েছে। বর-কনের মঙ্গল হবে। এই নিয়ে খুব গুজব ছড়াচ্ছে। কাল খবর নিতে গিয়েছিলাম নানুরে।

কুঞ্জবিহারী তার ঝাটার মতো গোঁফজোড়া নাচিয়ে বললেন, "হুম ইন্টারেস্টিং। একটা স্টোরি করে দাও। দেখচ, অন্য জীবদের মানুষ সম্বন্ধে কেমন কৌতূহল।'

সম্পাদকের সামনে বসা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কেন থাকবে না মশাই? মানুষের যখন অন্য জীবজন্তু নিয়ে এত মাথাব্যথা! ওঃ, কত রকম মানুষ যে হয়। এই তো ক'দিন আগে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের শখ হচ্ছে সাপ। দিনরাত সাপুড়েদের কাছে ঘুরঘুর করেন। আবার সাপ পোষেন। উদ্ভট খেয়াল। ইস সাপ মশাই আমি দু'চক্ষে

মরদেয় মুখে।। ৩০৩ এরি না। এই নিয়ে আবার কেউ রিসার্চ করে! এর চাইতে নানুরের ওই হনুমান

দেখতে পারি না। এই

তিনি কোথায় থাকেন? কী নাম?' কৌতূহলী দীপকে প্রশ্ন।

সালোক দীপকের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করতে কুঞ্জবাবু বললেন— আলাপ করিয়া দিই। এর নাম বগলাচরণ দত্ত। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার।।

দীপক ও বগলাচরণ পরস্পরে নমস্কার জানায়। তারপর বগলাবাবু বলেন

‘সেই ভদ্রলোক থাকেন সিয়েনের কাছে। বীরভূমের লোক নন। বাইরের লোক। সিয়েনের কাছে একটা বাসা ভাড়া করে রয়েছেন কিছুদিন। সাপ আর সাপুড়ের খোঁজে বীরভূমের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গোটা পশ্চিমবঙ্গেই নাকি ঘুরছেন এই উদ্দেশ্যে। নাম বললেন, হরিবাবু। হরিহর নাগ। নাগ বংশীয় কিনা, তাই বোধহয় সর্পকুলের ওপর এত টান। খিকখিক করে হাসেন বগলাচরণ।

‘‘কি, হরি নাগের একটা ইন্টারভিউ নেবে নাকি?' সম্পাদকের মন্তব্য। ‘তাই ভাবছি', দীপক মাথা ঝাকায়। ‘বেশ, লেগে যাও।' সম্পাদক উৎসাহ দিলেন, ‘ইন্টারেস্টিং কিছু পেতেও পার।' সম্পাদকের কথাগুলো মনে রেখে দীপক বিদায় নেয়।

দুই

হরিহর নাগ যে বাসায় থাকেন সেটা গ্রামের এক প্রান্তে। বহু পুরনো দোতলা পাকাবাড়ি। বাড়ির চারধারে অনেকখানি এলাকা। এখন বড় বড় গাছ আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। পুকুরটা মজে গিয়েছে। একসময় ধনী সরকার পরিবারের বাস ছিল বাড়িটায়। তবে এখন গোটা বাড়ি ফাকা পড়ে থাকে প্রায় বছরভর। পরিবারের সবাই প্রায় গ্রাম ছেড়েছে। চাষের জমিও প্রায় সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু প্রাচীন গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ জীর্ণ বাড়িটা টিকে আছে কোনোরকমে। সরকারদের একটি পরিবার এখনও আছে বটে ভিটে আগলে কিন্তু তারা থাকে পুরনো বাড়ি থেকে খানিক তফাতে। মাটির বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। পুরনো বাড়িখানার যা দশা, কোনোদিন না ভেঙে পড়ে ছাদ। তাছাড়া এতকাল বাকা পড়ে থাকায় ভূতুড়ে বলেও কিঞ্চিৎ বদনাম হয়েছে সরকার বাড়ির। হরিবাবু সরকারদের এই পাকাবাড়ির নিচের তলায় কয়েকটা ঘর নিয়েছেন নামমাত্র ভাড়ায়। সাফ করে থাকছেন। ওঁর ভূত বা সাপখোপের ভয় নেই। একদম একা থাকেন না অবিশ্যি। কালুয়া বলে একটি লোক থাকে সঙ্গে। কালুয়া জাতে সাপুড়ে। ওর বাড়ি নাকি বীরভূমেই। লাভপুরে। হরিবাবুর সঙ্গে এসেছে। সে হরিবাবুর কাজকম্ম করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেও। সাপুড়ে বলেই কালুয়ার সাপ সম্পর্কে ভয়ডর নেই। নইলে যে সাপ পোষে তার সঙ্গে অন্য লোক কেউ থাকত না।

হরিবাবু সম্বন্ধে এসব জানল দীপক গ্রামের লোকের মুখে। বঙ্গবার্তা দফতরে হরিহর নাগের কথা শোনার কয়েকদিন বাদে এক দুপুরে সে হাজির হয় হরিবাবুর বাসায়। হরিবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন না। কেউ ছিল না বাসায়। ঘর তালা বন্ধ।

দীপক ফিরে যায়নি। এই অবসরে সে গ্রামে ঘুরে হরিবাবু এবং সরকার বাড়ি সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড় করল। তবে গায়ের লোকের হাবভাব দেখে তার একটা সন্দেহ হল যে এই আগন্তুককে গাঁয়ের লোক বিশেষ পছন্দ করে না। হয়তো বা হরিবাবুর উদ্ভট খেয়ালের কারণে। গ্রামের মান্যগণ্যরা বেশ একটা অবজ্ঞা ও বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করল হরিবাবু সম্পর্কে। তবে সোজাসুজি কোনো বদনাম দিল না কেউ। হরিবাবুর চেয়ে হরিবাবুর সঙ্গী কালুয়া সম্পর্কেই মনে হল। গাঁয়ের অপছন্দ বেশি। কারণটা ঠিক ধরতে পারে না দীপক।

হরিবাবু ফিরলেন বিকেলে।

বগলাচরণের মুখে যা বর্ণনা শুনেছিল তাই মিলিয়ে হরিবাবুকে আন্দাজ করে দীপক। লম্বা রোগা। পাকানো শরীর। বয়স বছর চল্লিশ। লম্বাটে মুখ। রোদে পোড়া শ্যামবর্ণ। খাড়া নাক। চাপা ঠোট। রগের চুলে একটু পাক ধরেছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের জুতো। কাধে একটা চটের ব্যাগ।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলায় মেঠো পথ বেয়ে বড় বড় পা ফেলে এলেন ভদ্রলোক। তার বেশ খানিকটা পিছনে আসছিল আর একজন। লোকটির কাধে একটা বড়সড় থলে।

ভদ্রলোক সরকার বাড়ির জঙ্গুলে এলাকায় ঢোকার মুখে দীপক এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কা। আপনি কি শ্রীহরিহর নাগ?

ভদ্রলোক থমকে গিয়ে বললেন, হ্যা। ‘‘আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আপনি নাকি সাপ নিয়ে রিসার্চ করছেন?'

‘‘আপনি?’ হরিহরবাবু ভুরু কোচকান।

‘আমার নাম দীপক রায়। রিপোর্টার।

‘কোন কাগজ?'

সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা।

বঙ্গবার্তা? কোথা থেকে বেরোয় ?

‘বোলপুর। আপনার একটা ইন্টাভিউ নিতে চাই।

আমার কথা শুনলেন কোত্থেকে?”

“শুনেছি,' রহস্যময় হাসে দীপক, রিপোর্টারদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয়।”

হরিহরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, “রিসার্চ গবেষণা অত বড় ব্যাপার আমি করি না। সাপ নিয়ে সামান্য কিছু স্টাডি করছি। জীবজন্তু নিয়ে আমার চিরকালই আগ্রহ। আপাতত সাপ নিয়ে পড়েছি। হু, যদি সাবজেক্টটা আরও সময় দিতে পারি, নতুন কিছু পাই, ইচ্ছে আছে একটা বই লিখব। শুধু সাপ নিয়ে নয়, সাপুড়েদের নিয়েও।'

‘আপাতত যা জেনেছেন তাই নিয়েই বলুন কিছু।

হরিহর রুক্ষস্বরে বললেন, 'মাপ করবেন। প্রেসকে এখন আমি ইন্টারভিউ দেব না। এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত আছেন। ভুলভাল কিছু বলে ফেললে এক্সপার্টরা আমার রক্ষা। রাখবেন না। সমালোচনা করে তুলো ধুনে দেবেন। আমি শখ করে এই নিয়ে মেতেছি। এখুনি সিরিয়াস ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

হরিহর সোজাসুজি ইন্টারভিউ দিতে নারাজ বুঝে দীপক কথা ঘোরায়। ‘আপনি কলকাতায় থাকেন?”

‘না। ব্যারাকপুরে। চব্বিশ পরগনা।

‘চাকরিতে ছুটি নিয়ে এই শখ মেটান বুঝি?

চাকরি করি না। ব্যবসা করি। মাঝে মাঝে ব্যবসা থেকে ছুটি নিয়ে শখ মেটাই।

‘আপনি কি সাপ পোষেন?”

“ঠিক পোষ মানাবার চেষ্টা করি না। তবে কিছুদিন রাখি নিজের কাছে।'

“কেন?”

‘তাদের ধরন-ধারণ স্টাডি করি বন্ধ ঘরে ছেড়ে দিয়ে। “বিষাক্ত সাপ?”

‘আপনি সেই ঘরেই থাকেন?”

‘থাকি কখনও কখনও।'

‘ডেঞ্জারাস। যদি কামড়ে দেয়?

“অবশ্যই বিষ বের করা সাপ। তাই কামড়ালেও মরি না।” ‘আপনি সাপ ধরতে পারেন?

সাপ পান কোথেকে?'

কিনি সাপুড়েদের থেকে।

‘বিদাত কামাতে পারেন?

না।”

‘তাহলে?”

'কখনও সাপুড়েরা কামিয়ে দেয়। কখনও কালুয়া কামায়।

‘কালুয়া মানে আপনার ওই সঙ্গী?”

‘হু। ওর খবরও পেয়েছেন দেখছি। কালুয়া জাতে সাপুড়ে। সাপ ধরতে পারে। বিষ ঝাড়তে পারে। তাই এ কাজে ওকে নিয়ে ঘুরি।'

কালুয়া নামে হরিহরবাবুর সঙ্গীটি খানিক তফাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ লক্ষ করেছিল দীপককে। তারপর হরিবাবু ইঙ্গিত করতেই সে ধীরপায়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে যায়।

কালুয়ার চেহারা বা ধরন-ধারণু বেশ অদ্ভুত। মোর কালো রং। মাথায় ঝাকড়া বাদামি চুল। পুরুষ্ট পাকানো গোঁফ। মাঝারি লম্বা। দারুণ গাট্টাগোট্টা। মুখ ভাবলেশহীন কঠিন। খুদে খুদে তীক্ষ চোখ! গায়ে ধুতি ও হাওলা গেঞ্জি। খালি পা।

‘আচ্ছা সাপগুলো কিনে কিছুদিন রেখে মানে অবসার্ভ করে তারপর কী করেন? বিক্রি করে দেন?'

‘না। বিক্রি করি না। ছেড়ে দিই।

‘ মানে?

হ্যা, ছেড়ে দিই। তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিই। ঝোপেঝাড়ে মাঠে ছেড়ে দিই।'

দীপক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হরিহরবাবু বলেন, “দেখুন আমি একজন অ্যানিমাল লাভার। জীবজন্তুকে বন্দি কর রাখা আমি অন্যায় বলে মনে করি। তারা ভারি কষ্ট পায়। ভাবুন তো জেলে আটকে রাখলে মানুষের কত বড় শাস্তি! যথেষ্ট আরামে রাখলেও। তবু বাধ্য হয়ে আমরা চিড়িয়াখানা বানাই। আর সাপুড়েরা যে সাপগুলোকে রাখে ঝাপির মধ্যে সারাক্ষণ, কী কষ্ট তাদের। মোট নড়াচড়া করতে পারে না। এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত। কিন্তু তাহলে আবার সাপুড়েরা ভাতে মরবে। উভয়ই সমস্যা।'

দীপক পুলকিত হয় হরিহরবাবুর কথায়। সে নিজেও জীবজন্তু খুব ভালোবাসে। বন্দি প্রাণী দেখলে কষ্ট পায়। তাই হরিবাবুর ব্যথা সে বোঝে। বলে, “ঠিকই বলেছেন। | হরিহরবাৰু উৎসাহিত হয়ে আরও বলেন, “দেখুন সাপুড়েদের ঝাপিতে দিনের পর দিন জড়সড় হয়ে থেকে সাপেদের আয়ু কমে যায়। বেশিদিন বাঁচে না বেচারিরা। অনেক সময় বন্দি মৃতপ্রায় সাপকে সাপুড়ে নিজেই ছেড়ে দেয়। তবে সে বড় শেষ সময়ে। আমি তার আগেই কিনে নিই খানিক তাজা সাপ। কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে স্টাডি করে ছেড়ে দিই তাদের, যাতে তারা আরও বেশ কিছুকাল বাঁচতে পারে। দুটো উদ্দেশ্যই সফল হয়। আমার ক্ষুদ্র সামথ্যে যেটুকু করা যায় আর কী।'

সদ্য ধরা একদম তাজা সাপ কিনে ছাড়লে তো আরও ভালো হয়। দীপক প্রস্তাব দেয়।

ভালো হয় ঠিকই। তবে সেরকম সাপের দাম খুব চড়া। সাপুড়েরা সহজে বিক্রি করতে চায় না। খেলা দেখায়। বিষ বিক্রি করে তাই বাধ্য হয়ে একটু পুরনো সাপ কিনি।'

হরিহর নাগ সম্বন্ধে দীপকের শ্রদ্ধা হল। ভদ্রলোকের বাইরের আবরণ রুক্ষ হলেও সত্যি জীবপ্রেমী। গ্রামের লোক একে অপছন্দ করে কেন? হয়তো

ভদ্রঘরের ব্যক্তির সাপ নিয়ে ঘাটাঘাটি পছন্দ নয়। আর একটা কারণ হতে পারে, হরিবাবুর সঙ্গী কালুয়া। ওর হাবভাব দীপকেরও ভালো লাগেনি।

দীপক ভাবল যে হরিবাবু ইন্টারভিউ না দিলেও ওঁর সম্বন্ধে নিউজ ছাপলে তো আটকাতে পারেন না। সে অধিকার আছে সাংবাদিকের। অতএব হরিহরের গতিবিধি কাজ ইত্যাদির খোজ আরও নিয়ে সে খবর ছাপবে বঙ্গবার্তায়। আশেপাশের গ্রামের লোক আর সাপুড়েদের থেকে শুনতে হবে হরিহরবাবুর সম্পর্কে।

তিন

দিন সাতেকের মধ্যে দীপক হরিহর নাগের বিষয়ে বেশ কিছু খবর পেল। বিচিত্র সব খবর।

নানান গ্রামের সাপুড়েরা জানাল যে হরিবাবু তাদের কাছে অনেক কিছু জানতে আসেন বটে। সাপুড়েদের জীবনযাত্রা। সাপ নিয়ে তাদের বিশ্বাস, পালাপার্বণ। সাপেদের রকমসকম। খাতায় লিখে নেন কী সব। প্রায়ই সাপ কেনেন। তবে ছোট সাপ কেনেন না। বড় বড় সাইজের সাপ কেনেন। বিষধর বা নির্বিষ যে কোনো সাপ। সাপ কে নিয়ে বড় দরাদরি করেন। কেনেন যথাসম্ভব কম দামে। ফলে পুরনো নির্জীৰ সাপই মেলে বেশি।

শুনে খারাপ লাগল দীপকের। হরিবাবু দীপককে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে মিলছে না।

যে কাজের ধারা। এতে হরিহরের সাপ কেনার প্রধান উদ্দেশ্যটাই যে বার্থ হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের কি অর্থের অভাব? অথবা কিপ্টে স্বভাব?

হরিহর যে গ্রামে বাসা বেঁধেছেন সেখানে খোঁজ করেও বিচলিত হয়। দীপক। গায়ের বেশির ভাগ লোক এই আগন্তুকের ওপর মহাখাল্লা হয়ে উঠেছে।

অন্য জায়গা থেকে সাপ এনে এই গাঁয়ে ছাড়বে—এইসব বন খেয়াল চলবে না। গায়ে বিষাক্ত সাপের অভাব নেই। প্রতি বছরই দু-একজন কামড় খায় বিষধরের। মারাও যায় কেউ কেউ। তার ওপর এই বাড়তি উপদ্রব কেন? গ্রামের লোক এই নিয়ে হরিহরকে ধমকেছে।

হবিহর নাকি বুঝিয়েছেন তাদের। তিনি এই গাঁয়ে বাইরে থেকে আনা সাপ কখনও ছাড়বেন না। সেগুলি ছেড়ে দেবেন গ্রামের সীমানা থেকে অনেক দূরে। গ্রামের লোক কিন্তু বিশ্বাস করেনি তার কথায়।

এই গ্রামের লোকের আর একটা ক্ষোভ কালুয়াকে নিয়ে। বেপরোয়া ধরনের লোকটা গাঁয়ের কাউকে যেন গ্রাহ্য করে না। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে গাঁয়ের লোকের ছোটখাটো খিটিমিটি হয়ে গিয়েছে। কালুয়ার গতিবিধি অতি সন্দেহজনক। রাতবিরেতে নিঃশব্দে কোথায় যায় আসে? লোকটা যে সুবিধের নয় তার প্রমাণ মিলেছে। এখানকার থানা থেকে পুলিশ এসে কালুয়ার খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে লোকটা নাকি লাভপুরে বছরখানেক আগে একটা ডাকাতির কেসে ফেঁসেছিল। বরাতজোরে প্রমাণ অভাবে সেবার ছাড়া পায়। তবে মারপিটের অভিযোগে বারককে অল্পকালের জন্য জেল খেটেছে। বোলপুর থানা ওর ওপর তাই নজর রেখেছে। এমন একটি কুখ্যাত সঙ্গী জেটিালেন কেন হরিবাবু?

গ্রামের লোক মনিব-ভূত উভয়ের ওপরই সতর্ক চোখ রাখছে। বেচাল দেখলেই তাদের তাড়িয়ে ছাড়বে।

ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয় দীপক। বেইজ্জত না হন। ওঁকে সাবধান করে দিলে হয়।

দাসপুর গিয়েছিল দীপক এক বন্ধুর শছে। কথায় কথায় বন্ধুটি বলল, 'কাল এক কাণ্ড হয়েছে। হরিহর নাগ নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন এ-তল্লাটে। নাম শুনেছিস?

‘হ্যা, শুনেছি। কেন?”

হরিহরবাবু নাকি সাপ পোষেন। সাপ নিয়ে রিসার্চ করেন। ‘হা, শুনেছি।'

ওঁর একটা চাকর আছে কালুয়া নামে। কাল যা ঘটেছে, গায়ের লোক কলুয়ার ওপর সাংঘাতিক চটে গিয়েছে।'

'কালুয়াটা ঘোষদের আমবাগান থেকে একটা মস্ত ঢ্যামনা সাপ ধরে নিয়ে গিয়েছে লুকিয়ে।'

"ঢ্যামনা ধরল কী করে! যা ছোটে।

‘সাপটা ব্যাঙ-ট্যাঙ কিছু খেয়ে নিজবে হয়ে পড়েছিল। নড়তে পারছিল না। সেই সুযোগে ধরেছে। আমবাগানটা গ্রামের সীমানায়। কালুয়া ওর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল দুপুরে।

তখন ধরে। একটা বাগাল ছেলে আগেই দেখেছিল সাপটা খাবার গিলে পড়ে আছে বাগানে। ছেলেটা দূর থেকে দেখে, কালুয়া ওখানে বসে কী জানি করল। তারপর চলে গেল। একটু বাদে বাগালটা গিয়ে দেখে সাপটা নেই। নির্ঘাৎ কালুয়ার কীর্তি। ওর মনিবকে দেবে।”

বন্ধুটি উত্তেজিতভাবে বলে, “ঢ্যামনা সাপ চাষির উপকারী জীব। ধেড়ে ইদুর খায় প্রচুর। ধেড়ে ইদুর কত ধান খেয়ে লোকসান করে চাষির। গায়ের লোক পারতপক্ষে ঢ্যামনা সাপ মারে না।'

‘হরিবারও মারবেন না। উনি সাপ এনে কিছুদিন রেখে অবসার্ভ করেন। তারপর ছেড়ে দেন।' দীপক ঠান্ডা করার চেষ্টা করে।

বন্ধুটি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, “ওঃ, এ গায়ের সাপ অন্য কোথাও ছাড়লে আমাদের লাভ? গ্রামের লোক ঠিক করেছে কালুয়া ফের এখানে এলে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেবে।'

দীপকের মনে নানান প্রশ্ন ঘোরে। ব্যাপারগুলো কেমন গোলমেলে?

সিয়েনের কাছেই জমির সাপুড়ের বাড়ি। জমিরের সঙ্গে দীপকের বহুদিনের চেনা। জমিরের ছেলের অসুখে খুব সাহায্য করেছিল দীপক। দশ বছরের মরমর ছেলেকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে এনে জমির তখন দিশেহারা। দীপক চটপট রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করে জমিরকে। ক্রমে ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। অনেকদিন বাদে দীপককে দেখে জমির ভারি খুশি। চা খাওয়ায়। এটা সেটা কথার পর দীপক জিজ্ঞেস করে, হরিহর নাগকে চেনো?” “আজ্ঞে চেনা হয়েছে।'

তার কাছে সাপ বিক্রি করেছ?”

করিছি বাবু।

কী কী সাপ?”

“সে হরেক রকম।

“উনি কি সাপ পোষেন?”

হ, তাই বলেন।

তুমি গেছ ওর বাসায়?"

“আজ্ঞে গেছি।”

‘হরিবাবুর চাকর কালুয়া লোকটা কেমন?

দীপক লক্ষ করে যে জমির থতমত খায়। মুখে ত্রস্ত ভাব। সে জবাব দেয় না সঙ্গে সঙ্গে। খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'জানি না ঠিক।

দীপক বলল, 'ভাবছি এখন একবার হরিহরবাবুর বাসায় যাব। কেমনভাবে সাপ রাখেন, কী কী করেন দেখব। যাবে নাকি সঙ্গে?"

জমির কাচুমাচুভাবে বলে আজ একটু কাজ আছে।' তারপর সে ইতস্তত করে বলে, ‘ওসব জিনিস দেখার দরকার কী? মা মনসার বাহন। ওদের মতিগতি বোক দায়। বড় মেজাজি জীব। শেষে বিপদ আপদ'—বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে যায়।

দূর, বিপদ আবার? যাক, চলি এখন। দীপক রওনা দেয়।

চার

বেলা দুপুর। হরিহর নাগের বাসায় পৌঁছে দীপক দেখল যে বাড়ি বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। সে ঘরগুলোর দরজা জানলার কপাট ঠেলে ভিতরে উকি মারার চেষ্টা করতে লাগল। একটা ছোট ঘরের জানলা দেখল আধখোলা। সে ঘরের মধ্যে নজর করে। | ভিতরে আলো নেই। তবে বাইরে ঝা ঝা রোদ। তারই ফলে ভিতরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। ঘরে টাঙানো দড়িতে কী যেন ঝুলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে দীপক। একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে ঘর থেকে।

দীপক পরীক্ষা করে প্রতিটি জানলা দরজা। নাঃ, কোনোটাই খুলতে পারা যায় না। সে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর খানিক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে

লুকিয়ে বসে।

চারপাশে ঘন গাছগাছালি থাকায় সরকারবাড়িটা বাইরে থেকে ভালো দেখা যায় না। দীপকের পিছনে একটা ভাঙা গোয়ালঘর, সামনে কুলকোপ। সাবধানে সে দেখে নেয় চারধার। জায়গাটা সাপখোপের আড্ডা। বাগান ভেদ করে বাসায় ঢোকার পথটা রইল তার নজরে। আশা করলে তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি দীপককে। কালুয়া ফিরল। সে ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। তারপরই একটা ছোট থলি হাতে বেরিয়ে গেল গ্রামের দিকে। মনে হল কিছু কিনতে গেল দোকানে। দরজায় তালা দিল না। শিকল তুলে দিল। অর্থাৎ এখুনি ফিরবে।

দীপক কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। হরিহরের দেখা নেই। তিনি বোধহয় পরে ফিরবেন। আলাদা বেরিয়েছেন। কালুয়া ফেরার আগে সময়টুকু কাজে লাগাই। হয়তো এমন সুযোগ আর মিলবে না। দীপক শিকল খুলে বাসায় ঢুকল। এঘর ওঘর করে ঢুকল গিয়ে সেই ঘরটায়। দড়িতে ঝোলানো বস্তুটি পরীক্ষা কাল। বিশ্রী গন্ধটায় গা গুলিয়ে উঠছে। তাকে রাখা অনেকগুলো ছোটবড় সাপের ঝাপি। একটা বাঁশের লাঠি খাড়া করা রয়েছে দেওয়ালে। সেটা হাতে নেয়। এবার তার চোখ পড়ে ঘরের এক কোণে দুটো কাঠের প্যাকিং বাঙ্গ। এক একটা হাত দেড়েক লম্বা, হাতখানেক চওড়া। তাদের ওপর কাঠের আলগী তক্তা চাপিয়ে ঢাকা দেওয়া।

ডান হাতে লাঠিটা দৃঢ় মুষ্টিতে পাকড়ে বাঁ হাতে একটা বাক্সের ডালা তুলেই চমকে যায়। দীপক। ও, এই ব্যাপার। সে তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল।

পিছনে খুট করে আওয়াজ হতেই দীপক চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় লাঠি বাগিয়ে। কালুয়া ফিরেছে নিশ্চয়।

কিন্তু যে দৃশ্য দেখল, কাঠ হয়ে গেল সে।

কালুয়া নয়। স্বয়ং হরিহর নাগ দাঁড়িয়ে দরজায়। তার হাতে উদ্যত পিস্তল। কঠোর মুখ। চোখে তীব্র রাগ।

‘লাঠিটা ফেল, কঠিন কণ্ঠে আদেশ করেন হরিহর, নইলে গুলি করব! সাইলোর লাগানো আছে রিভলবারে। কেউ শুনতে পাবে না। তারপর লাশ পুঁতে দেব

মাটিতে।

দীপক লাঠি ফেলে দেয়। হরিহরের হিংস্র মূর্তি দেখে বিশ্বাস করে যে, ও যা বলছে তা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এবার পিছনে ফের।' আদেশ হয়। দীপককে ইতস্তত করতে দেখে খুব ঠান্ডাভাবে হরিহর রিভলবার তাক করেন ওর কপাল লক্ষ্য করে। নিরুপায় দীপক পিছন ফেরে। 'কালুয়া, ওকে বেঁধে যে। হরিহরের কণ্ঠে হুকুম হয়।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড বলশালী থাবা দীপকের হাত দুটো টেনে পিছনে এনে সড়ি জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তারপরই তাকে ল্যাং মেরে মেঝেতে শুইয়ে দেয় কালুয়া। এবার বাঁধে তার পা।

'একদম চুপ। পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে।" হরিহর দীপকের বুকের ওপর রিভলবার তাক করে শাসায়।

দীপকের হাত-পা বাঁধা হলে কালুরা দীপককে মেঝেতে শুইয়ে রেখে বেরিয়ে যায়। দ্রুত ফিরে আসে। ফিরেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে। দীপকের নাকটা জোরে টিপে ধরে দু আঙুলে। নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়ে দীপক হাঁ করতেই কালুয়া তার মুখের মধ্যে ঠেসে দেয় একদলা ন্যাকড়া। দীপকের দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। সে ছটফট করে। কালুয়া নাক ছেড়ে দেয় বটে,তবে ঝটপট নিপুণ হাতে ওর মুখ বেঁধে ফেলে গামছা জড়িয়ে। দীপকের আর টু শব্দ করার উপায় থাকে না। শতর চোখে দেখে। বোঝে না এদের মতলবটা কী?

কালুয়া, আমাদের কোনো বিষওলা সাপ আছে?' হরিহরের প্রশ্ন। 'আছে। একটা কেলে গোখরোর বিষ জমেছে দাঁতে।'

"ভেরি গুড়। দু-একটা এমন থাকা দরকার। কাজে লাগে।

এবার দীপকের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সুরে ক্রুর হেসে বললেন হরিহর, কীহে ইয়ংম্যান। রিপোর্টারি ছেড়ে ডিটেকটিভগিরি ধরলে কেন? এ গ্রেট ফুল। বড্ড বেশি জেনে ফেলেছ। তাই মরবে। নাগের লেজে পা দিয়েছ। ছোবল খেতেই হবে, উপায় নেই।"

তিনি এবার কালিয়াকে বললেন, 'শোন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখুনি। বাসে বোলপুর শহরে যাব। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে রাতে ওখানেই কাটাব গেননা হোটেলে। সকালে ফিরব। আমি চলে যাওয়ার খানিক বাদে তুই গোখরোটাকে ছেড়ে দিবি এই ঘরে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিবি। এরপর বাইরে থাকবি। উঠোনে গুৰি, কাজক করবি, দু-একবার গ্রামের ভেতরে যাবি। কে থাকে এসে লক্ষ করবি সাপটা একে কামড়াল কিনা। ছেলেটা অক্কা গেলে লাশ রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসৰি যতটা সম্ভব দূরে ধানখেতে। সাবধান, কেউ যেন না দেখতে পায়। ফেলার আগে এর ধাধন-টাধন সব খুলে দিবি। দেখে যেন মনে হয় আলপথে সাপে কেটে মরেছে।”

লাশ ফেলে এসে তুইও বেরিয়ে যাবি। ফিরবি একদম ভোরে। হ্যা, কালই সব মান পাচার করে ফেলতে হবে। সন্দেহ করে সার্চ করলে যেন কোনো প্রমাণ না পায়। সাপ কামড়াতে বেশি দেরি করলে জানলা দিয়ে ঢিল মেরে উসকে দিবি। তবে তাড়া নেই। এখন

চারটেও বাজেনি। ঢের সময় আছে।' নির্দেশগুলো দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় জারি করে দীপকের দিকে আর দৃপতি মাত্র না করে বেরিয়ে গেলেন হরিহর নাগ। কালুয়াও সঙ্গে গেল।

কালুয়া ফিরে এল মিনিট দশেক বাদে। সে তাক থেকে একটা ঝাপি নামিয়ে মাটিতে রাখল। তারপর ঝাপির ডালা তুলে একটু ফাক রেখে চট করে পিছিয়ে গেল।

কালো কুচকুচে এক সাপের মাথা সেই ফাকটুকু দিয়ে ভালা ঠেলে বেরুতে শুরু করে। তার মুখ থেকে সকলকে চেরা জিভ বেরুচ্ছে আর ঢুকছে। কালুয়া দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজার কপাট বন্ধ করে। বাইরে শিকল তোলার শব্দ হয়।

ধীরে ধীরে বেরোয় সাপটা। অন্তত হাত চারেক লম্বা, তেমনি মোটা! চকচকে নিকষকালো দেহ। সেটা চলতে শুরু করে।

দীপক একেবারে কাঠ। সে জানে যে সাপ খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য প্রাণীকে নেহাত ভয় না পেলে অথবা বিরক্ত না করলে আক্রমণ করে না। দীপক বুকের ওঠানামা, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ও গতি কমিয়ে আনে প্রাণপণে। যতক্ষণ এইভাবে বাঁচা যায়।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় দীপক কিছুটা কাত হয়ে শোয়া। তার পায়ের দিকে দরজা। সাপের ঝাপিটা সামনে। খোলা জানলাটা পিঠের দিকে।

সাপটা একবার ঘাড় তুলে দেখে নেয়। অতঃপর ধীরেসুস্থে এঁকেবেঁকে চলে দেওয়াল ঘেঁষে। বোধহয় ও কোনো ফুটোর সন্ধান করছে বেরিয়ে পালাবার ধান্দায়। দীপকের অস্তিত্ব হয়তো টের পায়নি অথবা বিপজ্জনক মনে হয়নি এখনও। সারা ঘরে চকর দিতে থাকে সাপটা।

দীপক আড়চোখে নজর রাখছে সাপটাকে। কখনও সেটা তার কাছাকাছি চলে আসছে। কখনও দূরে। ইচ্ছে করে নয়, স্বাভাবিক আতঙ্কেই অবশ হয়ে যাচ্ছে দীপকের দেহমন। সাপটা যখন তার পিছন দিকে যাচ্ছে তখন যে রী অসহনীয় অবস্থা! প্রতি মুহুর্তে আশঙ্কা এই বুঝি ছোবল খেলাম। স্পর্শ পাব কোনো হিমশীতল সরীসৃপ দেহের। কোথায় ওটা? নড়াচড়া বা মুখ ঘুরিয়ে দেখার উপায় নেই। একইভাবে স্থির হয়ে থাকে সে।

জানলাটা দিয়ে আলো ঢুকছে। মাঝে মাঝে ছায়া পড়ছে হারে। কেউ নিশ্চয়ই জানলায় দাঁড়াচ্ছে, তোদর পথ আগলে। আবার সরে যায় ছায়া। কালুয়া লক্ষ রাখছে সাপটা দীপককে ছোবল দিল কিনা।

দীপকের মনে ভেসে ওঠে অনেক প্রিয়জনের মুখ-বাবা-মা দাদা-বউনি। ভাইপো ছোটন। ভাইঝি ঝুমা। আরও কতজনের। ঘরে থাকলে বউদি এই সময় তাকে চা খেতে ডাকত। দাসুর রেস্টুরেন্টের আড্ডায় একটু পরে এক এক করে বন্ধুরা জুটতে শুরু করবে। চা খেয়ে দীপকও হাজির হত। বঙ্গবার্তা অফিসে কুপ্রবাবু টেবিলে ঝুঁকে সম্পাদকীয় লিখছেন। হয়তো আশা করছেন দীপককে।

কেউ কি কল্পনাও করতে পারবে দীপক এখন কোথায়? নিশ্চিত মরণের মুখে কি যন্ত্রণাময় ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। সময় বুকি আর এগোয় না। কতক্ষণ কেটেছে। পনেরো মিনিট? আধ ঘন্টা? দীপকের বোধ হচ্ছে যেন কয়েক ঘণ্টা।

মনের চাপ অসহ্য হয়ে ওঠে এক এক সময়। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ঘুরছে চারপাশে।

রয়েসয়ে খেলাচ্ছে যেন উৎকট উল্লাসে। সে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক নীল, দিক ছোবল। আর সহ্য হয় না।

আবার একটা মরিয়া চিন্তা মাথায় খেলে। এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সঁপে দিই কেন মৃত্যুর কবলে? শেষ চেষ্টা করা যাক। হঠাৎ যদি বাঁধা জোড় পায়ের নিচে চেপে ধরতে পারি সাপটার মাথা থেতলে পিষে নিই ওর মুন্ডুটা। যদি ফস্কাই মরব। সে তো এমনিতেও এড়ানো যাবে না। কিন্তু যদি সফল হই, তখন হাত-পায়ের বাঁধন খোলা অসম্ভব হবে না। জানলার গরাদ ভেঙে বের। লাঠিটা রয়েছে ঘরে। লুয়া বাধা দিলে মোকাবিলা করা যাবে। মোট কথা, এই একমাত্র উপায়। কালুয়ার কাছে নিশ্চয় পিস্তল নেই। সাপটার অজান্তে ধীরে অতি ধীরে উঠে দাঁড়াতে হবে। তারপর সাপটা কাছে আসার অপেক্ষা। নির্ভুল নিশানায় লাফিয়ে পড়তে হবে ওর মাথায়। দীপকের সমস্ত স্নায়ু টান টান। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে মাথা তুলতে থাকে মেঝে থেকে।

সহসা বাইরে একটা আওয়াজ হল জোরে। কী ব্যাপার? দীপক স্থির হয়ে যায়।

একটু বাদে দরজায় শব্দ হয়। শিকল খুলছে কেউ। পলকে সাপটা দরজা লক্ষ্য করে ফণা ধরে শ্রিংয়ের মতো খাড়া হয়ে ওঠে। দীপক তৎক্ষণাৎ মেয়ে শুয়ে ফের নিথর হয়। নির্ঘাৎ কালুয়া এসেছে।

পাঁচ

দরজার কপাট খুলে যায়। যে মুখটা উকি দিল, তাকে দেখে দীপক থ। কালুয়া নয়। আমির। তার হাতে লম্বা লাঠি। সতর্ক চোখে জমির সাপটাকে নজর করে। এক পা ঢোকে ঘরে। কুদ্ধ বিষধর সঙ্গে সঙ্গে সে তেড়ে যায় জমিরকে। মুহূর্তে লাঠির ঘা পড়ে সাপটার ঘাড়ে। ছিটকে যায় সাপটা। পরপর আরও কয়েক ঘা প্রচণ্ড আঘাতে জমির শেষ করে দেয় সাপটাকে। জমিরের পিছনে আরও একজন ঢোকে ঘরে। বসির। জমিরের ভাই।

জমির চটপট দীপকের হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দেয়। আকুল স্বরে জিজ্ঞেস করে, সাপটা কি কেটেছে?”

না। দীপক মাথা নাড়ে। ‘ওঃ, বাঁচলাম, আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে জমির, ভাবছিলাম বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।'

দীপক উঠে বসে হাঁপায়। অবিশ্বাস্য চোখে দেখে মুত সাপটা। কী যে ঘটে গেল ঠিক ঠাহর হয় না। তারপর প্রশ্ন করে জমিরকে, 'তুমি এখানে?'

‘আপনি চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল, আপনাকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। এর দুষ্ট লোক। যনি বিপদে পড়েন? তাই বসিরকে সঙ্গে নিয়ে এলাম আপনার পিছু পিছু। দূর থেকে দেখলাম, আপনি সরকারবাড়ির বাগানে ঢুকলেন। কালুয়া এল। হরিবাবু এলেন। হরিবাবু বেরিয়ে গেলেন। কালুয়া ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আপনার দেখা নেই। বাড়ি থেকে বেরুবার তো একটাই পথ। দু'জনে গিয়ে বাগানে লুকোলাম। দেখলাম কালুয়া থেকে থেকে একটা জানলা দিয়ে দেখছে ভেতরে। সন্দেহ হল। কালুয়া এবার গায়ের দিকে যেতেই গিয়ে উকি দিলাম ওই জানলায়। দেখলাম আপনি মেঝেতে পড়ে আছেন মরার মতো আর সাপটা ঘুরছে। ভয়ে হিম হয়ে গেল বুক। বসিরের সঙ্গে যুক্তি করলাম। একটু বাদে কালুয়া ফিরল। ওকে পিছন থেকে এক ঘা দিয়ে পেড়ে ফেলে বেঁধে ফেললাম। তারপর ঢুকলাম এই ঘরে।'

ওই বাক্সটা দেখ।' দীপক একটা কাঠের বাক্স দেখায়। ডালা খোলা বাক্সে ঝুঁকে দেখে জমির নীরবে মাথা ঝাকায়। ‘ওই বাক্সটা খোল। দ্বিতীয় কাঠের বাক্সটা দেখায় দীপক। সে নিজেও ওঠে।

জমির বাক্সের চাপাটা তুলতেই দীপক দেখে অন্য বাক্সটার মতো এটাও প্রায় ভর্তি সাপের চামড়ায়। নুন মাখানো শুকনো চামড়া। আঁশটে বোটকা গন্ধ ঠেলে ওঠে বাক্স থেকে।

দুটো বাক্স এবং ঘরে দড়িতে টাঙানো মস্ত একটা সাপের চামড়া দেখিয়ে দীপক জিজ্ঞেস করল জমিরকে, তুমি জানতে এরা সাপ মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়?' 'জানতাম বাবু।

বিলোনি কেন? সাপের চামড়ার ব্যবসা বেআইনি, জানতে না? সাপের দামি চামড়ার লোতে গাদা গাদা সাপ মারা হচ্ছিল। অনেক জাতের সাপ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সরকার তাই আইন করেছে সাপ মেরে চামড়া বিক্রি নিষিদ্ধ।

জমির কাচুমাচুভাবে বলে, 'আজ্ঞে জানতাম। বলতে পারিনি ভয়ে।

'কীসের ভয়?'

‘একদিন এখানে হঠাৎ এসে দেখি পিছনের উঠোনে দড়িতে অনেকগুলো সাপের চামড়া শুকাচ্ছে। বুঝতে পারি, এই এদের ব্যবসা। চলে আসার আগেই

কালুয়ার চোখে পড়ে যাই। ও শাসায়, কাউকে বললে আমায় খুন করবে। লোকটা সাংঘাতিক। তাই ভয়ে মুখ বুজে থাকি। আমি ছাড়া বোধহয় আর কেউ টের পায়নি। তবে বাবু আমি অকৃতজ্ঞ নই। আপনার বিপদ বুঝে আর স্থির থাকতে পারিনি।'

হাতে-পায়ে বাধনের জায়গাগুলো টনটন করছে। ম্যাসেজ করে আড়ষ্টতা কমিয়ে দীপক বাইরে আসে। বারান্দায় একটা খুঁটিতে কালুয়া মোক্ষম করে বাঁধা। তার মাথার পিছনে এক জায়গায় রক্ত গড়াচ্ছে। লোকটার চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে হিংস্র রাগে।

শান্ত সুশীল জমিরেরও দেখা গেল ভিন্ন মূর্তি। দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গনি ছাড়ে, বসির, একটা বিষে টইটম্বুর কালনাগ নিয়ে আয় দিকি। শয়তানটার গায়ে ছেড়েদি। সাপের বিষে মৃত্যু কেমন আরাম টের পাক।

‘‘থাক, থাক’, দীপক থামায়, এসো।'

খানিক তফাতে গিয়ে দীপক বলল, কালুয়া যেমন আছে থাক। এক্ষুনি বোলপুর যেতে হবে। থানায়। জমির, তুমি আমার সঙ্গে চলো। বসির এখানে কলয়াকে পাহারা দিক। বাস, লরি, প্রাইভেট কার যা পারি ধরে চলে যাব। টের পেলেই হরি নাগ পালাবেন। উনিই আসল শয়তান। আজ রাতের মধ্যে দুটোকে অ্যারেস্ট করানো চাই।।

বাস রাস্তায় পৌঁছে দীপক দেখল যে বাস-স্টপে হরিহর নেই। অর্থাৎ উনি বোলপুর রওনা হয়ে গিয়েছেন। যাক, নিশ্চিন্তি।

দুদিন বাদে। সকালে বঙ্গবার্তা অফিসে হাজির হল দীপক।

কুঞ্জবিহারী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দীপকের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘কন্যাচলেশনস।' তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, ‘খানিক আগে থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, কলকাতায় হরি নাগের গুদাম সার্চ করে প্রচুর সাপের চামড়া পাওয়া গিয়েছে। দেশে-বিদেশে চালান দিতেন গোপনে। এই কারবারে প্রচুর টাকা কামাতেন। ওঁর বিজনেস-পার্টনারকেও ধরেছে পুলিশ। এই লোভীগুলোর জন্যে কত প্রাণী যে লোপ পেতে বসেছে! এদের শাস্তি আরও কঠোর হওয়া উচিত।'

দীপক বসতে, কুঞ্জবাবু প্রশ্ন করলেন, বলো তো বাপু, কীভাবে সন্দেহ করলে কেসটা? সেদিন তোমায় টায়ার্ড দেখে ডিটেলস জিজ্ঞেস করিনি।'

দীপক বলল, "গ্রামের লোকের কথায়। শুধু বুড়ো আর বড় সাপ কেনেন। এদিকে হরি নাগ মুখে বলেন অন্যরকম। বড় ঢ্যামনা সাপের অর্ডার দেন সাপুড়েদের। সাপ নিয়ে রিসার্চ করছে আর নির্বিষ ঢ্যামনা সাপ সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকের সেন্টিমেন্ট জানেন না? স্ট্রেঞ্জ! আবার কালুয়ার মতো দাগি গুন্ডাকে সঙ্গী জুটিয়েছেন! খটকা লাগল। ভাবলাম, ওঁর সম্বন্ধে আরও খোঁজ নিই।'

ওই গাঁয়ের পোস্টমাস্টার আমার চেনা। তাকে বলে রাখলাম, হরিহর কোনো চিঠি পোস্ট করলে, কোথায় পাঠাচ্ছেন ঠিকানাটা টুকে রাখতে। তিন দিন বাদে ঠিকানা পেলাম। তাই দেখে চলে গেলাম কলকাতায়। ট্যাংরা অঞ্চলে। নাগ কোম্পানির অফিস-গুদাম বের করলাম। দেখি চামড়ার ব্যবসা। সন্দেহটা বাড়ল। তখন হানা দিলাম ওর ডেরায়। ভানে অ্যানিমাল লাভার। কী ধূর্ত। 'খুব বেঁচে গেছ। লোকটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল, কুঞ্জবিহারী মন্তব্য করেন।

মূর্তি চুরি - অজেয় রায় Murti Churi by Ajeo Ray

মুর্তি চুরি   অজেয় রায়

দু'চারটে কথার পরেই 'বঙ্গবার্তা'র রিপোর্টার দীপক রায় উৎসাহিত কণ্ঠে বলল, একটা নতুন আইডিয়া এসেছে। বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে মন্দিরগুলো নিয়ে স্টোরি করব কাগজে।'

'সে তো গাদা মন্দির। কত লিখবে?' বঙ্গবার্তার সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতির ভুরু কুঁচকোয়।

'না না, সব নয়। যেগুলোর হিস্ট্রি বেশ ইন্টারেস্টিং, শুধু সেগুলো নিয়ে।' জানায় দীপক।

'তা মন্দ নয়। করো।' সম্মতি দেন সম্পাদক।

এই সূত্রেই বীরভূমের তিন-চারটে গ্রামে ঘোরার পরই একটা রহস্যের হদিশ পেয়ে যায় দীপক।

পলাশপুর গ্রামে গিয়েছিল দীপক এই উদ্দেশ্যেই। ওখানে বলাই দাস তার পরিচিত। বছর চল্লিশ বয়সি বলাইবাবুর সঙ্গে সরকারবাড়ির মন্দির দেখতে যাচ্ছে দীপক, উল্টোদিক থেকে একজন বয়স্ক লোক এল। মুখোমুখি হতেই লোকটা থতমত খেয়ে চোরা চাউনিতে দীপককে দেখতে দেখতে পথের ধারে সরে গিয়ে মুখটা পাশ ফিরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, যেন ইচ্ছে করেই মুখ আড়াল করতে বাঁ হাতে কপাল চুলকোতে চুলকোতে পেরিয়ে গেল তাদের।

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে কেমন খটকা লাগল দীপকের। আর অদ্ভুত ব্যাপার, লোকটার সঙ্গে বলাই দাসের কোনো কথা হল না। কিন্তু সাধারণত একই গায়ের মানুষরা সামনাসামনি হলেই পরস্পরকে সম্ভাষণ করে। এই লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছি যেন? শেষে কৌতুহল চাপতে না পেরে দীপক প্রশ্ন করে বলাইবাবুকে, 'এইমাত্র যিনি গেলেন উনি কি এই গ্রামে থাকেন?”

‘না। উনি আমাদের পাড়ার জগবন্ধুর আত্মীয়। বেড়াতে এসেছেন দিন দুই হল।' জানান । বলাই দাস।

‘কোথায় থাকেন?” জিজ্ঞেস করে দীপক।

‘শুনেছি বর্ধমান শহরে।'

নাম জানেন?

বলাই দাস বললেন, ‘তারকবাবু। পদবি জানি না।' দীপকের মন খচখচ করে। ওই মুখ, ওই নাম কি একটা ব্যাপারে জড়িয়ে আছে! তখন। আর এই নিয়ে বেশি ভাবার সুযোগ মেলে না। সরকারবাড়িতে পৌছে যায় তারা।

গ্রামের মাঝামাঝি সরকারদের বাড়িটা বেশ বড়। দোতলা পাকাবাড়ি। বসত-বাড়ি ঘিরে হাত পাঁচেক উচু পাঁচিল। মন্দিরটা পাঁচিলের ঠিক বাইরে। শিবমন্দির। বিশেষ বড় নয়।

নেহাতই সাদামাটা ছোট একটা মন্দির। তবে বেশ পুরনো।

মন্দিরের ভিতর ঢোকে দীপক। অন্যান্য শিবমন্দিরের মতোই চেহারা। বিগ্রহ বলতে একটা বড়সড় হাতখানেক শিবলিঙ্গ বা লম্বাটে মসৃণ গলো পাথর মেঝেতে বসানো। তার গায়ে চন্দনের ছোপ, পায়ের কাছে ফুল,পাতা। মন্দিরে জানলা নেই। কয়েকটা ঘুলঘুলি রয়েছে মাত্র।

ভিতরটা একটু আবছায়া। মন্দিরের ভিতর এক কোণে আর একটি মূর্তি দীপকের নজরে পড়ে। মনে হল বিষ্ণুমূর্তি।

ফুটখানেক উচু। কালচেরঙা পাথরে তৈরি, গভন ভারি সুন্দর! পাথরের বেদির ওপর বসানো মূতিটা। তাঁর পায়ের কাছে ফুল তুলসী পাতা দেখে মনে হল যে তিনিও পূজা পান।

মন্দিরটা সম্বন্ধে কিছু জানতে দীপক গেল মেজকর্তা হেমেন সরকারের কাছে হেমেনবাবু হাসিখুশি মানুষ। তিনি বলাই দাসের বয়সি এবং বন্ধু। এই গ্রামে সরকারদের বাস একশো পঁচিশ বছর। এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই এই মন্দির স্থাপন করেন তারা। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়। কথায় কথায় দীপক জানতে চাইল, আর একটা মূর্তি দেখলাম মন্দিরে ?"

হেমেনবাবু বললেন, 'হ্যা ওটা বিষ্ণুমূর্তি। নারায়ণ। ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি আছে ওর। আমাদের একটা দিঘি আছে গ্রামের ধারে। বছর পঞ্চাশ আগে আমার বাবা দিঘিটা সংস্কার করাচ্ছিলেন। সেই সময় কাদার নিচ থেকে ওই মূর্তিটা মেলে। গোড়ায় মূর্তিটা বাড়িতেই রাখা ছিল। কিন্তু এরপরেই আমাদের হঠাৎ কিছু ধনসম্পত্তি লাভ হয়। বাবার বিশ্বাস জন্মায় যে ওই বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধারের ফলেই এই সৌভাগ্য। তখন তিনি শিবমন্দিরেই মূর্তিটাকে স্থান দেন।

'মুর্তিটা দেখে মনে হল বেশ পুরনো', দীপক মন্তব্য করে।

'হ্যা, খুবই প্রাচীন। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে একবার কয়েকজন এসেছিলেন আমাদের। গ্রামের মন্দির দেখতে। তারা বলে গিয়েছেন, ওই বিষ্ণুমূর্তি অন্তত হাজার বছরের পুরনো। এই গ্রামের গায়েই একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বহু আগে। এখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের ধারণা, বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে ওই গ্রামের কোনো মন্দিরের বিগ্রহ ওই বিষ্ণুমূর্তিকে দিঘির জলে লুকিয়ে

রাখা হয়। তারপর আর তুলে নিয়ে যেতে পারেনি। দীপকের মাথায় খেলে, ওই বিষ্ণুমূর্তি নিয়েই কাগজে একটা স্টোরি লেখা যাবে খাসা।

সরকারবাড়ি থেকে ফেরার পথে ঝা করে দীপকের মনে পড়ে গেল সেই লোকটার নাম ও পরিচয়—বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে ভাবতে ভাবতেই।

আরে ওই লোকটার নাম তো তারকচন্দ্র পাল। পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করে। প্রাচীন মূর্তি চুরির কেসে একবার ওকে ধরেছিল পুলিশ।

সাত বছর আগের ব্যাপার। বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর তীরে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এক লুপ্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের জন্য খোঁড়াখুড়ি করছিল। দীপক গিয়েছিল দেখতে। তখন সামান্য আলাপ হয় তার পালের সঙ্গে। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তারক পাল ওখানে ক্যাম্পে ছিল।

দীপক সেখানে যাওয়ার মাস দুই বাদে খবর বেরোয় কয়েকটি নামকরা সংবাদপত্রে— বর্ধমানে অনুসন্ধান করে পাওয়া কয়েকটি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা এবং একটা প্রাচীন মূর্তি উধাও হয়েছে। জিনিসগুলি কলকাতায় নিয়ে আসার পরেই, মিউজিয়াম থেকে। প্রাচীন প্রত্নদ্রব্য চোরাচালাকারীদের কাজ সন্দেহ নেই। এই সূত্রেই তারক পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কারণ সন্দেহ করা হয় যে তারই যোগসাজসে চুরিটা হয়েছে। এই নিয়ে কেস চলে। ফল কি হয় জানা নেই দীপকের।

দীপকের আরও মনে পড়ে যে ওই তারক পালকে সে দেখেছে মাস ছয় আগে বীরভূমেরই অন্য গ্রামে। সেবার অবশ্য দীপক মন্দির দেখতে যায়নি। তার পাল একটা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তবে তাকে লক্ষ করেছিল কিনা সেটা খেয়াল করেনি। ওর আগের পরিচয়ও সেবার দীপকের মনে জাগেনি।

দীপক বলাইবাবুকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা ওই তারকবাবু কি এখানে মন্দির দেখে বেড়াচ্ছেন?

'হ্যা।' জানান বলাইবাবু, 'মানুষটা ভক্ত প্রকৃতির। কাল সরকারদের শিবমন্দিরে বসেছিলেন অনেকক্ষণ।

এর আগে এসেছেন এই গাঁয়ে। এসেছেন। অনেক বছর আগে। দীপক সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। ঠিক করে যে তারক পাল সম্বন্ধে আর একটু খোজ নিতে হবে

কলকাতায় ডক্টর বোসের কাছে।

ডক্টর প্রতুল বোস পুরাতত্ত্ব বিভাগে ছিলেন উচু পদে। সম্প্রতি 'অবসর নিয়েছেন। তারক পালের প্রসঙ্গে রেগে বললেন দীপাকে, লোকটা আস্ত শয়তান। নির্ঘাৎ শোনো প্রত্নদ্রব্য চোরাচালানকারী দলের সঙ্গে ওর যোগ আছে। বর্ধমানের কেসে প্রমাণের অভাবে জেল-খাটা থেকে রেহাই পেয়েছিল বটে, তবে কর্তব্যে অবহেলার কারণে ওর চাকরি যায়। জান উত্তরবঙ্গে পরপর কয়েকটা মন্দির থেকে প্রাচীন বিগ্রহমুর্তি চুরি যায় বছর দুয়েক আগে। আর তার কিছুদিন আগে তারককে ওইসব জায়গায় দেখা গিয়েছিল ব্যবসার নামে ঘুরতে। সেবারও সন্দেহ করে পুলিশ ওকে ধরে কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়। পলাশপুর আমি গিয়েছি। সরকারদের শিবমন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি আমি দেখেছি। ওটা সত্যি প্রায় হাজার বছরের পুরনো। চমৎকার মূর্তি। প্রত্নবস্তু হিসাবে অতি মূল্যবান। সরকারদের সাবধানে রাখা উচিত। ‘তারক পাল কি নিজে চুরি করে? জানতে চায় দীপক।

ডক্টর বোস বললেন, তা মনে হয় না। ও ইনফর্মেশান জোগায়। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের কিছু স্টাফ এই দুষ্টমটি করে। প্রাচীন মূলবান মুক্তির খবর জানিয়ে দেয় স্মাগলারদের। মানে টাকার লোভে। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের বেশির ভাগ কমী দখিনি কাজ করতে করতে মোটামুটি জেনে যায় কোনো মূর্তি বা শিল্পবস্তুত প্রাচীন এবং দামি। এদের কাজে লাগায় স্মাগলাররা। তবে চুরিটা করে অন্যেরা। মানে অনাদের নিয়ে করায়। তারপর কয়েক ধাপ হাত বদলে আসল লোকের কাছে পৌছায়। খুব দুশিয়ার এরা।

দীপক প্রশ্ন করে, 'এত কাণ্ড করে, এত খরচ করে, এসব চালান করে খুব দাম পায় নিশ্চয়?'

‘পায় বইকি। লক্ষ কোটি টাকা দামে বিক্রি হয় এসব প্রত্নদ্রব্য। উত্তেজিতভাবে জানান ডক্টর বোস।| ‘কেনে কারা?

ডক্টর বোস জানান, ‘ইউরোপ আমেরিকায় অনেক ধনীর প্রাইভেট মিউজিয়াম আছে। তারা বিশাল দামে এমনি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন শিল্পকর্ম কিনে নিজেদের সংগ্রহশালার প্রেস্টিজ বাড়ায়। আবার বিদেশে কিছু সরকারি আধা-সরকারি মিউজিয়ামও কেনে এমনি মুর্তি, ছবি ও প্রাচীন শিল্পবদ্ধ। জিনিসটা চোরাপথে এসেছে বুঝেও। শুধু ইন্ডিয়া থেকে নয়, পৃথিবীর অন্য দেশ থেকেও সমানে পুরনো

মুর্তি আর শিল্পদ্রব্য চুরি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এই কারণে। কিছু ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং এই ব্যবসা করে। ভীষণ ধূর্ত তারা। তেমনি টাকার জোর।' দীপক জিজ্ঞেস করল, ‘পলাশপুরে আর কোনো প্রাচীন মূল্যবান মূর্তি আছে কি?" ডঃ বোস বললেন, 'না। তেমন কিছু নেই আর। কলকাতা থেকে ফিরে দীপক সোজা গেল পলাশপুর। হেমেন সরকারকে একান্তে ডোকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের শিবমন্দিরের দরজার চাবি থাকে কার কাছে?”

হেমেনবাবু জানালেন, 'পুরোহিতমশাইয়ের কাছে। উনিই মন্দির খোলেন। বন্ধ করেন। “উনি বিশ্বাসী? “নিশ্চয়। বহুকাল আছেন। এ কথা কেন? হেমেনবাবু রীতিমতো অবাক হন।

যান হেমেন্দ্র সরকার। তারপর বলেন, তবে তো মূর্তিটা ওখান থেকে বাড়ির ভেতর সেফ জায়গায় এনে রাখা উচিত।'

দীপক বাধা দেয়, ‘না। আমার একটা অন্য প্ল্যান আছে। বলছি সেটা। আগে বলুন ওই মন্দিরের চাবি হাতে পাওয়ার সুযোগ কাদের আছে? মানে ছাপ নিয়ে নকল চাবি তৈরি করার সুযোগ?”

হেমেনবাবু একটু ভেবে বললেন, “পুরোহিত ভট্টাচার্যিমশাই কোনো কারণে না এলে ওঁর ভাইপো যদুগোপাল পুজো করে। মাঝেমাঝে আমাদের কাজের লোক কেষ্ট চাবি নিয়ে মন্দির গুলে ঢুকে সাফসুফ করে। আমাদের পরিবারের লোকেও প্রয়োজনে চাবি নিয়ে খুলে মন্দিরে ঢোকে। মোটামুটি এই ক’জনারই চাবি হাতে পাওয়ার সুবিধা আছে।”

যদুগোপাল বিশ্বাসী? "তা বলতে পারি না ঠিক। স্কুল ফাইনাল পাশ, বেকার যুবক। আপনারই বয়সি। চাষবাস আর টুকটাক ব্যবসা করে। আবার পুজাআচ্ছা করেও কিছু রোজগার করে। একটু শৌখিন বটে। তবে তেমন কোনো বদনাম শুনিনি।

আর কেষ্ট?

‘ও বছর পাঁচেক আছে এ বাড়িতে। কিঞ্চিৎ হাতটান আছে জানি। পারলে দু'-চার পয়সা সরায়। তবে বড় চুরি ধরা পড়েনি। খুব খাটিয়ে। তাই ওই দোযটুকু আমরা উপেক্ষাই করি।”

দীপক ব্যগ্রভাবে বলে, 'সরকারমশাই, আমার একটা প্ল্যান আছে চোর ধরার। ফাঁদ পেতে। 'আপনারা যদি রাজি থাকেন?'

কী রকম?'' হেমেন সরকার কৌতূহলী। দীপক তার পরিকল্পনাটা বোঝাল হেমেনবাবুকে।

সব শুনে হেমেনবাবু খানিক চুপ করে ভাবলেন। তার মুখ দেখে মালুম হল যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব খেলছে মনে। আবার মুখে উত্তেজনার আভাস। দীপক ঠিকই আঁচ করেছিল। হেমেন সরকার মানুষটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। তিনি চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি রাজি। তবে দাদা রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। দাদা একটু নার্ভাস প্রকৃতির।

দীপক বলে, 'ব্যস, ব্যস, আপনি রাজি হলেই হবে। দাদাকে এখন জানানোর দরকারটা কী? দিন সাতেক মন্দিরটা গার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না? দিনে রাতে কোনো ক্রমেই যেন বিষ্ণুমূতিটা চুরি না যায়। রাতেই রিস্ক বেশি। দিনে পুরোহিতমশাই যেন মন্দির খোলা রেখে মোটেই দূরে না যান। আমি ফিরে না আসা অবধি উনি যেন কখনও মন্দিরের চাবি আর কারও হাতে না দেন বাড়িতেও আলগা ফেলে না রাখেন।

তালা দিয়ে বাক্সে রাখেন। মুর্তি চুরির সম্ভাবনাটা ওকে বলতেও পারেন। তবে একথা যেন উনি ঘুণাক্ষরেও আর কাউকে যাস না করেন। রাতে বিশ্বাসী কাউকে দিয়ে মন্দির পাহারার ব্যবস্থা করবেন। ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়। গোপনে গার্ড দেবে। চুরি হতে দেখলে। চোরকে আটকাবে। যদ্দিন না আমি ফিরি। পারবেন না ব্যবস্থা করতে?

হেমেনবাবু চকচকে চোখে বললেন, ''ঠিক আছে, কর ব্যবস্থা। দেখুন আপনার প্ল্যানটা যদি খাটে?

বোলপুরে ফিরে দীপক সম্পাদক কুঞ্জবিহারীকে জানাল, 'দিন সাতেক ছুটি চাই। ওড়িশ যাব।

''কেন?' সম্পাদক অপ্রসন্ন, 'এই তো গেলে কলকাতা। ''সে পরে বলব। 'ভীষণ জরুরি দরকার। তবে জেনে রাখুন খানিকটা বঙ্গবার্তার স্বাথেই।

বটে।' কুঞ্জবিহারী গোফ ফুলিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, দুটি চাইছ নাও, মিছে কথা বলার দরকার কী? পুরী-টুরি বেড়াবে বুঝছি না? তা একা না দলবলে?

দীপক একটু রেগে বলল, 'লাক ফেভার করলে শিগগিরি দারুণ একটা স্টোরি ছাড়হি কাগজে, তখন দেখবেন। 'কী নিয়ে? সম্পাদক উৎসুক। 'চুরি।' মন্তব্য করে দীপক, "তবে ছিচকে কেস নয়। জব্বর ব্যাপার।

পরদিনই ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে দীপক পলাশপুরে কিছু ফোটো তুলল। দু'দিন বাদেই সে রওনা দিল ওড়িশা।

ছয় দিনের মাথায় বোলপুরে ফিরে দীপক সোজা চলে গেল পলাশপুরে। ইতিমধ্যে

ঘূর্তি চুরি। ২৯৩ কোনো অঘটন ঘটেনি। বিষ্ণুমূতি যথাস্থানেই আছে। হেমেনবাবুর সঙ্গে সব কাজ সেরে সে বোলগুরে ফিরল সন্ধ্যায়।

দীপক বাসায় আসতেই তাকে চেপে ধরল তার পেয়ারের ভাইপো ক্লাস টেনের ছাত্র ছোটন। 'কাকু, ফিরে এসে পুরীর গপ্পে করলে না? কোথায় গিয়েছিলে?' দীপক বলল, "পলাশপুর। একটা জরুরি কাজে। ছোটন অবাক হয়ে বলল, "তুমি নগেনদের গায়ে বারবার যাচ্ছ কেন?" "কে নগেন?' 'নগা আমার সঙ্গে পড়ে। ওর বাবার নাম যোগেন সরকার। ওখান থেকে বাসে আসে।

"আঁ, যোগেন সরকার। হেমেন সরকারের দাদা! আরে ওদের বাড়িতেই তো যাচ্ছি কাজে। তা নগেন কেমন ছেলে?'

"দারুণ। আমার খুব বন্ধু। পারুণ ফুটবল খেলে। ছোটন উচ্ছ্বসিত। 'সাহস আছে?' জিজ্ঞেস করে দীপক। 'নেই আবার! ভীষণ ডানপিটে। আবার ক্যারাটে শিখছে।'

বাঃ। এইরকম একজন ছেলেই চাইছিল দীপক। সরকারবাড়ির হতে হবে এবং ডাকাবুকে। বাইরের কাউকে দিয়ে ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। আবার এ কাজের ভার বয়স্ক হেমেনবাবুকে দিতেও 'বাধো বাধো ঠেকছিল। তা নার্ভাস যোগেনবাবুর ছেলে যে এমন ডেয়ার-ডেভিল কে জানত? দীপক ছোটনকে বলল, 'নগনকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবি?

সেদিনই ছোটন বিকেলে নগেনকে হাজির করল। দীপক দেখল গাট্টাগোট্টা শ্যামলা ছেলেটির সুশ্রী কাটা-কাটা মুখ। দুষ্টমি চিকচিক করছে যেন চোখে। দীপক সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দিল যে ওদের মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি উধাও হওয়ার ভয় আছে এবং চোর ধরতে নগেনের সাহায্য চাই। | উত্তেজনায় নগেন প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, 'আঁ, তাই নাকি? বইয়ে পড়েছি এমনি সব ব্যাপারস্যাপার হয়। তবে আমাদের বাড়িতেও যে তেমন কিছু ঘটতে পারে কোনোদিন 'ভাবিনি। ধরব চোর। বলুন কী করতে হবে কাকু?”

দীপক বোঝাল, 'শুধু মন্দির থেকে যে চুরি করবে তাকে ধরলেই চলবে না। আরও এগুতে হবে। গোড়া ধরে টান দিতে চাই। এসব কাজ এক চোরের কীর্তি নয়। অনেকের হাত থাকে। তোমায় পাহারা দিতে হবে লুকিয়ে। তুমি এর মধ্যে আছে আর কেউ যেন না অজানে। শুধু তোমার কাকা হেমেনবাবু জানবেন। মনে রেখো এসব কেসে প্রথম চুরিটা সাধারণত গ্রামেরই কাউকে দিয়ে করানো হয়। তারপর পাচার হয়ে বাইরে যায় মূর্তি। জানাজানি হয়ে গেলে সাবধান হয়ে যাবে চোর। 'তক্ষুণি নগেন সায় দেয়, “সে আমি কাউকে বলব না।'

দীপক নগেনকে বলল, 'কয়েক দিন রাতে গোপনে মন্দিরের ওপর নজর রাখতে পারবে কেউ ঢুকছে কিনা?

নগেন বলল, “তা পারব। আমি দোতলায় শুই। একা একটা ঘরে। এই ঘরের জানলা থেকে মন্দিরের দরজার কাছ অবধি দেখা যায়। জানলা একটু ফাক করে রাত জেগে নজ রাখব।

দীপক তাকে থামায়, “উহু, একা রাতের পর রাত জাগা সম্ভব নয়। একটা ওয়ার্নিং বেলের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে রাতে মন্দিরের দরজা খোলামাত্র শব্দ শুনে জেগে উঠতে পার। কিন্তু মন্দিরে তো ইলেকট্রিসিটি নেই। তোমাদের বাড়িতে আছে বটে। উপায় একটা ভেবেছি। তোমার ঘরে বেলটা ফিট করে নেবে।'

কী রকম?' নাগেন টানটান অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে। দীপক বোঝাল, 'মন্দিরের দরজায় ভেতর দিক থেকে একটা শক্ত অথচ সরু দড়ি লাগানো থাকবে রাতে। দড়িটা দেওয়ালের গায়ে গায়ে উঠে খুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে যাবে তোমার ঘরে। তোমার ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে গলে নামবে। তার শেষ মাথায় বাধা থাকবে একটা ভারী লোহা। কুলবে লোহাটা। একটু নিচে থাকবে একটা টিন বা লোহার পাত। মন্দিরের দরজা খুললেই দড়িটা আলগা হবে এবং তোমার ঘরে

লোহার টুকরোটা নিচে নেমে ঠং করে ঘা দেবে পাতে। পাশে শুয়ে থাকলে তুমি অমনি জেগে উঠবে আওয়াজে। অবশ্য তোমার কেমন ঘুম জানি না। আওয়াজে উঠবে তো?'

'হু, সে ঠিক উঠে পড়ব। বেলটা দারুণ আবিষ্কার করেছেন। জানায় নগেন।

দীপক বলল, "আমার আবিষ্কার নয়। এ ধরনের ওয়ার্নিং বেলের চলন আছে যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। দিনের বেলা দরজা থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে গুটিয়ে কোনো বুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখবেন পুরোহিতমশাই -হ্যা, উনি জানেন ব্যাপারটা। রাতে দের বন্ধ করে বেরুবার সময় দড়িটা আটকে দিয়ে যাবেন দরজার গায়ে অকে। দড়িটা দেখতে না পেলে বাইরের কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। মন্দিরের গায়ে একটা গাছ আহে। গড়িটা গাছের ডালপালার ফাক দিয়ে যাবে যাতে চট করে নজরে না পড়ে বাইরে থেকে।

নগেন বলল, 'কারও নজরে পড়লেও ক্ষতি নেই। ওটা হনুমান তাড়াবার কল বলে চালিয়ে দেব। মাঝে মাঝে আমাদের দোতলায় হনুমান লাফিয়ে আসে, উৎপাত করে।'

বাঃ! তাহলে তো নিশ্চিন্দি। দীপক খুশি। নগেন হঠাৎ বলল, আমার সঙ্গে বঙ্কাকে চাই।"

"কে বঙ্কা?' জানতে চায় দীপক।

'আমার খুব বন্ধু। ওই গায়েই থাকে। বেলের আওয়াজে বাই চান্স যদি ঘুম না ভাঙে? বন্ধা আর আমি দু'জনেই শোৰ আমার ঘরে। ও প্রায়ই এসে থাকে আমার কাছে। আমারই ক্লাসে পড়ে তবে অন্য স্কুলে। ও কাউকে বলবে না, কথা দিচ্ছি। দ'জনে পালা করে জাগব। বেল বাজার রিস্ক নেব না।

'অলরাইট। তাই করো।' দীপক সম্মতি জানায়, আর তোমার কাকা হেমেনবাবুকে বলবে কাল দুপুরে এখানে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। আমি পলাশপুরে বারবার গেলে লোকে সন্দেহ করতে পারে। মানে ফিউচার চোরেরা।

পরদিন হেমেনবাবু আসতে দীপক তাকে বুদ্ধি দিল, 'গ্রামে চাউর করে দিন যে মন্দিরা জাবাবার কথা ভাবছেন। শিবলিঙ্গ বাদে অন্য মুর্তিগুলো সরিয়ে ফেলে

মেঝেও সরাবেন। সপ্তাহখানেক বাদে কাজ শুরু করতে চান। জনে জনে বলার দরকার নেই। এমন ৃউকে বলবেন যাতে খবরটা রটে যায় চটপটি। আছে তেমন কেউ?”

‘আছে বইকি। সব গায়েই থাকে।' জানান হেমেনবাবু, হরি মুদিকে গল্পচ্ছলে কথাগুলি পেশ করলেই কাম ফতে। একদিনেই গোটা গা জেনে যাবে। কিন্তু বাড়ির লোক জানলে?”

‘বাড়ির লোককে বলবেন, প্ল্যান একটা আছে মন্দির সারাবার। তবে ওই সাত-আট দিনটা নেহাত কথার কথা। হরি জিজ্ঞেস করছিল, বলে দিলুম।”

‘কিন্তু এই রটনা কেন ?” হেমেনবাবু বিস্মিত।

'কারণ মন্দির সারাই হলে বিষ্ণুমূর্তি সরানো হতে পারে এই ভয়ে হয়তো চোর এই ক'দিনের মধ্যেই কাজ হাসিলের চেষ্টা করবে। আমাদেরও বেশিদিন টেনশনে ভুগতে হবে।

পাঁচ দিন বাদে সকাল আটটা নাগাদ ভবানী প্রেসের এক কোণে বঙ্গবার্তার জন্য নিউজ লিখছিল দীপক। এমন সময় এই প্রেস এবং বঙ্গবার্তার মালিক ও সম্পাদক কুঞ্জবিহারীর আগমন ঘটল সশব্দে। দুমদাম করে রাস্তা থেকে প্রেস-ঘরে ঢুকেই দীপককে দেখে তিনি হুংকার ছাড়লেন, 'আরে দীপক, এখানে কী কচ্চো? ওদিকে কি কাণ্ড হয়েছে জান? পলাশপুর গ্রাচ্ছে সরকারদের মন্দিরে চুরি হয়ে গিয়েছে কাল রাতে। বিষ্ণুমূর্তি উধাও হয়েছে। পুলিশ গিয়েছে। ওই গাঁয়ের মধু বলে গেল হাটে যাওয়ার পথে। যাও এক্ষুণি পলাশপুর, রিপোর্ট নিতে। ‘বাঃ! তাহলে গিয়েছে।' দীপক উল্লসিত।

কী ব্যাপার হে? মনে হচ্ছে তুমি যেন আশায় বসেছিলে। বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে!” কুঞ্জবাবুর লোমশ ভুরু জট পাকায়। ‘সব বলব’খন পরে। চলি। দীপক দ্রুত বেরিয়ে যায়।

সরকারদের শিবমন্দিরের গায়ে ঠাসা ভিড়। দুই সরকার কর্তা চিন্তিত মুখে বোলপুর থানার ছোট দারোগার সঙ্গে কথা বলছেন। দীপক উকি মেরে দেখল যে মন্দিরের তালা খোলা। কড়া কাটা নয়। নকল চাবি দিয়ে খুলেছে কি? মন্দির থেকে কত সোনাদানা গিয়েছে তাই নিয়ে প্রচণ্ড গুজব চলছে চাপা কঠে।

দীপকের কানে এল ইতিমধ্যেই চুরি-যাওয়া ঠাকুরের গয়না ইত্যাদির মূল্য লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। হয়তো আরও বাড়বে যত সময় যাবে। দীপক নজর করে, সরকারবাড়ি থেকে নগেন তাকে ইশারায় ডাকছে। ঘুরতে ঘুরতে দীপক একটু একা হতেই নগেন টুক করে তার পাশে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, “কে চোর, কোথায় চোরাই মাল লুকনো আছে সব জানি। স্কুলে যাচ্ছি। যাব আপনার কাছে টিফিনে।' বলেই সে স্যাং করে সরে গেল।

“ কী খোয়া গিয়েছে।' দীপকের প্রশ্নের জবাবে সারোগা জানালেন, 'একটা বিষ্ণুমূর্তি।

‘সোনাদানা দামি কিছু?' জানতে চায় দীপক।

‘নাঃ। দামি কিছু নাকি রাখা হত না মন্দিরে। দারোগা জানান।

‘কাকে সন্দেহ করছেন?”

“এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না। মূর্তিটা নাকি খুব প্রাচীন। পুরনো মুর্তি চুরি স্মাগলারদের কাজ।

‘তালা খুলল কীভাবে?' দীপকের প্রশ্ন।

ছোট দারোগা বললেন, 'বলা যাচ্ছে না ঠিক। নিয়ে যাচ্ছি পরীক্ষা করতে।'

‘মূতিটা কি উদ্ধারের আশা আছে?" চেষ্টা করব যথাসাধ্য। দারোগার দায়সারা জবাব। দুপুরে দীপাকের বাড়ি হাজির হল নগেন। সে উত্তেজনায় ঘামছে। তড়বড় করে বলে গেল, রাত দশটা নাগাদ ঠং করে বেল বাজে। অবশ্য তখন জানলায় বঙ্কা। ডিউটি দিচ্ছিল জেগে। শব্দে আমার ঘুমটা সবে ভেঙেছে, বঙ্কা ঠেলা মেরে বলল, 'একটু আগে একটা লোক গিয়েছে মন্দিরের দরজার দিকে। চেনা যায়নি অন্ধকারে। দু'জনে তখুনি নিচে নেমে খিড়কি দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে মন্দিরের কাছে গেলাম। গাছের আড়াল থেকে নজর রাখলাম। মন্দিরের দরজা বন্ধ কিন্তু তালাটা খেলা। খানিক বাদে দরজা একটু ফাক হল। একজন মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে টুক করে বেরিয়ে পথ চলতে লাগল। বেরিয়ে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল। বাইরে হালকা চাঁদের আলো ছিল। লোকটা পথের ধার ঘেঁষে বাড়িগুলোর ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে চলল। তার

বগলের নিচে কিছু একটা ছিল। গামছা দিয়ে সেটা ঢেকে নিয়েছিল। গ্রাম তখন শুনশান। দু'একজন মাত্র পথে যাচ্ছে'।

‘লোকটাকে চিনতে পেরেছিলে?’’ দীপক প্রশ্ন তোলে।

‘‘হ্যা।' খাড় নাড়ে নগেন, 'মতি কামারের ছেলে ষষ্ঠীপদ। ও তালা-চাবির কাজ জানে। চাবি হারালে চাবি বানিয়ে দেয়। সরু শিক ঢুকিয়ে বন্ধ তালা খুলতে পারে।'

‘কত বয়স?' ‘‘এই বাইশ-চব্বিশ।'

‘গ্রামেই থাকে?'

"হ্যা। তবে মাঝে মাঝে বোলপুরে গ্রিলের কারখানায় কাজ নেয়। তখন বাহিরে থাকে। মহা চালিয়াৎ।' নগেন রেগে ওঠে।

‘হ্যা, তারপর কী হল?’’ দীপক তাড়া দেয়।

নগেন বলে চলে, ‘লুকিয়ে যাবে কোথা? ও মোড় বাঁকতেই আমরা দৌড়ে গিয়ে মোড় থেকে উকি মেরে নজর রাখলাম। এমনি দুটো মোড় বেঁকে ধষ্ঠীদা নিজের বাড়ির সামনে গেল। কিন্তু ঢুকল না বাড়িতে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল ও পাড়ায় একটা পুকুর আছে সেই দিকে। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সরু পথে।

আমরাও লক্ষ রাখলাম পুকুরপাড় থেকে। যষ্ঠীদা জলে নেমে ঘাটের পাশে কিছু একটা ডুবিয়ে রাখল। তারপর উঠে গিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকল।

দীপক গভীর উদ্বেগে বলে, তুমি এখানে এলে, এতক্ষণে ষষ্ঠী নির্ঘাৎ ওটা পাচার করে দিয়েছে।’’

নগেন মিচকে হেসে জানাল, 'মোটেই না। সারারাত আমরা পুকুরপাড়ে গার্ড দিয়েছি। সকাল থেকে পালা করে নজর রাখছি। জলের ভেতর বিষ্ণুমূর্তি ঠিক আছে।

‘অ্যাঁ। বিষ্ণুমূর্তি রেখেছে জানলে কী করে?' দীপক তাজ্জব।

নগেন বলল, 'আজ সকালে ষষ্ঠীদা দেখলাম বাড়ি থেকে বেরলো। ওকে ফলো কুললাম। ষষ্ঠীদা বাসে চেপে বোলপুরের দিকে গেল। তক্ষুণি গিয়ে পুরে নেমে

ডুবে খুজে দেখলাম, এক থলির মধ্যে বিষ্ণুমূর্তি দিব্যি রয়েছেন।'

'একসেলেন্ট। দারুণ কাজ করেছ।' দীপক উচ্ছ্বসিত, আচ্ছা পুকুরটায় ভোর থেকে বাসন মাজা, চান করা হয় কি?

নগেন জানায়, 'তা হয়। খুব ভোর থেকেই। ওটাই যে ও পাড়ার একমাত্র পুকুর।' 'তাহলে দিনে নয়, রাতেই তুলবে মূর্তিটা। তারপর পাচার করবে। সাইকেলে যাবে, না বাসে?'' দীপক উত্তর খোঁজে।

নগেন বলল, 'যষ্ঠীদার সাইকেল নেই। মতি জ্যাঠার আছে। সেটা লজুঝরে। সাত-আট মাইল যাওয়া যাবে না।'

'ই, তাহলে বাসেই যাবে। দীপকের সিদ্ধান্ত, ''আচ্ছা মতি কামার লোক কেমন? এই ষড়যন্ত্রে আছে মনে হয় ?"

নগেন বলল, ''মতি জ্যাঠা খুব সৎ মানুষ। এসব করবে না।

দীপক বলল, 'তাহলে যষ্ঠী মুর্তিটা রাতে তুলে ভোরেই পাচার করবে বাসে চড়ে। বাড়িতে বেশিক্ষণ রাখতে সাহস পাবে না। গ্রাম থেকে বাস রাস্তায় পৌঁছনোর তো একটাই পথ ?'

'হ্যা। ঘাড় নাড়ে নগেন।

''কিন্তু ঘষ্ঠীকে ওয়াচ করার উপায়? মানে থলি বা ব্যাগে মুর্তি পুরে যখন বাসে উঠবে! আজ নিশ্চয় জানতে গিয়েছে, মূর্তিটা কখন হাত বদল করবে। দু'-একদিনের ভিতরেই ও মুর্তি নিয়ে যাবে আসল ঘাটিতে। ও কোথায় গিয়ে মূর্তিটা দেয় সেটা জানা খুব দরকার।

সে ব্যবস্থা করে ফেলব। নগেন জোরের সঙ্গে জানায়। 'কী করে?'

নগেন বলে, 'মতি কামারের ঠিক সামনের বাড়িতে থাকে পাঁচু। আমার বন্ধু। পাঁচু ষষ্ঠীদার ওপর হাড়ে চটা। মাস খানেক আগে ষষ্ঠীলা পাঁচুকে চড় মেরেছিল নেহাতই তুচ্ছ কারণ। পাচুকে বলব ওয়াচ রাখতে। যষ্ঠীদা যেই না বাগ-ট্যাগ হাতে বেরুবে সেজেগুজে অমনি যেন আমাদের কাউকে খবর দেয়। খুব ভোর থেকে নজর রাখবে।

কিন্তু কারণটা যদি জানতে চায় পাঁচু?"।

'সে যা হোক বলে দেব। তবে মুর্তির কথা ভাঙব না। বলব, পরে বলব সব। বলে দেব, যষ্ঠীদাকে একটু প্যাচে ফেলতে চাই সেই কারণেই। "কিন্তু পাঁচু যখন স্কুলে যাবে?' নগেন বিষন্ন সুরে বলে, "পাঁচু আর ইস্কুলে যায় না। ক্লাস এইট অবধি পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। ওর বাবার কাজে সাহায্য করে। ওর বাবা দর্জি। খুব অভাব ওদের। পাঁচুর কথা বলতে বলতে নগেন কেমন মিইয়ে পড়ে। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র। তারপরই ডবল উৎসাহে চেঁচিয়ে ওঠে, আরও একটা ওয়াচ রাখব।' 'আবার কে?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

নগেন বলে, 'বাস স্টপেজ চায়ের দোকানটা বঙ্কার দাদার। দোকান খোলে ফাস্ট বাস যাওয়ার আগেই। ওই দোকানে হারু নামে একটা ছেলে কাজ করে, খুব চালাক-চতুর। বঙ্কা ওকে বলে রাখবে, ষষ্ঠীদা হাতে ব্যাগট্যাগ নিয়ে বাস ধরতে এলেই যেন আমাকে বঙ্কাকে কিংবা পাঁচুকে খবর দেয়। আমরা যে পারি ষষ্ঠীদাকে ফলো করব।'

'অলইট। খেয়াল রাখ।' মুখে বললেও দীপক নগেনের কথায় খুব একটা ভরসা পায় না। কিন্তু এছাড়া উপায় কী? ষষ্ঠীকে হাতেনাতে ধরতে হবে মূর্তি সমেত। তারপর পুলিশ জেরা করে জানবে গর কাছে মূর্তি যাচ্ছিল। পুলিশকে অবশ্য এক্ষুনি খবর দেওয়া যায়। থানা থেকে টিকটিকি লাগাবে ষষ্ঠীর পিছনে। তারপর ধরবে হাতেনাতে। কিন্তু থানায় তার পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। এত আগে খবর দিলে যদি লিক হয়ে যায় খবর! ষষ্ঠী সাবধান হয়ে যাবে। আর এই মূর্তির কাছে ঘেঁষবে না। দীপক জানে থানাতেও এসব গ্যাংয়ের চর থাকে। একেবারে লাস্ট মোমেন্টে জানাবে থানায়। যাতে বড় বা ছোট দারোগা স্বয়ং গিয়ে ৰামাল সমেত ধরতে পারে যষ্ঠীকে। | দীপক ভাবছে এইসব। ছোটন হঠাৎ ফস করে বলে বসল, 'কাকু, আমি আজ নগেনের সঙ্গে পলাশপুর যাই না? ও কতবার থাকতে বলে ওদের বাড়িতে। যাওয়া হয়নি। বঙ্কার সঙ্গে আমার চেনা আছে। দু'দিন থাকব ওদের বাড়ি। কাল শনিবার ইস্কুলে ছুটি দিয়েছে। সোমবার ওখান থেকে সোজা স্কুলে চলে আসব। তুমি একটু বলে দাও মা-কে।'

অমনি নগেন যোগ দেয়, 'হ্যা, ও দুদিন থাকবে আমার কাছে। দিন না যেতে।" 'বুঝেচি', হেসে বলে দীপক, ওখানে নরক গুলজার করবে তিনজনে। তবে বাপু বেশি। উৎসাহে বাড়াবাড়ি করো না। ষষ্ঠী সতর্ক হয়ে যাবে। ঠিক আছে ছোটন, তোর যাওয়ার পার্মিশন করে দেব।'

ছোটনের ছোট বোন ঝুমা আড়াল থেকে সব শুনেছে। নগেন ছোটন স্কুলে চলে যেতেই সে এসে আবদার জুড়ল, "কাকু, আমার বুঝি পলাশপুর যেতে ইচ্ছে করে না? নগেনদার বোনের সঙ্গে ভাব করতে কদ্দিনের হচ্ছে।'

দীপক দাবড়ে নেয় তাকে, "মোটেই না। এখন ওসব আহ্লাদ ছাড়। দু' দুটো বাইরের ছেলে-মেয়ে বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করছে দেখলে যষ্ঠীপদ মূর্তির ধারকাছ মাড়াবে না। পরে

অভিমানে ঝুমা ঠোট ফুলিয়ে চলে যায়। বেশি ভোগাল না যষ্ঠীপদ।

রবিবার সকালে ঝড়ের মতো হাজির হয়ে ছোটন দীপককে ডাকল, 'কাকু, কুইক। ষষ্ঠীপদ এসে গেছে মাল নিয়ে। চৌরাস্তায় বাস থেকে নেমে ও রিকশা চড়ে গিয়েছে। নগ বঙ্কা ওকে ফলো করেছে। যষ্ঠীপদর হাতে একটা কিটব্যাগ ছিল। পাঁচু বলেছে, ও নাকি

মুক্তি চুরি।। ২৯১ কাল রাতে যষ্ঠীপদকে পুকুরে নামতে দেখেছে। তাই বুঝছ তোল্লীপক চটপট তৈরি হতে হতে জেনে নেয়

নোন ছোটন শনি রবি দু'দিনই সকাল থেকে রেডি হয়েছিল। আর বঙ্কা ভোর থেকে ওর দাদার দোকানে গিয়ে জুটত। আজ পাঁচু খবর দেওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়েছে। দীপককে চৌরাস্তায় অপেক্ষা করতে বলেছে নাগেন।

দীপক সাইকেল চড়ে বেরুল। পেছনে ক্যারিয়ারে ছোটন।

মিনিট পনেরো বাদেই দেখা গেল নগেন হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। সে খবর দিল যে ষষ্ঠীপদ একটা বড় লাল বাড়িতে ঢুকেছে। ও বাড়ি ওমপ্রকাশের। বিসনেসম্যান। বঙ্কা গার্ড দিচ্ছে।

নগেন আর ছোটনকে পাহারায় পাঠিয়ে দীপক সাইকেলে ছুটল থানায়।

দাবোগাবাবুদের আভাস দিয়ে রেখেছিল দীপক যাতে ঠিক সময় হেল্প পাওয়া যায়। তবে কেসটা কী ভেঙে বলেনি। সব শুনে বড় দারোগা বললেন, 'আপনার ইনফর্মেশন কারেক্ট তো? ওমপ্রকাশ সোজা লোক নয়। ঝামেলা পাকাতে পারে।'

‘হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট', জোর দিয়ে বলে দীপক, এখন তো যাবেন যষ্ঠীপদর খোজে। মুক্তি পাওয়া গেলে তখন যদি ওমপ্রকাশ জড়িয়ে যায় তাকেও ধরতে অসুবিধা নেই।

আচমকা পুলিশের হানায় ষষ্ঠীপদ পালাবার সুযোগ পেল না। তার কিটব্যাগ খালি। কিন্তু বৈঠকখানায় যেখানে সে ছিল, সেই ঘরেই খুঁজে পাওয়া গেল বিষ্ণুমূর্তি, এক গাদা তাকিয়ার নিচে। ওমপ্রকাশও উপস্থিত ছিল সেই ঘরে। ফলে ওমপ্রকাশকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। ওমপ্রকাশের বাড়ি সার্চ করা হল। একটা গুদামে অনেকগুলো খুঁটের বস্তা ছিল। একটা বস্তার ওপরে খুঁটে, তলায় মিলল হরেকরকম পুরনো শিল্পদ্রব্য। নানা ধরনের পাথর ও পোড়া মাটির মূর্তি আর কিছু রুপোর বাসন। সব কটিই অপূর্ব কারুকার্য করা। আবার একটা বস্তার ভিতর পাওয়া গেল পিতলের তৈরি ফুট দেড়েক উচু প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ মূর্তি।

দারোগাসাহেব দেখেই চিনলেন ওই মূর্তিটা এবং রুপপার বাসনগুলি চুরি যাওয়া দ্রব্য হিসাবে ইতিমধ্যে ডায়েরি করা আছে থানায়। বাকি জিনিসের মালিকরা হয়তো এখনও টেই পায়নি যে তাদের জিনিস খোয়া গিয়েছে। অথবা কোনো দূর এলাকা থেকে এখানে আনা হয়েছে জিনিসগুলি। রাধাকৃষ্ণের মুর্তিটা এবং ওই পুরনো শৌখিন জিনিসগুলি 'এখানে এল কেমন করে? ওমপ্রকাশ তার সদুত্তর দিতে পারে না।

পলাশপুরের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধারের পর পুলিশি তদন্ত চলছে। যাতে চোরদের গোটা গ্যাং ধরা পড়ে। ষষ্ঠীপদ আর ওমপ্রকাশ দুজনেই আপাতত হাজতে।

দীপক সম্পাদকের কামরায় ঢুকতেই টেবিলে বঙ্গবার্তার জন্য দীপকের স্টোরি মুর্তি চুরি রহস্য’ লেখাটি দেখিয়ে গমগমিয়ে ওঠে সম্পাদকের কণ্ঠ, ‘‘ওয়েল ডান। তারপরেই তিনি ধমকে উঠলেন, কিন্তু বড় রিস্ক নিয়েছিলে হে। উচিত হয়নি।

‘কেন? কীসের রিস্ক? দীপক বেশ অবাক।

কুঞ্জবিহারী কড়া সুরে বললেন, ‘‘ওই বাচ্চা ছেলেগুলোর চোখ এড়িয়ে যষ্ঠীপদ যদি সরে পডত? যদি ওমপ্রকাশের বাড়িতে পুলিশ পৌছানোর আগেই পাচার হয়ে যেত বিষ্ণুমূর্তি? আর উদ্ধার না হত?

দীপক সামনের চেয়ারে বসতে বসতে নির্বিকার স্বরে বলল, ‘তাহলে ষষ্ঠীপদই বিপদে পড়ত। ধরা পড়ে ও বেঁচে গিয়েছে।' “মানে?’ গর্জে ওঠেন সম্পাদক।

মানে নকল মূর্তি গছিয়ে মোটা দাও মারার অপরাধে ষষ্ঠীকে ছাড়ত না ওই গ্যাং। খুন হয়ে যেত ষষ্ঠী।' একই ভঙ্গিতে জানায় দীপক।

মানে?’ কুঞ্জবিহারীর গলা আর একপর্দা চড়ে।। দীপক বলল, “স্টোরিতে যা লিখিনি তা হচ্ছে, ষষ্ঠী যেটা চুরি করেছিল সেটা নকল। সেই যে ওড়িশায় গিয়েছিলাম। ওখানে পাথরের মূর্তি বানানোর ওস্তাদ সব কারিগর আছে। কয়েকজনকে আমি চিনি। সরকারদের বিষ্ণুমূর্তির ফোটো দেখে ওরা প্রায় অবিকল অমনি একটা মূর্তি বানিয়ে দেয় আমায়। আমি ফিরলে, নকলটাই রাখা হয় মন্দিরে আর আসলটা চলে যায় হেমেন সরকারের বেডরুমে। এই গোপন ব্যাপারটা শুধু জানতাম আমি, হেমেনবাবু আর পুরোহিতমশাই। মূর্তি বানানোর খরচাটা হেমেন সরকারই দিয়েছিলেন।

হতভম্ব সম্পাদককে মিচকে হাসি দিয়ে দীপক মন্তব্য করে, আমি কি অতই কাঁচা?

মেলায় ঝামেলা - অজেয় রায় Melay Jamela by Ajeo Ray

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বঙ্গবার্তার অফিসে একবার ঢু মারল দীপক। ভবানী প্রেসের এক অংশে কাঠের পার্টিশন ঘেরা ছোট্ট কুটুরি। তারই ভিতর বসেন সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি। ভবানী প্রেসেরও মালিক মাইতিমশাই। বছর পঁচিশেকের যুবা দীপক রায় বঙ্গবার্তার একজন সাংবাদিক। কাজটা তার শখের বলা চলে। কারণ সাংবাদিকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার সাধ্য নেই বঙ্গবার্তার, বড়জোর মাঝে-মাঝে দু-চার টাকা গাড়ি ভাড়া মেলে।

কুঞ্জবিহারী চেয়ারে হেলান দিয়ে দ হয়ে বসে। সামনে টেবিলের ওপর দু-ঠ্যাঙের অর্ধেক ছড়ানো। চোখ আধবোজা। ডান হাতের আঙুলে ধরা খোলা ডটপেন। টেবিলে বিছানো কয়েক পাতা ফুলস্কেপ সাদা কাগজ। আগামী সপ্তাহের জন্য একটি জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় ভাবছেন।

ক্যাঁচ। সুইং-ডোরে মৃদু আওয়াজে চোখ খুললেন কুঞ্জবিহারী। দীপক মুন্ডু বাড়িয়েছে দরজা ঠেলে। সম্পাদককে চিন্তামগ্ন দেখে সে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বলল, ‘‘ঠিক আছে। পরে আসব, এই এমনি এসেছিলাম।'

অন্যমনস্কভাবে দীপকের পানে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে কুঞ্জবিহারীর থমথমে মুখে খুশির আভা ফোটে। সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, ‘‘এসো

দীপক, তোমার কথাই ভাবছিলাম আজ। কাজ আছে।'

দীপক ঘরে ঢুকে সম্পাদকের সামনে বসল চেয়ারে।

কুঞ্জবিহারী মাঝবাসি। দৃঢ়কা শ্যামবর্ণ। বেটেখাটো। গোলগাল চোখে প্রখর দৃষ্টি। মাইতিমশাই বাজখাই গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘‘পাথরচাপুড়ির মেলায় গেছ কখনো?'

‘না। ঘাড় নাড়ে দীপক। ‘‘কিছু জান মেলাটা সম্বন্ধে ? কোথায় হয়? কী উপলক্ষে?

দীপক আমতা আমতা করে, 'সিউড়ি শহর থেকে খানিক দূরে হয় শুনেছি। কোনো এক ফকিরের নামে। আর কিছু ঠিক’--সে চুপ করে যায়।

‘সিউড়ি থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে পাথরচাপুড়ি গ্রামের পাশে মেলা বসে', জানালেন কুঞ্জবিহারী, মেলার হিস্ট্রিটা ইন্টারেস্টিং। প্রায় দেড়শো বছর আগে এক মুসলমান ফকির এসে পাথরচাপুড়ি গ্রামে বাস করতে থাকেন। ফকিরের নাম ছিল বোধহয় মহবুব শা। কিছু অলৌকিক ক্ষমতার গুণে এবং দাতা হিসেবে তিনি বিখ্যাত হন। ভক্তদের থেকে যা পেতেন সব বিলিয়ে দিতেন গরিব-দুঃখীদের। লোকে তাকে তাই নাম দেয় দাতাসাহেব। ১৮৯৮ সালে দাতাসাহেব ওইখানেই দেহত্যাগ করেন। তার মৃত্যুবার্ষিক উদ্যাপন উপলক্ষে ১৯১৮ সাল থেকে এখানে মেলা বসতে শুরু করে। ১০ চৈত্র দাতা সাহেবের মৃত্যু দিন। সেইদিন মেলা শুরু হয়। অফিসিয়ালি তিন দিন থাকে। অবশ্য ভাঙতে আনও দিন দুয়েক কেটে যায়। প্রথম দিকে ছোটো মেলা ছিল। এখন বিরাট ব্যাপার। প্রচুর লোক আসে। অনেক দোকানপাট বসে। হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের লোক যায় মেলায়। শুধু,

আশেপাশের অন্য জেলা থেকেও লোক যায়। ভক্তরা দাতাসাহেবের সমাধি দর্শন সানী দেয়। আমি প্রায় কুড়ি বছর আগে একবার গিয়েছিলাম পাথরচাপুড়ির মেলায়।

কাটা ঢের বড় হয়েছে। আজ ১০ চৈত্র। অর্থাৎ আজ থেকে মেলা শুরু হল। পারলে লই চলে যাও। ঘুরে দেখে এসে লেখ মেলাটার বিষয়ে। স্পেশাল পয়েন্টগুলো নোট ববে। আর যদি—কুঞ্জবিহারী মুহূর্ত থেমে একবার ভুরু

নাচালেন, 'তেমন কোনো ঝামেলা, মানে ইয়ে কোনো ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়ে যায়, স্টোরিটা জমে যাবে।'

সিউড়ি গিয়ে বাস চেঞ্জ করে পাথরচাপুড়ি?' দীপক জানতে চায়। “আমি তাই গিছলাম। তবে এখন কিছু বাস এই বোলপুর থেকেই সোজা পাথরচাপুড়ি অবধি যায় মেলার সময়। জানালেন কুঞ্জবিহারী। "ঠিক আছে যাব কাল।” দীপক বিদায় নিল।

দীপক পাথরচাপুড়ির মেলায় যাবে শুনে তার ন্যাওটা দুই ভাইপো ভাইকি ষোলো বছরের ছোটন আর চোদ্দো বছরের ঝুমা আবদার জুড়ল, কাকু, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।

দীপক ভেবে দেখল, মন্দ নয়। একা একা ঘুরে ব্যাজার হব। এরা দুটোই খুব চালাক চতুর। তার নিজের কাজে বাধা হবে না। বরং গল্পগুজব করে সময়টা ভালোই কাটবে। তবু সে ওদের একটু সাবধান করে দেয়, "নিয়ে যেতে পারি তবে বেশি ছটফট করা চলবে না। আমার চোখে চোখে থাকতে হবে। শেযে লোকের ভিড়ে হারিয়ে গেলে খুঁজে মরব তা হবে না।

'না না কাকু, একদম তোমার লেজ ধরে থাকব।' ঝুমা সরবে জানায়।

কী বললি? কী ধরে থাকবি?' দীপক চোখ পাকাতেই ঝুমা জিভ কাটে। অমনি ছোটন কাকাকে উসকোয়, দরকার কি ওকে নেবার। নেলার ভিড়ে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ভারি ঝামেলা। কেবল আগলাও।'

“থাক থাক তোমার আর আমার ঝামেলা বইতে হবে না, ঝুমা ফোস করে, “কাকু নেবে আমায়?' তার চোখ ছলছল। দীপক তাড়াতাড়ি বলে, “বেশ বেশ যাবে দু’জনেই। এবার তার আদরের ভাইঝির মুখে হাসি ফোটে।

দুপুর দুটো নাগাদ ছোটন ও কুমাকে নিয়ে দীপক পাথরচাপুড়ি পৌছল। একা এলে সে সকালেই আসত। কিন্তু ছোটন কুমা থাকায় দুপুরের খাওয়াটা সেরে এসেছে। মেলায় কোথায় আবার ভাত খাবে ওদের নিয়ে? এরপর বাসের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। পথে এবার বাস বিগড়েছিল। এই সব কারণে মেলায় পৌছতে দেরি হয়ে গেল তাদের। বাস যেখানে থামে সেখান থেকে মেলায় ঢুকতে মিনিট পাঁচ সাত হাঁটতে হয়। বাস কে নেমে দীপক থ। এ মেলায়

এত ভিড় হয় সে ভাবতে পারেনি। জনস্রোত বইছে দুমুখো। একদল ঢুকছে মেলায়, অন্যরা বেরিয়ে আসছে। শুঃ চৈত্রে মেঠো পথে-যাত্রীদের ম পায়ে গুড় গেরুয়া ধুলোয় মেলার আকাশ কিছুটা ঘোলাটে। নানান বয়সি লোকের কেতাদুরস্ত মানুষ কম। বেশির ভাগই গ্রাম অঞ্চলের গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ। বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে গরুর গাড়ি রয়েছে অন্তত শ'খানেক। বেশির ভাগ গাড়ির জোয়াল নামানো, মুখ থুবড়ে রয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে গরু গুলি জাবর কাটছে। গাড়ির কাছাকাছি বসে রান্না করছে বা বিশ্রাম নিচ্ছে অনেক আরোহী। চার-পাঁচখানা প্রাইভেট মোটরগাড়ি এবং কয়েকটা লরি দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে। ধানের কাছে দূরে নানান আশনের ভঁৰু পড়েছে অনেক।

তিনজনে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে। একটার পর একটা মিছিল আসছে নানারকম বাজনা বাজাতে বাজাতে। ঢুকে যাচ্ছে মেলায়। প্রত্যেক মিছিলের সঙ্গে ট্রলি-রিকশা বা ঠেলাগাড়ি রিকশা বা ঠেলার ওপর বিছানো সুন্দর সুন্দর চাদর। চাদরের ওপর ছড়ানো রয়েছে গানা নোট আর খুচরো পয়সা। গাড়িগুলিতে আরও কীসব পোটলাপুঁটলি। মিছিলের লোকের হাতেও পোঁটলা, তাছাড়া সঙ্গে নিয়ে চলেছে ছাগল মুরগি খাসি ইত্যাদি।

'এত মিছিল কোথায় যাচ্ছে কাকু?' জিজ্ঞেস করে ঝুমা। দীপক পাথরচাপুড়ির মেলা সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিয়ে এসেছিল। তাই জবাবটা আটকাল না। বলল, 'এরা ভক্তশ্রী যাচ্ছে, বাতাসাহেবের মাজার অর্থাৎ সমাধি দর্শন করতে। সেখানে প্রণাম করবে আর টাকাকড়ি সিন্নি নানারকম রান্না খাবার, তাছাড়া মোরগ খাসি ছাগল এইসব উৎসর্গ করবে। শুনেছি নগদে অর জিনিসে মিলিয়ে প্রায় লাখখানেক টাকার মতন জমা পড়ে দাতাসাহেবের নামে এই মেলার কদিনে। এবার মেলায় ঢুকি।' দীপক এগোলো।

মেলায় ঢোকার মুখেই এক অদ্ভুত দৃশ্য। পায়ে চলা হাত দশেক চওড়া ধূলিধূসর কাচা রাস্তার দু'ধারে সার দিয়ে রয়েছে কয়েক শো ভিখিরি। কানা খোঁড়া রোগগ্রস্ত কে নেই। নানান বয়সি পুরুষ ও নারী ভিখিরির কেউ বসে, কেউ বা মাটিতে শুয়ে। কেউ বিকট চিৎকার করে ভিক্ষে চাইছে। কেউ বা মৃদু কাতর স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করছে। ভিক্ষুকদের বেশির ভাগেরই চেহারা করণ বীভৎস। এই দৃশ্য দেখে বুমা তো একদম দীপকের গা ঘেঁষে এল। ভিখিরিদের সামনে রাখা বাটি, থালা, চটে পয়সা পড়ছে মন্দ নয়। বোঝা যায় দাতাসাহেবের কাছে আগমন উপলক্ষে যাত্রীরা উদার হস্তে দান করে গরিব দুঃখীদের।

দীপক মেলায় ঢুকে প্রথমে যেটা দাতাসাহেবের সমাধি সেটা দর্শন করল। সুন্দর তবে আড়ম্বরহীন মাঝারি আকারের বাড়িটি। এর ভিতরে আছে দাতাসাহেবের কবর। মাজারের ভিতরে বাইরে বেজায় ভিড়। খানিক তফাতে থেকে অল্পক্ষণ মাজার দেখে দীপক ভাইপো ভাইঝিকে নিয়ে মেলায় টহল দিতে লাগল।

বীরভূমে আর পাঁচটা মেলার মতন এখানেও সার্কাস ম্যাজিক নাগরদোলা চিড়িয়াখানা ফোটো তোলার স্টুডিও ইত্যাদি এসেছে। হরেকরকম দোকানপাট। খাবার দোকান প্রচুর। দীপক মাঝে মাঝে কোনো দোকানদার বা কোনো যাত্রীর সঙ্গে কথা বলে মেলাটা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লাগল।

যেতে যেতে ঝুমা বলল, 'কাকু, দেখেছ, এখানে কত বাতাসার দোকান।

ব্যাপারটা দীপকেরও নজরে এসেছিল। এক দোকানিকে জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারল যে দাতাসাহেবের ভক্তরা অনেকেই বাতাসা কিনে মাজারে প্রণামী দেয়। তাই এখানে বাতাসার চাহিদা খুব।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মন্টুর মুখোমুখি হল দীপক। মটু ওরফে তারাপদ গড়াই সমাচার পত্রিকার সাংবাদিক। সমাচারও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বোলপুর থেকে প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গবার্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মন্টু দীপকেরই বয়সি। তার কাঁধে ব্যাগ ও ক্যামেরা।

স্ত্রী মেলা কভার করতে বুঝি? মন্টু বাঁকা হেসে দীপককে জিজ্ঞেস করে। মানে এই বেড়ানো আর রিপোর্টিং দুই। আগে দেখিনি এই মেলা। এরাও ধরল খুব। দীপক তার ভাইপো ভাইঝিদের দেখায়।

কখন এলে?' একটু আগে।'

এঃ দেরি করে ফেললে। আমার তো প্রায় কাজ শেষ। একটু বাদেই ফিরে যাব, জানায় মন্টু। মেলা অফিসে গিছলে?"

'যাব।' মন্টুকে এড়িয়ে এগোয় দীপক।

মেলা কমিটির প্রৌঢ় সেক্রেটারি ভুরু কুঁচকে জানালেন—"কোথাকার কাগজ বললেন, বোলপুর? বোলপুরের কাগজকে দিলাম তো সব স্ট্যাটিটিকস্। ফের

কেন?'

দীপক বুঝল যে সেক্রেটারি সাহেব মন্টুর কথা বলছেন। সে বলল, আগে যার সঙ্গে কথা বলেছেন সে বোলপুরের বটে তবে অন্য কাগজের রিপোর্টার। আমি বঙ্গবার্তা থেকে আসছি।'

'ও!' সেক্রেটারি এবার একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলে এক তাড়া কাগজ বের করলেন, তাতে টাইপ করা এবং হাতে লেখা নানান ফিরিস্তি। কাগজগুলো দীপকের সামনে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, 'এতে সব হিসেব আছে। কত দোকান এসেছে। কী কী টাইপ। সার্কাস ম্যাজিক এই সব কটা। গতকাল, আন্দাজ কত লোক এসেছে মেলায়। মেলা কমিটির ফাংশান। কত গেস্ট রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বলুন কী কী চান?

কাগজগুলোর ফিরিস্তিতে চোখ বোলাচ্ছে দীপক, সেক্রেটারি বললেন, "ফোটো তুলবেন না ?"

'ফোটো!' দীপক অবাক। "হ্যা। আগের রিপোর্টার তো আমাদের মেলা কমিটির ফোটো নিলেন ওঁদের কাগজে ছাপবেন বলে?' জানান সেক্রেটারি।

দীপক জানে বঙ্গবার্তার মতোই সমাচারেও কস্মিনকালে ফোটো ছাপা হয় না। কারণ খরচে পোষায় না। মন্টু ফলস্ দিয়েছে। নিজের জন্য মেলায় ফোটো তুলতে ক্যামেরা এনেছে। সমাচারের জন্য নয়। কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না এখানে। তাই সে ম্যানেজ দিতে বলল, 'আমাদের ফোটোগ্রাফার এবার আসতে পারেনি। পরের বছর ফোটোসুদ্ধু মেলাটা কভার করব।

'ও।' সেক্রেটারির সুরে কিঞ্চিত তাচ্ছিল্য। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বললেন, 'আমি যাচ্ছি। জরুরি কাজ আছে একটা। এই সেলিম রইল, মেলা কমিটির মেম্বার। ওকে যা দরকার জিজ্ঞেস করবেন।'

গাঁট্টাগোট্টা বছর কুড়ির এক যুবককে দেখিয়ে সরে পড়লেন সেক্রেটারি। দীপক সেলিমকে প্রশ্ন করল, 'সমাচারের রিপোর্টার কি এই সব তথ্যই নিয়েছে?" 'হা!' ঘার নাড়ে সেলিম। কারও ইন্টারভিউ মানে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি?' "সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন কীসব, আমি শুনিনি।' সেলিম কাচুমাচু।

দু'চারটে দরকারি তথ্য টুকে নিল দীপক। কিন্তু এই সমস্ত খবর তো সমাচারেও থাকবে। বাড়তি নতুন কিছু চাই। সেলিমকে খুঁচিয়ে দেখল ছেলেটার মগজ বেশ নিরেট। কেবল হেঁ হেঁ করে, মাথা চুলকায় আর সেই মেলার কাগজপত্র হাতড়ায়। তেমন নতুন কিছুই দিতে পারল না। একে বোধহয় নেহাতই গায়ে আটার জন্যে কমিটিতে ঢোকানো হয়েছে। খানিক হতাশ হয়েই দীপক মেলা অফিস ছেড়ে রে ঘুরতে বেরোল।

একটা ম্যাজিকের তাঁবুতে কল দীপক। ছোট তাবুটা প্রায় ভরে গেছে দর্শকে। এটা পরেই শুরু হবে শো। সাদা প্যান্ট ও কালো কোট গায়ে, সরু গোফ, ব্যাব্রাশ করা চুল, আধা-বাসি ম্যাজিশিয়ান ভেঞ্চি দাঁড়িয়ে ছিলেন টিকিট কাউন্টারের কাছে। দীপক তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে নোট বই ও পেন হাতে প্রশ্ন করতে লাগল। যেমন—বাড়ি কোথায়? এর আগে কি এসেছেন এই মেলায়? টিকিট বিক্রি কেমন হচ্ছে? খেলা শিখেছেন কেমন করে? ইত্যাদি। ম্যাজিশিয়ান উত্তর দিতে দিতে ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি কি খেলা দেখবেন?"

দেখতে পারি,' জানায় দীপক। দীপকের সঙ্গে ছোটন আর বুমার ওপর এক নজর বুলিয়ে নিয়ে ম্যাজিশিয়ান বললেন, "দেখুন স্যার, বোলপুরের কাগজকে আর কিন্তু ফ্রি-পশি দিতে পারব না। তবে হাপ-ফ্রি নিতে পারি। নইলে লোকসান হয়।'

দীপক বুঝল যে শ্রীমান মন্টু একে ইন্টারভিউ করে গেছে এবং বিনি পয়সায় শো দেখেছে। সে চটে গিয়ে বলল, 'না না, আমাদের ফ্রি দেওয়ার দরকার নেই। দেখলে টিকিট কেটেই দেখব?'

দীপক ছোটন ও ঝুমাকে জিজ্ঞেস করল, "দেখবি ম্যাজিক?

কাকার মুড বুঝে ছোটন বলে উঠল, 'নাঃ, এখন থাক পরে।

ম্যাজিশিয়ান ভেঞ্চিতে আপাতত বরবাদ করে দীপক বেরিয়ে এল। একটু বাদেই মন্টুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ।

"কি গিয়েছিলে মেলা অফিসে? আরে ওরা শুধু মামুলি খবর দেয়। কিন্তু ইন্টারেস্টিং লোক পাকড়ে বরং ইন্টারভিউ করো, স্টোরি জমে যাবে।" মন্টু মাতব্বরি ঢঙে বলল।

“তুমি করেছ?' জানতে চায় দীপক।

‘হু করেছি বইকি।” মন্টু রহস্যময় মিচকে হাসি দেয়। তারপর একবার আকাশ পানে তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'এবার ফিরব বোলপুরে। সকাল থেকে ঘুরছি। টায়ার্ড। মেঘ করেছে। ঝড় জল আসতে পারে। আচ্ছা গুড বাই।'

দীপক গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে মনে ভাবল, মন্টু -টা ভালোই দিয়েছে। কয়েকটা ইন্টারভিউ করতে হবে, বেশ চমকপ্রদ। যাতে সমাচারকে টেক্কা দেওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে একটা আইডিয়া তার মাথায় খেলে যায়। ছোটনকে বলল, “আয় আমার সঙ্গে। কুমা বলল, “কাকু খিদে পেয়েছে। এই মিনিট পনেরোয় একটা কাজ সেরে এসে খাওয়া যাবে। অগত্যা দীপকের পিছু নিল ছোটন ও ঝুমা।

মেলায় ঢোকার মুখে ভিখিরিদের সারির কাছে এসে দীপক বলল, 'আমি কয়েকজন ভিখিরির ইন্টারভিউ নেব। দাতাসাহেবের মেলা, ভিখিরিদের জন্য বিখ্যাত। এত ভিখিরি অন্য মেলায় আসে না। দেখি ওদের থেকে ইন্টারেস্টিং কিছু পাই কিনা?”

শুনেই ঝুমা থমকে গিয়ে বলল, 'কাকু তুমি যাও, আমরা এখানে থাকি।'

ছোটনের ভাব দেখে মালুম হল, তারও ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। দীপক বলল, বেশ, তোরা এখানে অপেক্ষা কর।

দীপক প্রথমে এক বৃদ্ধা ভিক্ষুকের সামনে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করল—কোথেকে আসছ?"

‘হুই গা হতে।' বৃদ্ধা এক দিকে আঙুল দেখায়।

“ভিক্ষে মাছ কেন? কেউ নেই তোমার ?”

“কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। আপন নোক সব শব্দুর। বুড়িকে ঠকিয়ে সর্বস্ব নিয়ে এখন কেউ দু'মুঠো খেতে দেয় না—বৃদ্ধা কাঁদতে থাকে এবং কাপা কাপা দুর্বোধ্য কণ্ঠে নিজের দুঃখের কাহিনি বলে চলে।

দীপক তার কথা কিছুই উদ্ধার করতে পারে না। অপ্রস্তুত হয়ে বৃদ্ধাকে পঁচিশ পয়সা দিয়ে সে সরে যায়।

দীপকের নজর পড়ল কাহেই আর একজন ভিখিরির দিকে।

লোকটির শরীর বেশ জোয়ান। বয়স বেশি নয়। মাথাভরা রুক্ষ চুল। রং কালো। সারা গাঁয়ে ধুলো ময়লা। মুখে অযত্নে ছাঁটা পাতলা দাড়ি গোঁফ। পরনে হেঁড়া ধুতি ও শাট। তার বাঁ পায়ে হাঁটুর নিচ থেকে গোছ অবধি নোংরা ন্যাকড়া পেঁচানো ব্যান্ডেজের মতন। নিশ্চয় ঘায়ের ওপর ন্যাকড়া জড়িয়েছে। কারণ ব্যান্ডেজ তেলতেলে, তার ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে লালচে ছোপ ছোপ। লোকটির পাশে শোয়ানো একটা মোটা লাঠি। লোকটি কুঁজো হয়ে বসেছে। তার ডান পা মাটিতে ছড়ানো, বাঁ পা হাঁটু মুড়ে সামনে তুলে রেখেছে। সে নিচু গলায় কাতর স্বরে মাঝে মাঝে ভিক্ষে চাইছে। করুণ চোখে দেখছে আগন্তুকদের। কখনো বা মাথা নামিয়ে থাকছে। সামনে ভিক্ষাপাত্র, একখানি টিনের থালা।

দীপক ওই ভিখিরিটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ি কোথায়?

ভিখিরিটি বোকার মতন দীপকের মুখ পানে তাকিয়ে থাকে। যেন প্রশ্নটা ধরতে পারেনি।

দীপক ফের জিজ্ঞেস করল।

"সিউড়ির কাছে। ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় জানায় লোকটি।

“পায়ে কী হয়েছে?”

লোকটি নিজের ন্যাকড়া জড়ানো পা-টা দেখে। জবাব দেয় না।

“কী হয়েছে ঘা?’ জিজ্ঞেস করে দীপক।

লোকটি বলে, 'হু বাবু।'

কী করতে আগে?

‘আজ্ঞে মজুর খাটতাম।”

‘ডাক্তার দেখিয়েছিলে?”

হুম।

‘ওষুধ খেয়েছিলে?

লোকটি চুপ করে থাকে।

দীপক বোঝে ঠিক মতো ডাক্তার দেখানো বা ওষুধ খাওয়া সম্ভব হয়নি ওর। সে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে কে কে আছে?”

‘আছে। এর বেশি উত্তর মেলে না। লোকটি ঘাড় নিচু করে থাকে। যেন নিজের পরিচয় দিতে তার বড়ই সংকোচ। হয়তো এই বীভৎস ঘা হওয়ার কারণে নিজের স্বজনরা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এই ঘায়ের জন্য কাজও জোটে না। ফলে এখন ওর ভিক্ষাবৃত্তি মাত্র সম্বল। তাই বুঝি আগের সুস্থ জীবনের প্রসঙ্গ এড়াতে চায়। লজ্জা পায়। কষ্ট পায়।

দীপক জিজ্ঞেস করল, “ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মানে, যে রোগ লিখে দিয়েছিলেন কাগজে সেটা কি আছে? দেখাতে পারবে?

লোকটি হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে। দীপক বলল, “তোমার যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই, করবে?” লোকটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। দীপক বুঝল তার কথা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না।

দীপক ভাবে, সিউড়ির ডাক্তার মুখার্জি সুচিকিৎসক এবং উদার হৃদয়। তিনি দীপককে খুব স্নেহ করেন। দীপক অনুরোধ করলে হয়তো এই লোকটিকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে রাজি হবেন। যদি এর কুষ্ঠ হয়, কোনো কুষ্ঠ আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন ডাঃ মুখার্জি। হয়তো একে সারিয়ে সুস্থ করে তুলতে পারা যাবে ঠিক মতো চিকিৎসা হলে। দরকারে দীপকও চাদা তুলে সাহায্য করবে সাধ্য মতো।

তবে এখনই একে বেশি আশা দিতে ভরসা হল না দীপকের। সে লোকটিকে বলল, 'তুমি এখানে আছ তো? আমি আসছি, খানিক বাদে, কথা আছে। দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি। ভিখিরিটি ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে থাকে।

ভিখিরিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আর ইচ্ছে হল না দীপকের। সমাজের এই অসহায় অস্ত্র মানুষগুলির ইতিবৃত্ত খুজলে মন দুঃখে ভরে ওঠে।

মেলায় ঝুমা আর ছোটনকে নিয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকল দীপক। পেল্লায় সাইজের লেংচার সঙ্গে গরম শিঙাড়া খেল।

হোটল বলল, 'আমরা ইলেকট্রিক নাগরদোলায় চড়ব।"

মেলার এক ধারে, ইলেকট্রিক নাগরদোলা বসেছে। দীপক বলল, "বেশ তোমরা যাও নাগরদোলা চড়তে। আমি যতক্ষণ না যাই, ওখান থেকে আর কোথাও যেও না।'

"বেশি তাড়াতাড়ি কিন্তু যেও না কাকু', মা বলে। অর্থাৎ তারা বেশ খানিকক্ষণ নাগরদোলা চাপতে চায়।

ছোটন ঝুমা চলে গেল। দীপক এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সিউড়ির ডাঃ মুখার্জিকে একটা চিঠি লিখতে লাগল দোকানে বসে। ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ জানাল, এই হতভাগ্য। ভিখিরিটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে, যথাসম্ভব কম খরচে। এই চিঠিটা সে দেবে ওই ক্ষতদুষ্ট ভিখিরিটির হাতে। ঠিকানা দিয়ে বলবে, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে তার চিকিৎসার জন্য। আর সে বোলপুরে ফিরেই একটা চিঠি লিখবে ডাঃ মুখার্জিকে।

মিনিট পয়তাল্লিশ বাদে দীপক নাগরদোলার কাছে গিয়ে দেখে যে তখনও দুই মুর্তিমান নাগরদোলায় ঘুরছে। ইলেকট্রিক নাগরদোলার বিশাল চাকা। বসার চেয়ারগুলো যখন টতে ওঠে তখন যেন গগন হেয়। দীপক হাতছানি দিয়ে এবং বিস্তর ডাকাডাকির পর কুমাদের ফের মাটিতে নামাতে পারল।

ঝুমা কাছে এসেই বলল, "জানো কাকু, সেই যে ভিখিরিটা, যার পায়ে ভীষণ ঘা, যাকে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে, তাকে দেখলাম। লাঠিতে ভর রে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হেটে গিয়ে দূরে একটা ছোট্ট তাঁবুতে ঢুকল। দাদা প্রথমে দেখেনি আমিই প্রথম দেখেছি।'

দীপক একটু অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি! কী করে দেখলি?" ঝুমা বলল, 'কেন ওপর থেকে। নাগরদোলায় উচুতে বসে গোটা মেলা দেখা যায়। ব্যালান্স ঠিক হচ্ছিল না বলে আমরা অনেকক্ষণ উঁচুতে বসে ছিলাম।' | দীপক বলল, "ও

বোধহয় ওই তাবুতে থাকে রাতে। কিন্তু ও চলে গেল কেন? বললাম ওখানে থাকতে। ওকে বেরুতে দেখলি?'

ছোটন বলল, না তা দেখিনি। তবে নাগরদোলা ঘোরার সময় তো আর ওই তাবুটা সবসময় দেখতে পাচ্ছিলাম না। জানো কাকু, খানিকবাদে আর একটা লোককে দেখেছি, ওই তাবুতে গিয়ে ঢুকল। লোকটাকে দেখে মনে হল একজন চানাচুরওলা।

আঃ আরও একজন! চানাচুরওলা! ওই ভিখিরির সঙ্গে এক তাবুতে!" দীপক রীতিমতো অবাক। বলল, 'চ' তো দেখি লোকটা ফিরেছে কি না?

ভিখিরিদের সারিতে গিয়ে দীপক দেখল, সেই পায়ে ঘা লোকটি নেই। ও কি তবে এখনও তাবুতে? সে ছোটনদের বলল, 'চ', সেই তাবুটা দেখা।

মেলার একদিকের সীমানায় গিয়ে ছোটন দেখাল, ওই তাবু'।

মেলার সেদিকে দোকানপাটের সীমানার শেষে কিছু বলদ ও মোষের গাড়ি এবং অল্প কটা তালু কাছাকাছি। এদের থেকে বেশ খানিক তফাতে দূরে একটা গাছের নিচে ছোট্ট একটা তাবু। সরু গাছটার গুঁড়কে মাঝের খুটি বানিয়ে ছেড়া চট টানোনা হয়েছে তাবুর আকারে। | মিনিট দশেক মেলার সীমানায় দাড়িয়ে তাকুটা লক্ষ করল দীপক। তার মনে একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু ছোটনদের কাছে তা প্রকাশ করল না। সে বলল, "ছোটন কুমা তোরা একটা কাজ কর। এখানে বসে খানিকক্ষণ ওয়াছ কর তাবুটাকে। ওই খড় পড়ে আছে। দু আটি এনে বস। আমি এই ফাকে মেলায় গিয়ে কিছু কাজ সেরে আসি। নজর রাখবি সেই ভিখিরিটা বেরোয় কিনা? বেরুলে কোন দিকে যায়। আর কেউ ঢুকলে বা বেরুলেও নজর করবি।

ঝুমা বাজার হয়ে বলল, 'কতক্ষণ থাকতে হবে?"

বেশিক্ষণ নয়।' "মোগলাই পরোটা খাওয়াতে হবে কিন্তু', বলল ছোটন। 'পুতুল নাচ দেখাতে হবে আর একবার নাগরদোলা চাপব।' ঝুম যোগ দেয়। 'বেশ বেশ হবে সব, ঘুরে আসি।' দীপক চলে যায়।

মেলায় গিয়ে দীপক চটপট দু'জনের সাক্ষাৎকার নিল। প্রথমে এক বৃদ্ধ মুসলমান আগন্তুকের। দুর্গাপুরে থাকেন। প্রতিবারই এই মেলায় আসেন। তিনি

একটা নতুন কথা শোনালেন যে এই মেলায় নাকি মাহি আর কুকুর একদম দেখা যায় না। দীপক ভেবে নিল কথাটা যাচাই করব পরে।

এরপর সে এক পাথরের থালা বাটি ইত্যাদি দোকানদারের ইন্টারভিউ নিল। এরপর দীপক গেল দাতাসাহেবের মাজারের কাছে। কালো আলখাল্লা ও টুপি পরা প্রচুর ফকির সেখানে ভিড় করেছে। দীপক তাদের হাবভাব লক্ষ করল। কান পেতে শুনে নোট করে নিল তাদের কিছু কথাবার্তা, আলাপ, পরিচয়। আধঘণ্টাটাক বাদে সে ফের ছোটদের কাছে হাজির হল।

ছোটনরা উৎসুকভাবে তাকিয়েছিল তনুটার দিকে। কাকাকে দেখেই সমস্বরে বলে উঠল, 'জানো সেই চানাচুরওয়ালা আর অন্য একটা লোক ওই তাবু থেকে বেরিয়ে মেলায় গিয়ে ঢুকল। দুজন কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল।

'অন্য লোকটা দেখতে কেমন?' দীপকের প্রশ্ন।

ঝুমা বলল, "লোকটা গুন্ডা মতন। ধুতি শার্ট পরা। রং ময়লা। মুখ ভালো দেখতে পাইনি এত দূর থেকে, তবে মেটা গোঁফ আছে।'

'হাইট। জানতে চায় দীপক।

"এই মাঝারি।'

দাড়ি আছে?"

না।'

ভাই-বোন ঘাড় নাড়ে। দীপক ভাবে একটুক্ষণ। তারপর সে সোজা চলে যায় তাবুটার দিকে। চটের পর্দা সরিয়ে তাবুর ভিতরে উকি মারে। তাঁবু ফাঁকা, কেউ নেই। সে ফিরে আসে ছোটনদের কাছে।

দীপকের মনে যে সন্দেহটা জাগছিল সেটা দৃঢ় হয়। সে শুনেছে যে অনেকে কানা খোড়া ঘেয়ো রুগির ছদ্মবেশ ধরে ভিখিরি সোজে ভিক্ষে করে। না খেটে এ এক দিব্যি রোজগারের পন্থা। এটাও তেমনি কেস নাকি? পায়ে ঘা সেই লোকটি ভিখিরিদের জায়গায় ফেরেনি। এখানে আসার সময় সে দেখে এসেছে। রহস্যটা

অনুসন্ধান করে যদি সত্যি প্রমাণ পায়। তাহলে দারুণ একখানা খবর ছাড়া যাবে বঙ্গবার্তায়।

ছোটন আর ঝুমাকে নিয়ে দীপক প্রথমে পুতুল নাচ এবং চিড়িয়াখানা দেখল। এরপর ছোটন লুমা দুপাক নাগরদোলা খেল। দীপক নাগরদোলায় উঠল না অবশ্য। ওই ফাকে এক কাপ চা খেয়ে নিল।

একটা দোকানে মোগলাই পরোটা ভাজা হচ্ছে দেখে দীপক ছোটনকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, "তোরা খা। আমি একবার বাসের টাইমটা খোঁজ করে আসি। বোলপুরের বাস কখন কখন আছে? আরও দু'একটা খোঁজ নিতে হবে। খাওয়া হলে, এই দোকানেই অপেক্ষা করিস আমার জন্যে।

যদিও ঘড়ির সময়মাফিক বিকেল শেষে সন্ধ্যা নামতে তখনো খানিক বাকি কিন্তু আকাশে মেঘ করেছে। দিনের আলো প্রায় নিবু নিবু। আর দেরি করা উচিত নয়।| দীপক বাসস্ট্যান্ডে মোটেই গেল না। সে প্রথমে ভিখিরিদের জমায়েতে গিয়ে একবার চোখ বোলাল। উহ, সে পায়ে ঘা লোকটির পাত্তা নেই। এরপর সে চলল মাঠের মাঝে সেই রহস্যময় তাবুর উদ্দেশে।

পর্দা ফাক করে তাঁবুর মধ্যে উকি দিল দীপক। ভিতরে একটা মোমবাতি জ্বলছে এবং একজন লোক মাটিতে বসে। লোকটির সামনে বিছানো একখণ্ড কাপড়ের ওপর একরাশ খুচরো পয়সা। বোধহয় পয়সা শুনছে লোকটি।

লোকটি চমকে মুখ তুলে দীপককে দেখেই খুচরো কাপড়টা নিজের পকেটে পুরে ফেলে কর্কশ স্বরে বলল, 'কে?'

লোকটাকে এক নজর দেখেই দীপক বুঝে নিয়েছিল, এ সেই লোক। যাকে চানাচুরওয়ালার সঙ্গে তাবু থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল বুমরা। এদের বর্ণনার সঙ্গে এই লোকটার চেহারা ভীষণ মিলে যাচ্ছে। সে প্রতি ভাবে তালুর ভিতর পা বাড়িয়ে হেসে বলল, 'নমস্কার। আমি একজন সাংবাদিক। এই মেলার বিষয়ে অবির নিতে এসেছি। ঘুরতে ঘুরতে এই তাবুটা দেখে ভাবলাম, কোনো যাত্রী নিশচয়। আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।' "কে আপনি?' লোকটি কেমন সন্দিগ্ধ।

বললাম যে রিপোর্টার। মানে সাংবাদিক। মানে কাগজের লোক। খবর জোগাড় করি।”

কী চাই?

“কিছু প্রশ্ন করব যদি উত্তর দেন।"

"মশায়ের নাম?'

উত্তর হয়, রাধাচরণ মণ্ডল।

" “কোত্থেকে আসছেন?

‘সাইকিয়া'।

“প্রত্যেকবার আসেন এই মেলায়?

'না, মাঝে মাঝে। কী জন্য এসেছেন?

“এমনি বেড়াতে।

দু'চারটে এমনি আলতু-ফালতু প্রশ্ন করতে করতে দীপক লক্ষ করল যে যদিও এই লোকটি দাড়ি কামানো, মোটা গোফ, তেল চকচকে চুল পাটি করে আঁচড়ানো তবুও এর নাক চোয়াল চোখ ইত্যাদি এবং শরীরের গঠনের সঙ্গে সেই পায়ে ঘা ভিখিরিটির মিল খুজে পাওয়া যায়।

রাধাচরণও যেন কিঞ্চিৎ নার্ভাস। দায়সারা গোছের জবাব দিচ্ছে। দীপক ফস করে বালে বসল, দুপুরের দিকে একজন ভিখিরি কি এসেছিল আপনার কাছে। তার বাঁ পায়ে ঘা।

রাধাচরণ কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর রাগী চাপা সুরে বলল, “আপনি জানলেন কেমন করে?'

‘এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম দূর থেকে। এই তাবুতে ঢুকল ভিখিরিটি। চেনেন নাকি ওকে?”

‘হুম। আমার মামার বাড়ির গায়ের লোক। ঘা হয়ে এখন ভিক্ষে করে। লোকে বলে কুষ্ঠ।”

কী করতে এসেছিল?

"কিছু সাহায্য চাইতে। দিলাম। গরিব মানুষ অক্ষম হয়ে গেছে। খেতেও দিলাম কিছু।”

দীপক কিঞ্চিৎ ধন্দে পড়ে। রাধাচরণের বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো বা ঠিক। এখানে কিছু সাহায্য নিতেই এসেছিল ভিখিরিটি। নাগরদোলায় পাক আবার ফাকে তার চলে যাওয়া দেখতে পায়নি ঝুমার। তবু রাধাচরণের উসখুস ভাব দেখে সন্দেহ ঘোচে না। তা ছাড়া দু'জনের চেহারায় এত সাদৃশ্যই বা কেন?

সহসা দীপকের চোখ আটকে যায় তাবুর এক কোণে। সেখানে মাটিতে কিছু ময়লা ছেড়া ন্যাকড়া ও কাপড়ের পাড় পড়ে নাকড়াগুলোয়। এমনি ন্যাকড়া ও পাড় দিয়েই তো ভিখিরিটির পা জড়ানো ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপকের দৃষ্টি চলে যায় রাধাচরণের বাঁ পায়ের দিকে। হাঁটুর নিচে যেটুকু পা বেরিয়ে আছে তা মোটামুটি পরিষ্কার হলেও তাতে যেন অস্পষ্ট কালচে ছোপ জায়গায় জায়গায়। এই সময় রাধাচরণ চট করে তার বাঁ পা ধুতি টেনে ঢেকে দিল।

রাধাচরণের সঙ্গে খেজুরে আলাপ চালাতে চালাতে এবং নোট বইয়ে ইন্টারভিউ লেখার ভান করার ফাকে দীপক দ্রুত চিন্তা করে আসল কথাটা কী ভাবে পড়া যায় ? সোজাসুজি চার্জ করব কি? কী ভাই তুমিই না ভিখিরি সেজে বসেছিলে? পায়ে নকল ঘ বানিয়ে। হুঁ ঠিক চিনেছি।

লোকটা কি চটে গিয়ে তেড়ে উঠবে? মারতে আসবে? তাতে অবশ্য ভয় পায় না দীপক। ওর 'আক্রমণের মোকাবিলার শক্তি সে রাখে। তবে তেড়েফুড়ে ওঠার চেয়ে ওর ঘাবড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তখন চাপ দিয়ে আসল ব্যাপার টেনে বের করা যাবে। বরং আশ্বাস দেব, যদি আপত্তি থাকে কাগজে ছাপব না তোমার গলো। শুধু এই নকল ভিখিরিদের ব্যাপারটা জানতে চাই। এদের কায়দাকানুন। রোজগার। স্রেফ আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল।

অবশ্য এমন ইন্টারেস্টিং স্টোরি পেলে কি আর না ছাপা যায়। শুনে নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়ার পর কে আর কখছে তাকে। আর এ লোকটাও কি আর ওর সত্যি পরিচয় দেবে? কক্ষণো নয়। এখানে সেজেছে যেয়ো রুগি। অন্য কোথাও হয়তো বনে যাৰে বোবা কালা। ছদ্মবেশও পাল্টাবে। লোক ঠকানোর অপরাধে পুলিশ ওর হদিশই পাবে না। তবে হ্যা, যদি ওর কথা শোনায়, দীপক এখানে ওর নামে পুলিশে নালিশ করবে না। সেটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ তার আছে।

মৃদ খসখস আওয়াজ আসে কানে। লেখা থেকে মাথা তুলে দীপক দেখল, বাধাচরণ কেমন। বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। তার নজর দীপকের ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিবন্ধ। দীপক পিছু ফেরার আগেই সে মাথার পেছনে এক প্রচণ্ড আঘাত পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রান হারাল।

দীপক যখন চেতনা ফিরে পেল তখন তাঁবুর ভিতর অন্ধকার। বাইরে তখনও পুরোপুরি রাত নামেনি। তাবুর কাপড়ের ফাক দিয়ে আবছা দিনের আলো চোখে পড়ল।

দীপক পাশ ফিরে সটান পড়ে আছে মাটিতে। তার পা দুটো বাঁধা। দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মুখও বাধা। | হাঁ-এর ভিতর কাপড় ঠুসে দেওয়া হয়েছে। তাঁবুতে আর কেউ নেই।

নড়াচড়া করতে গিয়ে দীপক টের পেল যে তাবুর মাঝে গাছের গুড়ির সঙ্গে তার কোমরের কাছে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাধা রয়েছে। অর্থাৎ বেশি নড়াচড়া করা বা চেচানোর উপায় নেই। অতি অসহায় অবস্থা।

দীপক প্রাণপণে চেষ্টা করে বাধনমুক্ত হতে। কিন্তু তার ছটফটানিই সার হয়। দড়ির গিট আলগা করতে পারে না। গলা দিয়ে চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ বের করতে পারে শুধু। কিন্তু এই নিরালায় সে আওয়াজ কি কারও কানে পৌছবে? কেউ কি এগিয়ে আসবে তাকে উদ্ধার করতে। এভাবে কতক্ষণ কাটবে কে জানে? বাইরের আলো ক্রমে আরও ম্লান হয়ে আসে।

খানিকক্ষণ এইভাবে কাটে। হঠাৎ তাবুর পর্দা সরিয়ে একটা মুখ উকি দিল ভিতরে। আবছায়ায় দেখে দীপকের মনে হল ও মুখ ছোটনের। সে আপ্রাণ চেষ্টায় ডাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু একটা গোঙানির মতো আওয়াজ মাত্র বের হয়। চট করে মাথা টেনে নেয় ছোটন, বোধহয় ভয় পেয়ে।

দীপক মাটিতে মুখ ঘষে মুখের বাঁধন আলগা করে ফেলল। ছড়ে গেল তার গাল, ঠোঁট থুতনি। কিন্তু তখন সে মরিয়া। কোনোরকমে মুখের ভিতরে গোঁজা ন্যাকড়ার পিণ্ড খানিকটা উগরে ফেলে সে আর্ত বিকৃত কণ্ঠে ডাক দিল, 'ছোটন।' এরপরই কাশতে কাশতে যেন তার দম আটকে আসে। ছটন দৌড়ে ঢুকল তাবুতে। দীপকের গলা সে ঠিক চিনেছে। ডাকল—"কাকু।" দীপক কাশি সামলে বলল, 'খুলে দে। হাত পা বাঁধা। ছোটন অন্ধকারে হাতড়ায় বাঁধন খুলতে। 'আমার প্যান্টের পকেটে দেশলাই আছে।' জানায় দীপক। দেশলাইয়ের আলোয় কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।

বাঁধনমুক্ত হয়ে বসে হাঁপায় দীপক। হাত পা মুখে আঙুল বোলায় বাঁধনের জায়গাগুলোয়। ছাল উঠে গিয়ে মুখ ভীষণ জ্বলছে।

একি তোমায় এরকম করল কে?" আতঙ্কে উত্তেজনায় ছোটন হতভম্ব। দীপক সংক্ষেপে জানায় তার এই দুরবস্থার কাহিনি। বলে, "পেছন থেকে যে কে মারল দেখতে পাইনি। তবে তাবুর লোকটাই নকল ভিখিরি সন্দেহ নেই। ইস শয়তানটার আর বোধহয় পাত্তা পাওয়া যাবে না। কিন্তু তুই এখানে এলি কী করে? ঝুমা কই ?" | দীপকের কথার জবাব না দিয়ে ছোটন উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে—জানো সেই চানাচুরওয়ালাটাকে দেখলাম বাস স্ট্যান্ডে, একটু আগে। ওর সঙ্গে একটা লোক ছিল। তবে আগের লোকটা নয়, অন্য লোক। দাড়ি আছে, ছুঁচলো মতো। লুঙ্গি জামা পরা। মাথায় মুসলমানি টুপি, সাদা রঙের। দু'জনে চা খাচ্ছিল।

'অ্যা বাস স্ট্যান্ডে। দীপক তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ছোটনকে টানে—"চ' চ' শিগগির।"

বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে অল্প কথায় দীপক জেনে নেয় কী ভাবে ছোটন হাজির হল এই তাবুতে।

বেশ খানিকক্ষণ দীপকের আশায় ওই খাবার দোকানে অপেক্ষা করেও দীপক আসছে না দেখে, ছোটন ঘুমাকে দোকানে বসিয়ে রেখে যায় বাস স্ট্যান্ডে। কারণ কাকু বলেছিল যে বোলপুরের বাসের টাইম খোঁজ নেবে। সেখানে দীপককে না পেয়ে ছোটনের মনে হয় মাঠের মধ্যে তাবুটা একবার দেখে আসি।

-"ঝুমাকে একা রেখে এলি কেন?' বলল দীপক। ছোটন বলল, 'বাঃ তুমি যদি এসে ঘুরে যাও, আমাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে তো ভাবতে।'

বাস স্ট্যান্ডে জোরালো বৈদ্যুতিক বাতি নেই। সন্ধ্যা নেমেছে। আধো অন্ধকার মাঠে খাড়া অনেকগুলো বাস। যাত্রীও অনেক। বেশির ভাগ যাত্রীই ঘরে ফেরার অপেক্ষায়। যাত্রীরা কোথাও জটলা করছে, কেউ কেউ ইতস্তত থোরাঘুরি করছে। কোনো বাস একদম ফাকা। কোনো কোনো বাসের মাথায় ও কামরার ভিতরে আলো জ্বলছে। কিছু যাত্রী উঠে। বসেছে সেসব বাসে। কন্ডাকটাররা হাঁকাহাঁকি করে আহ্বান জানাচ্ছে প্যাসেঞ্জারদের।

যাত্রীদের টর্চের আলো, বাসের আলো এবং দু-তিনটে চায়ের দোকানের কার্বাইড, ল্যাম্পের আলোয় যতটুকু দেখা যায়।

দীপক ছোটনকে বলল, 'লক্ষ রাখ, সেই চানাচুরওয়ালা বা তার সঙ্গীর দেখা পাস কিনা?

দীপকের নিজের চোখও খোঁজে তাবুর সেই গুফো লোকটাকে। দ্রুত পায়ে ঘোরে তারা। জনে জনের মুখে দৃষ্টি বোলায়। চায়ের দোকানে সেইলোক দুটো তখন আর নেই। দীপকের আশঙ্কা ইতিমধ্যে ওরা হয় তো বাসে চড়ে সরে পড়েছে। যতটা সম্ভব আড়ালে থাকে দীপক, উজ্জ্বল আলো এড়িয়ে। যাতে তাকে না দেখে ফেলে আততায়ীরা। মুশকিল এই যে ওই চানাচুরওয়ালাকে সে দেখেনি, তাই ছোটনই প্রধান ভরসা।

হঠাৎ ছোটন আঙুল দেখায়—'ওই যে।

একটা বাসের ভিতরকার বাল্ব জ্বলছে। সিট অর্ধেক ভরে গেছে যাত্রীতে। কন্ডাকটার চিৎকার করছে, সিউড়ি, চলে আসুন সিউড়ি।

বাসটার দরজার উল্টো দিকের মাঝামাঝি জায়গায় একখানা দুজনার সিটে বসা দুই প্যাসেঞ্জারকে দেখিয়ে ছোটন বলল, 'জানলার ধারে যে ওই সেই চানাচুরওয়ালা। আর পাশে বসে দাড়িওয়ালা লোকটা।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোকে দেখতে দেখতে দীপক বলে, “ঠিক চিনেছিস?”

জানলার ধারে বসা লোকটা মুখে হাত চাপা দিয়ে ঘাড় গুজে রয়েছে। তার মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে তার মাথায় আঁকড়া চুল।।

“হ্যা' দৃঢ়স্বরে জানায় ছোটন, একবার মাথা তুলেছিল, তখন দেখলাম।

দীপক ছোটন বাস থেকে খানিক তফাতে। 'অন্য একটা বাসের ছায়ায়। তাই ওই বাস থেকে তাদের দেখার সম্ভাবনা নেই!

দীপক সিউড়িগামী বাসের পিছনের দরজার কাছে গিয়ে কন্ডাকটারকে বলল, “দাদা বাস কখন ছাড়বে?'

জবাব হয়—এক্ষুনি।।

দীপক দেখে নিল, ড্রাইভার তখনও সিটে বসেনি। সে কন্ডাকটারকে অনুরোধ করল, “আমরাও সিউড়ি যাব। এই ছেলেটা রইল, আমার ভাইপো। একজন মেয়ে আছে সঙ্গে, দোকানে বসিয়ে এসেছি। তাকে নিয়ে আসছি। প্লিজ একটু অপেক্ষা করবেন।' ‘যান যান তাড়াতাড়ি', কন্ডাকটার তাড়া লাগায়।

'আমি আসছি। তুই লোক দুটোর ওপর নজর রাখ।' ছোটনের কানে ফিসফিসিয়ে বলেই দীপক হনহন করে হাটা দিল মেলার দিকে। বল্ডাকটার ছোটনকে বলল, "সিটে বসে জায়গা রাখ।

ছোটন পিছনের সিটে একখানা রুমাল পেতে রেখে ফের নেমে এল।

দীপক ফিরল মিনিট পনেরো বাদে। তার সঙ্গে ঝুমা এবং দুজন কনস্টেবলসহ এক পুলিশ অফিসার।

বাসে তখন ড্রাইভার সিটে বসেছে। ঘন ঘন হর্ন বাজছে। সিটগুলো ভর্তি, দু-তিনজন প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়েও রয়েছে। কন্ডাকটার গজগজ করছে ছোটনের কাছে, কই তোমার কাকা তো এখনও এল না। এবার বাস ছেড়ে দেব। আর লেট করতে পারব না।'

আচমকা পুলিশ সমেত দীপকের আবির্ভাবে কন্ডাকটারের কথা থমকে গেল। ঝুমাকে ছোটনকে নিচে রেখে দীপক পুলিশদের নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঠল বাসে এবং সেই চানাচুরওলা ও তার সঙ্গীকে দেখিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলল—এই দু'জন।

বাসের যাত্রীরা থ। তাদের গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ। চমকে ঘাড় ফেরাল ঝাকড়াচুলো চানাচুরওলা এবং তার ছুঁচলো দাড়ি সঙ্গী। তারা ধড়মড় করে উঠে পড়তে গেল। কিন্তু তারা সিট ছেড়ে বেরুবার আগেই পুলিশ ইন্সপেক্টর তাদের পথ আগলে

সিটের পাশে। পৌঁছে গেছেন। হাতে তার উদ্যত রিভলভার। প্রচণ্ড ধমক লাগালেন ইন্সপেক্টরব। নড়লেই গুলি করব।”

তৎক্ষণাৎ দুই যাত্রী ফের বসে পড়ে কাঠ হয়ে থাকে। লোক দুটোকে খর চোখে দেখে নিয়ে ইন্সপেক্টর মাথা ঝাকালেন। তারপর দাড়িওলা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম?

‘এজে নবাব আলি। লোকটি ঢোক গিলে জবাব দেয়। ‘একে চেনো?' ওর পাশের যাত্রীকে দেখান ইন্সপেক্টর।

এজে না।' নবাব আলি ঘাড় নাড়ে। 'ইন্সপেক্টর স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ তার দাড়ি ধরে মারলেন এক হেচকা টান। চড়াৎ করে খুলে এল নকল দাড়ি। চকিতে ইন্সপেক্টরের হাতের এক ঝটকায় উড়ে গেল লোকটার মাথার টুপি। দীপক চিনল, এই সেই পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা সাজা ভিখিরি।

বেটাদের বেঁধে নামা। সাবধান, পালায় না যেন। ইন্সপেক্টর হুকুম দিলেন কনস্টেবলরে। অতঃপর তিনি ব্যঙ্গ কৌতুক মিশিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য ছাড়লেন, 'আহা নবাব বাদশাদের কি আর এমন ভিড়ের বাসে যাওয়া পোষায়। চ’বাবা, তোদর আলাদা গাড়িতে সেপাইসান্ত্রি দিয়ে সিউড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।'

হাত পিছমোড়া করে বেঁধে এবং কোমরে দড়ি এঁটে লোক দুটোকে নামানো হল বাস থেকে।

বাসের বাইরে এসে পুলিশ ইন্সপেক্টর দীপককে বললেন—“থ্যাংক্যু মিঃ রয়। দুটোই ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। ফেরারি ডাকাত। পুলিশ খুঁজছিল এদের।

আসামিদের নিয়ে চলে যায় পুলিশরা।

ছোটন ও ঝুমাকে নিয়ে দীপক চলল বোলপুরের বাসের খোঁজে। জব্বর খবর দীপকের পকেটে।

রুদ্ধ-প্রাণ - অজেয় রায় Rudra Pran by Ajeo Ray

এক

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফিরল অমল। হাত মুখ ধুয়ে বাইরের শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা ও ঢোলা জামাটা পরে বসল বারান্দায়। নব এক কাপ ধূমায়িত চা রেখে গেল সামনের টেবিলে। সেই সকাল আটটায় বেরিয়েছে। বেশ ক্লান্ত। গরম চায়ে চুমুক দিল অমল। আহ।

কলকাতা শহরে ভবানীপুর অঞ্চলে এই ছোট দোতলা ফ্ল্যাটটিতে অমল আট বছর বাস করছে। একা থাকে, একটি রাত-দিনের কাজের লোক নিয়ে। সে কলকাতায় এক কলেজে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক। তারই সঙ্গে সাহায্য করছে ডক্টর সেনের গবেষণার কাজে। দেশ বীরভূম জেলার রামপুরহাটে। সেখানে থাকে বিধবা মা, অবিবাহিত একটি বোন এবং ছোট। ভাই। ভাই রোজগেরে। বোন কলেজে পড়ছে।

আঠাশ বছর বয়সি অমল, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছে দু'বছর আগেই। মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতনামা প্রফেসর ডক্টর বঙ্কিমচন্দ্র সেন যে দুরূহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন, সেই কাজ সফল হলে ডক্টর সেনের সহকারী হিসাবে অমলও পাবে বৈজ্ঞানিক মহলে যশ ও প্রতিষ্ঠা।

অঘ্রানের বিকেল। বাতাসে সামান্য শীতের ছোঁয়া। ক্রিং ক্রিং,টেলিফোন বাজল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল অমল, “হ্যাল্লো, অমল রায় বলছি।

—অমল, আমি প্রশান্ত। আরে! কবে ফিরলি? —অমল চমকাল।

—আজই সকালে। তোকে আগে একবার রিং করেছিলাম। শুনলাম, বেরিয়ে গেছিস। সন্ধের আগে ফিরবি না।

—হুঁ, তাই বলে গিছলাম। কিন্তু তুই এত আগে ফিরলি যে। তোর না আরও মাসখানেক বাদে ফেরার কথা? জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে?

খুব খেটে আগেই শেষ করে ফেললাম কোর্সটা। তাই ছুটি পেয়ে গেলাম। তোর খবর কী?

—ভালো।

—হারে, বাবা কোথায়?

মেসোমশাই?—অমল ঢোক গেলে। ঠিক এই প্রশ্নটির আশঙ্কাতেই তার বুক দুরদুর করছিল।

—হ্যা, হ্যা! বাবা কোথায় গেছে? এসে দেখি বাড়ি বন্ধ। দোতলার ভাড়াটে মিস্টার ব্যানার্জি ডুপ্লিকেট চাবি দিলেন। ঘর খুলেছি। মিঃ ব্যানার্জি বললেন, বাবা নাকি কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন মাস চারেক আগে। ঠিকানা দিয়ে যাননি। তুই মাঝে মাঝে বাবার নামে চিঠিপত্র এলে নিয়ে যাস।

কোথায় গিয়েছে বাবা? তীর্থে-টির্থে নাকি? বাবার হিমালয়ে বেড়াবার ঝোক অনেকদিনের। যা ঠিকানাটা বল। আমি গিয়ে নিয়ে আসব। বাবার জন্যেই তো এত খেটে তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একা রয়েছেন। শরীটাও ওঁর ভালো যাচ্ছিল, দেখে গিয়েছিলাম। গজু কোথায়?

অনেক দিন পর দেশে ফেরা এবং প্রিয়জনের দেখা পাওয়ার প্রত্যাশায় উৎফুল্ল প্রশান্ত হুড়মুড় করে বকে যাচ্ছিল। আর তখন? টেলিফোন লাইনের অপর প্রান্তে রিসিভার হাতে কাঠ হয়ে দাড়িয়েছিল অমল। তার মনে ঝড়ের তোলপাড়। সে কি উত্তর দেবে এখন?

অমল খানিক চুপ করে থেকে বলল, দেখ প্রশান্ত মেসোমশায়ের ঠিকানাটা আজ নয়, পাঁচ-ছ'দিন পরে তোকে জানাব।

কেন?—প্রশান্তর বিস্ময়ভরা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ভেসে আসে। মানে, কারণটা তোকে এখুনি বলতে পারছি না। অমল আমতা আমতা করে একটু অসুবিধা আছে। বাবা ভালো আছেন? মানে, সুস্থ আছেন তো? —প্রশান্তের কণ্ঠে গভীর আকুলতা। হা হা, মেলোমশাই ভালো আছেন! তোর চিন্তার কিছু নেই। —অমলের আশ্বাস।

আমি বুঝতে পারছি না, বাবার ঠিকানাটা এখন বলতে তোর আপত্তি কীসের? ব্যাপারটা আমার ক্লিন মনে হচ্ছে না। আমি যাচ্ছি তোর কাছে। ফোনে এত কথা হয় না। তুই অপেক্ষা কর।—প্রশান্ত রিসিভারটা রেখে দিল।

গভীর উদ্বেগ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অমল। কী করবে সে? কিছুই তার মাথায় খেলে না।।

প্রশান্ত অমলের কলেজ জীবনের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছে চার বছর। তবে অনার্স ও এম.এস.সি-তে দুজনের বিষয় ছিল আলাদা। অমলের প্রাণিবিজ্ঞান। প্রশান্তের ফিজিক্স।

প্রশান্ত থাকে দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডে। তার মা নেই। সঙ্গে থাকেন শুধু বাবা। একমাত্র বোন বিয়ের পর চলে গিয়েছে জার্মানিতে। প্রশান্তর বাবা বড় চাকুরে ছিলেন। আপাতত কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রশান্তের বাড়িতে প্রায়ই যেত অমল। অবিনাশবাবু যথেষ্ট স্নেহ করেন তাকে।

প্রশান্ত কাজ করে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। মাস ছয় আগে সে সুইডেনে যায় একটা কম্পিউটার কোর্স শিখতে। অমলের ওপর ভর দিয়ে গিয়েছিল বাবার দেখাশোনার। পয়সার অভাব নেই তাদের। লেক রোডের বাড়িও তাদের নিজের। তবে অবিনাশবাবু মানুষটা বড় একগুঁয়ে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই। বন্ধুও গুটিকয়েক মাত্র। অবসর নিয়ে শুধু বই পড়তেন। তার যত স্নেহ 'ভালোবাসার আশ্রয়, পুত্র প্রশান্ত। প্রশান্তও তার বাবাকে খুব ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সুতরাং বাবার এই রহস্যময় অন্তর্ধানে প্রশান্তর বিচলিত উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। বাইরে মোটর থামার আওয়াজ। নব গেল দরজা খুলতে।

ঋজু, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ প্রশান্ত এসে দাঁড়াল অমলের সামনে। তার সদাহাস্যময় মুখ থমথম করছে। অমল বলল, “বস।

দুজনে বসে থাকে মুখোমুখি। প্রায় মিনিট খানেক দু’জনেই চুপ। কি বল কিছু - বলল অমল।

বললাম তো বাবার ঠিকানাটা চাই। আমি দেখা করতে যাব কালই। -জোরালো গলায় জানাল প্রশান্ত।

আমিও তো বললাম কদিন পরেই জানতে পারবি। অমলের কথায় জেদি সুর।

দেখ অমল, আমি ফিরে আজ বাবার খোঁজ করতে গিয়ে কিছু খবর পেয়েছি। বাবা কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। এমনকী বাবার ল-ইয়ার মিস্টার দস্তিদার অবধি জানেন না! বাবা নাকি তোকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে গিয়েছেন। যদ্দিন না উনি তার অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে আসেন, টাকাকড়ি সংক্রান্ত সমস্ত লেনদেন ও অন্যান্য ভার। তোকে দিয়ে গিয়েছেন লিখিতভাবে। কোনো কারণে উনি ফিরে না এলে, আমি বিদেশ থেকে না ফেরা অবধি এই ভার তোর ওপরই থাকবে। বাবা নাকি একটা উইলও করে গিয়েছেন। যদি আমি বিদেশ থেকে ফেরার এক মাসের মধ্যে উনি না ফেরেন, তাহলে সেই উইল অনুসারে ওঁর সম্পত্তি বিলি হবে।

আর একটা খবর জানলাম আজ ব্যাঙ্কে গিয়ে। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে ত্রিশ হাজার টাকা তুলেছেন। কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে।

আমার আরও একমাস পরে ফেরার কথা ছিল। হঠাৎ এসে পড়তে মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ বেকায়দায় পড়ে গেছিস। বাবাকে নিয়ে তুই কী করেছিস আমি জানতে চাই? স্পষ্ট ও সত্যি কথা না জানালে বাধ্য হয়ে আমায় পুলিশে ইনফর্ম করতে হবে।—শুকনো দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি বলে গেল প্রশান্ত।

অমলের ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, -তুই কি ভাবছিস, টাকার লোভে আমি মেলোমশায়ের কোনো ক্ষতি করেছি? সেই জন্যেই চেপে যাচ্ছি?

প্রশান্ত সামান্য অপ্রতিভ হলেও তার কঠিন মুখ দেখে বোধ হল যে, সন্দেহ কাটেনি। সে ফের বলল, হু, আর একটা ব্যাপার। প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে

আমি বাবার একটা অদ্ভুত চিঠি পাই। চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এই রকম—আমি এক অজ্ঞাত স্থানে যাচ্ছি। কিছুদিনের জন্য। ঠিকানা জানাব না। দেশে ফেরার আগে আমি যেন তাকে আর কোনো চিঠিপত্র না লিখি। কারণ সে চিঠি তিনি পাবেন না। আমি ফিরলে আশা রাখেন সুস্থ দেহে দেখা হবে দু'জনে।।

এই চিঠিটা পেয়ে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার খেয়ালি বাবার এও এক বিচিত্র আচরণ। তবু একটা চিঠি দিই বাবাকে। কিন্তু উত্তর পাইনি। এই কারণেই আমি প্রাণপণে খেটে যতটা সম্ভব আগে ফিরেছি দেশে।

অমল মুখ নিচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল, - প্রশান্ত এ বিষয়ে এক্ষুণি একটি কথাও বলতে পারব না। আমায় মাপ কর। আজ রাত্তিরটা অপেক্ষা কর। কাল সকাল আটটা নাগাদ তোকে টেলিফোন করব। তখন যা সম্ভব হয় জানাব। তারপর তোর যা খুশি করিস।

প্রশান্ত বুঝল, অমলের কাছ থেকে এখন আর বেশি কথা বের করা যাবে না। সে উঠে দাঁড়াল। এবং গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেল।

অমল ঘড়ি দেখল। সোয়া দুটা। আরও অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সে দিল্লিতে ট্রাঙ্ক-কল করবে প্রফেসর সেনকে। ডক্টর সেন রাত সাতটার আগে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফেরেন না।

প্রফেসর সেনের নির্দেশের ওপরই নির্ভর করছে তার আগামিদিনের কর্তব্য। নিচে প্রশান্তর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ হল।

অন্ধকার বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে অমলের মন পিছিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খায় মাস পাঁচেক আগের কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা জড়ানো স্মৃতির আবর্তে।

তারিখটা ঠিক মনে নেই অমলের। দিনটা সোমবার। বিকেল চারটে নাগাদ সে দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রশান্তের বাবা অবিনাশবাবুর সম্মুখে।

এই সময়টা সামান্য দিবানিদ্রার পর উঠে চা খান অবিনাশবাবু। অমলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, “আরে কী ব্যাপার, এমন অসময়ে? মনে হচ্ছে কোনো ইমপর্ট্যান্ট খবর আছে? ভালো না মন্দ? বিচ্ছু কেমন আছে?

অমল উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল,—খবর ভালো। ওঃ কাল সারাটা দিন যা টেনশনে ছিলুম।

ভেরি গুড। ভেরি গুড! ও, তাই কাল আসোনি। রবিবার তো তুমি একবার ঢু মেরে যাও। যাক, বিচ্ছু খাওয়া দাওয়া করছে ?

খেলছে?

—আগের মতো লাফালাফি করছে না এখনও। তবে চলাফেরা করছে। এখনও পুরোপুরি জড়তা কাটেনি। তবে ক্রমেই ফিট হয়ে উঠছে।

—চিনতে পারছে ঠিক মতো? মানে ব্রেন, মেমারি সব ফাংশন ঠিকঠাক?

—মনে তো হয়। অবশ্য আরও কয়েকদিন অবজার্ভ না করলে বোঝা যাবে না।

–যাক কনগ্রাচুলেশনস। তোমাদের রিসার্চে একটা বড় স্টেপ এগোল। তোনারও একটা মস্ত পার্সোনাল প্রবলেম মিটল। যা একখানি ভক্ত জুটিয়েছ। চা খাবে?

পরম নিশ্চিন্তে অবিনাশবাবুর সামনে, চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিল অমল। একটু বাদেই অবিনাশবাবুর পরিচারক গজ নিয়ে এল চা ও কেক।

উঃ, বিচ্ছুকে নিয়ে কী ঝামেলায় যে পড়েছিল অমল! বিচ্ছু, অমলের পোষা কুকুর। বয়স দেড় বছর। কলকাতা শহরে ফ্ল্যাট বাড়িতে কুকুর। পোষার শখ কোনোদিনই ছিল না অমলের। যদিও সে খুব কুকুর ভালোবাসে। কিন্তু হঠাৎ জুটে গেল একটা কুকুর বাচ্চা। মানে জুটিয়ে আনল শ্রীপতি—অমলের পুরনো কাজের লোক। রাস্তার দেশি কুকুরের বাচ্চা। মাসখানেক বয়স। ওর মা মোটর চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। অনাথ বাচ্চাটাকে বুকে তুলে বাড়িতে হাজির শ্রীপতি।

অমল প্রথমে রাগ করেছিল, —কে এটার দেখাশোনা করবে? আমার সময় কই?

শ্রীপতি অমলের দেশের লোক। অমলকে ছোটবেলা থেকে দেখছে। সে শুধুমাত্র পরিচারক নয়। অমলের একার সংসারের গার্জেনও বটে । একটু ধমকের সুরে বলেছিল শ্রীপতি, সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

অতএব রয়ে গেল কুকুরটি। নাম দেওয়া হল বিচ্ছু। ওর স্বভাবের কারণেই। যা দই বুদ্ধি! দেখতে দেখতে তার চেহারাটি হল খোলতাই। সাদা কালো রং। লোমভরা চকচকে গা। যেমনি গাট্টা গড়ন, তেমনি বিক্রম। অচেনা লোককে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ফ্ল্যাটে। দেখতে দেখতে বিচ্ছুর ওপর ভারি মায়া পড়ে গেল অমলের।

বাড়িতে সময় পেলে অমল বিচ্ছুর সঙ্গে খেলা করত। সুযোগ পেলেই বিচ্ছু অমলের কোলে মুখ গুঁজে দিয়ে লেজ নেড়ে সোহাগ জানাত। সে অপেক্ষা করে থাকত সন্ধ্যায় বা রাতে অমল কখন বাড়ি ফেরে। অমল বাড়ি এসে নিচের দরজায় কলিং বেল টিপলেই, ঠিক বুঝতে পারত সে। দৌড়ে গিয়ে দরজার ওপর আঁচড়াতে থাকত। চেনে বাঁধা থাকলে, চিৎকারে বাড়ি মাথায় করত। অমল ভিতরে ঢুকে খানিক আদর করলে, তবে শান্তি।

সমস্যা হল, নয় দশ মাস বাদে শ্রীপতি অসুস্থ হওয়ার পর। শ্রীপতির বয়স হয়েছিল। কে তার সেবা করে? অমল তাই ওকে দেশে, ওর ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিল। বলল,—চিকিৎসা করাও, খরচ আমি দেব।

শ্রীপতির এক জ্ঞাতির ছেলে, বছর কুড়ির নব এল অমলের কাছে কাজ করতে। শ্রীপতির শরীর আর সারল না। ফলে নব পাকাপাকিভাবে বহাল হল অমলের কাছে।

প্রথম প্রথম বিচ্ছু নবকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে না পারলেও ক্রমে ক্রমে অনেক চেষ্টায় নব ভাব জমিয়ে ফেলল বিচ্ছুর সঙ্গে। অমল হাঁপ ছাড়ল।

কিন্তু চারদিনের জন্য দুর্গাপুরে গিয়েই সে টের পেল সমস্যা ঘোচেনি।

দুর্গাপুরে যাওয়ার তৃতীয় দিনে ভোরে টেলিফোন এল কলকাতা থেকে। অমলের। নিচের তলার ভদ্রলোক ফোনে জানালেন যে, বিচ্ছু কেবল কাঁদছে। নব বলেছে ও কাল থেকে কোনো খাবার ছোঁয়নি। মনে হচ্ছে বিচ্ছু অমলকে খুঁজছে। ওর চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আশেপাশের বাড়ির লোক। কেউ কাছে গেলেই দাঁত খিচোচ্ছে।

অগত্যা সেদিনই সকালে কলকাতায় ফিরতে হল অমলকে, কাজ পুরো শেষ না করেই। তাকে দেখেই বিষন্ন ক্ষিপ্ত বিচ্ছুর কী আশ্চর্য পরিবর্তন! আহাদে ডগমগ।

অমল তাকে খেতে দিতেই গবগব করে গিলে ফেলল দুবেলার মোট আহার।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই অমলের ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার কথা হল, প্রফেসর সেনের রিসার্চের প্রয়োজনে। ব্যাপারটা জরুরি। প্রফেসর সেন বা অমল ছাড়া আর কেউ গেলে হবে না। বিশেষ নকশা অনুযায়ী একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বানিয়ে আনতে হবে ওখানকার এক কারখানা থেকে। এবং তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। যাওয়া, আসা, থাকা মিলে অত দু সপ্তাহ থাকতে হবে কলকাতার বাইরে। হয়তো আরও কয়েকদিন বেশিও লাগতে পারে। ডঃ সেনের অসুবিধা ছিল। অতএব অমলই ভরসা।

অমলের আর কোনো অসুবিধা ছিল না। সমস্যা একটাই—বিচ্ছু। ও তো উপবাস দিয়ে মারা পড়বে। অমলকে এত দিন না দেখে রাগে দুঃখে পাগল না হয়ে যায়।

মহা আতান্তরে পড়ল অমল। উপায় কিছু খুঁজে না পেয়ে সমস্যাটা জানাল স্যারকে। অর্থাৎ, ডঃ বঙ্কিম সেনকে।

সব শুনলেন ডঃ সেন। পরদিন একটা উপায়ও বাতলালেন। নিরুপায় অমল তাতেই রাজি হল।

ব্যাঙ্গালুরু থেকে ফিরে দু'দিন খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছে অমলের। যাক তারপর নিশ্চিন্দি। ডঃ সেনের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। বিছুকে ছেড়ে বাইরে যেতে অমলের 'আর ভাবনা রইল না।

মনে আছে, অবিনাশবাবুকে বিচ্ছুর খবরটা দিয়ে আসার পরদিনই অমল শুনল তিনি অসুস্থ। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পাড়ার লোকই, উদ্যোগ করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে তাকে।

অমল ছুটে গিয়েছিল তাকে দেখতে। অ্যাটাকটা অবশ্য গুরুতর নয়। কয়েকদিন হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন। তবে বাড়িতে সেবা যত্ন চাই। অমল বলছিল, —প্রশান্তকে খবর দিই।

অবিনাশবাবু এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন প্রস্তাব। তার বক্তব্য,অনেক কষ্টে খোকা এই ফেলোশিপটা জোগাড় করেছে। মাত্র এক মাস হল গিয়েছে। এখন ফিরে এলে কোর্সটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এমন সুযোগ হয়তো আর পাবে না।

আমি আজ না হয় কাল যাবই ওপারে। কিন্তু খোকার ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। আমার এই অসুস্থতার খবরও এখন ওকে দেওয়ার দরকার নেই।

জার্মানিতে মেয়েকেও খবর দিতে দেননি অবিনাশবাবু। মাত্র তিনমাস আগে ও ঘুরে গিয়েছে। এলেও বা কতদিন থাকতে পারবে? শুধু একবার চোখে দেখার জন্যে অদুর থেকে ঘর সংসার ফেলে, চাকরিতে ছুটি নিয়ে হুট করে আসা কত অসুবিধের!

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার কিছুদিন বাদে অবিনাশবাবু একদিন বললেন, -দেখ অমল ডাক্তার বলছিলেন আমার শরীরটা বিগড়েছে। এ যাত্রায় ফাড়া কেটে গিয়েছে, তবে সেকেণ্ড অ্যাটাকটা সিরিয়াস হতে পারে। এবং ডাক্তারের কথায় বুঝেছি যে, সেটা যে কোনো সময় হওয়ার সম্ভাবনা। আগেই বলেছি মরতে আমার দুঃখ নেই। শুধু একটাই ইচ্ছে, মরণকালে খোকা যেন আমার কাছে থাকে। প্রশান্তকে তাহলে আসতে লিখি?—বলেছিল অমল।

-না না, তা হয় না। এর কোর্স শেষ হোক।

অবিনাশবাবু খানিক চিন্তামগ্ন থেকে বলেন — জানো অমল, ডাক্তার বলছিলেন যে আমার দেহযন্ত্রটি কিঞ্চিৎ মেরামত করলে আরও অনেকদিন টিকে যাব। ওপেন্-হার্ট সার্জারি করা দরকার। এই অপারেশন এদেশেও হচ্ছে আজকাল। তবে অনেক হাঙ্গামা। যথেষ্ট টাকাও লাগে। টাকা ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিন্তু খোকা ছাড়া অন্যের ঘাড়ে আমি এত ঝামেলা ও দায়িত্ব ফেলতে পারি না। খোকা ফিরুক। তবে তার আগেই যদি হঠাৎ টেসে যাই? —বিষণ্নভাবে হাসেন তিনি।

অমল চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না। পরামর্শ দেওয়া বৃথা। কারন শুনে চলার লোক নন অবিনাশবাবু। নিজে যা ভালো বঝবেন তাই করবেন।

প্রায় মিনিট পাঁচেক নীরবতার পর অবিনাশবাবু বললেন, একটা উপায় ভেবেটি, বিচ্ছুর মতো আমাকেও যদি—? অমল চমকায়। স্তম্ভিত ভাবে চেয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বলে,—

কিন—তু! অবিনাশবাবু মৃদু হেসে বলেন, "কী? বিপদের কথা ভাবছ? রিস্ক নেওয়ার অতে আমার আছে। জীবনভর ঢের রিস্ক নিয়েছি। যাক, তুমি ডক্টর

সেনকে একবার আমার কাছে আসতে বলো। বলবে, আমার অনুরোধ। ওঁর সঙ্গে কথা বলেই আমি প্ল্যানটাকে ফাইনাল করব।

সেই সব কথা ও ঘটনা একে একে মনে ভেসে আসে অমলের।

তিন

সকালে অমল ফোন করল প্রশান্তকে, আমার কাছে চলে আয় তোর গাড়ি নিয়ে। তারপর দুজনে এক জায়গায় যাব। কোথায়?—প্রশান্তর প্রশ্ন।

—দেখতেই পাবি। কী নার্ভাস লাগছে আমার সঙ্গে বেরোতে?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর আসে না। খট করে শব্দ ভেসে এল। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে প্রশান্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত হাজির হল অমলের বাসায়। অমল তৈরি হয়ে ছিল। দু'জন বেরোল।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ল মোটর। অমলের নির্দেশমতো চালাচ্ছে প্রশান্ত। সিঁথির একটু আগে ডান ধারে একটা রাস্তা ধরে বেঁকল! তারপর কিছু এঁকেবেঁকে গিয়ে থামল এক তালা-বন্ধ লোহার গেটের সামনে।

একটি লোক দ্রুত পায়ে এসে খুলে দিল গেট। গাড়ি ভিতরে ঢুকে থামল একটা মাঝারি দোতলা বাড়ি থেকে খানিকদূরে কয়েকটি একতলা ঘর ও টিনের শেড। ইলেকট্রিক ও টেলিফোন লাইন রয়েছে। | একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে খোলা সদর দরজায়। রোগা, লম্বা চোখে চশমা ট্রাউজার্স ও ফুলশার্ট পরা। কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখছে প্রশান্তকে।

অমল বলল, এটা একসময় ছিল জমিদারের বাগান বাড়ি। তারপরে কারখানা।

আপাতত ডঃ সেনের প্রাইভেট ল্যাবরেটরি।

প্রশান্ত কথা বলে না। তার সন্দিগ্ধ সতর্ক চোখ ঘুরছে চারধারে। ' কী অজয়, নতুন কোনো খবর? – বলল অমল।

দরজায় দাঁড়ানো যুবক মাথা নাড়ল। অর্থাৎ-না।

ডেইলি চেক-আপ সব সাটিসফ্যাক্টরি ?

—হ্যা, শুধু একটা... বেশ যাচ্ছি আমি, চল। আয় প্রশান্ত। ডাকল অমল।

বাড়িটায় ঢুকেই প্রশস্ত এক কক্ষ। প্রায় খালি। এক কোণে কয়েকটি বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল! মাথার ওপর সিলিং-ফ্যান। চেয়ার দেখিয়ে অমল বলল,- প্রশান্ত বস এখানে, আমি আসছি এক্ষুণি। প্রশান্ত বসল।

কফি খাবি?

—এখন নয়, তুই ফিরলে।

—অলরাইট।

অমল একটা ভেজানো দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। অজয় নামে যুবকটি গেল তার পিছু পিছু।

একা আড়ষ্ট হয়ে থাকে প্রশান্ত। অমলের ব্যবহার থেকে সে কোনো হদিশ খুজে পায় না। কেমন রহস্যময় চাপা লুকনো ভাব। যদিও ভয় পাওয়ার মতো কোনো ইঙ্গিত নেই! মনে হচ্ছে অমল কিছু দেখাতে চায়। কিছু বলতে চায় গোপনে। কী এমন ব্যাপার? বাড়িতে না বলে ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে টেনে আনার কারণ? এর সঙ্গে তার বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্পর্কই বা কী? এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ ব্যাকুল চিত্তে প্রশান্ত প্রতীক্ষায় থাকে।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এল অমল। বসল প্রশান্তর পাশের চেয়ারে। কফি এল।

দুজনে চুমুক দেয়। অমল ডুবে আছে কোনো গভীর চিন্তায়। নির্বাক। প্রশান্ত লক্ষ করে। ওকে। এক সময় অমল নীরবতা ভাঙে। ধীর স্বরে বলে, তোকে এখানে কেন এনেছি জানিস?

—না। আমার দিব্যদৃষ্টি নেই।

প্রশান্তর বিপে কান না দিয়ে, একই সুরে অমল বলল, তোকে এখানে এনেছি, কারণ এখানেই আছেন মেসোমশাই। অর্থাৎ তোমার বাবা, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বোস।।

সেকি! কোথায় ?—দাঁড়িয়ে ওঠে প্রশান্ত।

বোস।মৃদু স্বরে হাত নেড়ে নির্দেশ দিল অমল।

মানে? -প্রশান্ত উত্তেজিত। আমি এক্ষুনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তোর অনেক হেঁয়ালি সহ্য করেছি।

আগে আমার কথাগুলো শোন। অমলের গলা একটুও চড়ে না। তার সেই ধীর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব যেন ক্রমে সম্মোহিত করে প্রশান্তকে। বাধ্য করে তাকে চেয়ারে বসতে। অমলের কথার প্রতি মনোযোগ দিতে। অমল বলল, প্রথমেই সংক্ষেপে বলি, মেসোমশাই এখন ঘুমিয়ে আছেন।

আঁ, এত বেলা অবধি!—ধড়ফড় করে উঠল প্রশান্ত : বাবা তো খুব ভোরে ওঠেন। ডেকে দাও। বলো, আমি এসেছি।

অমল শান্ত কণ্ঠে বলল, -এখুনি ওঁকে ডেকে তোলা সম্ভব নয়। কারণ এ ঘুম সাধারণ ঘুম নয়।

-কেন? বাবার শরীর কি ভালো নেই? প্রশান্তর কথার জবাব না দিয়ে অমল বলল,—হাইবার্নেশন কী জানিস?

অবাক হয়ে প্রশান্ত বলল, হাইবার্নেশন?

হা, মানে, শীত-ঘুম। সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি শীতে গর্তে ঢুকে সারা শীতটা মড়ার মতো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াকেই তো হাইবার্নেশন বলে?

অমল বলল,হু, ঠিকই বলেছিস। তবে শুধু শীতল রক্তের সরীসৃপ নয়, কিছ উচ্চ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীরও এমনি হাইবার্নেট করার অভ্যাস আছে। বিশেষত ঠান্ডা দেশের কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর। যেমন উত্তর-মেরু প্রদেশের কাঠবেড়ালি।

হাইবার্নেশন হচ্ছে জীবের শরীরে এমন এক রাসায়নিক পরিবর্তন, যার ফলে তার দেহে মেটাবলিজম্ অর্থাৎ বিপাক ক্রিয়া খুব মন্থর হয়ে যায়। তখন তার দেহে ক্ষয় হয় খুব সামান্য। দেহের তাপ খুব নেমে আসে। রক্ত স্রোত চলে অতি ধীরে। হৃৎস্পন্দনের হার খুব কমে যায়। ফলে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হাইবানেট অবস্থায় জীবদেহের অতি সামান্য শক্তি খরচ হয়। কেবল প্রাণটুকু জিইয়ে থাকে। সে আবার জেগে ওঠে, দেহে বিপাক ক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে।

শীত কেটে গিয়ে গরম পড়লে সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি যারা শীত ঘুম দেয়, তাদের দেহে বিপাক ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, পরিবেশ বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য।

আধুনিককালে অনেক বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করছেন, যেসব প্রাণী স্বাভাবিকভাবে হাইবানেট করে না তাদের কীভাবে কৃত্রিম উপায়ে অমনি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এবং ফের তাদের জাগানো যায় প্রয়োজন মতো। কৃত্রিম হাইবার্নেশনকে অবশ্য আমি শীত-ঘুম বলব না। বলব হিম নিদ্রা। কারণ এই ব্যবস্থায় শরীরকে হিম শীতল করে ঘুমে আচ্ছন্ন করার জন্য, বাইরের শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার হয় না। সময়টা শীত না গ্রীষ্ম তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এই ব্যবস্থায় জীবের শরীর হিম শীতল করা হয় কৃত্রিম উপায়ে।

মানুষকেও হাইবার্নেট করার চেষ্টা হচ্ছে। কিছুটা সম্ভবও হয়েছে। আমার গুরু প্রফেসর সেনের গবেষণা এই নিয়েই—হিউম্যান হাইবার্নেশন। বাবাকে কি? প্রচণ্ড বিস্ময়ে প্রশ্নটা শেষ করতে পারে না প্রশান্ত।

–হ্যা, ঠিক ধরেছিস। মেসোমশাইকে এখন হাইবার্নেটেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। উনি এখন ঘুমে অসাড়। অচেতনই বলা যায়।

—কিন্তু বাবাকে কেন?

শখ করে নয়, প্রয়োজনে। এবং আমার বা ডক্টর সেনের বৈজ্ঞানিক খেয়াল মেটাতে নয়। মেসোমশায়ের একান্ত ইচ্ছার ফলেই ওঁকে এইভাবে রাখা হয়েছে। প্রায় জোর করে আমাদের বাধ্য করেছেন!

-কেন?

—মাস পাঁচেক আগে মেসোমশায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়। মাইল্ড অ্যাটাক। অল্পদিনেই সামনে উঠেছিলেন। তোক কিছুতেই খবর দিলেন না, পাছে তোর

ট্রেনিং-এ ক্ষতি হয়। ডাক্তাররা বললেন, এইরকম অ্যাটাক ফের হতে পারে এবং তাহলে সিরিয়াস হবে। প্রাণহানির সম্ভাবনাও রয়েছে। একমাত্র ওপন হার্ট সার্জারি করলে মেলোমশাই আবার পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু মেসোমশায়ের একটাই ভয়, তুই ফিরে আসার আগে যদি ফের ওঁর হার্ট-অ্যাটাক হয়। যদি শেষ সময়ে তোকে দেখতে না পান। অথচ তোকে কোর্স শেষ না করে আসতে দেবেন না। এই সময়ে ওঁর মাথায় এই বুদ্ধিটা জাগে! উনি জানতেন ডক্টর সেনের সঙ্গে আমার রিসার্চের বিষয়। প্রায়ই এই নিয়ে কৌতুহলী প্রশ্ন করতেন আমাকে!

ওঁর হার্ট-অ্যাটাক হওয়ার ঠিক আগের দিনই আমি মেলোমশাইকে খুশি হয়ে বলেছিলাম, আমার প্রিয় কুকুর বিচ্ছর কথা। বিচ্ছকে বাড়িতে রেখে বাইরে যাওয়া আমার। মহা সমস্যা হয়েছিল। আমি রাতে না ফিরলে ও পরদিন থেকে খাওয়া বন্ধ করবে। বিদ্যুকে দু'হপ্তার জন্য হাইবার্নেশনে রেখে আমি ব্যাঙ্গালোর ঘুরে আসি। তারপর সাকসেসফুলি বিচ্ছুকে জাগাই ওর কৃত্রিম হিমনিদ্রা থেকে। যাহোক, মেলোমশাই ধরলেন, তাকেও হাইবার্নেশনে রাখা হোক, যদ্দিন না তুই বিদেশ থেকে ফিরিস। তাহলে আর ওই সময়ে ওঁর হার্ট-অ্যাটাকের ভয় থাকবে না। কারণ হাইবানেশন পিরিয়ডে দেহের রক্ত চাপ খুব কমে যায় এবং নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ডঃ সেন প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না এই প্রস্তাবে। কারণ হিউম্যান-হাইবানেশনের আফটার-এফেক্ট কী হতে পারে, তা নিয়ে আমাদের অনেক কিছুই জানার বাকি ছিল। আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট দরকার। দুম করে মেসোমশাইকে নিয়ে পরীক্ষা করতে আমাদের ভরসায় কুলচ্ছিল না। কিন্তু মেসোমশাই জেদ ধরলেন। বললেন, যে সে রিস্ক। তার। যদি কোনো অঘটন ঘটে, এমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য আত্মদানও নাকি গৌরবময়। আমরা গোড়ায় রাজি না হতে উনি রীতিমতো চটে গেলেন। তখন ভয় হল। এই কারণেই না ওঁর ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গিয়ে বিপদ ঘটে। অগত্যা ডঃ সেন রাজি হলেন।

ঠিক ছিল, তুই ফিরে আসার কয়েকদিন আগে ওঁকে হিম-নিদ্রা থেকে জাগানো হবে। সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলা হবে। তুই আচমকা এসে পড়তে সব প্ল্যান ভেস্তে গিয়েছে। অবশ্য আমার মনে হয় তুই আগে ফেরাতে ভালোই হয়েছে! বরং দেরি হলে,-বলতে বলতে অমল হঠাৎ চুপ করে যায়। কী যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল।

সপ্রশ্ন ভাবে তাকায় প্রশান্ত।

অমল উত্তর দেয় না।

প্রশান্ত বলল, —তা এই কথাগুলো কাল বললি না কেন? মিছিমিছি একটা মিস। আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

অসুবিধা ছিল রে। - জানাল অমল : ডঃ সেনের অনুমতি ছাড়া এসব নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করা বারণ। তুই ঠিক সময়ে এলে হয়তো জানতেই পারতিস না। এই কয়েক মাস মেলোমশাই কীভাবে কাটিয়েছেন। ডঃ সেন এখন দিল্লিতে। দু-তিন দিন বাদে ফিরবেন। কাল রাতে ট্রাঙ্ক কল করে আমি ওর কাছে জানতে চাই কী করব? উনি পারমিশন দিতে আজ তোকে সব বললাম। হ্যা আর একটা কথা, মেসোমশায়ের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে খরচ হিসেবে। হাইবানেশনে খরচ বেজায়। ডঃ সেন বলেছেন, যে ইচ্ছে হলে তুই তোর বাবাকে একবার দেখতেও পারিস।

-মানে ওই রকম ঘুমন্ত অবস্থায়?

—হ্যা। ডঃ সেন ফিরে না আসা অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। মেলোমশায়কে তার আগে জাগানো সম্ভব নয়।

বেশ চল। বলল প্রশান্ত। দু’জনে উঠে দাঁড়াল।

প্যাসেজ দিয়ে খানিক হেঁটে অমল দাঁড়াল একটা ঘরের সামনে। পাশে দেওয়াল আলনায় ভোললানো কয়েকটা মোটা কাপড়ের অ্যাপ্রোন। পোশাকের ওপর তাই একটা চাপিয়ে নিল অমল। প্রশান্তকেও একটা পরতে বলল।

এক পাল্লার আঁট হয়ে চেপে বসা কপাট। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল অমল, পিছু পিছু প্রশান্ত।

ছোট ঘর। তাতে একটা মাত্র কাচের বন্ধ জানলা। ঘরটা এয়ারকন্ডিশন করা। বেশ শীত শীত। উল্টো দিকের দেওয়ালে একই রকম দেখতে আর একটা দরজা। প্রশান্তের মনে হল যেন একটা বড় হলঘরকে দেওয়াল তুলে ভাগ করা হয়েছে। সেই দেওয়ালে কাচ লাগানো। একটা বড় ফোকর।

ঘরের এক ধারে পিয়ানোর মতো দেখতে একটা যন্ত্র। তাতে কাচে ঢাকা ছোট ছোট খোপ। মনে হল ডায়াল ও মিটার। ভিতরে আলো জ্বলছে। কাটা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও ঘরে কয়েকটি কম্পিউটার জাতীয় বিচিত্র দর্শন যন্ত্র। সামনের দেওয়ালের দুটো ফুটো দিয়ে। অনেকগুলি সরু মোটা বৈদ্যুতিক তার ও নল এসে যুক্ত হয়েছে এ ঘরের যন্ত্রগুলিতে। এই যন্ত্রগুলির সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে দেওয়ালের সুইচ-বোর্ডে।

বড় যন্ত্রটির সামনে চেয়ারে বসে, সেই অজয়। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অজয়কে ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলে, অমল এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ঘরের অন্য প্রান্তের দরজার সামনে। চাবি লাগিয়ে দরজাটা খুলল। প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল সেই ঘরে। দরজা বন্ধ হল। এই ঘরটাও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরে একটিমাত্র কাচের শাশি আঁটা জানলা।

ঘরের ভিতর নিচু নিচু কাঠের স্ট্যান্ডের উপর নানান আকারের কয়েকটি বাক্স শোয়ানো। বাক্সগুলি ধাতু নির্মিত, তবে ওপরে স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের ঢাকনা।

অমল সোজা গিয়ে দাঁড়াল, একটা লম্বা বড় চারকোনা বাক্সের পাশে। প্রশান্ত বাক্সের স্বচ্ছ ওপরের অংশ দিয়ে দেখতে পেল, ভিতরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তার বাবাশ্রীঅবিনাশচন্দ্র বোস। পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে তার বুক অবধি ঢাকা। শুধু হাত দুটো বাইরে বার করা।

অবিনাশবাবুর চোখ বোজা। দেহ যেন একেবারে নিথর। তবে বিগতপ্রাণ মানুষের মতো তার মুখের ভাব ফ্যাকাসে নয়। সামান্য রক্তাভ। মাথা, বুক ও দেহের নানা জায়গায় কয়েকটি বৈদ্যুতিক তার ও নল আটকানো। সেগুলি বাক্স থেকে বেরিয়ে ঘরের দেওয়ালের দুটো ফুটো দিয়ে সামনের ঘরে চলে গিয়েছে। অবিনাশবাবুর বাম বাহুতে লাগানো সরু একটা নল গিয়ে ঢুকেছে তার আধারের পাশে রাখা একটি ছোট চৌকো কাচের বাক্সে। ওই বালোর মধ্যে মস্ত চিনাবাদামের আকারের লাল রঙের একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের মতো জিনিস। নল তার সঙ্গে যুক্ত। আবার ওই লাল বাদাম আকৃতির ব্যাগ থেকে অন্য একটি নল গিয়ে ঢুকেছে অবিনাশবাবুর চাদরের তলায়।

ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা তার বাবাকে এমন অসহায়ভাবে দেখে প্রশান্তর বুকে মোচড় দিল, ভারি কষ্ট হল। আগেকার সেই মানুষটিকে ফের ফিরে পাবে

তো? প্রশান্তের মনে হল বাবাকে যেন একটা কফিনে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সে বাবার দেহ সংলগ্ন নল ও তারগুলি দেখিয়ে প্রশ্ন করল, এগুলো কী?

অমল বলল,-এই তারগুলো ওঁর শরীরে বসানো ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত। ওঁর ব্রেনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হৃৎপিণ্ড কেমন চলছে ওগুলির মাধ্যমে তা জানা যায়। নলগুলি দিয়ে মাপা হচ্ছে ব্লাডপ্রেসার এবং আরও কিছু শারীরিক ক্রিয়া। এইসব তার ও নল পাশের ঘরে কিছু যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে প্রতি মুহুর্তে নির্দেশ দিচ্ছে ওঁর দৈহিক অবস্থা। কোনো গন্ডগোল দেখা দিলেই ওয়ার্নিং দেবে। আমরা পালা করে ওয়াচ রাখি ইন্ডিকেটর প্যানেলে। আসার সময় তো দেখলি অজয় ডিউটি দিচ্ছে।

আর, পাশে ওই কাচের বাক্সে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের মতো জিনিসটি হচ্ছে আর্টিফিসিয়াল -কিডনি। মানুষের কিডনি হাইবানেশনের সময় ঠিক মতো কাজ করে না। তাই কৃত্রিম কিডনির সাহায্যে রক্তকে পরিত করে দূষিত ইউরিন বের করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। দেখ, ওঁর বাঁ হাতে লাগানো একটা নল গিয়ে ঢুকেছে কৃত্রিম কিডনিতে। ওই পথে ওঁর রক্ত বেরিয়ে গিয়ে কৃত্রিম কিডনিতে পরিশ্রুত হয়ে অন্য নল দিয়ে ফের দেহে ফিরে যাচ্ছে।

তীক্ষ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, "শাস প্রশ্বাস হচ্ছে না যে? বুকের ওঠানামা কই?

হচ্ছে বইকি। বলল অমল: নইলে বেঁচে আছেন কী ভাবে? তবে ওঁর হৃৎপিণ্ড চলছে খুব আস্তে আস্তে। তাই চট করে বোঝা যাচ্ছে না বুকের ওঠানামা।

বাবাকে এই অবস্থায় আনা হল কীভাবে?—কৌতূহল জাগে প্রশান্তর।

স্যার, মানে ডঃ সেন কিছু কিছু বলতে অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য খুঁটিনাটিতে যাব না ওটা আমাদের সিকরেট। মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি।

প্রথমে ওঁর শরীরে নানান জায়গায় ইলেকট্রোড বসানো হয় এবং দেহের ভিতরকার রক্তস্রোত ও অন্যান্য ক্রিয়াগুলিকে ওয়াচ দ্রার ব্যবস্থা হয়। এরপর উনি শুয়ে পড়েন এই হিমনিদ্রার আধারে।

তারপর জেনেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ প্রয়োগ করে ওঁকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। ওঁর দেহে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কিছু রাসায়নিক দ্রব্য।

মানুষের দেহে যেসব রাসায়নিক ক্রিয়া, ক্ষয় বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবর্তন আনে এবং তাপ সৃষ্টি করে, এই রাসায়নিক মিশ্রণ তাকে বাধা দেয়। ফলে দেহের উত্তাপ কমে দাঁড়ায় বরফ জমা হিমাঙ্কের কাছাকাছি। মাত্র দু-তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। চালু করা হয় আর্টিফিসিয়াল কিডনি। দেহযন্ত্রকে সজীব রাখার জন্য কিছু পুষ্টিকর বস্তুও ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনজেকশনের সাহায্যে। অবশ্য উনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। শ্বাস-প্রশ্বাস চলে কৃত্রিম উপায়ে। হৃৎস্পন্দনের হার মিনিটে দু-তিনটি মাত্র এবং খুবই মৃদু। নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগ চলেছে ইনজেকশনে, যাতে রক্তকণিকা জমাট না বেঁধে যায়। এই অবস্থাই হচ্ছে হিউম্যানহাইবার্নেশন। মানুষের হিম-নিদ্রা। এই বিশ্রাম আধারটিকে বলা হয় হাইবার্নেকুলাম। আর এই ঘরকে বলা যায় হাইবার্নেশন চেম্বার।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত একটি ধমনীর এক জায়গা পুরু হয়ে যাওয়াই মেসোমশায়ের হৃদরোগের কারণ। এই হিমনিদ্রায় থাকার সময় দেহের বৃদ্ধি ঘটে না, এবং আগেই বলে ব্লাড-প্রেসার খুব কমে যায়। ফলে এই অবস্থায় ওঁর খারাপ আর্টারিটি আরও বেশি খারা অর্থাৎ পুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবং রক্ত স্রোতের গতি অতি ধীর হওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। বাবা কি সাড়ে তিন মাস ধরেই এই অবস্থায় আছেন? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

অমল বলল, মোটামুটি তাই। তবে প্রতি দশ-পনেরো দিন অন্তর ওঁর দেহের তাপ বাড়িয়ে মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা, অর্থাৎ প্রায় ৩৭° সেন্টিগ্রেড করা হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। তখন ওঁকে অচেতন থেকে আচ্ছন্ন অসাড় অবস্থায় আনা হয়। যাতে ওঁর দেহকোষে শক্তির ক্ষয় পূরণ করা যায়।

বাবাকে এইভাবে দেখতে প্রশান্তর আর ভালো লাগছিল না। সে বলল, অমল এবার চল যাই, কেমন দম বন্ধ লাগছে।

ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে হঠাৎ প্রশান্ত অন্য দুটি বাক্স দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, —ওগুলো কী?

—ওগুলোও হাইবার্নেকুলাম। অর্থাৎ হিম-নিদ্রার আধার।

দু'জনে একটা হাইবার্নেকুলামের পাশে দাঁড়ায়। দেখা গেল, ভিতরে নিদ্রায় অসাড় দুটি ইদুর এবং একটি কুকুর।

যেতে যেতে অমল বলল, আর একটা ঘরে আছে আমাদের ল্যাবরেটরি। রিসার্চ চলছে সেখানে।

দু'জনে আবার গিয়ে বৈঠকখানায় বসল। আরও এক রাউন্ড কফি এল বিস্কুট সহযোগে। প্রশান্তর মনে তখন অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

পাচ

আমার বাবাই কি তোমাদের হিউম্যান-হাইবানেশন এক্সপেরিমেন্টের প্রথম কেস? –জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

না।—উত্তর দিল অমল। আর একজনকে নিয়ে আমরা আগে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। কাকে? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে। প্রশান্তর প্রশ্ন।

কিছু বাধা নেই, বলল অমল; ব্যাপারটা হয়েছিল কি, মাস ছয়েক আগে একদিন দেখি এক বৃদ্ধ ল্যাবরেটরির সামনে রাস্তায় গাছতলায় শুয়ে। বৃদ্ধ খুবই শীর্ণ ও অসুস্থ। তাকে এই বাড়িতে এনে খেতে দিলাম, কিছু চিকিৎসাও করলাম। সামান্য সুস্থ হল। কিন্তু সমস্যা দাড়াল, তাকে এখন পাঠাই কোথায়? কার কাছে? লোকটি কিঞ্চিৎ জড়বুদ্ধি। তবে তার চেহারায় পোশাকে ভদ্র সন্তানের ছাপ।

কোথায় বাড়ি কে কে আছে? হাজার প্রশ্ন করেও তার কাছে বিশেষ উত্তর মিলল না। এ বাড়ি ছেড়ে নড়তেও চায় না। মাঝে মাঝে একটা নাম বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। অনেক জিজ্ঞসার পর বোঝা গেল ওটা তার ভাইয়ের নাম। কিন্তু তার ভাইয়ের ঠিকানার কোনো হদিশ পেলাম না।

লোকটি খুবই অসুস্থ। কিডনি খারাপ। আমরা প্রথমে ঠিক করলাম ওকে মাদার টেরেসার হোমে দিয়ে আসব। কিন্তু স্যার দিলেন অন্য এক প্রস্তাব। বললেন যে ওকে কিছু দিন হাইবানেশনে রেখে দেওয়া যাক। হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই ওর বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়া যাবে। হোম-এ পাঠালে আমরা দায়িত্ব মুক্ত হই বটে, তবে ও বেশি দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। হয়তো বাড়ির লোকের সঙ্গে ওর আর দেখাই হবে না। হাইবানেশনে রাখলে সেটা সম্ভব। কারণ ওই সময় ওর রোগ বৃদ্ধি হবে না, একই অবস্থায়। থাকবে। আসলে স্যার হিউম্যান-হাইবার্নেশন হাতে কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। অথচ এমন নতুন এবং বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্টের জন্য কোনো মানুষকে স্বেচ্ছায় পাওয়া দুষ্কর। কাজেই সুযোগটা

নিতে চাইলেন। রিস্ক নেই। কারণ আশপাশের লোকের কোনো আগ্রহই নেই বৃদ্ধ সম্বন্ধে। ব্যাপারটা শুধু জানব আমরা নিজেরা ক’জন। যদি অঘটন ঘটে, হিম-নিদ্রা চিরনিদ্রা হয় বৃদ্ধের, বলে দিলেই হবে বৃদ্ধ অসুখে মারা গিয়েছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

তারপর কী হল বৃদ্ধের? - প্রশান্ত জানতে চায়।

অমল বলল,ভাগ্যবশত দিন কুড়ি বাদে একজন এসে এখানে বৃদ্ধের খোজ খবর করতে থাকে। ভদ্রলোকের পরিচয়ে জানলাম সে-ই বৃদ্ধের ছোট ভাই। বললেন, যে তার। দাদার মাথার গোলমাল। বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। এমনি আগেও ঘটেছে। তবে ফিরে এসেছেন নিজে নিজেই। কয়েকদিন বাদে, বা কাছাকাছি কোথাও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এতদূরে আসেনি কখনও।

আমরা চেপে গেলাম আসল ব্যাপার। বললাম যে, এখান থেকে তো চলে গিয়েছেন। উনি। ঠিকানা রেখে যান। খোঁজ পেলে চিঠি দিয়ে জানাব।

সেই বৃদ্ধকে হিম-নিদ্রা থেকে জাগানো হল। চার-পাঁচ দিনে তাকে যতটা সম্ভব সুস্থ করে তোলা হল। তারপর চিঠি দেওয়া হল ওঁর ভাইকে।

প্রথম কেস হিসাবে যদিও ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তার রেজাল্ট সম্পর্কে আমরা খুব নিশ্চিত নই।

-কেন?

—কারণ বুদ্ধের হাইবার্নেশন পিরিয়ড ছিল খুব অল্প। এবং হাইবার্নেশনের ফলে বৃদ্ধের দেহ-মনে কোনো ক্ষতি হয়েছিল কিনা তা আমরা ঠিক জানতে পারিনি। বৃদ্ধ মাত্র দু'মাস বাদেই মারা যান। সুতরাং মেশেমশায়ের কেসটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টের দিক থেকে খুবই সিগনিফিক্যান্ট। বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন তো?—চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত। অমল একটু চুপ করে থেকে বলল,- মনে তো হয়। প্রশান্ত লক্ষ করল অমলের মুখে সংশয়ের ছায়া। সে অন্য প্রসঙ্গে গেল, —ডঃ সেনের সঙ্গে তোরা ক'জন কাজ করছিস?

অমল বলল, – তিনজন। অবশ্য এ বাড়ির দারোয়ান ও মালিকে বাদ দিয়ে। রিসার্চের কাজে সাহায্য করি আমি, অজয় আর বরেন। অজয়কে তো দেখলি। ও ডাক্তারি পাশ করেছে। বরেন যন্ত্রপাতির ব্যাপারে এক্সপার্ট। বলতে পারিস, আমিই

ডঃ সেনের প্রধান সহকারী। রিসার্চে খুটিনাটি ও গোপনীয় বিষয় নিয়ে উনি আমার সঙ্গেই কেবল আলোচনা করেন। আরও একজন অবশ্য আসত এখানে। তার আসা আপাতত বন্ধ করা হয়েছে।

কে? –ডঃ সেনের পুরনো কাজের লোক, বংশী। সাধারণত স্যারের সঙ্গেই সে আসত। স্যারের খাওয়া-দাওয়া যত্ন-আত্তির জন্য। তার গতিবিধি ছিল এ বাড়ির সর্বত্র। এমনকী ল্যাবরেটরি বা হাইবার্নেশন চেম্বারেও সে ঢুকে পড়ত। কে আটকাবে ওকে? ডঃ সেনের কথাই মানে না। বরং স্যারকেই ধমকায়।

—তা ওর আসা বন্ধ হল কেন?

বংশী মহা কৌতুহলে মাঝে মাঝে দেখত ঘুম পাড়ানো জীবগুলিকে। বৈজ্ঞানিক কৌশলে ওর বিশ্বাস ছিল না। ভাবত, তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার। যাহোক, সেই বৃদ্ধকে হাইবার্নেট করার পর, বংশী মহা ঝামেলা লাগিয়ে দিল। ওর ধারণা হল স্যার তান্ত্রিক বানে গিয়েছেন। এবং শৰ সাধনা শুরু করেছেন। ফলে স্যারের কাছে কান্নাকাটি, তর্জন-গভনি করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে স্যার বংশীর এখানে আসা বন্ধ করে দিলেন। তবে ভাগ্যি ভালো, বংশী অতি বিশ্বসী লোক। এখানকার রিসার্চের কথা বাইরে বলে না। নইলে মানুষ নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে জানলে, খবরের কাগজে হইচই জুড়ে দিত। আমাদের রিসার্চ হয়তো পণ্ড হত।

—তোদের রিসার্চ খুব গোপনে হচ্ছে, তাই না?

—তা তো বটেই! বিশেষত হিউম্যান-হাইবার্নেশন ব্যাপারটা একদম গোপন রাখা হয়েছে। সাধারণ লোক ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে? রিসার্চ-ওয়ার্কাররা ছাড়া মাত্র দু-একজন বাইরের লোক জানে আমরা কী করছি। যেমন তোর বাবা জানতেন।

—আর কে জানে?

—ঠিক তা জানি না স্যার কাকে কাকে বলেছেন। তবে মিঃ মান্ডি জানেন।

—মান্ডি কে?

—বম্বের এক বিজনেসম্যান। এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা করেন। ইন্ডিয়ার নানা জায়গায় ওঁর অফিস আছে।

—তা মান্ডি জানলেন কীভাবে?

—স্যারের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয় দিল্লিতে। রিসার্চের জন্য জার্মানি থেকে একটা যন্ত্র আনাবার চেষ্টা করছিলেন তখন ডঃ সেন। মান্ডিকে অনুরোধ করেন এটা তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিতে।

অমল বলে চলে :

মান্ডি কৌতুহলী হয়ে জানতে চায় কী বিষয়ে রিসার্চ? স্যার অল্পসল্প আভাস দেন। মান্ডি যন্ত্রটা আনিয়ে দেন খুবই কম খরচে। এরপরেই স্যারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। স্যার মান্ডিকে তাঁর রিসার্চের বিষয়ের অনেক কথা বলেন। এমনকী ভবিষ্যতে তার হিউম্যান হাইবার্নেশন প্রোগ্রামও।

মান্ডি লোকটা খুব দিলখোলা এবং আলাপী। তিনি খুবই আগ্রহ দেখান। এমনকী ডঃ সেনকে আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্যও দিতে চাইলেন। একসময় স্যার রাজি হলেন এই সাহায্য নিতে। আসলে তখন ডঃ সেনের হাত প্রায় শূন্য। তার ওপর গবেষণার এই বিরাট খরচ। স্যার সরকারি সাহায্যের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো হেল্প পাননি। দু-একজন কেষ্ট বিধু সায়ান্টিস্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ডঃ সেন যদি তাদের সঙ্গে নেন, গবেষণার অর্থ তাহলে জোগাড় হতে পারে। অথচ তারা হাইবার্নেশন রিসার্চের কিছু বোঝেন না। অর্থাৎ মতলব, ডঃ সেন সফল হলে তাঁরা ফোকটসে ভাগ বসাবেন। স্যার রাজি হননি। অবশেষে নিজের পয়সায় গবেষণা শুরু করেন।

ডঃ সেনের অনেক টাকা বুঝি? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

—ছিল। এখন আর নেই। বিখ্যাত সার্জেন ছিলেন। এদেশে এবং আমেরিকায় ডাক্তারি করে প্রচুর রোজগার করেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে আমেরিকায় থাকার সময়, হাইবার্নেশন রিসার্চে আকৃষ্ট হয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে দেন। কালিফোর্নিয়ার এক বিখ্যাত ল্যাবরেটরিতে এই নিয়ে রিসার্চ করেন পাঁচ-ছয় বছর। তারপর দেশে আসেন।

আসলে উনি আর খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। এক এক সময় হতাশ হয়ে ভাবছিলেন, ফিরে যাবেন আমেরিকায়। মিঃ মান্ডির প্রস্তাবে তাই খুব খুশি হলেন। লুফে নিলেন অফার। মান্ডির কলকাতা অফিসের ম্যানেজার মিঃ

গুজরালকে জানালেই আমাদের দরকার মতো নগদ টাকা বা কোনো জিনিস পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বছরখানেক কয়েক লক্ষ টাকার হেল্প পাওয়া গিয়েছে মান্ডির থেকে। অবশ্য মান্ডি স্বয়ং এই ল্যাবরেটরিতে এসেছেন মাত্র একবার। সময় পান না। তবে চিঠিতে গবেষণার বিষয়ে স্যারের কাছে খোজ খবর নেন।

ডঃ সেনকে সাহায্য করায় মান্ডির স্বার্থ? কোনো শর্ত দিয়েছেন নাকি?—প্রশান্ত প্রশ্ন করল।

-না। শর্ত কিছু দেননি। বলেছেন স্যারকে, আপনি এই গবেষণায় সফল হলে আমায় একট কৃতজ্ঞতা জানাবেন। তাই আমার মস্ত পুরস্কার। তাতেই আমি ফেমাস হয়ে যাব। আসলে বুঝলি ব্ল্যাক মানি। ব্যবসাদার তো ট্যাক্স ফাকি দেওয়ার মতলব। কীভাবে লুকনো টাকা খরচ করবে ভেবে পায় না। এইভাবে কাজে লাগিয়ে যদি নাম হয়ে যায়। তা যাকগে, সদ্‌গতি হচ্ছে ওর টাকার।

মান্ডি। বোম্বাই। প্রশান্তের স্মৃতিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল নামটা। কোথায় যেন এর কথা শুনেছে? অমলের শেষ কথায় তার মনে পড়ে যায়। সে বলে ওঠে, -এর পুরো নামটা কী জানিস? ফুলচাঁদ মান্ডি কি?

হ্যা হ্যা ঠিক বলেছিস। জানাল অমল।

প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে যায়। বলে,-এর কথা আমি শুনেছি আগে। আমার এক সম্পর্কে কাকা বম্বেতে থাকেন, তার কাছে। ঠিকই বলেছিস, এই মান্ডির প্রচুর ব্ল্যাক মানি। কাকা বলছিলেন যে, এক্সপোর্ট ইমপোর্ট নয়। আসলে মান্ডি স্মাগলিং-এর ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামিয়েছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসা বাইরের লোক দেখানো ব্যাপার। পুলিশ কয়েকবার রেইড করেছে ওর বাড়ি। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। ফুলচাঁদ মান্ডি নাকি অতি গোল লোক।

শুনে অমল গুম মেরে গেল।

প্রশান্ত বলল,-এ টাইপের লোকের নানা ধান্দা। টাকা যে দিচ্ছে হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নেয় নাকি?

-কই না তো!

অমল মনে মনে ভাবে, কে জানে, হয়তো সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সাহায্য করে নাম কিনতে চায়। পরে সেই সুনাম ভাঙিয়ে ফায়দা লুটবে। তবু সতর্ক থাকা উচিত। ডঃ সেনকে মান্ডি সম্বন্ধে একটু জানিয়ে রাখা ভালো।

দিন পনেরো কেটেছে। অবিনাশবাবুর হিম-নিদ্রা ভেঙেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রশান্ত বাবার হার্ট-অপারেশনের ব্যবস্থা করছে।

প্রশান্ত একদিন বলল অমলকে, জানিস বাবাকে বললাম তোমায় ফের ঘুম পাড়িয়ে রাখি, যদ্দিন না অপারেশন হয়। কোনো রিস্ক থাকে না। তা বাবা স্রেফ উড়িয়ে দিলেন আমার কথা। বললেন যে, বহু বছর দিব্যি ভোগ করেছি জীবনটা। এখন যদি টপ করে অক্কা পাই আপশোস নেই। তুই কাছে থাকলেই হল। আর আমি ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করব না। তবে হ্যা, ফের যদি তুই বাইরে যাস অনেক দিনের জন্যে তখন না হয় ঘুম দেওয়ার কথা ভাবা। যাবে। কী যে করি ? দেখি যত তাড়াতাড়ি অপারেশনটা করানো যায়।

প্রশান্ত সময় পেলেই যেত ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে। গল্প গুজব করত অমলের সঙ্গে। সন্ধেবেলা অমলের ডিউটি থাকলে প্রশান্ত কোনো কোনো দিন তার কাজের শেষে অমলের কাছে গিয়ে পরে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরত। অমলদের গবেষণা নিয়ে প্রশান্তর খুবই কৌতুহল। তবে এ বিষয়ে বেশি প্রশ্ন করত না। মলয় যতটুকু নিজে থেকে বলত তাই শুনত।

ডঃ সেনের সঙ্গেও প্রশান্তর আলাপ হল। আলাপ সামান্য আগেও ছিল, এবার হল। ঘনিষ্ঠতা।-ডঃ সেনের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ছোটখাটো সতেজ চেহারা। গৌর বর্ণ। ধারালো মুখ। পুরু চশমার আড়ালে উজ্জ্বল চোখ। মানুষটি খেয়ালি। কখনও বেশ গল্প। করেন। কখনও গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক, চুপচাপ। প্রশান্ত শুনেছে, ডঃ সেনের স্ত্রী মারা। গিয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, থাকে কানপুরে।

এক সন্ধ্যায়। ল্যাবরেটরির ড্রইংরুমে বসে ডঃ সেন ও প্রশান্ত। কফি পান হচ্ছে। অমলের ডিউটি শেষ হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। ডঃ সেন বেশ খোশমেজাজে আছেন। এটা সেটা গল্প হচ্ছে। সুযোগ বুঝে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা স্যার, এই হিউম্যানহাইবার্নেশনের ভবিষ্যত কী? মানে আমাদের কি কাজে লাগবে? কিছুটা অবশ্য বুঝেছি। যেমন, এই সময় দেহের ক্ষয়ক্ষতি হয় খুব কম। তাই এই

অবস্থায় রেখে দিলে পরে সুযোগ। মতো চিকিৎসা করানো যেতে পারে। যেমন বাবার কেস।

ডঃ সেন বললেন, —সে একটা দিক। এছাড়াও ঢের ঢের উপকারে লাগবে, আর্টিফিসিয়াল হাইবানেশন যদি সফল হয়। এমন দিন আসবে, যখন যে কোনো প্রাণীকে বছরের পর বছর কৃত্রিম উপায়ে হিম-নিদ্রায় রেখে দেওয়া যাবে। মনে কর মানুষকে দীর্ঘদিন হাইবানেট করা সম্ভব হল। আজ মানুষের যেসব অসুখের চিকিৎসা জানি না। হয়তো, কয়েক বছর বাদে তাদের অনেকগুলিরই চিকিৎসা আবিষ্কার হবে। তখন ওই সব রোগে আক্রান্ত মানুষকে হাইবানেশন ভাঙিয়ে, তাদের নতুন চিকিৎসায় বাঁচানো যাবে।

একটু চুপ করে থেকে ডঃ সেন আবার বললেন, - আরও দিক আছে। হাইবানেশন প্রাণীর জীবনকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন ধর ছোট বাদুড় এবং ছুঁচোর উদাহরণ। দু'জনের ওজন প্রায় একই। কিন্তু বাদুড়ের জীবনীশক্তি ক্ষয়ের পরিমাণ অনেক কম। কারণ তারা রাতে এবং মাঝে মাঝে দিনের পর দিন হিম-নিদ্রায় কাটায়। ফলে যেখানে দুচো বাঁচে বড়জোর বছর দেড়েক, ওই আকারের বাদুড় বাঁচে প্রায় কুড়ি বছর। হাইনেশনে থাকার সময় প্রাণীর বয়স বাড়ে না, জরা আসে না।

এখন মানুষ মহাকাশ অভিযানের তোড়জোড় করছে। মহাকাশযানে যদি চারজন মানুষ। যায়, তাদের সবাইয়ের একসঙ্গে জেগে থাকার প্রয়োজন নেই। দু'জন জেগে থেকে মহাকাশযান চালনা করুক। বাকি দু'জন থাকুক হিম-নিদ্রায়। এইভাবে পালা করে চলুক তাদের বিশ্রাম ও জাগরণ। এতে মহাকাশযাত্রীদের জন্য ঢের কম অক্সিজেন ও খাবার নিলে চলবে। মহাকাশ যাত্রার একঘেয়েমিও কম ভোগ করতে হবে। আবার হয়তো তোমার কোনো কাজ নেই কয়েক মাস। শুধু খেয়ে শুয়ে সময় কাটানো। হিম-নিদ্রায় কাটাও। দরকার মতো জাগো। তোমার শরীর ও মনের বিশ্রাম হবে। ভবিষ্যতে কোনো দেশ হয়। বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তাদের হাইবার্নেশনে রেখে দেবে। সৈন্যদের খাওয়ার খরচ বাঁচবে, তারা তাজাও থাকবে। দরকার মতো তাদের জাগিয়ে তুলে যুদ্ধে পাঠানো হবে। পরমাণু যুদ্ধের সময় যারা হাইবানেশনে থাকবে তাদের শরীরে মারাত্মক বিকিরণের প্রভাব পড়বে অনেক কম।

ঘরের সিলিংয়ে চোখ রেখে আনমনা ভাবে নিজের মনে বললেন ডঃ সেন,-হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। স্তন্যপায়ী জীব এবং মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে হাইবার্নেট করার

সব রহস্য আর কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে যাবে। তবে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আরও সুদুরে। তারা এখন চিন্তাভাবনা করছেন সাসপেন্ডেড-অ্যানিমেশন আবিষ্কার নিয়ে।

সাসপেন্ডেড-অ্যানিমেশন কী? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

ডঃ সেন জবাব দিলেন, বাংলায় বলা উচিত রুদ্ধ বা স্থগিত জীবন। হাইবার্নেশনের উন্নততর ধাপ। এই প্রক্রিয়ায় জীবের শরীরের মেটাবলিক-অ্যাকটিভিটি অর্থাৎ বিপাক ক্রিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকবে। শরীরে তখন কোনো ক্ষয় বা বৃদ্ধি ঘটবে না। অথচ প্রাণ টিকে থাকবে। এইভাবে প্রাণীকে যত বছর খুশি রাখা যাবে। আবার তাকে জাগিয়ে স্বাভাবিক করে তোলা যাবে। এই অবস্থায় আনতে হলে, দেহের উত্তাপ সব নিম্ন তাপমাত্রায় অর্থাৎ এবসলিউট-জিরো টেম্পারেচার বা-২৭৩ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি নামিয়ে এনে, দেহকোষগুলির তরল উপাদানকে বরফের মতো জমিয়ে ফেলা হবে। আবার প্রয়োজন মতো দেহকে স্বাভাবিক করে তোলা চলবে। অবশ্য এর সঙ্গে থাকবে বহু রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অতি দুরূহ সব ব্যাপার। যা এখনও প্রায় জল্পনা-কল্পনার স্তরে।

এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনায় সচকিত প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, -সাসপেন্সেল, অ্যানিমেশনে মানুষের কী কী সুবিধে হবে স্যার?

প্রচুর প্রচুর।—ডঃ সেন উত্তেজিত: ভবিষ্যতে হয়তো মহাকাশ যাত্রা হবে বহু দূর দর গ্রহে। শত শত বছরের যাত্রা। দশ বিশ বছরের জন্য হাইবানেশন প্রক্রিয়া চলতে পারে, কিন্তু শত সহস্র বছরের অভিযানে মহাকাশচারীদের সাপেন্ডেড-অ্যানিমেশনে রাখা ছাড়া উপায় নেই। স্পেসশিপ-এর সুপার-কম্পিউটার দেখাশোনা করবে রুদ্ধ-প্রাণ যাত্রীদের। এবং দরকার মতো তাদের জাগিয়ে তুলবে। এই ব্যবস্থা ছাড়া বহু দূর গ্রহে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। নইলে মানুষের পরমায়ুই তো শেষ হয়ে যাবে যাত্রা পথে। এ ছাড়াও পরমাণ যুদ্ধের রক্ষাকবচ হিসাবে বা ভবিষ্যৎ কালে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সুযোগ নিতে সাসপেন্ডেড-অ্যানিমেশন, হাইবানেশন থেকেও মানুষের ঢের বেশি উপকারে আসবে।

আমতা আমতা করে প্রশান্ত বলে, – আচ্ছা স্যার, রামায়ণে পড়েছি কুম্ভকর্ণ নাকি বছরে ছয় মাস জেগে থাকত, আর ছয় মাস ঘুমিয়ে কাটাত। সেটা কি হিউম্যান হাইবানেশন কে?

ডঃ সেন হেসে বললেন, হতে পারে, হতে পারে। ব্যাপারটা সত্যি হলে বলতে হয় সে যুগে বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছিল।

উৎসাহ পেয়ে প্রশান্ত বলল, “রামের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কুম্ভকর্ণকে হঠাৎ জাগিয়ে তুলে, তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধে পাঠানো হয়। হয়তো সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় পায়নি। তাই হয়তো ভালো মতো যুদ্ধ করতে পারেনি। ফলে বেচারা মারা পড়ে। নইলে সে তো অপরাজেয় ছিল। হতে পারে। ইউ মে বি রাইটডঃ সেনের মুখে কৌতুক মেশানো হাসি।

স্যার, আপনার হিউম্যান-হাইবার্নেশন রিসার্চ তো প্রায় সাসেসফুল। উজ্জ্বল মুখে বলল প্রশান্ত। উঁহু। - হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লেন ডঃ সেন: আমার কাজ এখনো ঢের বাকি। -কেন? বাবাকে তো ঠিক মতোই...

—হু, অবিনাশবাবুর কেস থেকেই বুঝেছি। প্রোগ্রাম ছিল প্রতি দু-সপ্তাহ অন্তর ওঁর। বডি-টেম্পারেচার কয়েক ঘণ্টার জন্য নর্মালে নিয়ে আসা হবে। তখন একবার চেক-আপ হবে এবং ওঁর দেহকোষে ইতিমধ্যে যে সামান্য এনার্জি ক্ষয় হয়েছে তা পূরণ করা হবে। কিন্তু তৃতীয় বার এমনি করার পর দেখা গেল যে, হাইবার্নেশন পিরিয়ডে ওঁর শরীরে ক্ষয় বেড়েছে। দেহের তাপ আর প্রথমবারের মতো নামানো যাচ্ছে না। হার্টবিটও বাড়ছে। ফলে ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা আরও তাড়াতাড়ি করতে হল। এইভাবে ওঁকে পাঁচ-ছয় মাসের বেশি রাখা সম্ভব হত না।

প্রশান্ত বুঝল, এই জন্যেই সেদিন অমল বলেছিল যে, সে আগে আগে ফেরায় বাবার মঙ্গলই হয়েছে।

ডঃ সেন ক্ষুব্ধ স্বরে বলতে থাকেন, এখনও অনেক রহস্যই অজানা। স্বাভাবিকতা যে সব স্তন্যপায়ী জীবরা হাইবানেট করে, তাদের দেহে এই সময় কী কী পরিবর্তন ঘটে।

কী কী হরমোন ও এঞ্জাইম তৈরি হয়? কী ভাবে হয় তাদের দেহে ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা? আরও কত খুঁটিনাটি তথ্য।

তবে হয়ে যাবে। সবই আবিষ্কার হবে ক্রমে ক্রমে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে এই রিসার্চে আধুনিক উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরি আর যন্ত্রপাতি দরকার। বড় খরচ। কতকাল এ খরচ টানতে পারব জানি না। মিঃ মান্ডির থেকেই বা আর কত নেব?

তাছাড়া মান্ডি সম্বন্ধে অমলের কাছে যা শুনলাম।—ডঃ সেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রশান্তর দিকে তাকালেন। বোঝা গেল মান্ডির পরিচয় তার কানে পৌছেছে। ডঃ সেন বিড়বিড় করেন,—ভয় হয়। ওর মতলব কী, ঠিক বুঝছি না।

সাত

সকাল সাতটা নাগাদ অমল এসে হাজির হল প্রশান্তর কাছে। প্রশান্ত অবাক। কী ব্যাপার এখন! কলেজ নেই? —না, আজ অফ-ডে। একটা ইন্টারেস্টিং খবর দিতে এলুম।

—মিঃ মান্ডি একটা অনুরোধ জানিয়েছেন স্যারকে। অদ্ভুত রিকোয়েস্ট।

—কী রকম?

—মিঃ মান্ডি তার নিজস্ব একটা হাইবার্নেশন-চেম্বার করতে চান বম্বেতে। সেখানে শুধু তাঁর ফ্যামিলি-মেম্বারদের দরকার মতো হাইবার্নেট করে রাখা হবে। ওঁর মায়ের নাকি বয়স হয়েছে আশির ওপর। শরীর খুব খারাপ। এদিকে বৃদ্ধার ভারি শখ নাতি নাতনি সবার বিয়ে-শাদি দেখে যাবেন। মান্ডির ইচ্ছে মাকে হাইবার্নেশনে রাখা হোক। নাতি নাতনিদের বিয়ের সময় একবার করে তাকে ঘুম থেকে জাগানো হবে। ফের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে। তাছাড়া মাণ্ডির পরিবারে কারও ক্যানসার বা ওই জাতীয় রোগ হলে, যার চিকিৎসা এখনও অজানা, তাদেরকে হাইবার্নেশনে রাখতে চান মান্ডি! কারণ ভবিষ্যতে ওই সব রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার হলে তাদের প্রাণরক্ষা হতে পারে!

মান্ডি কি চিঠি লিখেছেন? জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত : ডঃ সেনের রিসার্চ কদূর এগিয়েছে মান্ডি জানেন দেখছি!

হু, স্যারকে উনি এই বিষয়ে চিঠিপত্র লেখেন জানি। তবে তিন দিন আগে উনি হঠাৎ কলকাতায় এসেছিলেন। তখন স্যারের সঙ্গে দেখাও হয়েছে। আমাদের রিসার্চের প্রোগ্রেস সম্পর্কে কথাও হয়েছে কিছু। এত টাকা দিচ্ছে, এ খবরটুকু জানার অধিকার আছে বইকি মান্ডির। তবে সায়ান্টিফিক ডিটেলস নিয়ে উনি কিছু প্রশ্ন টশ্ন করেননি। বোঝেও না কিছু। তোর বাবার কেসটা শুনে স্যারকে নাকি খুব কনগ্রাচুলেশনস জানিয়েছেন। তারপরই নিজেদের জন্য বম্বেতে হাইবানেশনের ব্যবস্থা করার প্ল্যান দেন।

স্যার অবশ্য বলেছেন, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। রিসার্চের খুঁতগুলো আগে ঠিক হোক। তাছাড়া আগে কোনো ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে ছাপা হোক ওঁর রিসার্চের ফলাফল।

মান্ডি তবু ছাড়েনি। বলেছেন যে মেসোমশায়ের মতো তিন-চার মাস ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা হলেও আপাতত চলবে। মা অন্তত মেজ নাতির বিয়েটা দেখে যাক। মানে মান্ডির মেজ ছেলে এখন কলেজ পড়ছে। মাস ছয়েক বাদে ফাইনাল পরীক্ষা। তারপর বিয়ে দেবে। অথচ ওঁর মায়ের শরীরের যা হল, যে কোনো দিন গত হতে ব্যাপারটা একদম গোপন রাখা হবে। এবং হাইবানেশনের ব্যাপারে কোনো অঘটন ঘটি সে দায়িত্ব কখনওই ডঃ সেনের ঘাড়ে চাপবে না। সম্পূর্ণ রিস্ক মান্ডির। এক্কেবারে আধুনিক ও উন্নত ল্যাবরেটরি ও হাইবার্নেশন চেম্বার বানাবার খরচ দেবেন মান্ডি। স্যার বলেছেন, যে, চেষ্টা করবেন মান্ডির অনুরোধ রাখতে। মুশকিল! গাদা গাদা টাকা দিচ্ছে। এখন এই আবদার এড়ানো দায়।

পরের দিন সন্ধ্যায় অমল ফের প্রশান্তর বাড়িতে হাজির। বলল,—জানিস মিঃ মান্ডি একটা অফার পাঠিয়েছেন আমাকে, ওঁর ম্যানেজার গুজরাল মারফত।

কী অফার ?—প্রশান্ত জানতে চায়।

—মিঃ মান্ডির প্রাইভেট-হাইবার্নেশন চেম্বার তৈরি হলে আমি তার চার্জ নিতে রাজি আছি কিনা? মাইনে এখন যা রোজগার করছি তার দু'গুণ দেবে।

—হঠাৎ তোকে কেন?

—কারণ আমি কাজটা জানি। মান্ডি চান ডঃ সেনের অ্যাসিস্টেন্টদের থেকে কেউ আপাতত তার প্রাইভেট চেম্বারের ভার নিক। তাহলে রিসার্চের তথ্য গোপন থাকবে। বাইরের লোককে ট্রেনিং দিলে আমাদের রিসার্চ সিক্রেট ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মান্ডি তা চান না। ডঃ সেনও রাজি নন, বাইরের কাউকে এ বিষয়ে কিছু জানাতে।

—মান্ডি তাহলে প্রাইভেট হাইবার্নেশন-চেম্বার করছেনই।

—হু। একদম উঠে পড়ে লেগেছেন। ওঁর মাকে মেজ নাতির বিয়েটা দেখাবেনই। নাছোড়বান্দা লোক বটে!

তুই কী ভাবছিস?—জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

আমি যাব না। বলল অমল : আমি স্যারের সঙ্গে রিসার্চ চালিয়ে যেতে চাই। বম্বে গেলে তা বন্ধ হয়ে যাবে।

-তাহলে?

—আমায় না পেলে গুজরাল নিশ্চয় অজয় বা বরেনকে অ্যাপ্রোচ করবে। ওদের কেউ হয়তো রাজিও হয়ে যাবে। ওরা মান্ডির আসল পরিচয় জানে না। তাছাড়া প্রচুর মাইনের টোপ।

—স্যার জানেন, তোদেরকে চাকরির অফার দিচ্ছে? —এখনও জানেন না। তবে শুনবেন ঠিকই। কী করবেন! নিরুপায়। মান্ডির অনুরোধ রাখলে হয়তো তার সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটুকু দাবি মেটালে স্যারের রিসার্চের বিশেষ ক্ষতি হবে না। রিসার্চের গোপন তথ্য ফাস না হলেই হল।

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বলল, আর একবার ভেবে দেখ অফারটা। কোনো খাটুনি নেই। শুধু মান্ডির ঘুমন্ত নানির তদারকি। স্রেফ বসে বসে অতগুলো টাকা পকেটে পুরবি।

ভাগ! প্রশান্তর রসিকতায় চটে গিয়ে উঠে পড়ল অমল।

সাতদিন বাদে সন্ধ্যায়। প্রশান্ত ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে গেল অমলের খোঁজে। ইতিমধ্যে দু'জনে আর দেখা হয়নি।

অমল ল্যাবরেটরিতে ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, আমার আজ ফিরতে রাত হবে। তুই অপেক্ষা করিসনে। বোস, এক কাপ কফি খাই। তারপর যাবি। খুব ব্যস্ত বুঝি!জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

—হ্যা। আর একটা হিউম্যান-হাইবার্নেশন কেস জুটেছে। গতকাল তাকে ঘুম পাড়ানো হল।

—। কে আবার রাজি হল?

—একজন মাঝবয়সি পুরুষ। আমরা চিনি না। মিঃ মান্ডি পাঠিয়েছেন। নাগপুরে থাকেন। ভদ্রলোককে মিঃ গুজরাল নিয়ে এসেছিলেন ডঃ সেনের কাছে। মান্ডির চিঠি এনেছিল গুজরাল।

-কী ব্যাপার?

—মান্ডি লিখেছেন, এই ভদ্রলোকের নাম দশরথ। মান্ডির নিকট আত্মীয়। দশরথবাবুর ক্যানসার হয়েছে কিডনিতে। আর্লি স্টেজ। মান্ডির ইচ্ছে দশরথবাবুকে নিয়ে বিদেশে যাবেন চিকিৎসা করাতে। কিন্তু এখন ব্যবসার কাজে মান্ডি ভীষণ ব্যস্ত। তাছাড়া জোগাড়যন্ত্র করতেও কম করে মাস দুই লাগবে। এই সময়টা যদি 'দশরথবাবুকে হিম-নিদ্রায় রাখা যায় তাহলে রোগ আর বাড়বে না। বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন মিঃ মান্ডি। ডঃ সেনও এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ ছাড়েননি।

—কী ভাবে রাখা হয়েছে ওকে? বাবার মতো? —হ্যা। —একবার দেখাবি? বাবাকে সেদিন ভালো করে লক্ষ করিনি। কষ্ট হচ্ছিল দেখতে।

বেশ চল। দু’জনে হাইবার্নেশন চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

সেই কফিনের মতো বাতটির পাশে দাঁড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন মানুষটিকে দেখল প্রশান্ত। খুটিয়ে লক্ষ করল বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক কারিগরি, প্রায় আধঘণ্টা ধরে। অনেক প্রশ্নও করল অমলকে।

বিদায় নেওয়ার সময় প্রশান্ত মিচকে হেসে বলল, “মাভি এবার তার মাকেও এখানে পাঠাবে। কাল আমি বম্বে যাচ্ছি দু-তিন দিনের জন্যে। ভেবেছিলাম ঠিকানাটা নিয়ে মান্ডির সঙ্গে দেখা করব। তোর বদলে আমিই না হয় মান্ডির প্রাইভেট হাইবার্নেশন চেম্বারের চাকরিটা চাইব। ডঃ সেনকে বলে একটা ট্রেনিং নিয়ে নিলেই হবে। তা বাবা দরকার নেই। হয়তো ছেলের নানিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে এখানে পৌছে দিতে।

বম্বে থেকে ফিরেই দুপুর তিনটে নাগাদ প্রশান্ত সোজা হাজির হল ডঃ সেনের ল্যাবরেটরিতে। অমল ছিল সেখানে। জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরলি?

আজ।—উত্তর দিল প্রশান্ত : শোন, দশরথবাবু কি এখনও ঘুমিয়ে আছেন?

-হ্যা আছে বইকি। -আমি একবার তাকে দেখতে চাই। -কেন?

হিম-নিদ্রায় আচ্ছন্ন দশরথবাবুকে খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে প্রশান্ত পকেট থেকে একটা পত্রিকা বের করল। ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা। সেই পত্রিকার পাতা উল্টে একটা ছবি বেশ করে খোলা পাতাটা টেবিলের ওপর রেখে প্রশান্ত বলল,—অমল দেখ, এর সঙ্গে দশরথবাবুর মিল পাচ্ছিস?

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িসহ, শার্ট গায়ে এক ব্যক্তির আবক্ষ ফোটোগ্রাফ থেকে ছাপা ছবি। প্রশান্ত আঙুল চাপ দিয়ে ছবির লোকটির দাড়িটুকু ঢেকে দিয়ে বলল, এবার লক্ষ কর।

—হু, মিলটা স্পষ্ট। যদিও চুলের কায়দা একটু অন্যধরনের। ছবি লোকের টেরি হালফ্যাশনের। দশরথবাবুর চুল সাদা মাটা পাট করে আঁচড়ান। সিঁথিও অন্য ধারে। তবু নাক চোখ চিবুকের গড়নে এবং গালে একটা কাটা দাগের মিল দেখে মনে হয় দু'জনে একই লোক।

এ ছবি কার?—প্রশ্ন করল অমল।

—একজন ক্রিমিনালের। স্মাগলার। বম্বে পুলিশ ওকে খুঁজছে একটা খুনের কেসে। ওর চালু নাম জনি। এটা বম্বের পত্রিকা। ছবিটা দেখতে দেখতে হঠাৎ দশরথবাবুর সঙ্গে যেন। মিল খুঁজে পেলাম।

হু ঠিক এক লোকই বটে। খাসা লুকোবার ব্যবস্থা হয়েছে ওর। যাক, কী। করবি এখন?

স্যারকে বলি আগে! —অমল রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছে।

ডঃ সেনের বাড়ি। ডঃ সেন, অমল, প্রশান্ত চিন্তিত মুখে বসে আছে। সব শুনে শুম্ মেরে গিয়েছে ডঃ সেন। নিজে গিয়ে ঘুমন্ত দশরথ এবং জনির ছবি মিলিয়ে দেখে এসেছেন।

অমল বলল, -বোঝা যাচ্ছে এই জন্যেই প্রাইভেট হাইবার্নেশন চেম্বার বানাতে চাইছে মান্ডি। দলের লোককে প্রোটেকশন দিতে। প্রয়োজনে লুকিয়ে রাখতে। ফ্যামিলির ব্যাপারটা ভাওতা।

দশরথ, ওরফে জনির ক্যানসারের প্রমাণ, মানে এক্স রে প্লেট, ডাক্তারের রিপোট ইত্যাদি দেখায়নি?—জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

দেখিয়েছিল। উত্তর দিল অমল : নিশ্চয় সব ফলস। মিথ্যে। দশরথ নামে অন্য কারও রিপোর্ট ম্যানেজ করে এনেছিল। টাকার জোরে কিনা হয়?

ডঃ সেন ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন অমলের কথায়। এখন কী করবেন স্যার?—জানতে চাইল অমল।

ভাবছি পুলিশে খবর দিই। – বললেন ডঃ সেন।

না স্যার, সেটা ঠিক হবে না। আপত্তি জানাল প্রশান্ত : মান্ডি ডেনজারাস লোক। আপনারা ভীষণ বিপদে পড়বেন।

অমল বলল, —তাছাড়া প্রমাণ? মান্ডি যে ওকে পাঠিয়েছে, সেই যে মান্ডির লেখা চিঠি। গুজরাল চলে যাওয়ার পর আর সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেবিলের ওপর ছিল চিঠিটা।

প্রশান্ত বলল,—অর্থাৎ গুজরালই ওটা সরিয়েছে। আটঘাট বেঁধেই প্ল্যান করেছে। সুতরাং মান্ডির কিসসু হবে না। উপরন্তু আপনারাই ঝামেলায় পড়বেন জনিকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে।

তাহলে কী করব? —ডঃ সেন উদ্ভ্রান্ত : সব জেনেশুনে একজন ক্রিমিনালকে রাখা? নাঃ, অসম্ভব।

প্রশান্ত বলল,আমি বলি স্যার, জনিকে আগে কৌশলে সরান এখান থেকে, তারপর আমি ওর ব্যবস্থা করব। হুম। ভাবতে থাকেন ডঃ সেন।

অমল বলল, স্যার যদি গুজরালকে ফোন করে বলি, জনি মানে দশরথবাবুর হাইবার্নেশন প্রসেসে গন্ডগোল হয়েছে। একটা মেশিন ঠিকমতো কাজ করছে না। ওকে আজই জাগানো দরকার। নইলে মৃত্যু ঘটতে পারে। মেশিন সারানো হলে ফের ওকে ঘুম পাড়ানো হবে। বড় জোর দিন সাতেক লাগবে। গুজরাল তো সত্যি মিথ্যে ধরতে পারবে না। বলব, আপাতত দশরথবাবুকে নিয়ে যান। মেশিন ঠিক হলেই খবর দেব।

হুঁ, আমিও এই ধরনের ভাবছিলাম। বললেন ডঃ সেন।

ফার্স্ট ক্লাস প্ল্যান। -বলল প্রশান্ত : এমন ব্যবহার করবেন যাতে গুজরাল ঘুণাক্ষরেও টের পায়, আপনারা আসল ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন। ওকে নিয়ে গেলেই, অমল আমায় একটা খবর দিস।

পরের দিন রাত এগারোটা নাগাদ অমলের ফোন এল, প্রশান্ত, জনিকে নিয়ে গেছে গুজরাল।

-কখন?

—আধঘণ্টা আগে। —অর্থাৎ অন্ধকারে লুকিয়ে পাচার। যাক আপদ গিয়েছে। তিনদিন বাদে ভোরে খবরের কাগজ খুলে চমকে উঠল অমল। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে সংবাদ—কুখ্যাত অপরাধী গ্রেফতার। জনি নামে এক চোরাচালানকারীকে একটি খুনের মামলায় বম্বে পুলিশ খোঁজ করছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কলকাতা পুলিশ বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী ফুলাদ মান্ডির কলকাতা অফিসের ম্যানেজার বিনোদ গুজরালের বাড়িতে লুকানো চোরাই মালের সন্ধানে আচমকা হানা দিয়ে জনির সাক্ষাৎ পায়। নেভিল পিন্টো। ওরফে রুস্তম ওরফে জনি নামক এই দুর্ধর্ষ অপরাধীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। জনি গুলি ছুড়ে পালাতে চেষ্টা করে। অবশেষে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে ধরা পড়ে। এই সূত্র ধরে মিঃ গুজরাল এবং বম্বেতে মিঃ মান্ডিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অমল তৎক্ষণাৎ প্রশান্তকে ফোনে জানাল,—আজকে কাগজটা দেখেছিস? জনির খবর?

প্রশান্তর উত্তর এল,—হ্যা দেখেছি বইকি। আমার এক পুলিশ মামার কীর্তিকা পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার। তাকে জনির ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম রে নেই, মাভি তোদের সন্দেহ করবে না।

উঃ সেনের বৈঠকখানা। দু'টি মানুষ মুখোমুখি বসে। বিষণ্ণভাবে ডঃ সেন বললেন, —অমল, আমার এখানে রিসার্চের পাট চুল। মান্ডির থেকে আর সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। এবং তা নেওয়া উচিতও হবে না। তাই ঠিক করেছি, ফের আমেরিকায় চলে যাব। আমার পুরনো রিসার্চ-সেন্টারে গবেষণা করতে। ওখান

থেকে বার বার আমায় ডাকছে। বিদেশে আমি বাস করতে চাই না। কিন্তু কী করব? আমি নিরুপায়। ইন্ডিয়ায় আমার গবেষণার সুযোগ কই?

একটু থেমে বললেন, যদি কখনও আবার সুযোগ মেলে নিজের দেশে থেকে এই বিষয়ে কাজ করতে, অবশ্যই ফিরে আসব। এবং তখন তোমাকে ফের চাই। মনে রেখো কিন্তু।

বেদনাময় কণ্ঠে অমল বলল, স্যার আমি সেই অপেক্ষায় থাকব। প্রার্থনা করি আপনার সাধনা সফল হোক।

হাঙর উপদ্রব রহস্য - অজেয় রায়
Hangor Upadrab Rahassa pdf by Ajeo Ray

বাঃ! চমৎকার।

মুগ্ধ চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে মন্তব্য করে সুনন্দ।

বলার মতোই দৃশ্য বটে। সামনে সুদূরবিস্তারী গাঢ় নীল সমুদ্র। সাগরের ঢেউ অবিরাম কলরোল করতে-করতে এসে আছড়ে পড়ছে ওই দ্বীপের তটভূমিতে। ঢেউগুলি ভাঙতেভাঙতে বেলাভূমিতে খানিক এগিয়ে ফেনার রাশি তুলে এলিয়ে পড়ছে। সমতল বালুময় সাগরতট বেশি চওড়া নয়। বড়জোর পঞ্চাশ মিটার। তারপর জমি উচু হয়ে উঠেছে ক্রমে। পিছনে দ্বীপের ভেতর খানিক উঁচুতে কিছুটা জায়গা সমান। সেখানে একটা তাবু খাটানো। রয়েছে। তাঁবুর পিছনে বড় একটা কুটির। কুটিরটির দেওয়াল ও মেঝে বাঁশের তৈরি। মাথায় টিনের ছাউনি। ঘরের সামনে টানা বারান্দায় বাঁশের রেলিং। পিছনে আরও উঁচু জায়গায় বেশ খানিক তফাতে ঘন সবুজ বন। আর কোনো মানুষের বসতি চোখে পড়ে না। কাছাকাছি। হ্যা, রয়েছে বটে মনুষ্যবাসের চিহ্ন। কিছু দূরে। পাশে। প্রায় আধমাইল তফাতে। উঁচু জমিতে সেখানে বনের কোল ঘেঁষে দেখা যাচ্ছে একটি বাংলো ধরনের একতলা বড় বাড়ি। সেটিরও বাঁশের কাঠামো, টিনের চাল। অবশ্য ওই বাংলোয় কেউ রয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অন্তত বাংলোর বাইরে কোনো লোকের দেখা নেই।

সকাল প্রায় ন'টা। সাগরের গর্জন আর মাঝে-মাঝে সামুদ্রিক পাখির ডাক। ব্যস, আর কোনো আওয়াজ নেই। মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মতো ছিটে লাগা নীল আকাশ। সামনে সাগরে মাইলখানেক দূরে জল থেকে মাথা তুলে রয়েছে একটা কালচে পাথরের স্তুপ। অর্থাৎ, ওখানে জলের নিচে রয়েছে ডুবো পাহাড়।

সেই ছোট্ট নির্জন দ্বীপটির সৌন্দর্যে শুধু সুনন্দ নয়, মামাবাবু নবগোপাল ঘোষও কম মুগ্ধ হননি। তাদের ভাব দেখে ভরতের মুখও খুশি-খুশি।

খাসা জায়গা। এখানে দুটো দিন ভালোই কাটবে।মামাবাবুর কথায় সায় দেয় সুনন্দ, ভরতজি এই দ্বীপে অনেক টুরিস্ট পাবেন। আপনার ব্যবসা ভালো চলবে।

শুনে কিন্তু ভরতের হাসি মুখ মলিন হয়ে যায়। আমতা-আমতা করে বলেন, কী জানি বাবুজি। কেমন চলবে ব্যবসা? ঠিক বুঝছি না।

কেন-কেন? মামাবাবু সুনন্দ একযোগে প্রশ্ন করে অবাক হয়ে। সুনন্দ বলল, এমন সুন্দর পরিবেশ। একটু প্রচার পেলেই কত লোক বেড়াতে আসবে এখানে।

তা হয়তো আসবে।-আনায় ভরত, কিন্তু সমুদ্র তীরে যারা আসে তারা সমুদ্রে স্নান করতে চায়, সাঁতার কটিতে চায়। সে সুযোগ না থাকলে শুধু তীরে বসে সমুদ্র দেখায় ক'জনেরই বা মন ভরে ?

কেন এখানে সমুদ্রে স্নান করতে অসুবিধা কী? জিজ্ঞেস করেন মামাবাবু।

হচ্ছে বাবুজি। ভীষণ এক অসুবিধা। আগে তো বুঝিনি। কেউ বলেওনি বিপদ। এক ছেলে বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় পালেমবাং যেতে-যেতে এই দ্বীপে থামি। তখনই বুদ্ধিটা গজায় আমার। এখানে একটা ট্যুরিস্ট স্পট করলে কেমন হয়? সিঙ্গাপুর থেকে দূরে নয় বেশি।

বন্ধুও উৎসাহ দিল। পাঁচ বছরের লিজ নিলাম এই সমুদ্রতীরটা। ওই বাড়িটা বানালাম। তাবু, আর সব জিনিস কিনলাম ট্যুরিস্টদের এনে এখানে ক'দিন রাখতে। আমার স্ত্রী খুব ভালো রাঁধে। দেশি রান্না তো জানেই। অনেক বিদেশি রান্নাও শিখেছে। স্ত্রীও উৎসাহ দিয়েছিল এই ব্যবসায়। আমার বউয়ের এক বৃদ্ধা মাসি থাকে আমাদের কাছে। আমরা এখানে এলে মাসি আমাদের ছেলেমেয়েকে দিব্যি দেখাশোনা করতে পারবে ক'দিন।।

দু-পয়সা আয় হলে মন্দ কী? আমার জমা টাকা সব খরচা হয়ে গেল এখানের ব্যবস্থা করতে। কিছু ধারও হল। প্রথমে ভালোই চলছিল এই বাবসা। এখানে যখন বৃষ্টি কম হয়, তখনই যা টুরিস্ট পাই। সস্তায় সমুদ্রতীরে কাটানোর লোভে অনেক টুরিস্ট পেয়েছি গোড়ায়। নামকরা বেড়ানোর জায়গায়, ভালো হোটেলে থাকার খরচ অনেক। আমার এখানে খরচ ঢের কম। একটু-আধটু প্রচারও হচ্ছিল আমার এই ব্যবসার। কিন্তু এমন এক উৎপাত শুরু হয়েছে। সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। কী যে করি ভেবে পাই না?

—কীসের উৎপাত? সবিস্ময়ে জানতে চায় সুনন্দ।

ভরত কিন্তু-কিন্তু করছেন বলতে। যেন খোলসা করে বলতে সংকোচ। শুধু বিড়বিড় করলেন, সে ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। আগে বলিনি আপনাদের। বললে হয়তো আসতেন না। মাপ করবেন আমায়। একজনও টুরিস্ট গাইনি তিন মাস। এখনও যে দেনা শোধ হয়নি। ভেবেছিলাম এখানে এসে বলব। না হয় আরও কিছু কম দেবেন।

মামাবাবু চুপচাপ গম্ভীরভাবে শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন, চলুন ভরতজি, আপনার কটেজে যাই। রোদ চড়ছে গরম লাগছে। মনে হচ্ছে এখানে অল্প কথায় সব শোনাতে আপনার অসুবিধা আছে। বরং আপনার কটেজে গিয়ে শুনি সমস্যাটা কী?

—তাই চলুন। সম্মতি জানায় ভরত। তিনজন হাঁটা দেয় ভরতের কুটিরের দিকে। এই ফাকে ওই দ্বীপে আগন্তকদের পরিচয়টা জানিয়ে রাখি। মামাবাবু অর্থাৎ সুনন্দর মামা অধ্যাপক নবগোপাল ঘোষ বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী। বয়স মধ্য চল্লিশ। দোহারা অতি নিরীহ চেহারা। দেখে কে বলবে যে এই মানুষটি কীরকম অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। সুনদরও বিষয় প্রাণিবিজ্ঞান। সে গবেষণা করছে তার এই মামাবাবুর কাছে। দুজনেরই বাস কলকাতা শহরে।

মামাবাবু সুনন্দকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে। তিনদিন বিজ্ঞানের দুরূহ কচকচানি নিয়ে মাথা ঘামানোর পর স্রেফ দিন দুই ছুটি কাটাতে, আয়েস করতে, সেদিন সকালে এই দ্বীপে আগমন ভরত টুরিসম-এর ব্যবস্থাপনায়। দ্বীপটা সিঙ্গাপুরের কাছেই। রিও দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। সিঙ্গাপুর বন্দর থেকে ইঞ্জিন লাগানো নৌকায় মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ।

ভরত যাদবের বয়স প্রায় চল্লিশ। গাট্টাগোট্টা খাটো চেহারা। মুখে সরলভাব আদতে 'ভারতবর্ষের বিহার প্রদেশের লোক। পেটের দায়ে বাস করছেন সিঙ্গাপুরে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে এক গ্রাম সম্পর্কে কাকার হাত ধরে সিঙ্গাপুরে আগমন। দেশে তো জমিজায়গা নেই। দিনমজুরি সম্বল। কঠিন দারিদ্র্য। কাকা অনেককাল আছে সিঙ্গাপুরে। টুকিটাকি ব্যবসা করে কামাচ্ছে বেশ। কাকা ভরসা দিয়েছিল ভরতাকে, সিঙ্গাপুরে দেখবি। ঢের বেশি রোজগার করতে পারবি।

কাকার কথা মিথ্যে হয়নি। সিঙ্গাপুরে ভরত শিখেছেন কাঠমিস্ত্রির কাজ। চমৎক আসবাব তৈরি করেন। রোজগার হয় ভালোই। দেশে মা আর ছোট ভাই-বোননের উলে কিছু টাকাও পাঠান। বিহারে গিয়ে পাশের গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছেন। বছর সাত-আটের দুটি ছেলেমেয়ে আছে তাদের। ফুলে গড়ে। সিঙ্গাপুরে প্রচুর টাকি আসে। পর্যটন ব্যবসায় 'ভালো আয় হয়। রিও দ্বীপপুঞ্জের এই দ্বীপে সেই রকমই ব্যবসা ফাদতে চেয়েছেন ভরত তার কাঠের কাজের পাশাপাশি। নবগোপালবাবুর হোটেলের এক কর্মচারী খোঁজ দেয় ভরতের। খুব কম খরচে থাকাখাওয়া আর অতি নিরালা জলে দ্বীপে দিনরাত কাটানোর আশ্বাস পেয়ে সুনন্দ এবং তার মামাবাবু চলে এসেছেন এখানে। মানে ভরত নিয়ে এসেছেন। দুই দেওয়া, ইঞ্জিন লাগানো, ভাড়া করা একটা জেলে নৌকায়। দু'জন মাঝি নৌকা সামলেছে। দ্বীপে পৌঁছে নৌকা তীরে তুলে রেখে মাঝি দু'জন চলে গিয়েছে অন্য কোথাও। দু-দিন বাদে এসে যাত্রীদের ফেরত নিয়ে যাবে সিঙ্গাপুর। ভরাতের সঙ্গে মামাবাবু ও সুন্দর কথাবার্তা চলে প্রধানত হিন্দিতে। ভরত কিছুটা ইংরেজি জানেন, বাংলাও জানেন অল্পস্বল্প।

ভরতের স্ত্রী আর ওদের কাজের লোক বছর কুড়ির ভগলু একদিন আগেই চলে এসেছে এখানে। অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে।

ভরত দ্বীপে পৌঁছেই ভগলুর সাহায্যে চটপট টাঙিয়ে ফেলেছেন মামাবাবু এবং সুনন্দর থাকার তাবু।

ভরতের কুটিরের বারান্দায় বসল তিনজন টুল পেতে। মামাবাবু বসেই কথাটা পাড়লেন, সমস্যাটা কী শুনি? বলুন ভরতজি। লজ্জা করবেন না।

ভরতের কথা শুরুর আগেই ভরতের স্ত্রী লালমতি বারান্দায় বেতের টেবিলে রেখে গেল তিন কাপ গরম চা এবং এক থালা গরম পকৌড়া। বোঝা গেল যে

ভরতদের আসতে। দেখেই সে তৈরি হয়েছিল আপ্যায়নে।

আঃ খাসা। পকৌড়ায় কামড় দিয়ে উৎফুল্ল সুনন্দ। ভরত বলতে শুরু করেন ধীরে-ধীরে।

জানেন বাবুজি, প্রথম মাস চারেক ভালোই চলেছিল এই ব্যবসা। কম পয়সায় থাকার কারণে বেশ কিছু পার্টি কাটিয়ে গিয়েছে এখানে। কখনও কখনও দুটো তাবু খাটাতে হয়েছে টুরিস্ট রাখতে। সবাই খুশি হয়েছে এখানে থেকে খেয়ে। কিন্তু শুরু হল। এক উৎপাত। এক ভয়ংকর ব্যাপার। আমার এখানের অতিথি কেউ সমুদ্রে স্নান করতে নামলেই খানিক বাদে এখানে জলে হাজির হয় হাঙর। একসঙ্গে অনেকগুলো। আক্রমণ করে জলে নামা মানুষদের। কী বলব, একেবারে তীর অবধি ধেয়ে আসে। ভয়ে মান করতে নামা সবাই উঠে পড়ে জল থেকে। জলের ওপর হাঙরের পিঠের তেকোনা পাখনা দেখলেই যে টের পাওয়া যায় ওগুলো আসছে এদিকে। এক আমেরিকান সাহেবের হাত কামড়ে জখম করে নিল হাঙর। মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছে লোকটি। আর এক বামির টুরিস্টের পায়ে কামড় বসিয়েছিল। রীতিমতো জখম হয়। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এই রক্ষে।

লোক মুখে এই বিপদ চাউর হয়ে গেল। ভয়ে এখানে টুরিস্ট আসা একদম কমে গিয়েছে।

শুধু সমুদ্র দেখতে আর ক'জন আসে? বেশিরভাগ টুরিস্ট চায় সমুদ্রে স্নান করতে, সাতার কাটতে। আমার সব আশা লাটে ওঠার জোগাড় হয়েছে। এই বিপদের কথাটা জানিয়ে না রাখলে আমার পাপ হবে। জলে নামলে দোহাই খুব খেয়াল রাখবেন। হাওরের পিঠের পাখনা দেখলেই উঠে পড়বেন তীরে।

ওই এসে গিয়েছে। সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে বলে ওঠেন 'ভরত, দেখুন বাবুজি, দূরে জলের ওপর হাঙরের পিঠের পাখনা দুটো।

ভরতের মুখে আর বাক্য জোগায় না। গভীর হতাশায় কপালে হাত রেখে মাথা নিচু করে থাকেন। মামাবাবু বললেন, এই উপদ্রব হঠাৎ শুরু হয়েছে?

—হ্যা তাই।

–আচ্ছা যখন আপনি এখানে কটেজ বানালেন তখন হাওয়া দেখেননি বেশি?

মানে।

তীরের কাছাকাছি।

–আচ্ছ, ওই কটেজটা কার? মামাবাবু ডানপাশে কিছু দূরে অন্য কটেজটি দেখান।

ওটা মিস্টার লির। চুংলি। সিঙ্গাপুরের ধনী ব্যবসায়ী। শখ করে বানিয়েছেন ওই কটেজ। বেড়াতে আসেন মাঝে-মাঝে। ছোট একটা লঞ্চে চেপে। ওর নিজের লঞ্চ।

একা আসে?

—কখনও একা। কখনও কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। হইচই ফুর্তিটুর্তি করে।

—লি বা তার বন্ধুরা সামনের সমুদ্রে স্নান করে ?

—তা করে। সাঁতারও কাটে।

—ওদের ওপর হাঙরের আক্রমণ হয়েছে কখনও?

—না। একবারও শুনিনি। দেখিওনি। আশ্চর্য! মামাবাবু ভুরু কুঁচকে কী জানি ভাবেন। অতঃপর বলেন, কখনও এমন হয়েছে কি, আপনার ট্যুরিস্ট এবং চুংলি বা তার লোকরা একই সময় সমুদ্রে নেমেছে। কিন্তু শুধু আপনার এলাকায় লোকদের ওপর আক্রমণ করেছে হাওর? ওদের কিন্তু করেনি।

ভরত বলল, 'আমরা এদিকে সমুদ্রে নামলে ওরা কনও সমুদ্রে নামে না। আমাদের অপছন্দ করে, তাই বোধহয়।

মিস্টার লির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো নয় বুঝি?

না। থতমত খেয়ে জানান ভরত।

- আসলে আমি এখানে টুরিস্ট আনি চায়নি লি। এখানে আমি টুরিস্ট আনলে ওর নাকি শান্তিভঙ্গ হবে। যখন কটেজটা বানাচ্ছি, আমায় শাসানির সুরে বারণ করেছিল এই ব্যবসা করতে। এমনকী আমায় বলেছিল, লিজ বাতিল করে দাও।

যদি ফাইন লাগে আমি দিয়ে দেব। কিন্তু, ওর হুমকিতে আমার জেদ চেপে যায়। লি সাহাবের কথা মানিনি। কটেজ বানাই। টুরিস্ট রাখার ব্যবসা চালাই। লি আর আমার সঙ্গে কথা বলে না মোটে। বরং হুমকি দিয়েছে, আমার কেউ ওর এলাকায় ঢুকলে গুলি করবে। কিন্তু লির এলাকায় আমাদের ঢোকার দরকার কী? আমার টুরিস্টদেরও সাবধান করে দিই, ওর এলাকায় যেন একদম পা না দেয়।

—লির কটেজ কি অন্য সময় ফাঁকা পড়ে থাকে?

—না। একজন লোক বাংলো দেখভালো করে সারা বছর। এই দ্বীপে বিদ্যুতের বার নেই। তবে ওদের জেনারেটর আছে। দরকারে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে, ফ্যান ঘোরে কটেজে। মস্ত বড়লোক যে। আমার তো ইলেকট্রক আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করার সাধ্য নেই। আলো বলতে মোমবাতি আর হ্যাজাক বাতি ভরসা। তাই খুব কম পয়সা নিই ট্যুরিস্টদের থেকে। তবে আমার বউয়ের হাতের রান্না খেয়ে সবাই খুশি হয়। আপনার এই কটেজ কি ফাকা পড়ে থাকে টুরিস্ট না এলে? প্রশ্ন করে সুনন্দ।

—হ্যা। যাই বলা যায়। তবে গ্রামের একটি লোক মাঝে-সাঝে দেখভালো করে যায়। কিছু পয়সা নিই তাকে। গ্রাম! এখানে গ্রাম আছে?—সুনন্দ অবাক।

—আছে। ওই জঙ্গলের ওপাশে। উল্টোদিকে। ছোট্ট গ্রাম। জেলেদের। পুরুষরা বেশিরভাগ সময়ই কাজের ধান্দায় বাইরে থাকে। আমাদের নৌকার মাঝিরাও ওই গ্রামের লোক। ওরা গ্রামের বাসায় কাটাতে গেছে দুটো দিন। এ-পাশটায় গ্রামের লোক আসে খুব কম। কাছেই অঙ্গলের ভেতর একটা পুকুর আছে। সেখান থেকে জল এনে ধোয়ামোছা রান্নাবান্না করি। জল ফুটিয়ে খাই।

মামাবাবু বললেন, ধরুন আপনি এখানকার পাততাড়ি গুটোলেন। কিন্তু অন্য কেউ তো এসে এখানে ট্যুরিস্টস্পট বানাতে পারে? চুংলির শান্তিভঙ্গ করতে পারে। তখন?

সে সম্ভাবনা কম। আসলে এই দ্বীপে আসা-যাওয়ার বেশ অসুবিধে। কয়েকটা ডুবো পাহাড় 'আছে দ্বীপটার আশেপাশে। তাই জাহাজ বা বড় স্টিমার চলে না দ্বীপ ঘেঁষে। সিঙ্গাপুর থেকে যেসব জাহাজ বা স্টিমার সার্ভিস নিয়মিত যাত্রী নিয়ে যাওয়া-আসা করে। সুমাত্রা, জাভা কিংবা আর কোথাও সেগুলো অন্য পথে যায়। এই জীপে আসা-যাওয়ার ভরসা। ছোট লঞ্চা বা নৌকা। তাই জাহাজ স্টিমার বা

এরোপ্লেন থামে যেখানে, তার কাছাকাছি বড় বড় ট্যুরিস্ট বেড়ানোর আস্তানা গড়ে উঠেছে। ভালো-ভালো হোটেল হয়েছে। এই দ্বীপের ওপর কারও নজর পড়েনি। তাই তো কম টাকায় জমিটা লিজ পেয়ে গেলাম।

ঠিক, ঠিক। চমৎকার নিরিবিলি। আমরা এমনি জায়গাই চেয়েছি। মামাবাবু উৎসাহ দেন ভরতকে, আপনি এখুনি হাল ছেড়ে দেবেন না। আপনার সমস্যাটা নিয়ে ভাবি একটু। দেখি কী করা যায়?

দুপুরের আহার হল খাসা। ভাত ডাল সবজি মাছভাজা চাটনি। সত্যি ভারতের স্ত্রীর ৰামার হাত অতি উত্তম। খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক তাবুতে ক্যাম্পখাটে শুয়ে বিশ্রাম নিয়েই মামাবাবু বললেন, সুনন্দ, চলো সি-বিচটা একবার ঘুরে দেখি। মামাবাবু ভরতকেও ডেকে নিলেন সঙ্গে।

ভারতের তাবুর সামনে সমুদ্রতট ছোট হলেও পরিচ্ছন্ন। তখন ভাটার সময়। জল খানিক পিছিয়ে গিয়েছে। ভেজা বালির ওপর পড়ে রয়েছে কতরকম ঝিনুক। তড়বড়িয়ে দাড়া বাগিয়ে ঘুরছে ছোট-বড় কাঁকড়া। কাছাকাছি অনেকগুলি আকাশছোঁয়া নারকেল গাছ। গরম বেশ। এই জায়গার কাছ দিয়ে গিয়েছে নিরক্ষরেখা। তাই এখানে সারা বছরই গরম আবহাওয়া। যখন-তখন বৃষ্টি নামে বছরভর।

জলের ধার ঘেঁষে চুপচাপ ধীর পায়ে হেঁটে মামাবার চুংলির কটেজের দিকে চললেন।

পিছনে সুনন্দ ও ভাত। এক জায়গা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক পাথরের স্তুপ। ওই পাথরের সুপের মাঝামাঝি দিয়ে একটা সরু খাড়ি ঢুকে গিয়েছে। ভরত বললেন, এই খাড়িটাই আমার আর চুংলিসাহেবের জমির সীমানা। এপারে আমার, ওপারে চুংলির এলাকা।

সেই পাথরের ঝুঁপ দু-পাশে এবং পিছন দিকে ঢালু হয়ে মিশেছে দ্বীপের তটভূমিতে। নিশ্চয় এ কোনো ডুবো পাহাড়ের ডগা। ক্রমাগত সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে এই ঘড়ির সৃষ্টি, সৃপের নরম পাথর ভেদ করে। মামাবাবুরা তিনজন ঢাল বেয়ে সাবধানে ওই পাথরের সূপের মাথায় ওঠে। নিচে তাকায় খড়ির মধ্যে। খাড়িটা লম্বায় বিশ-পঁচিশ ফুট। ভেতরের অংশের পাড় খাড়া। কতটা গভীর বোঝা

গেল না। ভাটার সময়েও সেখানে জল এসে ঢুকছে। লির কটেজটা দেখা যাচ্ছে। তবে সেখানে কোনো মানুষের দর্শন মিলল না।

মামাবাবু তীক্ষ্ণ চোখে খাড়ি-গর্ভে দেখতে-দেখতে প্রশ্ন করেন 'ভরতকে, আচ্ছা, যখন আপনার টুরিস্ট জলে নামে, তখন কি লির কোনো নৌকা সমুদ্রে ভাসে?

কখনও-কখনও জানালেন ভরত।

—ওই যে খানিক দূরে জলের মধ্যে পাথরের স্তুপ দেখছি, ওর কাছে কি যায় তখন লির নৌকা?

না। ওই স্কুপের খুব কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। জলের নিচে পাহাড়ে ধাক্কা খাবে নৌকা। ডুবে যাবে।

-হুম। মামাবাবু আবার মন দিয়ে খাড়ির ভেতরটা দেখেন। দেখতে-দেখতে হঠাৎ স্থির দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে তিনি একটু নিচে নেমে যান পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে। তারপর সটান শুয়ে পড়েন উপুড় হয়ে ওখানে পাথরের ওপর অল্প একটু সমান জায়গায়। চাপা গলায় বলেন, সুনন্দ আমায় কি দেখা যাচ্ছে, চুংলির দিক থেকে?

এমনিতেই চুংলির এলাকায় শাড়ির পাড় মাঝে-মাঝেই ভরতের দিকের চেয়ে বেশি উঁচু। সুনন্দ তাই মাথা নেড়ে ইশারায় জানাল না।

এরপর মামাবাবু কঁাধের ব্যাগ থেকে বের করলেন একটা দূরবিন। দুরবিনে চোখ লাগিয়ে খাড়ির 'অপর দিকের খাড়া গায়ে দেখতে-দেখতে নিচু স্বরে বললেন, ভরতজি। আপনি এখানে নেমে আসুন তো গা ঢাকা নিয়ে।

মামাবাবু এরইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন সুনন্দকে, সুনন্দ তুমি ওপরে দাঁড়িয়ে নজর রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই আমায় সাবধান করে দিও।

ভ্যাবাচ্যাকা ভরত ধীরে-ধীরে নেমে মামাবাবুর কাছে গিয়ে বসলেন। মামাবাবু ভরতের হাতে দুরবিনটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন, ওইপাড়ে পাথরের গা দিয়ে একটা সরু দড়ি যেন নেমে গিয়েছে জলের ভিতর?

ভৈরত দূরবিন দিয়ে দেখে বললেন, হাঁ। তাই মনে হচ্ছে।

মামাবাবু বললেন, ওই দড়িটা এমনভাবে ঝুলছে যেন কিছু বাধা আছে দড়িতে, জলের তোড়ে তাই সরে যাচ্ছে না। ওই দড়িটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। কিছু বাধা আছে কিনা দেখতে চাই। কীভাবে করা যায়? নামতে পারবেন জলে?

খাড়ির ভেতর সাগর জলের উচ্ছ্বাস তখন বেশ স্তিমিত। তবু জলে নেমে ওপাশে গিয়ে দড়িটা আনতে সোনামনা করেন ভরত। বোধহয় হাঙরের ভয়ে। মামাবাবু ব্যাপার বুঝে বললেন, থাক। জলে নামতে হবে না। অন্য ব্যবস্থা করছি। তিনি তার ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বের করলেন পিচ বোর্ডের নলে জড়ানো সরু শক্ত সুতো আর বড়শির মতো 'ইঞ্চি দুই লম্বা একটা লোহার আংটা। মামাবাবুর কাধে ভোলো সর্বক্ষণের সঙ্গী ওই বড় ব্যাগটায় কত যে রকমারি জিনিস থাকে।

সুতো অনেকখানি খুলে মামাবাবু সুতোর ডগায় বাঁধলেন আংটাটা। তারপর পাক খাইয়ে ছুড়লেন সুতোটা। দু-দুবারের চেষ্টাতেও কিন্তু আংটা দড়িতে আটাল না। হতাশ মামাবাবু ভরতকে বললেন, — আপনি চেষ্টা করবেন নাকি?

এ ব্যাপারে ভরত অনেক বেশি দক্ষ। তার প্রথম ছোড়াতেই সুতোয় বাধা আংটা আটকে গেল দড়িতে। মামাবাবু টপ করে সুতোটা ভারতের হাত থেকে নিয়ে খুব সাবধানে সেটা টানতে লাগলেন কাছে। আংটায় লাগা দড়ি ক্রমে কাছে আসে। মামাবাবু বিড়বিড় করেন, বেশ ভারী কিছু বাধা আছে দড়িতে জলের তলায়।

দড়িটা এপাড়ের খুব কাছে এলে মামাবাবু সেটা গুটিয়ে তুলতে লাগলেন। সরু নাইলন। দড়ি। দড়ির ডগায় বাঁধা রয়েছে একটা বড় স্টিলের কৌটো-ফুটখানেক লম্বা। গোল আকার। মাথায় প্যাচ দিয়ে আটকানো ঢাকনা। ঢাকনার ওপর একটা ছোট আংটা। দড়িটা কৌটোর সেই আংটায় কয়েকবার পেচিয়ে শক্ত গিট দিয়ে বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত খাড়ির ওপাশে কোথাও আটকে রয়েছে। কৌটোর একদম ওপরের দিকে হোমিওপ্যাথির শিশির। সাইজের একটা ছোট্ট গোল ফুটো। কাত করতেই ফুটো দিয়ে একটু জল পড়ল।

মামাবাবু কৌটোর ঢাকনির পাট খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। খুব জোরে আঁটা। পিছলে যাচ্ছে হাত। তিনি কৌটোর ঢাকনি থেকে দড়িটা খুলে ফেললেন। ভরতকে বললেন, ওই কৌটোর ওজনের একটা পাথরের টুকরো বাধুন দড়ির মাথায়। তারপর জলে নেমে দড়িটা আগের মতো ঝুলিয়ে দিন ওধারে গাড়ির গায়ে। ভয় নেই। গাড়িতে হান্ডর নেই এখন। থাকলে ঠিক দেখা পেতাম।

ভরত মামাবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী পাথর বেঁধে দড়িটা খাড়ির অপর পাড়ে ঝুলিয়ে রেখে এল বটে। কিন্তু তার হাবেভাবে মনে হচ্ছিল যেন মামাবাবুর ভরসাতে বিশেষ আস্থা নেই। মামাবাবু ইতিমধ্যে সেই কৌটোটা পুরে ফেলেছেন তার ব্যাগে।

ফিরে যেতে যেতে মামাবাবু প্রশ্ন করেন ভরতকে,আপনার টারিস্ট এলে চুংলির লোক কি খাড়ির কাছে এসে লক্ষ করে ?

—তা করে। খেয়াল করেছি কয়েকবার। ফিরেই মামাবাবু নিজের তাবুতে ঢুকে গেলেন। চা বিস্কুট পাঠিয়ে দিতে বললেন। সুনন্দ বুঝল, আপাতত মামাবাবু অন্য চিন্তায় মগ্ন। এখন তার গল্পগুজবের ইচ্ছে নেই।

ঘন্টাখানেক বাদে এলেন মামাবাবু। আর এসেই ঘোষণা করলেন, ভরতজি। কাল সকালে আমি একবার সিঙ্গাপুরে যাব। এই সাতটা নাগাদ রওনা হতে চাই। কালই ফিরতে পারি। নইলে পরশু। সুনন্দ, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি একা যাব।

শুনে সুনন্দ থ। তবে মামাবাবু এরকমই খেয়ালি মানুষ। প্রশ্ন করা তিনি পছন্দ করবেন না।

ভাত বেশ অবাক হয়ে বললেন, -বেশ। ভগলুকে গ্রামে পাঠাচ্ছি এখুনি, মাঝিদের খবর দিতে।

মামাবাবু বললেন, এই বাড়তি যাওয়া-আসার খরচ আমি পুষিয়ে দেব। মাঝিদেরও বকশিশ দেব।

মামাবাবুর পরের প্রশ্নটা অদ্ভুত, আচ্ছা ভরতজি চুংলির কটেজে কি মুরগি বা ছাগল পোষে?

–তা পোষে। কয়েকটা মুরগি আর ছাগল আছে। দুধ ডিম মাংস খায়।

সেদিন রাতে গরম-গরম আটার হাতরুটি, ডিমের কালিয়া আর পায়েস দিয়ে জমিয়ে খেল সবাই। আনমনা মামাবাবু অবধি তারিফ করলেন, বাঃ! ভরতজি আপনার রান্নার হাত চমৎকার।

সুনন্দ খেয়াল করে, ভোররাতে মামাবাবু ভরতকে নিয়ে চলে গেলেন ঘড়ির দিকে। ফিরলেন খানিক বাদে। কী করতে গিয়েছিলেন তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। | সকাল সাতটা নাগাদ মামাবাবু সিঙ্গাপুর চলে গেলেন নৌকায়। যাওয়ার আগে তিনি সুনন্দকে বলে গেলেন, নজর রেখো চুংলির লোক ঘড়ির কাছে আসে কিনা। সমুদ্র স্নান একদম নয়। আর তোমরা কেউ ওই গাড়ির কাছে যেও না।

মামাবাবু চলে যেতেই সুনন্দ ভরতকে পাকড়ায়, ভোরে খাঁড়িতে কী করতে গিয়েছিলেন?

সেই কৌটোটা ফের দড়িতে বেঁধে আগের মতো গুলিয়ে রেখে এলাম। সারাটা দিন সুনন্দ একা-একা ঘুরে বেড়ায় দ্বীপে। বেলাভূমিতে কতরকম সামুদ্রিক জীব দেখল। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকল না। ধারে-ধারে ঘুরল। সেখানে বুননা আনারসের ঝোপ দেখে সে অবাক। ছোট-বড় প্রচুর আনারস ধারে রয়েছে। এক পাল ছোট আকারের বাঁদর ছিল বনে। অচেনা লোক কাছাকাছি ঘুরতে দেখে তারা কিচিরমিচির ডেকে বেজায় লাফঝাপ শুরু করে।

মামাবাবু সেদিনই ফিরলেন সন্ধের আগে। মুখ প্রসন্ন। অর্থাৎ যাত্রা বোধহয় সফল হয়েছে। পরের দিনও মামাবাবু ও সুনন্দ কাটাল ওই দ্বীপে। মামাবাবু স্রেফ তাবুতে বা তাঁবুর বাইরে বসে সমুদ্র দেখে কাটিয়ে দিলেন। তবে কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন। কারণ কথাবার্তা বলছিলেন খুব কম।

পরদিন মামাবাবু সুনন্দ ও ভরত দ্বীপ ছেড়ে নৌকায় পাড়ি দিল সিঙ্গাপুর। নৌকা নাকি আবার ফিরে এসে ফেরত নিয়ে যাবে মালপত্রসহ 'ভরতের স্ত্রী এবং ভগলুকে।

সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি পৌঁছেছে ভরতদের নৌকা। ওই সময় একটা ছোট লঞ্চ পাশ দিয়ে উল্টো দিকে বেরিয়ে গেল। ভরত বললেন, চুংলি সাহাবের লঞ্চ। বোধহয় ওই দ্বীপে যাচ্ছে।

মামাবাবু গম্ভীরভাবে আড়চোখে দেখলেন লঞ্চটা। সিঙ্গাপুরে ফিরেই মামাবাবুর ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি সেই প্রোগ্রাম বাতিল করে দিলেন। রায়ে গেলেন সিঙ্গাপুরের হোটেলে। কিন্তু ঘরে থাকতেন না বেশি। হরদম বেরিয়ে যেতেন। একা। সিঙ্গাপুরে কী করতে যে রয়েছেন মামাবাবু বোঝে না

সুনন্দ। সে বেচারি বাধ্য হয়ে সিঙ্গাপুর শহরে টহল মারতে লাগল। কখনও-কখনও ভরতের বাড়ি গিয়ে চা আর গরম পর্কৌড়া সাঁটায়।

-তৃতীয় দিন সকালে ভরত হঠাৎ হাজির হলেন হোটেলে, আমায় ডেকেছেন বাবুজি?

কিছু দরকার? আবার যাবেন নাকি এই দ্বীপে?

মামাবার বোধহয় ভরতের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, আসুন আসুন। নাঃ, এবার আর ওই দ্বীপে যাওয়ার সময় নেই। আপনাকে। ডেকেছি কটা খবর শোনাতে। খুব দামি খবর।

-খবর! কী খবর বাবুজি?

-এবার থেকে আপনি ওই দ্বীপে চুটিয়ে ব্যবসা করুন। ট্যুরিস্ট আনুন। তাদের সমুদ্রে স্নান করতে দেবেন নিশ্চিন্ত মনে। আপনার লোক জলে নামলেই যে হাঙরের উপদ্রব হত তা আর হবে না একদম। যতক্ষণ ইচ্ছে তারা স্নান করুক। সাঁতার কাটুক। মামাবাবুর কথা শুনে শুধু ভরত নয়, সুনন্দও হতভম্ব।

ভরত আমতা-আমতা করেন, ঠিক বলছেন বাবুজি?

ভরসা দিচ্ছেন?

—হা। পুরো ভরসা।

—আপনি কিছু কৌশল করলেন বুঝি?

তা বলতে পারেন করেছি। কী করেছি পরে জানতে পারবেন। এখন বলব না।

ভরত হাতজোড় করে মামাবাবুকে গদগদ স্বরে বলেন, আপনার বহুত মেহেরবানি বাবুজি।

কী কৌশল করলেন মামাবাবু হাঙরের উৎপাত ঠেকাতে? সুনন্দর মনে প্রচণ্ড কৌতুহল। কিন্তু ভরাতের সামনে প্রশ্ন করে লাভ নেই। মামাবাবু এখন চাইছেন না বলতে।

মামাবাবু হাসিমুখে বলেন, আর-একটা সুখবর দিচ্ছি। চুংলির হাল খুব খারাপ। ওই দ্বীপে ওর ডেরা ভেঙে গিয়েছে। আর ও আপনার সঙ্গে কামেলা করতে পারবে না।

—কী হয়েছে চুংলির? প্রশ্নটা যুগপৎ ভরত ও সুনন্দর।

—তাকে পুলিশে ধরেছে কাল। ফাটকে পুরেছে। চুংলি আর তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গকে। বিচারে বেশ ক'বছর জেল খাটতে হবে নির্ঘাত।

কেন? কী করেছে সে?

পরে ঠিক জানতে পারবেন। আমি যখন কিছু বলছি না। হ্যা, আমরা কাল সিঙ্গাপুর ছাড়ছি। আবার আসব বছরখানেক বাদে। তখন ওই দ্বীপে যাব। আপনার স্ত্রীর রান্না খাব। সমুদ্রে স্নানও করব।

খুশিতে ডগমগ ভরত বিদায় নিলেন।

ভরত চলে যেতেই উত্তেজিত সুনন্দ বলে, ব্যাপারটা খুলে বলুন মামাবাবু। ওখানে হাশুরের উপদ্রব আর হবে না কেন? চুংলিকে অ্যারেস্ট করেছে কেন?

মামাবাবু হেসে বললেন, রসসা বাপু, অত তাড়া দিও না। আগে এক কাপ চা খাই।

সুনন্দ উন্মুখ। চায়ে চুমুক দিয়ে মামাবাবু শুরু করেন, দেখ, হাঙরের উৎপাতের ব্যাপারটা শুনেই আমার মনে খটকা লাগে। কী ব্যাপার? শুধু ভরতের কটেজের সামনে। সমুদ্রে হাঙর আসে কেউ জলে নামলেই। অথচ চুংলির এলাকায় সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব হয় না? দুটো সাগর তো পাশাপাশি মেশামেশি। আর-একটা প্রশ্ন–ভরতের কেউ যখন সমুদ্রে নামে, চুংলির কটেজের কেউ তখন সমুদ্রে নামে না কক্ষনো। অর্থাৎ ওপক্ষক জানে যে এখুনি হার আসবে ওখানকার সমুদ্রে? তাহলে কি ইচ্ছেমতো হাঙর ডেকে আনা হয় ভরতের কেউ হলে নামলে? যদি তাই হয়, কে করে? উপায়ে?

—এই প্রশ্নগুলো আমার মনেও এসেছিল।

-আসা উচিত। খুবই স্বাভাবিক। আমার সন্দেহটা চুংলির ওপরেই পড়ে। কারণ ওই জীপে ভরতের পর্যটন ব্যবসায় তার ঘোর আপত্তি ছিল গোড়া থেকেই। ভরতকে ওখান থেকে সরাবার চেষ্টা করেছে। হুমকি দিয়েছে। মনে হল, এ নির্ঘাত চুংলির কর্তি।

—কিন্তু হাঙ্গর লেলিয়ে দিত কীভাবে? এ কি সম্ভব?

-হ্যা সম্ভব। আমিও প্রথমে ভেবে পাচ্ছিলাম না কা উপায়ে করছে। তবে ওই নিয়ে ভাবতে-ভাবাতে একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় আসে হঠাৎ রক্ত। তাজা রক্ত। জানো তো, হাঙরের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। কিন্তু ওদের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। হার মাংসাশী হিংস্র প্রাণী। সমুদ্রজলে কোনো জীবের গা কেটে গিয়ে রক্ত বেরুলে হাঙর মাইলখানেক বা, আরও দূর থেকে সেই রক্তের গন্ধ পায় এবং শিকারের লোভে ওই রক্তের উৎস সন্ধানে ধেয়ে আসে। আমার মনে হয়েছিল ভরতের কেউ সমুদ্রে নামলেই চুংলির লোক কাছাকাছি সমুদ্রে ভরতের সি-বিচ ঘেষে তাজা রক্ত কিংবা তাজা রক্তমাখা মাংস খণ্ড ফেলে দেয়। সমুদ্রের জলে। তবে মাংস ফেললে 'তা খানিক বাদেই ঢেউয়ের তোড়ে তীরে এসে পড়বে। খানিকটা শুধু রক্ত ফেললেও তা স্রোতে দূরে সরে যাবে। খুব কাছে না থাকলে হাঙর ঠিক ভরতের এলাকার সমুদ্রে হামলা করতে আসবে না। স্রোতে ভাসা রক্তের গন্ধ অনুসরণ করে অন্য কোথাও চলে যাবে। চুংলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

পরে ভেবে মনে হল, আর-একটা উপায় হতে পারে। | চুংলির লোক হয়তো কোনো পাত্রে তাজা রক্ত ভরে সেটা দড়িতে বেঁধে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখে, ভরতের এলাকার সমুদ্রের কাছেই কোথাও। দড়ির অন্যপ্রান্ত ধাঁধা থাকে তীরে। পাত্র থেকে বেরোয় রক্ত। সমুদ্রের জলে মেশে। পাত্রটা তীরে বাঁধা থাকার জন্য ভেসে যায় না। ফলে কাছাকাছি বা বেশ দূরের হাঙর জলে ওই রক্তের গন্ধ পেয়ে রক্তের উৎস খুঁজতে খুঁজতে সাঁতরে চলে আসে ভরত এবং চুংলির সাগর এলাকায়। তাই তাজা রক্ত ভরা পাত্র জলে ডুবিয়ে রেখে চুংলির কেউ কদাপি সমুদ্রে নামে না। খানিক বাদেই হাঙরের আক্রমণ হবে জানে যে।

সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখা এমন কোনো কৌশল খুঁজতে-খুঁজতে সমুদ্রতীরে খাড়ির মধ্যে লুকনো ওই দড়ি বাঁধা কৌটোটা নজরে আসে। তোমরাও দেখেছ কৌটোটা। কৌটোর ঢাকনি তখন খুলতে পারিনি। তাঁবুতে গিয়ে খুলি। কৌটোয় অল্প জল ছিল। লালচে জল। কৌটোর ভেতরে কোথাও কোথাও ছিল কালচে ছোপ। কৌটোর জলে রক্ত আছে কিনা জানা দরকার। দ্বীপে মাইক্রোস্কোপ নেই।

তাই পরদিন সিঙ্গাপুরে চলে গেলাম পরীক্ষা করতে, কৌটোর জল শিশিতে পুরে কৌটোর ভিতরের গা টেচে কালচে ছোপের একটু স্যাম্পল নিয়ে। কৌটোটার ভিতরে গন্ধ শুকে আমি অবশ্য যাওয়ার আগেই মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে, জলে রঙ মেশানো আর ওই কালচে দাগটা রক্তের। সিঙ্গাপুরে গিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলাম যে আমার আন্দাজ সঠিক। প্যাথোলজিস্ট ডক্টর তাকাহাসিও পরীক্ষা করে তাই জানালেন।

অথাৎ আমরা দ্বীপে আসার পরেই চুংলির লোক তাজা রক্ত ভরে কৌটোটা ডুবিয়ে রেখে গিয়েছিল খাড়িতে। মুরগি ছাগল বা অন্য কোথাও প্রাণীর রক্ত। লুকিয়ে এসে টুক করে ফাঁদ পেতে পালিয়েছে। তখন সমুদ্রে নামলে কী হতে পারত বুঝেছ?

সুনন্দ বলে, খুব বুঝেছি। কৌটোর ফুটো দিয়ে একটু-একটু বেরিয়েছে রক্ত। সেই রক্ত মিশেছে খাড়ির জলে। সেখান থেকে রক্ত মেশা জল গিয়েছে সামনের সমুদ্রে। হাঙরের টোপ। খানিক বাদে আমরা কেউ জলে নামলেই হাঙরে ধরত। সেদিন দেখলামই তো, হাঙর এসে গিয়েছিল কাছাকাছি। বাপরে খুব বেঁচে গিয়েছি।

মামাবাবু বললেন, এই কায়দাই করছিল চুংলি, ভরতের ট্যুরিস্ট জলে নামলে। এবারও আশা করেছিল, আমরা একটু বাদেই সমুদ্রে নামব।

সুনন্দ বলে, কিন্তু মামাবাবু চুংলিকে পুলিশে ধরেছে কেন? ওকে অনেক বছর জেল খাটতে হবে কেন ? রক্তের ফাঁদ পেতে ভরতকে জব্দ করার দুর্বুদ্ধি, ওই দ্বীপে ভরতের ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা অপরাধ নিশ্চয়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ নয়। এর জন্যে ফাইন করতে পারে, সতর্ক করে ধমকধামক দিতে পারে আদালত। বড়জোর কিছুদিন জেল খাটা। কিন্তু অনেক বছর জেল খাটার মতো অপরাধ কি? জানি না অবশ্য এদেশের আইনকানুন!

মামাবাবু বললেন, ঠিক বলেছ, ভরতকে ওহ জব্দ করার চেষ্টা মোটেই তেমন বড় অপরাধ নয়। তা প্রমাণ করাও শক্ত। চুংলি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেক বছর জেল খাটতে হবে অন্য কারণে। ঢের গুরুতর অপরাধ।

-কী রকম?

-জানো, ভরতকে ওই দ্বীপ থেকে তাড়াবার এই অভিনব ফন্দি আবিষ্কারের পর আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। ভরত কী এমন অসুবিধে করছিল চুংলির? ভরত তো মাঝেসাঝে অল্প ক'জন ট্যুরিস্ট নিয়ে যায়। কয়েকদিন মাত্র থাকে। বেশি লোকের ব্যবস্থা করার সাধ্যি নেই ভরতের। ওই জংলা দ্বীপে বেশি ট্যুরিস্ট যাবেই বা কেন? থাকবেই বা কেন বেশিদিন? এর জন্যে এত মাথাব্যথা কেন চুংলির? নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে। চলে গেলাম আমার পরিচিত সিঙ্গাপুরের এক পুলিশ কর্তার কাছে। খুলে বলি সব। পুলিশ কর্তাটির মনেও খটকা লাগে। সন্দেহ হয় কিছু। আমরা যেদিন এই দ্বীপ ছাড়ি তার পরদিনই পুলিশ ফোর্স হানা দেয় ওই দ্বীপে। একেবারে হাতেনাতে ধরে শয়তান চুংলি আর তার কয়েকজন সাকরেদকে।

-কেন কেন?

–চোরাই মাদকদ্রব্য রাখার অপরাধে। ওই দ্বীপ ছিল চুংলির ঘাঁটি। দ্বীপে ওর বাংলোয় মাটির নিচে কুঠুরিতে পাওয়া গিয়েছে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশার বস্তু। হেরোইন আরও কী-কী। ওখান থেকে সুবিধেমতো নানা জায়গায় ওইসব মাদক পাচার করত। ওটাই ছিল চুংলির টাকা কামাবার আসল কারবার। পাছে ভরত কিছু টের পেয়ে যায় তাই কায়দা করে তাড়াতে চাইছিল ভরতকে। আচ্ছা কৌশল করেছিল বটে। ঘটনাটা শিগগির খবরের কাগজে বেরুবে। তখন সবই জানতে পারবে।ওঃ এই ব্যাপার! সুনন্দ স্তম্ভিত।

সমাপ্ত